[অন্তঃপুর]

সচিত্র মাসিক পত্রিকা।

(কেবল মহিলাগণকর্ত্তৃক লিখিত ও সম্পাদিত।)

স্বর্গীয়া বনলতা দেবী কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত।

সম্পাদিকা শ্রীমতী হেমন্তকুমারী চৌধুরী।

[[illegible] বর্ষ ১৩১০ সাল।]

১৯০৩ - ১৯০৪ খৃঃ।

গ্রিম বার্ষিক মূল্য ডাকমাশুল সমেত দেড় টাকা মাত্র।

র্য্যালয় আফিস—৩২নং সুকিয়া ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ahpur Office—32, Sukea's Street, Calcutta.

[সন ১৩১০ সাল।]

অন্তঃপুরের ষষ্ঠবর্ষের সূচীপত্র।

অকারাদি বর্ণমালানুসারে

যমুনা ঘাট, হইতে তাজমহল।

অন্তঃপুর

সচিত্র মাসিক পত্রিকা।

ANTAHPUR

AN ILLUSTRATED MONTHLY JOURNAL IN BENGALI.

Edited and contributed to by the ladies only.

কেবল মহিলাগণ কর্ত্তৃক লিখিত ও সম্পাদিত।

ক্ষুদ্র আমি, অণু আমি, বিশাল জগতি তলে,
তবু ত রয়েছি বেঁচে, তোমারি করুণা বলে।
যেটুকু শকতি আছে, সাধিতে তোমার কাজ,
সঁপি যেন ও চরণে, এই কর বিশ্বরাজ!

৬ষ্ঠ বর্ষ।	বৈশাখ, ১৩১০ বঙ্গাব্দ।	VOL. VI.
১ম সংখ্যা।	MAY, 1903.	NO. 1.

নব বর্ষের অঞ্জলি।

সর্ব্বশক্তিমান্ মঙ্গলময় দেবতাকে ভক্তি ও কৃতজ্ঞতার অঞ্জলি প্রদান করিতেছি। সুখে দুঃখে সম্পদে বিপদে যাঁহার করুণা আমাদিগকে কর্ত্তব্যপথে অগ্রসর করিয়াছে, সেই মহান্ দেবতাকে সর্ব্বাগ্রে স্মরণ করিতেছি। আমাদের স্নেহের অন্তঃপুর পত্রিকা পঞ্চমবর্ষ পূর্ণ করিয়া ষষ্ঠবর্ষে পদার্পণ করিতেছে। এই শুভদিনে আমরা সহৃদয়া পাঠিকা, সদাশয়া লেখিকা ও মহানুভব সহানুভূতিকারীগণকেও আন্তরিক ধন্যবাদ জানাইতেছি। অন্তঃপুর যে মহৎ উদ্দেশ্য সাধনের ব্রত গ্রহণ করিয়া অগ্রসর হইতেছে তাহা অতি পবিত্র ও উচ্চ। আমাদিগের ক্ষুদ্র শক্তির দ্বারা গুরুতর দায়িত্বপূর্ণ ব্রত সম্যকরূপে পালন করা বড়ই কঠিন অথবা সম্ভবপর নহে বলিলেই হয়। আমাদিগের শত ত্রুটি ও অসামর্থ্য আমরা অনুভব করিতেছি সুতরাং আমাদের অধিক কিছু বলিবার বা বাক্যাড়ম্বর করিবার অধিকার নাই। কেবল ভগবানের দয়া ও অনুগ্রাহক গ্রাহিকা ও অন্তঃপুরের হিতৈষিনী লেখিকাগণের সাহায্য ও সহানুভূতি আমাদিগের সম্বল। পরিশেষে যে সমুদয় সম্পাদক ও সম্পাদিকাগণ তাঁহাদের পত্রিকাদি অন্তঃপুরের বিনিময় প্রদান করিয়া আমাদের সহায়তা করিতেছেন তাঁহাদিগকেও কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি।

সন্তান শিক্ষা।

আমার স্বামী যখন শিলচরে বদলী হইয়া আসিলেন তখন আমার তিনটি সন্তান,— দুইটী পুত্র ও একটি কন্যা। বড় পুত্রটির বয়স তখন দশ বৎসর, ছোটটীর দুই বৎসর। কন্যাটি তখন সাত বৎসরের। আমরা জাতিতে কায়স্থ। আমার স্বামী গভর্ণমেণ্ট টেলিগ্রাফ আফিসে সিগনেল্যারের কাজ করিতেন। মাহিনা যাহা পাইতেন তাহাতে সংসারযাত্রা এক রকমে নির্ব্বাহ হইয়া যাইত।

আমাদের শিলচরে আসিবার প্রায় এক মাস পরে সিদ্ধেশ্বর ঘোষ নামে একজন সিগ্‌নেলার পরিবার লইয়া তথায় বদলী হইয়া আসিলেন। আমরা বাঙ্গালী পাড়ায় বাসা করিয়া ছিলাম। আমাদের বাসার অতি নিকটে একটি বাসা খালি ছিল; সিদ্ধেশ্বর বাবু তথায় আশ্রয় লইলেন। তাঁহার পরিবারের মধ্যে দেখিলাম, দশ বৎসরের একটি পুত্র পাঁচ বৎসরের একটি কন্যা, তাঁহার স্ত্রী ও তিনি নিজে।

সিদ্ধেশ্বর বাবু বড়ই সামাজিক লোক, আমার স্বামীও তদ্রূপ। এ ছাড়া চাকুরি এক, দুই পরিবারের শীঘ্রই ঘনিষ্ঠতা হইয়া গেল। তাঁহারা প্রায় আমাদের বাসায় আসিতেন, আমরাও তাঁহাদের বাসায় যাইতাম। বিদেশে যে কয়জন স্বদেশী থাকেন, তাহাদের মধ্যে মেশামিশি খুব বেশী। সহানুভূতি বড়ই প্রবল; প্রবাস, বন্ধুত্বের আবাসভূমি বলিলেও অত্যুক্তি [illegible] না। প্রবাসে বন্ধুত্বের বন্ধন বড়ই দৃঢ় হয়। [illegible] পর আপন হইয়া যায়। পরোপকারের [illegible]র বিরল নহে।

[illegible]দিন পরেই আমরা দেখিতে পাইলাম যে সিদ্ধেশ্বর বাবুদের চাল চলন অন্যরূপ— আচার ব্যবহার ভিন্ন প্রকারের। দেখিলাম তাঁহারা না খৃষ্টান, না ব্রাহ্ম, না মুসলমান, না হিন্দু। ছেলেরা সব ইংরাজিতে কথা কয়। স্বামীর অনুপস্থিতি কালে তাঁহার কোনও বন্ধু বা অপর কোনও লোক আসিলে, লজ্জার মাথা খাইয়া সিদ্ধেশ্বর বাবুর স্ত্রী তাঁহাদের সহিত কথা কয়, আসিবার প্রয়োজনাদি জিজ্ঞাসা করে এবং পুরুষের ন্যায় তাঁহাদিগকে আহ্বান করে। প্রাতঃকালে উঠিয়া হারমনিয়ম বাজাইয়া সকলে মিলিয়া ঈশ্বরের উপাসনাসূচক গান করে। কাপড়ে শুষ্ক ভাত পড়িলে তাহা ঝাড়িয়া ফেলিয়া দেয়; কাপড় ছাড়িয়া ফেলে না, হাতও ধোয় না। তাঁহাদের এইরূপ ব্যবহার দেখিয়া শুনিয়া আমরা একেবারে অবাক্ হইলাম। অপরাপর সকলে তাঁহাদের কথা লইয়া কাণাকাণি ফুস্‌ফুসানি আরম্ভ করিল। এমন কি ঠাট্টা তামাসা করিতেও ত্রুটি করিল না। তাঁহাদের ব্যাপার দেখিবার ও শুনিবার জন্য আমাদের বাসায় আমোদপ্রিয় স্ত্রী পুরুষের সমাগম হইতে লাগিল। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় সিদ্ধেশ্বর বাবুদের সব কাণা কাণিতে একটুও চৈতন্যের উদয় হইল না। এই সব খ্রীষ্টানগিরি পরিত্যাগ করিলেনও না। বরং পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর আগ্রহ সহকারে তাঁহাদের আচরণ মত কার্য্য করিতে লাগিলেন। অতএব তাহারা সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিয়া লইল যে, ঈশ্বর বোধ হয় সিদ্ধেশ্বর বাবুদের "পিত্তি"টুকু একেবারে দেন নাই। আমি কিন্তু কিছু অনিচ্ছা সত্ত্বেও আমাদের এই অতিথিবর্গের পক্ষ সমর্থন করিতাম এবং লোক নিন্দার ভয়ে সিদ্ধে-

শ্বর বাবুদের বাসায় গতায়াত কিছু দিনের জন্য বন্ধ করিবার মনস্থ করিলাম।

কিন্তু দুঃখের বিষয় আমার মনস্থ কার্য্যে পরিণত করিতে পারিলাম না। দু'দিন সিদ্ধেশ্বর বাবুদের বাসায় না যাওয়ায় তাঁহার স্ত্রী আমাদের বাসায় আসিলেন এবং আমি কেন তাঁহাদের বাসায় যাই নাই, তাহা জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি আসল কথা গোপন করিয়া সাংসারিক কার্য্যের ব্যস্ততা নিবন্ধন যাইতে পারি নাই বলিলাম। তাহার পর তিনি পরদিন তাঁহাদের বাসায় যাইবার জন্য বিশেষ অনুরোধ করিয়া গেলেন। আমিও যাইতে সম্মত হইলাম—অবশ্য দায়ে পড়িয়া।

পরদিন সকাল সকাল আহারাদি করিয়াই আমি সিদ্ধেশ্বর বাবুদের বাসায় গমন করিলাম। সিদ্ধেশ্বর বাবু তখন ডিউটিতে বাহির হইয়াছেন। গিয়া দেখিলাম যে সিদ্ধেশ্বর বাবুর স্ত্রী নিজ পুত্রকন্যাকে লইয়া লেখা পড়া শিখাইতেছেন। দেখিলাম তাঁহার হাতে একখানি ইংরাজি পুস্তক ও পুত্রকন্যারা হাতের লেখা লিখিতেছে। আমাকে দেখিয়া তিনি সসম্ভ্রমে উঠিয়া আমার হাত ধরিয়া সাদরে তাঁহার নিকট বসাইলেন এবং অন্যান্য সাধারণ স্ত্রীলোকের ন্যায়, কি পাকাদি ও আহার হইল, তাহার বিষয় কথা বার্ত্তা না বলিয়া অন্যান্য বিষয়ের কথা আরম্ভ হইল। আমিও সুযোগ বুঝিয়া তাঁহাদের ঐরূপ ধর্ম্ম ও সমাজ বিরুদ্ধ কথার উত্থাপন করিলাম এবং তাঁহাদের উপর আমার প্রতিবেশিনীগণের মতামতের বিষয় বলিলাম। এবং তাহার পর জিজ্ঞাসা করিলাম, "বোন্, তোমার ছেলেরা স্কুলে যায়না কেন? এই দেখদেখি আমার ছেলেরা সব কেমন স্কুলে যায়, না গেলে উনি কত মারেন বকেন কায়েতের ছেলে স্কুলে না গেলে চল্‌বে কেন? আর ভালও দেখায় না। স্কুলে না গেলে কি লেখাপড়া হয়? তোমার স্বামীও ত কিছু বলেন না!" আমার সমস্ত কথাগুলি মনোযোগ দিয়া শুনিয়া তিনি বলিতে লাগিলেন, "দিদি, তুমি যাহা বলিলে তাহা শুনিলাম কিন্তু আমরা ত কিছুই অন্যায় কাজ করি না। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকা সকলকারই কর্ত্তব্য। কাপড়ে শুক ভাত পড়িলে কাচিয়া দিলেই পরিষ্কার থাকা হয় না। আহার পরিচ্ছদ শয্যা প্রভৃতি বিষয়ে পরিষ্কার একান্ত আবশ্যক—আমরা করিয়াও থাকি। আর তুমি যে লজ্জার কথা বলিলে আমার বিবেচনায় ঐরূপ ব্যবহার করিলে নির্লজ্জতা প্রকাশ পায় না। স্বামী যদি গৃহে না থাকেন তবে কি অভ্যাগত ব্যক্তির আহ্বান হইবে না? মিথ্যা কথা বলিতে লোকের লজ্জা হওয়া উচিত। লোকের নিন্দা করা, হিংসা করা, মন্দ করা প্রভৃতি কার্য্যগুলিই লজ্জাজনক। গান করা, ইংরাজি পড়াশুনা করাকে আমি লজ্জাজনক বলিয়া বিবেচনা করি না। যে কাজে অনিষ্ট নাই বরং ইষ্টই অনেক সেই কাজ করাই সকলের একান্ত কর্ত্তব্য।

"আর ছেলেদের লেখা পড়ার সম্বন্ধে যে কথা উত্থাপন করিলে তাহা অতিশয় গুরুতর। সন্তান শিক্ষার উপর ব্যক্তিগত জীবন, এমন কি জাতীয় জীবনের ভাবী সুখ দুঃখ উন্নতি অবনতি নির্ভর করিতেছে। এই সন্তানেরাই উত্তরে সমাজের [illegible] কিয়ৎ পরিমাণে কর্তৃত্ব চালাইবে। অতএব ইহাদের উপরেই আমাদের দেশের [illegible] উন্নতি স্থাপিত রহিয়াছে। উহা আজ [illegible]

প্রায় সকলেই বুঝিতে পারিয়াছেন। তাই চিন্তাস্রোত অন্যদিকে ফিরিয়াছে। সেই জন্যই আজকাল-সমাজের শীর্ষস্থানীয় ভক্তিভাজন মহাপুরুষগণ সন্তানদের রীতিমত শিক্ষার জন্য মনোনিবেশ করিয়াছেন। সে কথা এখন যাউক, আমরা কেন ছেলেদের স্কুলে পাঠাই না তা শুন। তুমি বোধ হয় জান যে একটি প্রবাদ আছে, "সঙ্গদোষে গ্রাম নষ্ট" ; একথার সত্যতা সম্বন্ধে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। সকল দেশের সকল লোকেই ইহার সত্যতা এক বাক্যে স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। অল্প বয়সে স্কুলে পড়ার দোষ অনেক। স্কুলে অনেক ছেলের সমাবেশ। তাহাদের সকলের স্বভাব চরিত্র সমান নহে ; ক্লাশে ভাল ছেলের সংখ্যাই কম, মন্দ ছেলের সংখ্যাই অনেক। সুকুমারমতি বালকদিগের বিবেচনাশক্তি তত পরিস্ফুট নহে তাহাদের মন শীঘ্রই এবং স্বতঃই মন্দেরদিকে আকৃষ্ট হয়, অতএব স্কুলে তাহাদের কুশিক্ষা হইবার সম্ভাবনা বড়ই অধিক। স্কুলে না পাঠানের ইহাই প্রধান কারণ। এছাড়া স্কুলে উপস্থিত নিয়মানুসারে যেরূপ শিক্ষা দেওয়া হয় তাহা দুষণীয়। তাহাতে ছেলেদের জ্ঞান বড়ই সীমাবদ্ধ হয়। তাহারা পৃথিবীর অপরাপর বিষয় জানিবার তত সুবিধা পায় না ; তাহাদের বিদ্যা প্রায় "পুঁথিগত" হইয়া থাকে। এই সব ভাবিয়া চিন্তিয়া আমার স্বামী বাড়ীতেই ছেলেদের শিক্ষা দিবার মনস্থ করিয়াছেন। প্রাতঃকালে শয্যা হইতে উঠিয়া মুখ হাত ধুইয়া আমরা সকলেই ঈশ্বর স্তুতি[illegible] গান করি। তাহার পর ছেলেদের কিছু [illegible] হইয়াগেলে উঁহার সহিত বেড়াইতে [illegible] হয় ; আমি তখন সংসারের কার্য্যে [illegible]ই। বেড়াইবার সময় উনি উহাদিগকে এটা ওটা দেখাইয়া তাহাদের নাম ধাম উপকারিতা প্রভৃতি বোধগম্য বিষয় শিখাইয়া দেন। বেড়াইবার পর বাসায় আসিয়া উনি ঘণ্টা দুই পড়ান এবং পড়া লয়েন। পড়া শুনা হইলে উনি স্নানাহার করিয়া আফিসে চলিয়া যান। ছেলেদের খাওয়া হইলে তাহাদের একটু ঘুম পাড়াইয়া আমি আহারাদি করি এবং তৎপরে একটু বিশ্রাম করি। তাহার পর উহাদিগকে জাগাইয়া পড়াইতে বসি। যাহাতে আমি দুপুরবেলা তাঁহার আফিস অবস্থান কালে তাহাদিগকে পড়াইতে পারি, এই ভাবিয়া তিনি আমাকে বাঙ্গালা ইংরাজি শিক্ষা দেন। আমি এখনও তাঁহার নিকট হইতে ইংরাজি শিখিতেছি এবং তিনি আমাকে এরূপ শিখাইবার মনস্থ করিয়াছেন, যাহাতে আমি অনায়াসে উহাদিগকে এণ্ট্রান্স স্কুলের সেকেণ্ড ক্লাশ পর্য্যন্ত পড়াইতে পারি। পড়াশুনা হইয়া গেলে উহারা জলখাবার খাইয়া নিজেদের ইচ্ছামত খেলা করে। রাত্রে তাহারা পড়াশুনা করে না। সন্ধ্যার সময় ঈশ্বর উপাসনার গান হইয়াগেলে এদিক ওদিক খেলা করে এবং রাত্রে আহার হইয়াগেলে নিদ্রা যায়। আমার স্বামী তখন নিজে পড়েন এবং আমায় পড়ান। আর ছেলেদের শিক্ষোপযোগী কিছু দেখিলে তাহা চিহ্ন করিয়া রাখিয়া দেন—ভবিষ্যতে শিখাইবার জন্য।"

আমার নিকট তাঁহার কথাগুলি প্রকৃত বলিয়া বোধ হইল এবং তাহাতে যে কিছু নূতনত্ব আছে তাহা কিছু কিছু বুঝিতে পারিলাম। আমি অতিশয় আগ্রহ সহকারে শুনিতেছিলাম এবং একটু একটু করিয়া তাঁহাদের উপর আমার যে একটা ঘৃণা ছিল

তাহা অপসারিত হইতেছিল। তিনি আবার বলিতে লাগিলেন, "ইহা গেল সন্তানদের লেখাপড়া শিক্ষার কথা। আমি তোমাকে আরও অধিকতর আবশ্যকীয় শিক্ষার বিষয় বলিতে ইচ্ছা করি অনুগ্রহ করিয়া শুন। সন্তানদিগকে সচ্চরিত্র সুশীল করিতে হইলে দুইটি বিষয় একান্ত প্রয়োজনীয়। একটি সৎ শিক্ষা, অপরটি পিতামাতার নিজে সৎ হওয়া। দ্বিতীয়টির গুরুত্ব প্রথমটি অপেক্ষা কোনও ক্রমেই ন্যূন নহে বরং অধিক বলিয়াই প্রতীত হয়। আমি নিজে ভাল হইব না অথচ প্রত্যাশা করিব যে আমার ছেলেরা ভাল হইবে, আমি নিজে মিথ্যা কথা কহিব অথচ নিজে আশা করিব আমার ছেলেরা সত্যকথা বলিবে; আমি নিজে অসৎপথে যাইব আর আমার ছেলেরা সৎ হইবে, ইহার ন্যায় বিড়ম্বনাও আর নাই। আমার স্বামী বড়ই [illegible]। আমার স্বামী বলিয়া এ কথা বলিতেছি না প্রকৃতপক্ষে তিনি পরের কখনও নিন্দা করেন না, পরের কথা লইয়া কখনও থাকেন না। ভুলিয়াও কখন মিথ্যাকথা বলেন না। পরোপকার করিতে পারিলে তিনি বড়ই উৎসাহিত হন।"

"ছেলেকে সৎ করিতে হইলে শাসন আবশ্যক। কোনও অন্যায় কার্য্য করিলে প্রহার না করিয়া উপদেশসূচক বাক্যে তিরস্কার করা উচিত। তিরস্কার করিবার সময় অপর পক্ষ হইতে ছেলের সহায় হইয়া আদর করা একেবারে অন্যায়। ইহাতে বড়ই কুফল উৎপাদন করে। আমি দেখিয়াছি যে কোনও অনিষ্টের বা কুকার্য্যের জন্য পুত্র, পিতা কর্ত্তৃক তিরস্কৃত হইলে মাতা চুপ করিয়া না থাকিয়া অন্যায় রূপে অপরাধী পুত্রের সহায় হইয়া স্বামীকে অযথা গালি বর্ষণ করেন। এইরূপ ব্যবহারে ছেলেদের মাথাটি খাওয়া হয়। বাঙ্গালীর ঘরে এইরূপ কাণ্ড বিরল নহে। ছেলেদের মাটি হওয়ার এই একটি প্রধান কারণ। পিতা মাতা সৎ না হইলে পুত্রেরা চুরি বিদ্যা শিক্ষা করে। আমি দেখিয়াছি পুত্র অপর ব্যক্তির গাছ হইতে লিচু প্রভৃতি চুরি করিয়া আনিলে তজ্জন্য তিরস্কার করা দূরের কথা বরং মাতা [illegible] বাদে তাহা গ্রহণ করেন; এমন কি ঐ [illegible] কখন কখন উৎসাহও প্রদান করিয়া থাকেন। কোন কোন জননী, দুষ্ট একটা পথের ধারে ফেলিয়া আসায়, তিরস্কার পর্য্যন্ত করিয়া থাকেন। আমার স্বামী এসব বিষয়ে বড়ই সতর্ক। আমার ছেলেরা কাহারও বাড়ী গমন করিলে যদি তাহারা সন্তুষ্ট হইয়া উহাদিগকে পুতুল বা খেলনা দেয়, তাহা হইলে ঐগুলি কি প্রকারে পাওয়া গেল, এই কথা জিজ্ঞাসা করিয়াই শুধু ক্ষান্ত থাকেন না। যাঁহারা ঐগুলি দিয়াছেন তাঁহাদেরে জিজ্ঞাসা করিয়া থাকেন। বাড়ীতে খাবারাদি থাকিলে তাহারা কখনও চুরি করিয়া খায় না। আমার বলা আছে ক্ষুধা পাইলেই তাহারা খাইতে পারিবে।"

আমি তাঁহার কথাগুলি অতিশয় আগ্রহ সহকারে শ্রবণ করিতে লাগিলাম। আমার অন্তর হইতে ঘৃণা তিরোহিত হইয়া গিয়া তাঁহার উপর আমার একটু ভক্তির উদয় হইল। তাহারপর আমি আগ্রহ সহকারে জিজ্ঞাসা করিলাম, "বোন্ ছেলে পিলেদের সত্যিকথা কহিতে কি করে শেখাতে হয়?"

আমার কথা শুনিয়া সিদ্ধেশ্বর বাবুর স্ত্রী বলিতে লাগিলেন, "দিদি, আমি ঐ কথাই বলিতে যাইতেছিলাম। ছেলেরা মিথ্যাকথা কহে কেন? অবশ্যই কোন অপ্রীতিকর কার্য্য

কথায় তাহা হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য। আমি অন্যায় কাজ করিয়াছি পিতামাতা আমায় নিশ্চয়ই বকিবেন, শাস্তি দিবেন, এই ভয়েই তাহারা মিথ্যাকথা বলে। অতএব এখন দেখা যাইতেছে যে, এই ভয় নিবারণ করিতে পারিলেই উহাদের নিকট হইতে সত্যকথা পাইবার প্রত্যাশা করিতে পারা যায়। তাহাদের ভয় নিবারণ করিতে হইলে দৈহিক শাস্তি এমন কি মধ্যে মধ্যে তিরস্কারও বন্ধ করা একবারে উচিত। অনেকে মনে করিবেন ইহাতে বরং অন্যায়কে অনেকাংশে প্রশ্রয় দেওয়া হইবে; কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তাহা হয় না। কেবল উপদেশ সূচক তিরস্কার করিলে সুফল প্রায় ফলিয়া থাকে। দৈহিক শাস্তিতে অনুপকারই প্রায় দেখা যায়। মনে কর আমার ছেলে অসাবধানতা বশতঃ একটি কাচের বা অন্য কোনও মূল্যবান দ্রব্য ভাঙ্গিয়া ফেলিল। আমি যখন জানিতে পারিলাম তখন একে একে সকল পুত্রকে জিজ্ঞাসা করিলাম কে উহা ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছে? যে ভাঙ্গিয়াছে সে যদি জানে যে আমি নিশ্চয়ই তাহাকে খুব মারিব ও বকিব তাহা হইলে সে উহা হইতে নিষ্কৃতি পাইবার অভিলাষে নিশ্চয়ই মিথ্যাকথা বলিবে এবং চাকর বাকরের উপর বা আর কাহারও উপর দোষারোপ করিবে। আর যদি সে জানে যে আমি উহার কিছুই করিব না তাহা হইলে সে নিশ্চয়ই সত্যকথা বলিবে। আর যদি সে ভাঙ্গিয়া থাকে অথচ মিথ্যাকথা কয় তাহা হইলে তাহাকে মিথ্যাকথা বলার জন্য তিরস্কার করা বা শাস্তি দেওয়া উচিত—ভাঙ্গিবার জন্য নহে। এইরূপ করিলে সে বুঝিতে পারিবে যে তার মিথ্যা কথার জন্যই সে দণ্ডিত বা তিরস্কৃত হইতেছে অতএব সে ভবিষ্যতে সাবধান হইবে। আর যদি সে নিজ দোষ স্বীকার করে তাহা হইলে তাহাকে তাহার কার্য্যটি যে অন্যায় হইয়াছে তাহা বুঝাইয়া দিয়া তাহার সত্যকথা বলার জন্য তাহাকে উপযুক্ত পুরস্কার দেওয়া উচিত। ইহাতে সে এই মনে করিবে যে, সত্যকথা বলার জন্যই সে ঐ পুরস্কার পাইয়াছে অতএব সত্যের উপর তাহার অনুরাগ জন্মাইবে।"

আমি তাহার এই সুন্দর কথাগুলি শুনিয়া বড়ই আহ্লাদিত হইলাম। দুই একটি অন্য কথাবার্ত্তার পর আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "আচ্ছা মেয়েদের কি এই রকমে শিক্ষা দেওয়া উচিত, না তাহাদের আর কিছু বেশী আবশ্যক?"

তিনি বলিতে লাগিলেন, "এ সব ত তাহারা শিখিবেই তা'ছাড়া তাহাদের শিখিবার আরও অনেক আছে। তাহাদের শিক্ষা পুত্রদের শিক্ষা অপেক্ষা গুরুতর; কেন না তাহাদের উপর সংসারের ভার ও পুত্র কন্যাদিগের শিক্ষার ভার ন্যস্ত হইবে। মেয়েদের দ্বারাই পুত্র কন্যাদের চরিত্র অনেকাংশে গঠিত হয়। কারণ শৈশবকালে যখন তাহাদের চরিত্র গঠিত হইতে থাকে তখন তাহারা মাতার নিকটেই বাস করে। সেই সময় তাহারা যে শিক্ষা পায় সেই শিক্ষা তাহাদের ভবিষ্যৎ জীবনের উপর অনেক পরিমাণে প্রভুত্ব করে। অতএব তাহাদিগকে এরূপভাবে শিক্ষা দেওয়া কর্ত্তব্য যাহাতে তাহারা শ্বশুর শ্বাশুড়ী দেবর প্রভৃতি লইয়া সুচারুরূপে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে সক্ষম হয়, আর নিজ পুত্র কন্যাদের উপযুক্ত শিক্ষা দিতে পারে। মেয়েদের শিক্ষার উপর বেশী মনোযোগ আবশ্যক। আমার বিবে-

চনায় তাহাদের লেখাপড়া শেখা যত না আবশ্যক নির্ব্বিবাদে সংসার চালান শিক্ষা তাহা অপেক্ষা শতগুণে আবশ্যক। ইহা বড়ই দুঃখের বিষয় যে অনেকে এ বিষয়ে বড়ই ঔদাসীন্য দেখাইয়া থাকেন। মেয়েদের লেখাপড়া শিক্ষার জন্য তাঁহারা বড়ই ব্যস্ত কিন্তু তাহা অপেক্ষা শতগুণ এমন কি সহস্রগুণ আবশ্যকীয় এই বিষয়টী উপেক্ষা করেন। সে লেখাপড়া শেখার উপকারিতা কি? যদি শ্বশুর শাশুড়ী প্রভৃতি গুরুজনের সেবা করিতে জানিলাম না,—যদি সুখের সংসারে হিংসা দ্বেষ স্বার্থপরতার দ্বারা অশান্তির অনলশিখা জ্বালাইয়া দিলাম। যাহা হউক দিদি, এই তোমাকে প্রধান প্রধান বিষয় কয়টী বলিলাম। আরও অনেক বিষয় আছে সে সব বলিতে গেলে দু'একদিনে হয় না। একটু বিবেচনার সহিত কার্য্য করিলেই সব হইতে পারে। তবে আমি অত্যাবশ্যকীয় একটী শিক্ষার কথা বলিয়া অদ্যকার কথা শেষ করিব। সেটি স্ত্রী শিক্ষার প্রধানতম অঙ্গ। নিস্বার্থপরতার উপর আমাদের সংসারের সুখ দুঃখ শান্তি অশান্তি নির্ভর করিতেছে। আজকাল আমাদের বাঙ্গালী সংসারে অশান্তি প্রজ্বলিত হইতেছে ইহার প্রধান কারণ স্বার্থপরতা। এমন অনিষ্ট নাই যাহা স্বার্থপরতার দ্বারা সাধিত হইতে পারে না। সতীশ বাবুর "রায় পরিবার" ও তারক বাবুর "স্বর্ণলতা" তাহার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। এই স্বার্থপরতার জন্যই ভ্রাতৃবিচ্ছেদ, এই স্বার্থপরতার জন্যই সংসারে প্রত্যহ কলহ উপস্থিত হইতেছে। অতএব নিস্বার্থপরতা শিক্ষা সর্ব্বপ্রথমে আবশ্যক। কিন্তু কি উপায়ে ঐ শিক্ষা দেওয়া যাইতে পারে তাহা ঠিক করিয়া বলিতে পারি না।

তবে আমার স্বামী যেরূপে শিক্ষা দেন তাহা বলিতেছি শুন। তিনি বলেন, ছেলে মেয়েকে নিস্বার্থপরতা শিক্ষা দিতে হইলে পিতামাতার নিস্বার্থপর হওয়া একান্ত আবশ্যক। ছেলে মেয়েদের সাক্ষাতে কেবল নিস্বার্থপরতার দৃষ্টান্ত দেখাইতে হইবে। অনেক স্থলে দেখা গিয়াছে যে, পরিবেশনকারিণী মাতা পরিবেশন কালে নিজ পুত্রকেই বেশী দিয়া থাকেন বা দিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া থাকেন। এছাড়া অন্যান্য অনেক স্থলে পুত্রকন্যাদের সাক্ষাতেও ঐরূপ অনিষ্টকর পার্থক্য দেখাইয়া থাকেন। ইহাতে তাহারা মনে করে যে, পরের সহিত এইরূপেই ব্যবহার করিতে হয়। আপনার গণ্ডা বুঝিয়া লইতে হয়। আপনার জিনিষ আবশ্যক হইলে পরকে কদাচ দিতে নাই। নিস্বার্থপরতা শিক্ষা দিতে হইলে পুত্রকন্যাদের সর্ব্বদা একত্র থাকিতে দিতে হয়, একত্র খাইতে দিতে হয়। আপনার জিনিষ পরকে দিতে শিখাইতে হয়, ইহাতে স্বার্থত্যাগ শিক্ষা করে। আমার স্বামী মধ্যে মধ্যে ছেলেদের ঐরূপ শিক্ষা হইল কিনা তাহার পরীক্ষা লয়েন; আমার বড় ছেলেটিকে খাবার দিয়া বলেন, "না, তোতে আর খুকিতে পাগে যা"। এই কথা বলিয়া তিনি আড়াল হইতে দেখেন সে নিজে বেশী খাইতেছে কি দুজনে সমান পাইতেছে; নিজে অধিক খাইলে বড়ই বকেন। কখনও অপর ব্যক্তির ছেলেকে আনাইয়া ভূপেনকে একটি ভাল জিনিষ দিয়া বলেন, ভূপেন ও তোমাদের বাড়ীতে আসিয়াছে ওকে ঐটা দাও। যদি দেয় তাহা হইলে উনি তাহাকে কত আদর যত্ন করেন, তাহা অপেক্ষা ভাল জিনিষ তখনই কিনিয়া আনিয়া দেন। আর যদি না দেয়

তাহা হইলে তিনি যৎপরোনাস্তি বকেন এবং ঐ জিনিষটাও কাড়িয়া লয়েন।

"একান্নবর্ত্তী পরিবারের মধ্যে নিস্বার্থপরতা শিক্ষা দেওয়ার সুবিধা অনেক। তথায় পিতা মাতা ভাল হইলেই হয়। তথায় ছেলেপিলের সংখ্যা অধিক। অনেক একান্নবর্ত্তী পরিবারের মধ্যে দেখা গিয়াছে যে, কোনও খাদ্য দ্রব্য আসিলে জননী নিজ পুত্রদের জন্য অর্দ্ধেক আত্মসাৎ করিয়া থাকেন; ইহাতে যে ছেলেরা স্বার্থপরতা শিক্ষা করিবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? ইহা ছাড়া অনেক, উপার্জ্জনক্ষম স্বামীর স্ত্রী সংসারে বিষ বৃক্ষের বীজ বপন করিবার জন্য বলিয়া থাকেন, "আমার স্বামী রোজগার করিতেছে আমি আমার ছেলেকে বেশী দিব আমার ইচ্ছা। (দেবরকে লক্ষ্য করিয়া) উনি খালি ভায়ের অন্ন ধ্বংস করিবেন, নিজে বেশী উপায় করিতে পারিবে না, তবু আবার কথা বল্‌বে"। এইরূপ মাতার নিকট হইতে কি শিক্ষা করা যাইতে পারে তাহা সহজেই অনুমেয়।"

তাঁহার কথা শেষ হইলে আমি তাঁহাকে মনে মনে ধন্যবাদ দিলাম। এবং তথায় কিছুক্ষণ থাকিয়া বাসায় ফিরিয়া আসিলাম। দুই তিন ঘণ্টার মধ্যেই দেখিতে পাইলাম আমার মনের ও মতের অনেক পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে। স্বামীকে ঐ সব কথা বলিবার জন্য উৎসুক চিত্তে তাঁহার অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। দুঃখের বিষয় তিনি সে দিন অনেক দেরি করিয়া বাসায় ফিরিলেন। তাঁহার আসিতে বিলম্ব হওয়াতে আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "তোমার আজ আসিতে এত বিলম্ব হইল কেন? সিদ্ধেশ্বর বাবুত অনেকক্ষণ আসিয়াছেন, জলটল খাইয়া ছেলেদের লইয়া বেড়াইতে বাহির হইয়াছেন তোমার আর আসা হয় না।" "কেন দেরি হ'ল বলিব"? বলে তিনি মুখ হাত ধুইয়া জল খাইতে খাইতে বলিতে লাগিলেন, "তোমরা যা'হোক খুব মেয়েমানুষ বটে। তোমরা সব কর্‌তে পার"। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "কেন হয়েছে কি?"

আমায় উত্তর করিলেন, "আর হয়েছে কি। সিদ্ধেশ্বর বাবুদের আজ যাহা দেখে শুনে এলুম তা'তে তোমাদের বিবেচনা শক্তি টুকু ঈশ্বর দিয়াছেন কিনা সেই বিষয়ে আমার সন্দেহ হচ্চে।"

বলা বাহুল্য আমি সিদ্ধেশ্বর বাবুদের বিষয় তাঁহাকে বলিবার জন্য এতক্ষণ তাঁহার অপেক্ষা করিতেছিলাম। তাঁহার মুখে ঐ সিদ্ধেশ্বর বাবুদের কথা শুনিয়া আমার কৌতূহল আরও বৃদ্ধি হইল। আমি তাঁহাকে আগ্রহ সহকারে জিজ্ঞাসা করিলাম, "বলি ব্যাপারটা কি খুলে বল না।"

আমার স্বামী বলিতে লাগিলেন, "যা শুনে এলাম তা'তে আমার বোধ হয় যে, সিদ্ধেশ্বর বাবুরা দেবতা। আচ্ছা সিদ্ধেশ্বর বাবুর স্ত্রীকে কখনও কি গহনা পরিতে দেখিয়াছ? তাহার গহনা টহনা আছে কি বলিতে পার?"

আমি। "না, তাহার হাতে দুইগাছা বালা ছিল বটে কিন্তু আজ কয় দিন হল আর দেখিতে পাচ্ছিনে—বলি এসব কথা কেন?"

স্বামী। "শুন তবে বলি। সিদ্ধেশ্বর বাবুর স্ত্রী বিবাহের সময় অনেকগুলি গহনা পাইয়াছিলেন। কিন্তু সিদ্ধেশ্বর বাবুর বাড়ীতে কএকজন ভাই আছে, তাহাদের পড়াশুনার খরচের জন্য প্রায় সমস্ত গুলিই বিক্রয় হইয়া গিয়াছে। সিদ্ধেশ্বরবাবুর স্ত্রী এমন লক্ষ্মী যে

স্বইচ্ছায় সে গহনাগুলি খুলিয়া দিয়াছেন; হাতে কেবল দুই গাছি বালা ছিল, তাহা সেদিন তাহার এক দেবরের বি, এ, পরীক্ষার টাকা জমা দিবার জন্য বাড়ী পাঠাইয়া দিয়াছেন। দেখ দেখি কেমন মেয়ে মানুষ! তোমাদের এত গহনা রহিয়াছে তবু আর একখানির জন্য বিরক্ত করিয়া মার। এতক্ষণ ওদেরই কথাবার্ত্তা হইতেছিল। অদ্য অন্নদা বাবুর বাসায় আমার একটু দরকার ছিল; সেখানে গিয়া দেখি সিদ্ধেশ্বরবাবু ও তাঁহার ছেলে মেয়ে রহিয়াছে। অন্নদাবাবু তাহাদিগকে একটি গান করিতে বলিলেন। তাহারা পিতার অনুমতি লইয়া ঈশ্বর সম্বন্ধীয় একটি সুন্দর গান করিল। শুনিয়া সকলেই মোহিত হইল। তাহার পর সিদ্ধেশ্বরবাবু ভূপেনকে জয়দেবের দশ অবতারের স্তব, মোহমুদ্গর প্রভৃতি সংস্কৃত পদ্য মুখস্থ বলিতে বলিলেন। ভূপেন এমনই সুন্দরভাবে তাহা বলিল যে, আমি একেবারে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া গেলাম। তাহার পর আশালতাও কতগুলি পদ্য মুখস্থ বলিল। ঐটুকু মেয়ের মুখে অমন পদ্য শুনিয়া সকলেই তাহাকে ধন্য ধন্য করিতে লাগিল। আমিও তাহাদিগকে দুই একটি প্রশ্ন করিলাম, কিন্তু ঠকাইতে পারিলাম না। আহা দেখ দেখি, তাহারা কেমন সোণার চাঁদ ছেলে! আমাদের ওদের দেখ্‌লেই গা জ্বালা করে। এক একটি যেন "ভূত"। তাঁহার কথা সমাপ্ত হইলে আমার বক্তব্য সমস্ত তাঁহাকে বলিলাম। আমার কথা শুনিয়া, দেখিলাম তাঁহাদের প্রতি আমার স্বামীর শ্রদ্ধা বৃদ্ধি পাইল। তাহার পর দিন হইতে তিনি আমাকে পড়াইতে লাগিলেন এবং ছেলেদের স্কুলে যাওয়া বন্ধ করিয়া দিলেন এবং নিজে বাড়ীতে তাহাদিগকে পড়াইতে লাগিলেন। অল্প দিনের মধ্যে তাহার উপকারিতা দেখিতে পাইলাম। আমাদের দেখাদেখি অপরাপর লোকে যাহারা দুইদিন পূর্ব্বে তাহাদের নিন্দা করিতেছিল আমাদের অনুসরণ করিল।

আজ প্রায় পাঁচ বৎসর গত হইয়াছে। পৃথিবীর সঙ্গে সঙ্গে সংসারের ও জীবনের অনেক পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে। আমাদের ছেলেরা আর চক্ষুশূল বা ভূত নাই। এখন তাহাদের আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে। আমার বড় ছেলেটির বাড়ীতে পড়া শেষ হইয়াছে। শীঘ্রই তাহাকে এণ্ট্রেন্স স্কুলের সেকেণ্ড ক্লাসে ভর্ত্তি করিয়া দেওয়া হইবে, এখন সকলেই তাহাকে ভালবাসে ও স্নেহ করে। আমার কন্যা সরলার সুখ্যাতি তাহার শ্বশুর শাশুড়ীর মুখে আর ধরে না। আমাদের সংসার এখন স্বর্গের ন্যায় হইয়াছে। মাঝে মাঝে সিদ্ধেশ্বরবাবুর স্ত্রীর পত্র পাই। তিনি আমাদের যে উপকার করিয়াছেন তাহা আমরা জীবনে ভুলিতে পারিব না। ঈশ্বর তাঁহার মঙ্গল করুন।

শ্রীপ্রবোধিনী ঘোষ।

রমণীর পারিবারিক ও সামাজিক কর্ত্তব্য।

আজকাল স্ত্রীশিক্ষা অনেক স্থানেই প্রচলিত হইয়াছে। ঘোর তমসাবৃত নিস্তব্ধ যামিনী অবসানে, যেরূপ শত শত পক্ষী একসঙ্গে নানা সুরে ডাকিয়া উঠে এবং চতুর্দ্দিকে

কোলাহল উপস্থিত হয়, বঙ্গেও কিছু দিন পূর্ব্বে সেইরূপ অবস্থা উপস্থিত হইয়াছিল। বহুদিন নীরবের পর স্ত্রীশিক্ষা লইয়া চতুর্দ্দিকে মহা আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছিল। ইহা ভাল কি মন্দ, ইহা আমাদের দেশে সুফলপ্রদ হইবে কিনা, এই সকল লইয়া তর্ক বিতর্ক চলিতেছিল। কিন্তু তাহারই মধ্য দিয়া ধীরে ধীরে স্ত্রীশিক্ষা দেশময় ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে। আজকাল স্ত্রীশিক্ষা কথাটি আর নূতন বলিয়া বোধ হয় না।

কিন্তু শিক্ষা কি? যাহাদ্বারা আমাদের মনোবৃত্তিগুলির উন্মেষ সাধিত হয় তাহাই শিক্ষা। শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য কর্ত্তব্য জ্ঞান লাভ এবং কর্ত্তব্য সাধনে দৃঢ়তা লাভ। যে শিক্ষা মানুষকে কর্ত্তব্য সাধনে দৃঢ়চিত্ত করে না, তাহা কখনই প্রকৃত শিক্ষা নামে অভিহিত হইতে পারে না।

যেরূপ স্ত্রীশিক্ষা আজকাল চতুর্দ্দিকে ব্যাপ্ত হইয়াছে, তাহা প্রকৃতপক্ষে স্ত্রীজাতির মঙ্গল সাধন করিবে কি না দেখিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে দেখিতে হইবে শিক্ষিতা রমণীগণ পূর্ব্বাপেক্ষা কর্ত্তব্যপরায়ণা, উদার হৃদয়া ও বিনয়ী হইতে পারিয়াছেন কি না? তাঁহাদের বুদ্ধি মার্জ্জিত ও হৃদয় উন্নত হইয়াছে কি না? যদি শিক্ষিতা রমণীগণ কর্ত্তব্যহীনা সঙ্কীর্ণহৃদয়া হইয়া থাকেন তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে দেশীয় রমণীগণ সুশিক্ষা প্রাপ্ত হইতেছেন না।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে সুশিক্ষার গুণে কর্ত্তব্য জ্ঞান উজ্জ্বল হয় ও কর্ত্তব্য সাধনে দৃঢ়তা জন্মে। গৃহই রমণীর কার্য্যক্ষেত্র। এই পরিবাররূপ কার্য্যক্ষেত্রে সময়ে সময়ে যে সকল কঠিন কর্ত্তব্য রাশি রমণীকে বেষ্টন করে, সুশিক্ষার গুণেই তিনি সেই সকল কর্ত্তব্য সুন্দররূপে পালন করিতে সক্ষমা হন।

ভগবান স্ত্রীজাতির উপর যে সকল দায়ীত্ব অর্পণ করিয়াছেন তাহা বহন করিতে পারি সেই রমণীর মহত্ব। কত দেশে কত শত কবি রমণীর মাহাত্ম্য বর্ণনা করিয়াছেন, রমণীর বন্দনা করিয়াছেন। তাহার কারণ, প্রকৃতপক্ষেই ঈশ্বর রমণীকে জগতের আদর্শরূপিণী করিয়া জগতের পূজা পাইবার উপযুক্ত হইবার জন্যই সৃষ্টি করিয়াছেন।

রমণীর পারিবারিককর্ত্তব্য সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গেলে পরিবারে রমণীর অধিকার কি এই বিষয়ে বিশেষ চিন্তা করিয়া দেখা আবশ্যক। যে রমণী আপনার দায়ীত্ব ও উচ্চপদের কর্ত্তব্য উপলব্ধি করিতে পারেন, তিনিই কথঞ্চিৎ পরিমাণে কর্ত্তব্য পালনে সমর্থা হন। অতএব এই কর্ত্তব্যজ্ঞান উজ্জ্বল হওয়াই সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য।

পরিবার রমণীর রাজ্য। সেখানে রমণী সর্ব্বময়ী কর্ত্রী। কিন্তু এই পদের উপযুক্ত হইতে গেলে অনেকগুলি মূল্যবান গুণের আবশ্যক। বাঙ্গলায় একটী প্রবাদ আছে,—

"রাজার দোষে রাজ্য নষ্ট প্রজা কষ্ট পায়।
গিন্নীর দোষে ঘর নষ্ট লক্ষ্মী ছেড়ে যায়।"

রাজার যেরূপ রাজ্য, রমণীর সেইরূপ পরিবার। পরিবারে রমণীর একাধিপত্য। সেখানে রমণীর উপরে সকলের সুখস্বচ্ছন্দতা বিধানের ভার, পারিবারিক কার্য্য সকল সুচারুরূপে সম্পন্ন করিবার ভার। একটী উপযুক্ত রমণীর হস্তে পরিবার পরিচালনের ভার অর্পিত হইলে, যেমন গৃহ সুখ শান্তির আলয় হয়, গৃহ সর্ব্বপ্রকারে শ্রীসম্পন্ন হয়, তেমনি একজন অনুপযুক্তা রমণীর হস্তে পরিবারের কর্ত্তৃত্ব ভার ন্যস্ত হইলে সে পরিবার অতি

অল্পদিনে অতি শোচনীয় দশায় আসিয়া উপনীত হয়।

গৃহ মনুষ্যের আরামের স্থান। গৃহ সুখান্বেষীর সুখভবন, শান্তিহারার শান্তি আলয়, বাহিরের উৎপীড়নে উৎপীড়িত জনের আশ্রয় স্থান, জীবন সংগ্রামে পরিশ্রান্ত জনের বিশ্রাম ভবন, দুঃখ দারিদ্র্যের সময় সান্ত্বনা লাভের স্থান। এবং সকল অবস্থায় সকলের চির আনন্দ নিকেতন। এক কথায় গৃহ মনুষ্যের সর্ব্বপ্রকার অভাব পূর্ণ করিবার স্থান। রমণী এই গৃহের কর্ত্রী সেই জন্য এই অভাবগ্রস্ত ব্যক্তিদের সর্ব্ববিধ অভাব মোচনের ভার রমণীর হস্তে। যে রমণী গৃহকে এইরূপ অভাব পূর্ণ করিবার স্থলরূপে প্রস্তুত করিতে পারেন, তিনিই আদর্শ রমণী তিনি তাহার পারিবারিক কর্ত্তব্য সুন্দররূপে পালনে সমর্থা হইয়াছেন বলা যাইতে পারে।

গৃহে রমণী মাতৃবেশে সন্তান পালন করিবেন, উপযুক্ত সহধর্ম্মিণী হইয়া স্বামীর দেহ মন ও আত্মার সকল অভাব মোচন করিবেন, কন্যা বা বধূরূপে গুরুজনের আরামদায়িনী হইবেন; এবং চির হাস্যাননা দেবীমূর্ত্তিতে গৃহে বিরাজ করিয়া গৃহের আশ্রিত সকলের হিতকারিণী হইবেন।

মাতৃভাবই রমণীর দেবত্ব। সন্তানপালন রমণীর জীবনের সর্ব্ব প্রধান মহৎ কার্য্য। রমণী-হৃদয়ের যত সৌন্দর্য্য যত মহত্ত্ব আছে তাহা এই কার্য্যে পরিস্ফুট হয়। সন্তান পালনের ন্যায় গুরুতর কর্ত্তব্য আর নাই। এই কর্ত্তব্য ভার বহন করিতে হইলে সংকল্প, ধৈর্য্য, অধ্যবসায় ও বিশেষ চিন্তার আবশ্যক। শিশুকাল হইতে সন্তানের কোমল হৃদয়ের কোমলতর বৃত্তিগুলির উন্মেষ সাধন তাহার শারিরীক ও মানসিক স্বাস্থ্য বিধানের ভার রমণীর হস্তে। শৈশবকাল হইতেই মানসিক বৃত্তিগুলি বিকাশ আরম্ভ হয়, সেইজন্য শিশুকাল শিক্ষার প্রধান সময়। এই সময়ে মানবজীবন গঠনের ভিত্তিভূমি নির্ম্মিত হয়। প্রত্যেক রমণী যদি জননীপদে অধিষ্ঠিতা হইয়াও জননীর কর্ত্তব্য—এই সন্তান পালন সুচারুরূপে পালন করিতে চেষ্টা না করেন, তাহা হইলে তিনি পারিবারিক প্রধান কর্ত্তব্য অবহেলা করেন এবং সমাজের মহা অনিষ্ট সাধন করেন।

স্বামীর প্রতি যে সকল কর্ত্তব্য আছে, তাহা প্রত্যেক রমণীর পালন করাই রমণীর প্রধান ধর্ম্ম। শাস্ত্রে আছে

ছায়েবানুগতা স্বচ্ছা সখীব হিতকর্ম্মসু
দাসীবাদিষ্ট কার্য্যেষু ভার্য্যাভর্ত্তুঃ সদাভবেৎ

স্ত্রী ছায়ার ন্যায় স্বামীর অনুগতা হইবেন, সখীর ন্যায় তাহার হিতকর্ম্মে নিযুক্তা থাকিবেন এবং দাসীর ন্যায় তাহার আদিষ্ট কার্য্য গুলি সম্পন্ন করিবেন।

ইহাই আদর্শ ভার্য্যার চিত্র। যে স্ত্রী স্বামীর অনুগামিনী অথচ তাঁহার কর্ত্তব্যপথে উৎসাহ প্রদাত্রী, যিনি স্বামীর সুখের জন্য সর্ব্বদা আত্মসুখ বিসর্জ্জনে প্রস্তুত ছোট ছোট বিষয়ে পারিবারিক সকল প্রকার সুবিধা অসুবিধার মধ্যে, সম্পদ বিপদের মধ্যে, স্বামীকে সর্ব্বপ্রকারে সুখী করাই যাঁহার একমাত্র কামনা, তিনিই আদর্শ স্ত্রী।

রমণী পরিবারে সুশীতল ছায়ারূপিণী হইয়া সকলের আরাম ও শান্তি প্রদাত্রী হইবেন। গুরুজনদিগের প্রতি ভক্তিমতী হইয়া তাঁহাদের সর্ব্বপ্রকার সুখবিধানে যত্নশীলা হইবেন। স্নেহ প্রেম, ভক্তি এই সকল কোমল বৃত্তিগুলি রমণীর নিকটেই আশা

করা যায়। পরিবারে রমণী স্নেহের উৎস, প্রেমের নির্ঝরিণী, ভক্তির স্রোতস্বতী। মায়ের স্নেহ, পত্নীর প্রেম ও কন্যার ভক্তির ন্যায় অমূল্য পদার্থ পৃথিবীতে নাই।

আশ্রিত জনের প্রতি, দাস দাসীগণের প্রতি, রমণী সর্ব্বদা সদয় ব্যবহার করিবেন। সুমধুর স্নেহ শাসনে তাহাদিগকে সকল সময়ে বশীভূত রাখিবেন। তাহারাও রমণীর নিকটেই মাতৃস্নেহের আশা করে। তাহাদিগের হৃদয়ের সে অভাব পূর্ণ করিবার এবং তাহাদের সুখস্বাচ্ছন্দ্য বিধানের ভার রমণীর হস্তে। পরিবারের মধ্যে কেহ যেন রমণীস্নেহে বঞ্চিত না হয়, কাহারও হৃদয়ে যেন কোন অভাব না থাকে।

রমণী বিশ্বজননীর সর্ব্বব্যাপী প্রেমের ছায়া হৃদয়ে ধারণ করিয়া পরিবারে সকলকে স্নেহ বিতরণ করিবেন। এরূপ মহত ও স্বর্গীয় কার্য্যের ভার রমণী ভিন্ন আর কাহার হস্তে অর্পিত হইতে পারে?

পারিবারিক কর্ত্তব্যের মধ্যে সাংসারিক কার্য্য সুশৃঙ্খলামতে ও সুনিয়মে সম্পন্ন করা একটী গুরুতর কার্য্য। রমণী সংসারের কর্ত্রী। শত দাস দাসী থাকিলেও রমণী যদি গৃহকার্য্যে সুনিপুণা না হন, তাহা হইলে সে পরিবার কখনই উন্নত হইতে পারে না। সকল সাংসারিক কার্য্য রমণীর নিজহস্তে করা, না হয় বিশেষ মনোযোগ সহকারে তত্বাবধান করা কর্ত্তব্য। শাস্ত্রে আছে।—

সদা প্রহৃষ্টয়া ভাবং গৃহকার্য্যেষু দক্ষয়া
সুসংস্কৃতোপস্করয়া ব্যয়ে চামুক্তহস্তয়া

স্ত্রী সর্ব্বদা হৃষ্টচিত্তা থাকিবেন, গৃহকার্য্যে দক্ষা হইবেন, গৃহ সামগ্রী সকল পরিষ্কৃত ও পরিচ্ছন্ন রাখিবেন এবং ব্যয় বিষয়ে মুক্তহস্তা হইবেন না।

গৃহে রমণী হৃষ্টচিত্তা থাকিবেন। সর্ব্বদা প্রফুল্ল থাকা একটী কম গুণ নয়। কাজ কর্ম্মে কখন বিরক্তি প্রকাশ করিবেন না। সংসারে অসুখী হইবার শত শত কারণ প্রতি মুহূর্ত্তে উপস্থিত হয়। সকলেই যে সকল সময়ে আমার ইচ্ছামত চলিবে, আমার সুখ ও সন্তোষ সাধনের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া চলিবে, ইহা কল্পনা করা বাতুলতা। তদ্ভিন্ন সংসারে সকল সময়ে সুখ ও সৌভাগ্য বর্ত্তমান থাকে না। কত সময়ে কত মেঘ আসিয়া সংসারের উপর কালীমা ছায়া বিস্তার করে। রমণী সকল সময়ে প্রসন্ন মুখে সকল সহ্য করিবেন। আপনার মুখের প্রফুল্লতা ও পবিত্র হাসির দ্বারা সকল বিষাদ কালিমা ঢাকিয়া দিবেন। স্নেহপূর্ণ ব্যবহারে সকলের বিষাদক্লিষ্ট হৃদয়ে সান্ত্বনা ও আরাম প্রদান করিবেন।

গৃহকার্য্য সুন্দররূপে করা রমণীর প্রধান কর্ত্তব্য। গৃহের সকল দ্রব্যাদি সুনিয়মে পরিষ্কৃত ও পরিচ্ছন্ন রাখা, সকল বস্তুর বিশেষ তত্বাবধান করার ভার রমণীর হস্তে। রমণী গৃহের লক্ষ্মী, সাধারণ ভাষায় বলে, সুনিপুণা রমণীর গুণে গৃহে লক্ষ্মী বিরাজমানা থাকেন। এবং রমণীর দোষেই গৃহের লক্ষ্মী ছাড়িয়া যায়। আমাদের দেশের রমণী সাংসারিক কার্য্য চিরকালই প্রশংসার সহিত করিয়া আসিতেছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় বর্ত্তমান সময়ে গৃহকার্য্যে অমনোযোগী রমণীর সংখ্যা বিরল নহে। স্ত্রী শিক্ষার বিরোধীগণ স্ত্রী শিক্ষার প্রচলনই ইহার কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। কিন্তু সুশিক্ষা কখনই মানুষকে কর্ত্তব্যহীনা করিতে পারে না। তবে আজকাল রমণীর এরূপ নিন্দনীয় অবস্থা কুশিক্ষার অথবা শিক্ষাপ্রণালীর দোষে

ইত মদ্‌-দৌলা।
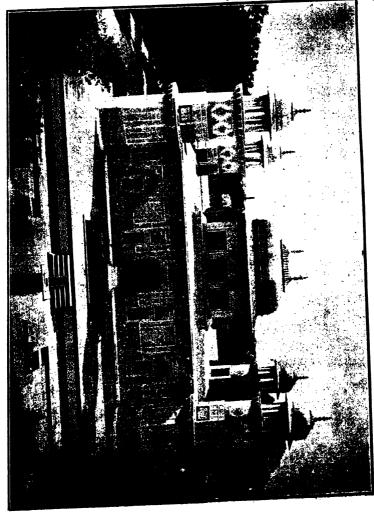
হইয়াছে। শিক্ষাপ্রণালী যেরূপ হওয়া উচিত সেইরূপে স্ত্রীশিক্ষা প্রচলিত হইলে চিরবিখ্যাত বঙ্গরমণীরা আজ এরূপ নিন্দার ভাজন হইতেন না। রমণীর পারিবারিক সম্বন্ধে অতি সংক্ষেপে বলা হইল সামাজিক কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে দেখিতে হইবে যে সমাজে রমণী কিরূপ স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছেন। সমাজ পুরুষ ও রমণী উভয় দ্বারা গঠিত। উভয়েই সমাজ গঠনের কার্য্যে নিযুক্ত, সমাজের প্রতি কর্ত্তব্য ও দায়ীত্ব উভয়ের মস্তকে আছে। সমাজের অবনতি ও উন্নতি উভয়ের উপর নির্ভর করে। কিন্তু পুরুষ ও রমণী বিভিন্ন উপায়ে ভিন্ন ভিন্ন প্রণালীতে সমাজের উন্নতির সাহায্য করিবেন, এই জন্য বিধাতা পুরুষ ও রমণীকে বিভিন্ন উপাদানে গঠিত করিয়াছেন। উভয়ের কার্য্যক্ষেত্র বিভিন্ন, কার্য্যপ্রণালী ও বিভিন্ন।

পরিবার সমষ্টি লইয়াই সমাজ গঠিত। পরিবারের উন্নতি অবনতির উপর সমাজের উন্নতি অবনতি নির্ভর করে। (অসম্পূর্ণ)

৺ বনলতা দেবী।

বর্ষায় আট দিন।

অনেক দিন এক জায়গায় বাস করিয়া কেমন এক প্রকার বিরক্ত হইয়া পড়িয়াছিলাম, তাই একবার শ্রাবণ মাসে আমাদের হঠাৎ বেড়াইবার সখ হইল। সে সময় আমাদের এক আত্মীয়ের ছুটি থাকায় আমাদের সখ মিটাইবার সুবিধাও হইল আমরা ১৪ই শ্রাবণ বুধবার রাত্রি ৮॥০ টার ট্রেনে এলাহাবাদ হইতে আগ্রা যাত্রা করিলাম। পরদিন ১০॥০ টার সময় আগ্রায় ন—বাবুর বাটীতে পৌছিলাম। বাবুরা তখনই আহারাদি করিয়া সেকেন্দ্রা দেখিতে চলিয়া গেলেন। আমাদের একটু বিলম্ব হইল সেজন্য তাঁহাদের সহিত যাইতে পারিলাম না। সেকেন্দ্রা দেখিতে আমার অনেকদিন হইতে ইচ্ছা ছিল সুতরাং মনে একটা দুঃখ রহিয়া গেল। সে যাহা হউক বেলা তিনটার সময় তাঁহারা ফিরিয়া আসিলেন আমরা আর কাল বিলম্ব না করিয়া তখনই এত্মদ্দৌলা দেখিতে যাত্রা করিলাম। ট্রেন হইতেই যমুনা-তীরস্থ ঘাট ও এই পুরাতন নগরীর সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়াছিলাম। বাস্তবিক যমুনা পুলের উপর হইতে আগ্রা যেমন সুন্দর দেখায় তেমন আর কোথাও হইতে দেখিলাম না। এখন আমরা সেই আগ্রা সহরের ভিতর দিয়া যাইতে লাগিলাম। প্রস্তর বাঁধান অপ্রশস্ত রাস্তা দুই পার্শ্বে নানা দ্রব্যপূর্ণ বিপনি। বাড়ীগুলি পুরাতন ধরণের; প্রস্তর বা ছোট ছোট ইটের গাথুনি, নীচু নীচু তলা। দরজাগুলিতে লোহার শিক বসান, মধ্যে মধ্যে লোহার দরজাও দেখিলাম; আগ্রার বাড়ীর আর একটি বিশেষত্ব দেখিলাম যে, সকল বাড়ীরই চারিদিকে অতি উচ্চ উচ্চ প্রাচীর। হয়ত বাড়ীতে ঘর আছে একটি, কিন্তু তাহার চারিদিকে প্রাচীর একতলার সমান। প্রাচীরে যে ইট খরচ হয় তাহাতে একটা ঘর হইয়া যায়। এটা বোধ হয় বাদসাহদের জঘন্য অত্যাচারের একটী প্রকৃষ্ট নিদর্শন, সকলেই আপন আপন স্ত্রী কন্যাকে তাহাদের পাপ চক্ষুর অন্তরালে রাখিবার জন্য বোধ হয় এইরূপ উচ্চ প্রাচীর

যারা গৃহের চারিদিক ঘেরিয়া রাখিত এই সকল দেখিতে দেখিতে আমরা যমুনার কাঠের পুল পার হইয়া এৎমেতৃউদ্দৌলায় পৌছিলাম। এৎমেতৃউদ্দৌলা সাম্রাজ্ঞী নুরজাহানের পিতার সমাধি। অতি শুভ্র শ্বেত প্রস্তরের উপর নানা বর্ণের প্রস্তরের কারুকার্য্য। চারিদিকে চারিটি রক্তবর্ণ গেট আছে, তাহার উপরে শ্বেত প্রস্তরের কারুকার্য্য। একটি গেট যমুনার উপর। সেখানকার দৃশ্য অতি সুন্দর। নিম্নে বর্ষাসলিল পরিপূর্ণা কলকলনাদিনী যমুনা, উপরে মেঘাচ্ছন্ন গম্ভীর অনন্ত আকাশ, আর সম্মুখে মনোহারিণী যমুনা তীরস্থ আগ্রা নগরী। অনেকক্ষণ সেই স্থানে বসিয়া রহিলাম। আরও কিছুক্ষণ থাকিতে ইচ্ছা ছিল। কিন্তু তাহা হইলে আর কিছু দেখা হয় না। কারণ আমাদের সময় বড় সংক্ষেপ, সেই দিনই ফিরিতে হইবে। তাই অপরিতৃপ্ত মনে সেখান হইতে সুবিখ্যাত তাজমহল দেখিতে গেলাম। আমরা ভরা বর্ষায় যাত্রা করিয়াছি, তাহার ফলও হাতে হাতে পাইলাম, তাজমহলের সম্মুখে আসিয়া পৌছিতে পৌছিতে খুব জোরে বৃষ্টি আসিল, আমরা সিংহদ্বারের সম্মুখে গাড়ীর ভিতর বসিয়া রহিলাম। বৃষ্টি থামিলে নামিব। কিন্তু বৃষ্টিও থামেনা, শেষে বলিলাম বৃষ্টিতেই নামা যাক, নহিলে আর দেখা হইবে না। আমাদের গরজ বুঝিয়া বৃষ্টিও চাপিয়া ধরিয়াছে। তারপর সেই বৃষ্টিতেই ছাতা মাথায় দিয়া নামিয়া পড়িলাম। আমাদের আগ্রহ দেখিয়াই বুঝি বৃষ্টির বেগ একটু কমিল। আমরা ভিজিতে ভিজিতে দেখিতে লাগিলাম। সেই শ্বেত প্রস্তর নির্ম্মিত নানা কারুকার্য্য খচিত অত্যুচ্চ প্রকাণ্ড প্রাসাদের পাদমূলে দাঁড়াইয়া যথার্থই স্তম্ভিত হইতে হয়। শুনিয়াছি নিজ প্রিয়তমা পত্নী "তাজকে" সম্রাট সাজাহান বলিয়াছিলেন, "প্রিয়তমে, তোমার জন্য এমন কিছু করিব যাহা পৃথিবীর মধ্যে অদ্বিতীয় হইবে।" সম্রাটের সেকথা এই তাজমহলে যথার্থই অক্ষরে অক্ষরে সত্য হইয়াছে। কেবল মাত্র শ্বেত প্রস্তরের এত বড় প্রাসাদে এমন কারুকার্য্য পৃথিবীর আর কোথাও নাই। আর বোধ হয় আধুনিক কালের পাশ্চাত্য শিল্পীগণ ভাবিয়াও পান না কেমন করিয়া ইহা নির্ম্মিত হইয়াছিল। তাহাদের মস্তকে এইরূপ একটা প্রাসাদের কল্পনাই বোধ হয় আসে না। সে যাহাই হউক আমরা বর্ষাসলিলে স্নাত হইয়া তাজ মহলের বাগানও দেখিলাম। বাগানে নানা প্রকার ফল ফুলের বৃক্ষ ও একটা বড় পুরাতন অশ্বত্থ বৃক্ষ, এবং মধ্যে অনেক উৎস আছে। সেই উৎসগুলির ধার দিয়া তাজমহলে প্রবেশ করিবার রাস্তা। একটা বড় চৌবাচ্চা বা হাউজের ভিতর অনেক বড় বড় মাছ আছে এক একটা ওজনে বোধ হয় ৴৪ সের হইবে। মানুষের শব্দ পাইয়া আহারের আশায় অনেক মাছ আমাদের পায়ের কাছে আসিয়া খেলা করিতে লাগিল ও কেমন এক প্রকার শব্দ করিতে লাগিল। আমাদের ইচ্ছাছিল তাহাদের কিছু ছোলা বা অন্য খাবার দিই কিন্তু শুনিলাম সেখানে কিছু পাওয়া যায় না কাজেই সেখানে আর অধিকক্ষণ অপেক্ষা না করিয়া, আমরা কেল্লা দেখিতে গেলাম। পথে সাজাহান নিজের জন্য যে সমাধি মন্দির নির্ম্মাণ করাইতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, তাহারই ভগ্নাবশেষ দেখা গেল। আগ্রার দুর্গ রক্তবর্ণ প্রস্তর নির্ম্মিত ও অতি বৃহৎ। আমরা প্রবেশ করিয়া প্রথমেই অঙ্গিনা মসজিদ দেখিলাম। এইস্থানে বেগমেরা

নমাজ পড়িতেন। শ্বেত প্রস্তরের নানারূপ কারুকার্য্য খচিত একটি দালান ও উঠান। উঠানে একটি উৎস আছে। শুনিলাম তাহাতে পূর্ব্বে নাকি গোলাপজল পড়িত ও সেই গোলাপ জলে বেগমেরা মুখ হাত ধুইতেন। অদিনা মসজিদের বাম পার্শ্বে একটি লাল পাথরের ছোট কুঠুরি। সেই স্থানে পাপিষ্ঠ আরঙ্গজেব সম্রাট সাজাহানকে বন্দী করিয়া রাখিয়াছিল। সেখান হইতে বেগম মহলে গেলাম। সমস্ত শ্বেত প্রস্তরের, স্থানে স্থানে অনেকগুলি করিয়া জলের ফোয়ারা। বেগম মহল দেখিয়া "দেওয়ানখাস" দেখিলাম। শ্বেত প্রস্তরের কারুকার্য্যময় একটা বড় প্রাসাদ, সেই স্থানে বাদসাহ রাজ্য সম্বন্ধীয় গুপ্ত মন্ত্রণা করিতেন। তারপর "দেওয়ান আম" দেখিতে গেলাম। একটি শ্বেত প্রস্তরের বেদী গড়নটা একটা ছোট বাড়ীর মত। নীচে থাম দেওয়া রক্তবর্ণ প্রস্তরের প্রশস্ত একটি দালান সেই খানে রাজারা ও আমীর ওমরাহরা বসিতেন ও বেদীর উপর বসিয়া সম্রাট দরবার করিতেন। সেখান হইতে বাদসাহের "দশ পঁচিশ" খেলিবার ঘর দেখিতে গেলাম। একটা উঠানে ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের প্রস্তরদ্বারা ঘর কাটা আছে, সাধারণে যেমন ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের ঘুঁটি লইয়া খেলে, বাদসাহ তেমনি ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের বস্ত্র পরিহিতা রমণীগণকে ঘুঁটি কল্পনা করিয়া খেলিতেন! বিলাসিতার চূড়ান্ত! তারপর যোধবাইয়ের মহল, বেগমদের লুকোচুরি খেলিবার ঘর। মহিলা বাজারের প্রশস্ত উঠান ও দোকান সাজাইবার ঘর, বেগমদের নাচ তামাসা দেখিবার ঘর, ও উঠানে বাদসাহের কষ্টিপাথরের সিংহাসন; যোধবাইয়ের যমুনায় স্নান করিতে যাইবার পথ; বাঁদীদিগের কারাগার ইত্যাদি অনেক দেখিলাম। সে সকলের বিশেষ বর্ণনা করিবার কিছু নাই। এই সকল দেখিয়া সাজাহানের যে স্থানে মৃত্যু হইয়াছিল সেই স্থানটা দেখিতে গেলাম। রক্তবর্ণ প্রস্তরের একটা গোলাকার দালান। দেখিবার কিছুই নাই, অনেক স্থান আবার ভাঙ্গিয়াও গিয়াছে। এইখান হইতে তাজমহল অতি সুস্পষ্ট ও সরল দৃষ্টি পথে দেখা যায়। শুনিলাম যে, যখন পুত্রের নিকট অন্য কোন দয়ার প্রত্যাশা ছিলনা তখন সম্রাট কহিয়াছিলেন, যে, "আমায় এমন কোন স্থানে থাকিতে দিও যেখান হইতে তাজবিবির সমাধি মন্দির দেখিতে দেখিতে মরিতে পারি", তাই এই ঘরে রাখা হইয়াছিল। সেখান হইতে বাদসাহের পুস্তকাগার দেখিতে গেলাম। পথে আমাদের গাইড একটা সুরঙ্গের মুখ দেখাইল। কথিত আছে ঐ সুরঙ্গ দিয়া নাকি ফতেপুর যাওয়া যায়। দুই জন গোরা এই কথা শুনিয়া সত্য মিথ্যা দেখিবার জন্য ঐ সুরঙ্গ মধ্যে গিয়াছিল কিন্তু তাহার পর তাহারা আর ফিরিয়া না আসায়, গভর্ণমেণ্ট, পাছে আর কেহ এই দুঃসাহসিক কার্য্যে ব্রতী হয়, সেই জন্য সুরঙ্গের দ্বার বন্ধ করিয়া দিয়াছেন। যাহা হউক আমরা পুস্তকাগার ও দুর্গের দুই এক স্থান দেখিয়া বাড়ী ফিরিলাম। পুস্তকাগার এখন ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। খানিকটা জায়গা লর্ড কার্জ্জন ঐ ঘরে কিরূপ কাজ ছিল তাহা লোককে দেখাইবার জন্য তৈয়ারি করাইয়াছেন, সে কাজ অতি সুন্দর। বাড়ী ফিরিয়া খাওয়া দাওয়া করিয়া সাড়ে দশটার ট্রেনে জয়পুর যাইবার জন্য ষ্টেশনাভিমুখে যাত্রা করিলাম। ট্রেনে চড়িতে গিয়া হাসিয়া মরি। একি গাড়ী! এমন গাড়ীতে ত কোন কালে উঠি নাই। যাহা হউক সেই খেলাঘরের গাড়ীতে উঠিয়া আমরা গজেন্দ্র গমনে জয়পুর যাত্রা করিলাম। (ক্রমশঃ)

শ্রীমনোরমা দেবী।

সংবাদমালা।

শিখ-মহিলা-সমিতি—প্রায় ২০০ শত শিখ মহিলাগণ সম্মিলিত হইয়া পাঞ্জাবের কোন নগরে এক সভা স্থাপন করিয়াছেন। রমণীদিগের মধ্যে শিখধর্ম্মের আলোচনা ও ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠাদির দ্বারা উন্নতি সাধন করা, এই নারী সভার উদ্দেশ্য। ঈশ্বর কৃপায় তাঁহাদের উদ্দেশ্য সফল হউক।

মহিলা সান্ধ্য-সমিতি—বোম্বাইর শাসনকর্ত্তার পত্নী তাঁহার প্রাসাদে বোম্বাইবাসিনী মহিলাদের এক সান্ধ্য-সমিতি করিয়াছিলেন। অনেক সম্ভ্রান্ত হিন্দু, পার্শী মহিলা সভাতে উপস্থিত হইয়াছিলেন। পরস্পরের সহিত আলাপাদি করিয়া ও লাট পত্নীর অমায়িক ব্যবহারে সকলেই বিশেষ সুখী হইয়াছিলেন। পরিশেষে জলযোগ হইয়া সমিতির কার্য্য শেষ হয়।

সদুদ্দেশ্য—(১) ইংলণ্ডের অন্তর্গত কিনমার্নক নগরে ইউনিটেরিয়ান মহিলাদের এক শিল্পসমিতি রহিয়াছে। গত ২৭শে ও ২৮এ মার্চ্চ উক্ত সমিতি এক শিল্প প্রদর্শনী করিয়াছিলেন। সমিতির সভ্যগণ তাঁহাদের উপাসনা গৃহের ঋণ পরিশোধের জন্য সকলে মিলিয়া শিল্প প্রস্তুত করিয়াছেন, প্রদর্শনীতে সেই সমুদয় দ্রব্য বিক্রয় করিয়া ৮৮৫৲ টাকা সংগ্রহ করিয়াছেন। এই অর্থের দ্বারা ইউনিটেরিয়ান ধর্ম্ম-মন্দিরের ঋণ পরিশোধ হইয়াছে।

(২) যাহাতে শিশু সন্তানের জননীরা নিশ্চিন্ত মনে দেবালয়ে উপাসনাতে যোগদান করিতে পারেন, সেজন্য ইংলণ্ডের কোন উপাসনা মন্দিরের পার্শ্বে একটী ঘরে তাহাদের শিশু সন্তানদের জন্য বিছানা, দোলনা, খেলনা ও ধাত্রীগণ থাকেন। মাতারা তাহাদের নিকটে শিশুদিগকে রাখিয়া নির্ব্বিঘ্নে উপাসনাতে যোগদান করেন।

পুরস্কার—ইংলণ্ডে জনৈক ব্যক্তি ঘোষণা করিয়াছেন যে, আগামী ১১ মাসের মধ্যে যে কোন পুরুষ, স্ত্রী, বালক অথবা বালিকা তামাক বা সিগারেট সেবনে বিরত থাকিবে, তাহাদের প্রত্যেককে একটী করিয়া স্বর্ণ মুদ্রা পুরস্কার দিবেন।

ধূম্রপান—ধূমপান করা অতি অপকারী, ইহাতে শরীরের কোন উপকার হয় না বরং অপকার হইয়া থাকে। তামাকের ধূম্রপানকারীর শরীর দুর্গন্ধময়। তামাক সেবনকারী দাস দাসীর ক্রোড়ে শিশু সন্তান রাখিলে তীব্র গন্ধে শিশুর কোমল স্বাস্থ্যের বিশেষ অনিষ্ট হইয়া থাকে। ধূমপান করিলে স্নায়ুমণ্ডল দুর্ব্বল, পরিপাকশক্তি হীন, দেহ খর্ব্বকায় হয়। ইহাতে নিকোটীন নামক ভয়ানক বিষ মিশ্রিত রহিয়া সেবনকারীর দেহকে বিষাক্ত করে। যে বিষপানে সবল পুরুষেরও স্বাস্থ্য নষ্ট হয়, তাহা কি কখনও অল্পবয়স্ক বালকগণ ও নারীগণের পক্ষে সেবনীয় হইতে পারে? পূর্ব্বাঞ্চলের অনেক স্থলে ভদ্রঘরের কুলবধূরা পর্য্যন্ত ধূমপান করেন। আশা করি, ইহার অনিষ্টকারিতা চিন্তা করিয়া সকলে এই কু-অভ্যাস পরিত্যাগ করিবেন। বিলাতী সিগারেট তো স্কুলপাঠশালার শিক্ষক ও ছাত্র (শিশু) পর্য্যন্ত সেবন করে। এই বিষময় দ্রব্য বিক্রয় করিয়া আমাদের দেশ হইতে প্রত্যহ ৩০।৪০ হাজার টাকা ব্যবসায়ী সাহেবেরা লইয়া যাইতেছে।

অদ্ভুত ব্যাপার—মান্দ্রাজ প্রদেশে জনৈক ৯০ বৎসর বয়স্ক হিন্দু যুবক তাহার প্রথমা পত্নীর দৌহিত্রীর (তৃতীয় পক্ষে) পানিগ্রহণ করিয়াছিল। তাহার একটী পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করে। নবীনা পত্নীর পতিভক্তি আশানুরূপ প্রবল ছিল না। ইহা দেখিয়া পতি মহাশয় পত্নীর প্রতি বড়ই অসন্তুষ্ট হইয়া তাহার পুত্রকে স্বীয় সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত করিয়া, মধ্যমা পত্নীর নিকট-সম্পর্কীয় কোন আত্মীয়কে সমুদয়ের অধিকারী করিলেন। ইহাতে পুত্রের মাতা (দৌহিত্রী) তাহার প্রাপ্য সম্পত্তির দাবী করিয়া আদালতে স্বামীর নামে নালিশ করিয়াছে। এতদঞ্চলে মাতামহ ও নাতিনীর বিবাহ উপহাসের কথা মাত্র কিন্তু অপর অঞ্চলে তাহাই কার্য্যে পরিণত হইয়াছে!

ধর্ম্মগ্রন্থের আদেশ পালন—মুসলমানদিগের ধর্ম্মগ্রন্থে চারিজন পত্নীর অধিক বিবাহ নিষিদ্ধ, কিন্তু উক্ত সম্প্রদায়ের অল্প সংখ্যক ব্যক্তি ইহা পালন করিয়া থাকে। সম্প্রতি কাবুল দেশের আমীর কেবলমাত্র চারিটী পত্নী রাখিয়া, অন্যান্য সমুদয় পত্নীদিগকে তাঁহার রাজ্যের সভাসদদিগকে বিবাহ করিবার অনুমতি দিয়াছেন। ইহাদিগের মধ্যে কোন রমণী যদি আমীরের বিবাহিতা বলিয়া অপর ব্যক্তিকে বিবাহ করিতে অসম্মতা হন, তাহা হইলে আমীর তাঁহাকে ভরণ পোষণের উপযুক্ত অর্থ প্রদান করিবেন। আমীর কেবল স্বয়ং ধর্ম্মোপদেশ পালন করিয়াই নিশ্চিন্ত হন নাই। কিন্তু প্রজামণ্ডলীকেও আদেশ করিয়াছেন যে, তাঁহার রাজ্যে কোন ব্যক্তি অতঃপর ৪ টীর অধিক বিবাহ করিতে পারিবে না। যে ৪ চারিজন সৌভাগ্যবতী রমণী আমীরের অন্তঃপুর সুশোভিত করিবার অধিকার পাইয়াছেন, তাঁহারা সকলেই সম্ভ্রান্তবংশীয়া ও পরমা সুন্দরী। কাবুলের আমীর কাবুলবাসীদের কিরূপ পোষাক পরিচ্ছদ পরিধান করিতে হইবে তাহারও একটী নিয়ম জারী করিয়াছেন। কাবুলবাসী মুসলমানগণ স্বর্ণ রৌপ্যখচিত পোষাক পরিধান করিতে পারিবে না। সাদাসিধে পোষাক পরিতে হইবে। স্ত্রীলোকগণ খাকি রংএর কাপড়ের বোরকা পরিধান করিবে। তাহারা বাগানে বা সমাধি স্থানে যাইতে পারিবে না। হিন্দু স্ত্রীলোকগণের লাল কিম্বা হলদে রংএর কাপড়ের বোরকা পরিতে হইবে। হিন্দু পুরুষগণের হলদে রংএর কাপড়ের পাগড়ি পরিধান করিতে হইবে।

ইন্দুরে প্লেগ—ইন্দুরেই প্লেগ সংক্রামিত করে। সুতরাং বাড়ী হইতে ইন্দুর তাড়াইতে পারিলে প্লেগের ভয় অনেকটা দূর হয়। মান্দ্রাজ প্রদেশের সেনিটরী কমিশনর কর্ণেল ডব্লিউ,জি,কিং তাঁহার নিজের গৃহে ও অন্যত্র পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে, আল্‌কাতরার সহিত সাল্‌ফিউরিক এসিড্ মিশ্রিত করিয়া গৃহস্থিত গর্ত্তে দিলে ইন্দুরকুল পলায়ন করে। সামান্য ব্যয়েই এই উপায় অবলম্বিত হইতে পারে। তিনি ⁄৩ তিন সের আল্‌কাতরার সহিত ১০ আউন্স সাল্‌ফিউরিক এসিড্ মিশ্রিত করিয়াছিলেন।

মশা বিনাশক উপায়। "হেল্‌থ" নামক স্বাস্থ্যবিষয়ক পত্রিকাতে প্রকাশ, এক গামলা জলে একটা মার্ব্বল পরিমাণ ফটকিরি দিয়া সেই জলে হাত, পা, মুখ প্রভৃতি শরীরের যে সকল অংশ খোলা থাকে, তাহা ধুইলে মশকের উপদ্রব হয় না।

ছারপোকানাশক ফল—শুষ্ক সোঁদালের

ফল গৃহ মধ্যে দগ্ধ করিয়া ধূম লাগাইলে ছারপোকার বংশ নির্ব্বংশ হয়।

বহরমপুরে মল্লক্রীড়া।—শ্রীমতী সরলা দেবীর প্রদর্শিত প্রণালী অনুসারে বহরমপুরের প্রাদেশিক সমিতি মল্লক্রীড়ার আয়োজন করিয়াছিলেন। সেখানে মল্লযুদ্ধ, লাঠি খেলা, তরোয়াল খেলা প্রভৃতি হইয়াছিল। মেদিনীপুরের পরমোৎসাহী উকীল বাবু প্যারীলাল ঘোষ, এম, এ, বি, এল, তরোয়াল খেলিয়া সকলকে চমৎকৃত করিয়াছিলেন।

অদ্ভুত যন্ত্র—জলমগ্ন হইলে জীবন রক্ষার এক নূতন আশ্চর্য্য ক্ষুদ্র যন্ত্র উদ্ভাবিত হইয়াছে। যন্ত্রটী একটী ক্ষুদ্র পুস্তকের মত। পকেটে রাখা চলে। এই যন্ত্রের সাহায্যে জলমগ্ন ব্যক্তি তিন দিন পর্য্যন্ত জলের উপর সহজে ভাসিয়া থাকিতে পারে। যন্ত্রটী জলস্পর্শে প্রসারিত হয়। জলযানে আরোহণকারীগণ, এই যন্ত্রটী পকেটে লইয়া জলযাত্রা করিলে অনেক সময় বিপদ হইতে রক্ষা পাইতে পারেন।

কন্যা বন্ধক।—বাঁকুড়া থানার অন্তর্গত তাঁতিপাড়া নিবাসী মাখন মন্দন্যা ফুলকুসমা নিবাসী রমানাথ সন্দারের নিকট সন ১৩০৭ সালের ১০ই শ্রাবণ তারিখে রেজষ্টরি দলিল দ্বারা ২১৲ টাকা কর্জ্জ লইয়াছিল। উক্ত দলিলে সর্ত্ত আছে যে, ঐ টাকা সুদসহ আদায়ের মাতর্ব্বরি জন্য মাখন মন্দন্যা আপন ১॥০ বৎসর বয়স্কা কন্যা শ্রীমতী ফুলকুমারী দাসীকে স্থিতবন্ধ রাখিল। মহাজনের টাকা আদায় না হওয়া পর্য্যন্ত ঐ কন্যার কোথাও বিবাহ দিতে পারিবে না এবং দিলে ঐ বিবাহ অগ্রাহ্য হইবে। এক্ষণে মহাজনকে না বলিয়া খাতক তাহার কন্যার অপর স্থানে বিবাহ দিয়াছে। মহাজন নালিশ করিবার উদ্যোগ করিতেছেন।

জাপানে নারী বিদ্যালয়।—দুই বৎসর হইল টোকিওর কতিপয় ধনী লোক পাশ্চাত্য বিদ্যালয় সমূহের অনুকরণে জাপানে বালিকাদের জন্য এক বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা করেন। এই বিদ্যালয়ের দুই বিভাগ,—এক বিভাগে কলেজের, আর এক বিভাগে উচ্চ শ্রেণীর ইংরাজী বিদ্যালয়ের অনুরূপ শিক্ষা দেওয়া হয়। এখানে তিন বিষয় শিক্ষাদান করা হয়, (১) ইংরাজী ভাষা ও ইংরাজী সাহিত্য, (২) জাপানী ও চীনা ভাষা ও সাহিত্য, (৩) গার্হস্থ্য কার্য্য। শিক্ষকদের অধিকাংশই পুরুষ। কোনও বিশেষ ধর্ম্মমত শিক্ষা দেওয়া হয় না, সকল ধর্ম্মাবলম্বী বালিকারাই এই বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিতে পারে। বিদ্যালয়ের সংশ্রবে ছাত্রীনিবাস, হাস্পাতাল ও পুস্তকালয় আছে। এই দুই বৎসরের মধ্যে জাপানের সর্ব্বপ্রদেশ হইতে ৮ শত রমণী এই বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হইয়াছে, ছাত্রীদের বয়স ১২ বৎসর হইতে ৩৫ বৎসর।

সূর্য্যমুখী ফুলের বীচি—আমাদের দেশে যেরূপ লোকে চীনা বাদাম ভাজিয়া খায়, রুষদেশে তেমনি লোকে সূর্য্যমুখী ফুলের বীচি নুন দিয়া ভাজিয়া খায়। মার্কিন দেশের লোকে সূর্য্যমুখী ফুলের চাষ করে,—তাহার বীচি প্রচুর পরিমাণে রুষদেশে বিক্রয় হয়। মার্কিনগণ ইহাতে বেশ দু'পয়সা রোজগার করিতেছে। ভারতে সূর্য্যমুখী ফুল প্রচুর পরিমাণে জন্মে। এই গরীব দেশের লোকগণ তাহার বীচি খাইতে পারে। সূর্য্যমুখী ফুল ম্যালেরিয়া নাশক বলিয়াও শুনা যায়। ম্যালেরিয়াগ্রস্ত গ্রামে গ্রামে ইহার চাষ হইতে

পারে। ইহাতে ম্যালেরিয়া নাশ ও আহারের উপকরণ, উভয়ই হইতে পারে।

ধাত্রীবিদ্যা—লেডি কার্জ্জনের ইচ্ছা প্রতি গ্রামে ধাত্রী বিদ্যা শিক্ষাদানার্থ মহারাণী ভিক্টোরিয়ার নামে বৃত্তি স্থাপন জন্য অর্থ সংগৃহীত হয়। পঞ্জাবে ও পাতিয়ালা রাজ্যে ধাত্রীবিদ্যা শিক্ষাদানার্থ বন্দোবস্ত হইয়াছে, ছাত্রীদিগকে দুই বৎসরকাল মাসে ৮৲ টাকা করিয়া বৃত্তি দান করা হইবে।

কবিতাপ্রিয় রাজা ও রাণী—জাপানের সম্রাট কবিতা লিখিতে বড় ভালবাসেন। তিনি প্রতিদিন অপরাহ্ণে ৫০।৬০ পংক্তি কবিতা লিখিয়া থাকেন। সম্রাজ্ঞীও কবিতা ভাল-বাসেন, কিন্তু সপ্তাহে ৮।১০ লাইনের বেশী লিখিতে পারেন না।

খেলানাপ্রিয় জাতি—গত বৎসর ইংরেজেরা তাঁহাদের পুত্র-কন্যাদের জন্য ৪ কোটি টাকার খেলেনা কিনিয়াছিলেন। ইংরেজ বালক বালিকা যেমন খেলেনা ভালবাসে, ইউরোপের আর কোন দেশের বালক বালিকারা তেমন ভালবাসে না। এক ইংলণ্ডে যত খেলেনা বিক্রয় হয়, সমস্ত ইউরোপে তত হয় না।

আগ্নেয় গিরি।—মধ্য আমেরিকার নিকারেগুয়া প্রদেশের তিনটা আগ্নেয়গিরি হইতে প্রবল অগ্নি বর্ষণ হইতে আরম্ভ হইয়াছে। দক্ষিণ আমেরিকার চিলিতেও পাঁচটী পর্ব্বতে অগ্ন্যুৎপাত হইতেছে।

মার্কিনে ব্যাঙ্ক। মার্কিনের নিউইয়র্ক সহরে একটী ব্যাঙ্ক খোলা হইতেছে। এই ব্যাঙ্কে যাঁহারা কাজ করিবেন, টাকা জমা দিবেন, তাঁহারা সকলেই স্ত্রীলোক। ব্যাঙ্কের মূলধন ৫০ লক্ষ ডলার অর্থাৎ প্রায় ১ ক্রোটী ৩০ লক্ষ টাকা।

সদনুষ্ঠান—অন্ধ বালক বালিকাদের জীবনকে কার্য্যোপযোগী জ্ঞানশিক্ষা দিবার জন্য কলিকাতায় ১৮৯৭ সালে এক অন্ধ শিক্ষালয় স্থাপিত হয়। বাবু লালবিহারী সাহা ইহার প্রতিষ্ঠাতা ও পরিচালক। এই আশ্রমে অন্ধ বালক বালিকারা বিনা ব্যয়ে আশ্রয় ও নানাবিধ শিল্প শিক্ষালাভ করে। অন্ধের নয়ন অভাবে জীবন কি দুঃখজনক তাহা সকলেই সহজে বুঝিতে পারেন, এরূপ দুঃখীর দুঃখ, কণামাত্র হ্রাস করিতে পারিলেও জীবন সার্থক হয়। এরূপ সৎকার্য্যে সাহায্য সকলেরই করা কর্ত্তব্য। অন্ধবালকগণ ভাঙ্গা বেতের মোড়া চেয়ার চিক প্রভৃতি মেরামত করিতে পারে। তাহাদের জন্য স্বতন্ত্র মুদ্রাযন্ত্র ক্রয় করিয়া পুস্তক প্রকাশের চেষ্টা হইতেছে।

বিবাহোৎসব—আমাদের মহারাজা এবং মহারাণী বাকিংহাম রাজ প্রাসাদে ১১ই মার্চ্চ তাঁহাদের বিবাহের চত্বারিংশ বার্ষিকোৎসব উপলক্ষে রাজপরিবারের লোকদের এক ভোজ দিয়াছেন।

বিধবা-বিবাহ।—মণিশঙ্কর গোবিন্দজী একজন প্রসিদ্ধ ঔষধ ব্যবসায়ী। গুজরাটের অতি সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণ কুলে ইঁহার জন্ম। কলি-কাতাতেও ইঁহার ঔষধের ব্যবসায় আছে। ইনি সম্প্রতি বোম্বাই নগরে এক সৎকুলোদ্ভবা ব্রাহ্মণ বিধবার পাণিগ্রহণ করিয়াছেন। কন্যার পিতা গুজরাটে কোন দেশীয় নৃপতির একজন উচ্চ শ্রেণীর কর্ম্মচারী।

কুপ্রথা।—আনন্দলাল চৌধুরী এটর্ণি মরগান কোম্পানির কেরাণী। তাঁহার স্ত্রী কামিনীকুমারী দেবীর সন্তান না হওয়াতে তিনি দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ করিয়া প্রথম স্ত্রীকে তাড়াইয়া দিয়াছেন। স্ত্রী খোরপোষের দাবীতে নালিশ করিয়াছেন।

গৃহস্থালীর কথা।

কেরোসিন তৈলের ব্যবহার।

১। ল্যাম্পের পলিতা-নলটীতে যাহাতে পলিতাটী বেশ ঠিক ঠিক প্রবেশ করে, যাহাতে খুব শিথিল বা খুব কসাকসি না হয়, তাহা করিতে হইবে। পলিতা গুটাইয়া মুচড়াইয়া নলের ভিতর পরাইবে না।

২। পলিতা নলে পরাইবার পূর্ব্বে, আগুনে তাতাইয়া লইয়া, তৎক্ষণাৎ কেরোসীনে ভিজাইয়া দিবে।

৩। পলিতা কদাচ ১০ ইঞ্চির অধিক দীর্ঘ হইবে না। আর তাহার গোড়াটী ল্যাম্পের তৈলাধারের তলায় গিয়া ঠেকিবে।

৪। দুই মাস অন্তর পলিতা বদলাইতে হইবে।

৫। ল্যাম্পের চিমনি যেন বেশ টাইট বসে, নাড়া চাড়ার সময় যেন চিমনি কদাচ পড়িয়া না যায়।

৬। যখন নূতন পলিতা আবশ্যক হইবে, বা নূতন চিমনি আবশ্যক হইবে; তখন ল্যাম্পের পলিতা বসাইবার বর্ণার বা প্যাচ-মুখটী দোকানে পাঠাইয়া দিবে, কদাচ আন্দাজ করিয়া পলিতা বা চিমনি আনিও না। যাহা ঠিক ঠিক না হয়, তাহাতেই বিপত্তি হইতে পারে।

৭। পলিতা বসাইবার বর্ণারটী খুলিয়া মাজা ঘসা চলে। মাসে অন্ততঃ একবার খুলিয়া মাজিবে ঘসিবে। তাহার ভিতর পুরাতন পোড়া পলিতার টুকরা, মাছি, মশা, পোকা, মাকড়, ময়লা প্রভৃতি যাহা থাকিবে, সব ফেলিয়া দিয়া পরিষ্কার করিবে।

৮। ল্যাম্প কদাচ আগুনের কাছে রাখিয়া তাহাতে তৈল পুরিও না; জ্বলন্ত ল্যাম্পেও কদাচ তৈল পুরিও না।

৯। তৈল পুরা হইলে, দেখিবে, যেন বর্ণার ঠিক আঁটিয়া বসিয়াছে। যেখানে তৈলাধারে তৈল ঢালিবার জন্য পার্শ্বে ছিদ্র আছে, সেখানে ছিদ্রের প্যাচটী যাহাতে আঁটা হয়, তাহা করিবে। এ দুই কার্য্যে কদাচ ঔদাসীন্য করিও না।

১০। জ্বালিবার পূর্ব্বে পলিতার পোড়া, মুখটী কাঁচি দিয়া বেশ করিয়া কাটিয়া ফেলিয়া দিবে। দেখিও যেন ল্যাম্পের গায়ে তৈলের ছিটা না লাগে। যদিই লাগে, তবে শুষ্ক কাপড় বা নেঁকড়া কানি দিয়া, বেশ করিয়া মুছিয়া ফেলিবে।

১১। ভিজা কাপড়, গামছা, জলের ছিটা, ভিজা হাত, কাচের চিমনি বা হরিকেনের লণ্ঠনে লাগিলেই, উহা ফাটিয়া যায়, এ পক্ষে সাবধান থাকিবে।

১২। জ্বালিবার পূর্ব্বে দেখিও, পলিতা যেন বর্ণারের মুখে ঠিক বসিয়াছে। পলিতার শিখা যাহাতে কদাচ বর্ণারের ধাতুময় অংশে না স্পর্শে, তাহার ব্যবস্থা করিও।

১৩। পলিতা জ্বালিয়াই, প্যাচ ঘুরাইয়া, একটু নামাইয়া দিবে; তৎপরে আস্তে আস্তে প্যাচ ঘুরাইয়া পলিতা তুলিয়া দিবে। যেই দেখিবে, ধূম উঠিতেছে, অমনই প্যাঁচ বন্ধ করিয়া দিবে, পলিতা আর তুলিবে না।

১৪। যখন দেখিবে, আলোক সাদা না হইয়া জরদবর্ণ হইতেছে, তখনই বুঝিবে পলিতা ঠিক জ্বলিতেছে না। তৎক্ষণাৎ বর্ণারটীকে বেশ করিয়া পরীক্ষা করিবে।

১৫। তৈলাধারে তৈল থাকিতে থাকিতে তৈল দিবে, যাহাতে সমস্ত তৈল পুড়িয়া যাইয়া তৈলাধার শূন্য না হয়, তাহা করিবে।

১৬। যে ল্যাম্প শিখা-নির্ব্বাণের স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত নাই, সে ল্যাম্পের প্যাঁচ ঘুরাইয়া পলিতা ও শিখা ভিতরের দিকে নামাইয়া দিবে। কিন্তু সাবধান, যেন পলিতা খসিয়া তৈলাধারে পড়িয়া না যায়। এইরূপে পলিতা নামাইয়া যখন দেখিবে, শিখা মিট মিট করিতেছে, তখন হয় চিমনির উপর একখানা পাতলা টিন বা তাসের মত মোটা কাগজ চাপা দিবে, না হয় চিমনির মুখে ফু দিবে, তাহা হইলেও শিখা নিবিয়া যাইবে, চিমনির তলায় ফুৎকার দিবে না।

১৭। ভগ্ন বা দোষযুক্ত ল্যাম্প-চিম্নির কদাচ ব্যবহার করিবে না। যখনই কোনরূপ দোষ ঘটিবে, বা কোনরূপ সন্দেহও হইবে, তখনই ল্যাম্প মিস্ত্রিখানায় পাঠাইয়া দিবে।

১৮। যেখানে থাকিলে ল্যাম্প হঠাৎ পড়িয়া যাইতে পারে, এরূপ স্থানে ল্যাম্প কদাচ রাখিও না। নড়নড়ে টেবিল, ব্রাকেট, আব্‌ড়ো খাব্‌ড়ো কুলুঙ্গি বা জানালায় কদাচ ল্যাম্প বসাইবে না।

১৯। দেওয়ালে গজাল পুতিয়া ল্যাম্প লাগাইতে হয়। দেখিও যেন গজাল শক্ত হইয়া বসে। ঝোলা ল্যাম্পের শিক প্রভৃতি যেন বেশ শক্ত থাকে।

২০। টেবিলের কেরোসীনল্যাম্প এখানে ওখানে লইয়া বেড়াইবে না, আর যখন ল্যাম্প লইয়া যাইবে, তখন আর কোন জিনিষ হস্তে রাখিবে না। ভারী ল্যাম্প কদাচ এক হাতে লইয়া যাইবে না।

২১। মনে থাকে যেন, অধিকাংশ স্থলেই এক স্থান হইতে অন্য স্থানে লইয়া যাইবার সময়েই ল্যাম্প পড়িয়া গিয়া সর্ব্বনাশ ঘটায়।

২২। নিবাইবার সময়েই ল্যাম্পের শিখা নামাইয়া দিবে। অন্যথা কখনই নহে, শিখা ভিতরের দিকে প্রবেশ করিলে, তৈল অত্যন্ত তপ্ত হইয়া উঠে।

২৩। কেরোসীন কদাচ আগুনের উপর ঢালিবে না। কেরোসীন দিয়া উনুন ধরাইলে সময়ে সময়ে বিপত্তি ঘটে। যে উনুন ধরায় তাহার সর্ব্বনাশ ঘটিতে পারে। অল্প তৈলে ঘুঁটে, কাগজ বা নেকড়া ভিজাইয়া, তাহা দিয়াই উনুন ধরাইবে। তৈল-পাত্র হইতে কদাচ তৈল উনুনে ঢালিবে না।

২৪। যদি হঠাৎ কাপড় ধরিয়া যায়, তবে কম্বল, জাজিম, গালিচা, কার্পেট, মোটা পশমী কাপড় বা ভিজা তোয়ালে চাপা দিবে। তাহা হইলেই ভয় দূর হইবে।

২৫। যাঁহারা চিম্নিযুক্ত ল্যাম্প প্রভৃতির ব্যবহার করেন, এই উপদেশগুলি তাঁহাদিগের শিরোধার্য্য। কিন্তু এদেশের পনর আনা লোকে টিনের বা কাচের ডিবায় কেরোসীন জ্বালে, তাহাদের সর্ব্বনাশও সর্ব্বদাই ঘটে।

২৬। দেখিতে হইবে, ডিবা যেন মজবুত হয়, যেন ডিবায় কিছুতেই তৈল না চুয়ায়, যেন ডিবায় জলের হাত না লাগে, যেন সলিতা বা পলিতা ডিবার ভিতর পড়িয়া না যায়, যেন ডিবার শিখা কোন দহনশীল দ্রব্যে না ঠেকে, যেন সেরূপ স্থানে ডিবা না রাখা হয়। জ্বলন্ত ডিবা হাতে করিয়া না চলাই ভাল। একান্ত আবশ্যক হইলে, খুব সাবধানে যাওয়া উচিত। কেরোসীনে যেন কদাচ জল মিশ্রিত না হয়।

(উদ্ধৃত—বসুমতী)

কবিতা।

মিনতি।

১। আঁধারে শৈশবকাল করেছি কর্ত্তন,
দিয়েছি পুতুল বিয়ে
মৃদু হুলুধ্বনি দিয়ে,
পাপিয়া উড়িয়া গেছে যখন তখন
সুকণ্ঠে গাহিয়া গীত মঙ্গলাচরণ।

২। সুখের কি দুঃখের তা বুঝি না এখন
সে এক গিয়াছে দিন,
হীন প্রাণে জ্ঞান ক্ষীণ,
মানব স্বভাব ছিল অজ্ঞাত তখন—
সে এক গিয়াছে দিন বুঝিনা কেমন

৩। বাহ্য চোখে বাহ্য বস্তু দেখিত কেবল;
স্মৃতি ধৃতি শক্তি হীন
হৃদয় সারাটা দিন
স্বাধীন সামান্য কাজে থাকিত চঞ্চল,
সে এক গিয়াছে দিন সরল নির্ম্মল।

৪। তারপর এ হৃদয়ে হইল যখন
তোমার একাধিপত্য
হে নাথ, সস্নেহে নিত্য
শিখাইলে কত জ্ঞান ধর্ম্ম আচরণ,
ইচ্ছামত গড়িলে এ রমণী জীবন।

৫। প্রদীপ্ত ভাস্কর তুমি উদিলে যখন
আমার অদৃষ্টাকাশে,
অমনি ফুটিল হেসে
হৃদয়-সরসী-নীর ভেদিয়া তখন,
শতদল জ্ঞান-পদ্ম কাঙ্গালের ধন।

৬। তব গুণে তব স্নেহে চিনিনু সংসার।
থাকিয়া তোমার বুকে
শুনিনু তোমার মুখে
ত্রিদিবের পূত ভাষা বীণার ঝঙ্কার—
অমূল্য দুর্ল্লভ বাণী, সাধনা আমার।

৭। নিজে ভালবেসে ভালবাসিতে শিখালে
হে নাথ, তুমিই ধন্য,
অধীনীর ছিল পুণ্য
জন্মান্তরে, তাই আজ আনন্দ-সলিলে
ভাসিতেছি তব পদ সেবি কুতূহলে।

৮। তোমারি প্রদত্ত জ্ঞানে চিনেছি তোমায়
মর্ত্ত্যে দেব অধিষ্ঠান
যে না বুঝে সে অজ্ঞান
রমণী, জনম বৃথা তার এ ধরায়;
স্বগুণে দিয়াছ চিনা যদি, রেখো পায়,

৯। অধীনীর এ মিনতি—এই আকিঞ্চন,
তব দত্ত জ্ঞান ধন
হৃদে রাখি অনুক্ষণ,
সীমন্তে ও পদধূলি করিয়া ধারণ
কেটে যেন যায় নাথ রমণী-জীবন।

শ্রীগিরিবালা সেন গুপ্তা।

নববর্ষে সম্পাদিকার প্রতি।

অয়ি! ভগিনি আমার
এ নব বরষে মনের হরষে
সুবাসিত ফুলদল,
করিয়া চয়ন মালা সুচিকণ
দেহে মনে নববল,
গাথিয়া নীরবে অন্তঃপুরে সবে
রমণীর কণ্ঠদেশে,

পরাও যতনে দৃঢ়তার সনে
সাজাও নবীন বেশে;
নিরমল মনে কর্ত্তব্য পালনে
হইয়াছ অগ্রসর,
অয়ি! ভগিনি আমার।

২

প্রিয় ভগিনি, আমার,
অটল ভাবেতে একমন চিতে
সাধিবারে সেই কাজ,
ঢেলেছ পরাণ দেবতা সমান
জগতে তোমরা আজ;
বড় আশা মনে তোমাদের সনে
ভগিনী কল্যাণ তরে,
আমিও ফিরিব, প্রাণ সঁপে দিব,
অদম্য উৎসাহ ভরে।
ভগিনি, আমার কিঁ বলিব আর,
সে সাধ পুরিল কই
মানস প্রসূনে অতি সংগোপনে
বদ্ধ আছে এক ঠাঁই,
সংসার কাননে কঠোর বন্ধনে
অবরোধ সদা মোরা
ব্যস্ত গৃহ কাজে বাঁধা গৃহ মাঝে
জ্ঞান শিক্ষা হয়ে হারা
আসিয়া ধরায় কি করিনু হায়
জগতের উপকার
প্রিয় ভগিনী আমার।

৩

অয়ি! ভগিনি আমার
যে ব্রত সাধিতে বাসনা প্রাণেতে
সম্পাদন কর তাহা,
তোদের হৃদয় পবিত্রতাময়
বিশুদ্ধ হউক আহা
কিছু চিন্তিবার নাই অবসর
কি আর বলিব ভাই,
সুশীতল বায় আমাদের গায়
লাগিতে পারেনা ছাই।
হয়ে দিশে হারা জ্ঞান বোধ হারা
রহিব ভবের মাঝে,
এমনি করিয়া জীবন ক
সাজিব মরণ সাজে,
আজি বনফুলে দেই হাতে তুলে
কোথা পাব কুবলয়;
লহ স্নেহ ভরে আদরে দু'করে
বনের কুসুম চয়
নবীন বরষে লও বোন! হেসে
ধর এই উপহার
প্রিয় ভগিনী আমার।

শ্রীহেমন্তকুমারী গুপ্তা।

বিস্মৃতি।

১

কত দূরে রহিয়াছ তুমি,
আমি বা রয়েছি কত দূরে,
কেন আজ গভীর নিশিতে—
আঁখি জল বহে বারে বারে?

২

মনেতে পড়িছে বার বার,
নিরমল মুখানি তোমার!
হৃদয়ের আকুল উচ্ছাসে—
ঝরিতেছে নয়নের ধার!

৩

কত দূর রহিয়াছ তুমি,
আমি বা রয়েছি কত দূরে;—
কালের ভীষণ আবর্ত্তনে,
হয় তো ভুলেছ একেবারে!

৪

আর কি রেখেছ মোর ঠাঁই,
তোমার প্রাণের এক ধারে!

কিম্বা মোরে দিয়াছ ভাসায়ে
বুঝি চির বিস্মৃতির নীরে!

৫

তোমার সে অনন্ত অসীম,
স্নেহ ভরা প্রেম ভরা প্রাণ!
সুদীরঘ বিরহের তাপে—
হ'য়েছে কি এতই পাষাণ?

৬

আর কি দিবে না তবে দেখা,
ভুলেছ কি জীবনের তরে!
বাসনা-আগুন লয়ে বুকে—
জ্বলিব কি সারা জন্ম তরে?

৭

মানুষের প্রেম ভালবাসা—
কেবলি কি ক্ষণিকের তরে?
রয়ে যায় অতৃপ্ত বাসনা—
হৃদয়ের প্রতি স্তরে স্তরে!

৮

একবার আসিয়া নিকটে,
একবার দাও যদি দেখা—
জীবনের বাসনা আমার,
চিরতরে মিটিত হে সখা!

৯

গিয়াছে হে ফুরায়ে আমার,
জীবনের সাধ আশা যত,
অন্তিমের অগম্য সে পথে—
আমি এবে হয়েছি ধাবিত!

১০

না জানি গো সে কেমন দেশ,
সেথা দেখা পাব কি তোমার?
—তাই ভাবি ব্যাকুল অন্তর,
আজ বড় প্রাণেশ আমার!

১১

কই কই রয়েছ কোথায়?
এখনো ত নিকটে এলে না,
এতই কি হয়েছ নির্দ্দয়!
বুঝিলে না প্রাণের বেদনা।

১২

চলিলাম জনমের মত—
সুখে থেক প্রাণেশ আমার!
—আমার রহিল স্মৃতি শুধু
দুই ফোঁটা তপ্ত অশ্রুধার!

১৩

যদি এস দেখা দিতে মোরে—
(যদি মোর কথা মনে হয়)
রহিল এ নয়নের জল,
দেখিও—এ যদি না শুকায়!

শ্রীকুমুদেন্দু দেবী

রন্ধন।

আইরিস ষ্টু।

প্রথমে মাংসগুলি সামান্য একটু জলে উনানে চড়াইয়া ২।৩ মিনিট রাখিয়া নাবাইয়া জল ফেলিয়া পুনরায় জল দিয়া পরিষ্কার করিয়া ধুইয়া ফেল, মাংসে যেন জল না থাকে। তারপর ঢাকনীওলা ডেকচিতে মাংস রাখিয়া তাহাতে গোটা কতক আস্ত খোলা ছাড়ান আলু আদার চাকা কয়েক খানা, পেঁয়াজ ডুমো ডুমো করিয়া, ছোট এলাচের একদিকের খোলা ছাড়াইয়া কয়েকটা দারচিনি কয়েক টুকরো লবঙ্গ ও তেজপাতা একটুটুকু ঘি এবং জল দিয়া ডেকচির ঢাকনা দিয়া ঢাকিয়া দাও। মাঝে মাঝে ঢাকনি, খুলিয়া নাড়িয়া দিবে। মাংস সিদ্ধ হইলে ইচ্ছামত ঝোল রাখিয়া নাবাইয়া রাখ। এইবার ষ্টু তৈয়ার হইল জানিবে। মাংসের পরিমাণ বুঝিয়া মসলা দিতে হয়।

শ্রীকমলেকামিনী গুপ্তা।

দুর্গ-মধ্যস্থ মতি মস্‌জিদ্‌ ।

অন্তঃপুর

সচিত্র মাসিক পত্রিকা।

ANTAHPUR

AN ILLUSTRATED MONTHLY JOURNAL IN BENGAL.

Edited and contributed to by the ladies only

কেবল মহিলাগণ কর্ত্তৃক লিখিত ও সম্পাদিত।

সংসার রাজ্যের মাঝে অন্তঃপুর রাজধানী,
পরম মহিমাময়ী রমণী তাহার রাণী।
সংসার সুখের হয়, স্বরগেতে পরিণত,
নারী যদি কায়মনে পালেন রমণী-ব্রত।

৬ষ্ঠ বর্ষ।	জ্যৈষ্ঠ, ১৩১০ বঙ্গাব্দ।	VOL. VI.
২য় সংখ্যা।	JUNE, 1903.	NO. II.

অন্তঃপুর ও বিলাসিতা।

আজকাল প্রায় অনেকের মুখেই শুনিতে পাওয়া যায়, যে স্ত্রী শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে বিলাসিতার প্রাদুর্ভাব অন্তঃপুর মধ্যে শনৈ শনৈ প্রবেশ লাভ করিতেছে, এবং অনেকে এরূপও বলিয়া থাকেন যে, এই বিলাসিতার প্রভাব পুরুষাপেক্ষা রমণীগণের মধ্যেই সমধিক পরিমাণে বিস্তারিত হইতেছে। এ বিশ্বাসের মূলে কোন ভিত্তি, বাস্তবিকপক্ষে আছে কি না, তাহা পর্য্যালোচনা করা নিতান্ত দরকার। প্রকৃতপক্ষে যে দেশে, বিলাসিতারদিকে আপামর সাধারণ সকলেরই দৃষ্টি পতিত হইয়াছে, সে দেশে রমণীগণের বিলাসানুরাগের প্রভাব যে একটু বেশী হইবে তৎপক্ষে কোন সন্দেহ নাই; কারণ স্ত্রীজাতি চিরদিনই সৌন্দর্য্য প্রিয়তার অনুরাগিণী। এই সৌন্দর্য্য প্রিয়তাকে বিলাসিতা বলা যাইতে পারে না। তবে এই সৌন্দর্য্যপ্রিয়তা হইতেই বোধ হয় বিলাসিতার সৃষ্টি। কি কারণে সৌন্দর্য্যপ্রিয়তা বিলাসানুরাগে পরিণত হইতেছে, তাহা নির্ণয় করা সুকঠিন। পূর্ব্বকালের রমণীগণ আধুনিক রমণীদিগের ন্যায় এত বিলাসপ্রিয় ছিলেন না। আজকাল নানারূপ বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের প্রভাবে আমরা প্রত্যহই নূতন নূতন বিলাসদ্রব্য সম্মুখে প্রাপ্ত হইতেছি, এবং তাহা উপভোগ করিবারও তেমন কোন প্রতিবন্ধক পাই না। এরূপ অবস্থায় সৌন্দর্য্যপ্রিয় রমণীজাতি মনমুগ্ধকর বিলাসদ্রব্য সম্মুখে পাইলে উপভোগ

করিবেন না কেন ? বাঙ্গালীজাতি স্বভাবতঃই অনুকরণ প্রিয়তায় অগ্রণী, বিশেষতঃ বিদেশস্থ আচার ব্যবহার আমাদের আদর্শস্বরূপ হইয়া দাড়াইয়াছে। এইক্ষণ আর আমরা খনা, লীলাবতী, গার্গী, মৈত্রেয়ী এবং সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী প্রভৃতি প্রাচীনকালের রমণীগণের রীতি নীতি অনুসারে চলিতে ইচ্ছুক নহি। এইক্ষণ আমরা বিলাসিতার আধার সুপ্রসিদ্ধ প্যারিস নগরের ফরাসী মহিলাদিগের বেশ-ভূষা এবং স্বাধীনতাপ্রিয় আমেরিকার আচার ব্যবহার, লণ্ডনের রীতি নীতি, অনুকরণেই অধিক যত্নবান। এই অবস্থায় বিলাসিতার ভাব বঙ্গদেশ মধ্যে অধিক পরিমাণে বিস্তৃত হইবে, ইহা স্থির নিশ্চয়। ইহাতে সহৃদয়া পাঠিকাগণ মনে করিবেন না যে আমি প্রাচীনকালের আচার ব্যবহার রীতি নীতি অক্ষুণ্ণভাবে বজায় রাখিতে যত্নবতী। কিন্তু আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস আমাদের দরিদ্রদেশের নিকট সেকেলে অনেক প্রথাই আদরণীয় হওয়া উচিত। এখন দেখা যাউক সম্পূর্ণভাবে বিলাসিতা কাহাকে বলা যায়।

আধুনিক রমণীরা আজকাল যে সমস্ত জিনিস ব্যবহার করিতেছেন, সে সমস্তই যে বিলাসিতার জন্য তাহা নয়, কিন্তু প্রয়োজনীয় জিনিসও অনেকের নিকট বিলাস সামগ্রী বলিয়া গণ্য হয়।

আজকাল অধিকাংশ রমণীগণই লজ্জা-শীলতা রক্ষা করিবার জন্য সেমিজ ও বডিস ব্যবহার করিয়া থাকেন। পূর্ব্বকালে এ প্রথা ছিল না বলিয়াই যে সেমিজ ও বডিস্ ব্যব-হার দোষনীয়, তাহা বলা যাইতে পারে না। কিন্তু বিলাসিতার প্রভাবে মার্কিনের সেমিজের স্থলে যেখানে ঝালর ও বহু মূল্যের লেশ দেওয়া সিল্কের সেমিজ অঙ্গে উঠিতেছে ইহাকে বিলাসিতা ভিন্ন আর কি বলা যাইতে পারে ? বহু পূর্ব্বকালের রমণীগণ অঙ্গরেখা পরিধান করিতেন, এখনও পশ্চিমাঞ্চলে এই প্রথা দৃষ্ট হইয়া থাকে। অধুনা অঙ্গরেখার পরিবর্ত্তে যে সেমিজ, বডিস্ ব্যবহৃত হইয়া থাকে, ইহাতে প্রকৃত উদ্দেশ্য সফল হয় কিনা সন্দেহ। পূর্ব্বে রমণীগণের গাত্র পরিষ্কার করিবার কি সামগ্রী ছিল জানি না, কিন্তু অধুনা সেই গাত্র পরিষ্কার জন্য নানাবিধ সুগন্ধি সোপ্ (সাবান) ব্যবহৃত হইতেছে *। যেস্থলে তিল তৈল বা নারিকেল তৈল মাখিয়াই সকলে বেশ সন্তুষ্ট থাকিতেন; এইক্ষণ সেস্থলে দেশী ও বিদেশী নানারূপ সুবাসিত তৈলে অঙ্গ সুমার্জ্জিত করিয়াও অনেকেই আবার নূতনের দিকে তাকাইয়া আছেন। অধিক আর কি বলিব, মাথা বাঁধিবার চিরুণীখানি হইতে সামান্য তেলের বাটিটী পর্য্যন্ত বিলাসোপযোগী হইয়া প্রস্তুত হইতেছে। বাস্তবিক চিন্তা করিয়া দেখিলে এই সব বিলাস সামগ্রী ধনী পরিবারের মধ্যে না হউক, দরিদ্র পরিবারের সমূহ অনিষ্টের কারণ হইতেছে, সহরবাসিনী মহিলাগণ এসব ইষ্টানিষ্ট উপলব্ধি করিতে না পারেন, কিন্তু পল্লীস্থ রমণীগণ আমার এ কথা সম্যক-রূপে প্রত্যক্ষ করিতেছেন। অনেক স্থলে এই সকল বিলাস দ্রব্যের জন্য গৃহস্থের বরাদ্দ না বুঝিয়া রমণীগন অযথা আবদার করিয়া জ্বালাতন করিয়া তুলেন।

* প্রাচীনকালে দেহ মার্জ্জনের জন্য আমলকীবাটা বুটের ডালের বেসম (গুঁড়া) দুগ্ধের সর ময়দা এবং জল মিশাইয়া ব্যবহৃত হইত। এতদ্ভিন্ন কোন কোন বৃক্ষের ত্বকের দ্বারাও দেহ মার্জ্জিত করা হইত। অঃ সঃ।

যাহা হউক এই সকল বিলাস সামগ্রী দরিদ্র পরিবারের অনিষ্টকর হইলেও, যদি দেখিতে পাইতাম এই সমস্ত আমাদের দেশেই প্রস্তুত হইতেছে, তবুও বুঝিতে পারিতাম ইহাদ্বারা আমাদের দেশের শিল্প ও বিজ্ঞানের কতক পরিমাণে উন্নতি সাধিত হইতেছে এবং আমরা এই সমস্ত জিনিস ব্যবহার করিয়া দেশের উন্নতির পথ প্রশস্ত করিতেছি, কিম্বা স্বদেশীয় জিনিসের আদর করিতে শিখিয়াছি, কিন্তু দুঃখের বিষয় তাহাদের অধিকাংশই ভিন্ন দেশ জাত।

বিলাসিতায় আমরা এতই অভ্যস্থ হইয়া পড়িয়াছি যে, অনেক সময়েই দেখিতে পাই নিজেদের অবস্থা বিবেচনা না করিয়াই মহিলাগণ নানারূপ সৌখিন দ্রব্যের জন্য অর্থনষ্ট করিতে কুণ্ঠিত হয়েন না। সুতরাং অনেক সময়েই প্রয়োজনীয় দ্রব্যের অভাবে অশেষবিধ অসুবিধা ভোগ করিতে হয়। ইহা অনেকেই বুঝেন না, এই জন্যই মনে হয় বিলাসিতার দ্রব্যগুলি দরিদ্র পরিবারের অনেক অনিষ্ট উৎপাদন করিতেছে।

সর্ব্বশেষে বক্তব্য এই যে, মহিলাগণ অপেক্ষা পুরুষদিগের অবিমৃশ্যকারীতায়ই অন্তঃপুর মধ্যে এই সকল বিলাসিতার প্রশ্রয় পাইতেছে। তাঁহারা যদি স্ব স্ব পরিবারের মধ্যে এইগুলি প্রচার করিবার পূর্ব্বে একটু বিবেচনা করেন, তাহা হইলে অনেক সময়ে তাঁহাদের লাঞ্ছনাভোগ করিতে হয় না। অনেক সময়েই মনে হয় পুরুষেরাই ইহার পথ প্রদর্শক। শেষে কিন্তু তাঁহাদেরই উৎপীড়িত হইতে হয়। দরিদ্র বঙ্গবাসী আজকাল অর্থের জন্য যেরূপ শারীরিক কষ্ট স্বীকার করিতে অগ্রসর হন, ইহা দেখিয়া মনে হয় বিলাসিতার জন্য এই প্রকার কষ্টোপার্জ্জিত অর্থের কিয়দংশও যেন কেহ ব্যয় না করেন। সকলেই ভাবিয়া দেখিবেন, জীবনের অনেক কাজ পড়িয়া আছে, যাহা সমাধা করিতে সর্ব্বদাই অর্থের প্রয়োজন।

রমণীগণ নানাপ্রকার বিলাস সামগ্রী দ্বারা বিভূষিত হইলেই যে বেশী সুখানুভব করেন, এমন বোধ হয় না। তাঁহারা দেখিবেন তৎপরিবর্ত্তে দুঃখীর দুঃখ দূর করিতে যত্নবতী হইলে, ইহার চেয়ে অনেক সুখানুভব হইবে। পরের চোখের জল মুছাইবার জন্য আমাদের প্রিয় পাঠিকা ভগিনীগণের মন যেন সর্ব্বদাই বিচলিত হয় ইহাই প্রার্থনা। আমি পরের জন্য যে বলিতেছি এমন নয়, আমি নিজেও এই বিষয়ে সতর্ক হইবার জন্য সর্ব্বদা বিশেষ চেষ্টা করিয়া থাকি।

শ্রীহেমন্তকুমারী গুপ্ত।

কেনগো ?

(১)

তোমরা কেনগো মোরে বলিছ দুঃখিনী ?
বিধবা বিধবা বলে
গৃহকোণে ঠেলে ফেলে
কেনগো চলিয়া যাও দিবস যামিনী ?

(২)

কেনগো কেনগো মোরে বলিছ দুঃখিনী ?
কেন বা স্বজনগণ,
সদাই বিরস মন,
আমারে হেরিলে সবে বলে অভাগিনী ?

(৩)

কেনগো কেনগো মোরে বলিছ দুঃখিনী ?
সবারি পদ্ধব মাথে,
নাহি ডাক যেতে সাথে,
'এয়ো' নয় বলে সবে যাওগো অমনি।

(৪)

কেনগো কেনগো মোরে বলিছ দুঃখিনী ?
বিধির বিধানবলে,
হৃদয়ে হৃদয় মিলে,
হেরিতে গেলে বলে বিধবা রমণী।

(৫)

কেনগো কেনগো মোরে বলিছ দুঃখিনী ?
ইন্দ্রিয়, হৃদয়, প্রাণ,
সকলি এক সমান,
দেখেছি দেখেছি আমি মিলায়ে আপনি।

(৬)

কেনগো কেনগো মোরে বলিছ দুঃখিনী ?
ক্রমে রবি শশী আসি,
গগণ প্রাঙ্গণে বসি,
হাসায় জগত-জীব উজলি ধরণী।

(৭)

কেনগো কেনগো মোরে বলিছ দুঃখিনী ?
কাননে কুসুম ফুটে,
মধু আশে অলি ছুটে,
তাওতো দেখিছে চোখে এই অভাগিনী।

(৮)

কেনগো কেনগো মোরে বলিছ দুঃখিনী ?
কাল কাদম্বিনী সঙ্গে,
বিজলী খেলিছে রঙ্গে,
আমিও তোদেরি মত দেখিলো অমনি।

(৯)

কেনগো কেনগো মোরে বলিছ দুঃখিনী ?
কত শত গিরিরাজ,
নানারূপ ধরি সাজ,
দাঁড়ায়ে হেরেছি আমি পতিতপাবনী।

(১০)

কেনগো কেনগো মোরে বলিছ দুঃখিনী ?
সাগরে মিলন আশে,
তটিনী ছুটেছে হেসে,
নিরখি তোদেরি মত দিবস যামিনী।

(১১)

কেনগো কেনগো মোরে বলিছ দুঃখিনী ?
বিহগ ললিত তান,
জুড়ায় আমার প্রাণ,
আরও জুড়ায় প্রাণ সুধা নির্ঝরিণী।

(১২)

কেনগো কেনগো মোরে বলিছ দুঃখিনী ?
প্রেমহীন প্রাণ বলি,
যেওনা যেওনা চলি,
দেখ, হৃদে বহিতেছে প্রেম-মন্দাকিনী।

(১৩)

কেনগো কেনগো মোরে বলিছ দুঃখিনী ?
শৈশবে মরতস্বামী,
হারায়ে লভেছি আমি
যৌবন জীবনে স্বামী বিশ্বপতি যিনি।

(১৪)

কেনগো কেনগো মোরে বলিছ দুঃখিনী ?
আমিতো বিধবা নই,
চির আয়ুষ্মতী হই,
অসীম অনন্তদেব, স্বামী মোর তিনি।

(১৫)

কেনগো কেনগো মোরে বলিছ দুঃখিনী ?
হৃদয়মন্দিরে আমি,
বাঁধিয়া রেখেছি স্বামী,
আমি যে লো তাঁর প্রেমে সদা উন্মাদিনী।

(১৬)

কেনগো কেনগো মোরে বলিছ দুঃখিনী ?
প্রতিদিন প্রতিক্ষণে,
তাঁরি প্রেম আলাপনে,
ভুলেছি মর্ত্তোর সব—শুধু তাঁরে জানি।

(১৭)

কেনগো কেনগো মোরে বলিছ দুঃখিনী?
হৃদয়মন্দির খুলে,
নিত্য শত প্রেম ফুলে,
সাজাই আমার পতি বিশ্বপতি যিনি।

(১৮)

কেনগো কেনগো মোরে বলিছ দুঃখিনী?
নিত্য পূজি যত্ন করে,
হৃদ-পিণ্ড অর্ঘ্য করে,
ভকতি চন্দন মেখে ওপদ দুখানি।

(১৯)

কেনগো কেনগো মোরে বলিছ দুঃখিনী?
পরিশ্রান্ত ক্লান্ত মন,
যাঁর প্রেম আলিঙ্গন
লভিয়া পায়লো শান্তি তাঁরে শুধু চিনি।

(২০)

কেনগো কেনগো মোরে বলিছ দুঃখিনী?
মম প্রেমময় পতি,
তাঁর প্রেমে মম গতি,
তাঁরেইতো সমর্পেছি ক্ষুদ্র প্রাণখানি।

(২১)

কেনগো কেনগো মোরে বলিছ দুঃখিনী?
ভুলেছি ভুলেছি সব,
শুধু তাঁর প্রেম রব,
শুনিছে শ্রবণ মম প্লাবিয়া ধরণী।

(২২)

কেনগো কেনগো মোরে বলিছ দুঃখিনী?
প্লাবি বিশ্ব চরাচর,
প্লাবি সিন্ধু ঘোরতর,
অনল অনিল প্লাবি সেই প্রেমধ্বনি।

(২৩)

কেনগো কেনগো মোরে বলিছ দুঃখিনী?
মাটীমাখা দেহ তার,
জীর্ণ বস্ত্র জটা ভার,
তাঁরি তরে সাজিয়াছি যৌবনে যোগিনী।

(২৪)

কেনগো কেনগো মোরে বলিছ দুঃখিনী?
তাঁরি প্রেম লভিবারে
তাঁরি প্রেমে ডুবিবারে
আমি—তাঁহারি তরে যৌবনে যোগিনী।

(২৫)

কেনগো কেনগো মোরে বলিছ দুঃখিনী?
তাঁরে সদা ভাবি বসি,
ত্যজিয়াছি অট্টহাসি,
লভি হৃদে স্বর্গ-সুখ আমি সন্ন্যাসিনী।

(২৬)

কেনগো কেনগো মোরে বলিছ দুঃখিনী?
তাঁর আজ্ঞা শিরে ধরি,
অরণ্যে অরণ্যে ফিরি,
আমি যে লো তাঁর প্রেমে সদা উদাসিনী।

(২৭)

কেনগো কেনগো মোরে বলিছ দুঃখিনী?
শয়নে, স্বপনে, মনে
কিম্বা জেগে তাঁরে বিনে,
মুহূর্ত্তের তরে ওযে অন্য ভাবিনি।

(২৮)

কেনগো কেনগো মোরে বলিছ দুঃখিনী?
আমার অনন্ত পতি,
অনন্তেই মম স্থিতি,
অনন্তের প্রেমেই যে আমি সোহাগিনী।

(২৯)

কেনগো কেনগো মোরে বলিছ দুঃখিনী?
বিশ্বপতি আলিঙ্গনে,
তাঁরি প্রেমামৃত পানে,
অনন্ত পিয়াসা নাশি আমি চাতকিনী।

(৩০)

কেনগো কেনগো মোরে বলিছ দুঃখিনী?
মর্ত্ত্যের কামনারাশি,
তাঁর পদপ্রান্তে বসি,
বলি দিয়ে হয়েছি তাঁর অঙ্ক-শায়িনী।

(৩১)

কেনগো কেনগো মোরে বলিছ দুঃখিনী ?
জগতজীবন নাম,
তিনি মম 'মোক্ষধাম,'
তিনি মোর প্রাণপতি প্রেমময় তিনি,
তবে কেন সবে মোরে বলিছ দুঃখিনী ?

শ্রীমনোদা দেবী।

পরিবারে শিশুশিক্ষা।

বাল্যাবস্থায় গৃহই বালকবালিকাদিগের প্রধান শিক্ষাস্থল। শৈশবের স্মৃতিশক্তি অতিশয় প্রথর। ঐ সময়ে পিতৃ মাতৃ সন্নিধানে বালক বালিকাদিগের যাহা শিক্ষা হয়, তাহা কেহ সমস্ত জীবনেও বিস্মৃত হইতে পারে না।

সন্তানের জন্ম হইতে আরম্ভ করিয়া তাহাদিগের মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত, চিরদিনই সন্তানের প্রতি জনকজননীর কঠিন কর্ত্তব্য ও দায়িত্ব আছে। সন্তান বৃদ্ধ হইলেও যেরূপ পিতা মাতার তাহাদিগের প্রতি সমধিক স্নেহ ও বাৎসল্য থাকে, সেইরূপই বয়ঃপ্রাপ্ত চরিত্রহীন উচ্ছৃঙ্খল সন্তানকে তাহাদিগের শাসিত ও দণ্ডিত করিবার ক্ষমতা থাকে। এই ক্ষমতার বয়োভেদে কেবল কিঞ্চিৎ তারতম্য হইয়া থাকে মাত্র। এই ক্ষমতায় বাল্যে কন্যাপুত্রগণকে নিজ আয়ত্তাধিন রাখিয়া যে প্রকার যথেচ্ছভাবে শাসন করিতে পারা যায়, অপর কোন সময়েই আর তদ্রূপ পারা যায় না। এবং পরিণত বয়সের শিক্ষাও কোন অংশেই শ্রেষ্ঠ ও কার্য্যকরী নহে, জ্ঞানী ও শ্রেষ্ঠ মহাত্মাগণ এই নিমিত্তই বোধ হয় বাল্যকালই প্রকৃত শিক্ষার সময় বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করিয়া গিয়াছেন।

সেই শিক্ষা কাহাকে বলে ? অনেকে হয়ত মনে করিবেন যে কেবল মাত্র পুস্তক পাঠকেই আমরা শিক্ষা বলিতেছি, কিন্তু তাহা নহে। পুস্তক পাঠকে প্রকৃত শিক্ষা বলা যায় না। কি পুরুষ কি রমণী, কোন কালে এবং কোন অবস্থাতেই শুধু পুঁথিগত বিদ্যায় মনুষ্য সমাজের ও জগতের কোন হিতই সাধন করিতে পারা যায়না। যে সকল মহাপুরুষগণ এবং অসাধারণ গুণগ্রাম সম্পন্না পুণ্যবতী রমণীগণ স্ব স্ব মহীয়সী শক্তির দ্বারা এ জগতের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিলেন, তাঁহারা সকলেই কি প্রকৃত বীরের ন্যায় কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণা হইয়া জনহিত ও বিশ্বহিত কল্পে সমস্ত জীবন উৎসর্গ করিয়া যাটেন নাই ?

পিতা মাতার সন্তানের প্রতি প্রধান কর্ত্তব্য শৈশবে ধর্ম্ম শিক্ষা ও সদ্দৃষ্টান্তদ্বারা তাহাদের চরিত্র গঠন করা। ঐ সময়ে চরিত্র গঠিত না হইলে আর কোন কালেও সে অভাব পূর্ণ হইবার নহে। শৈশবে মানবহৃদয়ে যে সকল বীজের অঙ্কুর উৎপন্ন হয়, পরিণতাবস্থায় তাহার বিকাশ মাত্র। বস্তুত বাল্যে যাহাদিগের হৃদয়ে ধর্ম্মভাব, কর্ত্তব্য জ্ঞান, দয়া দাক্ষিণ্য, ঔদার্য্য, নিঃস্বার্থপরতা প্রভৃতি সদ্‌গুণসমূহের উন্মেষ না হয়, তাহাদিগের উত্তরকালে ঐ সকল গুণে অলঙ্কৃত হইয়া জনসমাজে আদৃত হওয়া কখনই সম্ভবপর নহে। কিন্তু এই শিক্ষা ও এই সকল সদ্ভাবের উন্মেষ কেবল মাত্র শিশুদিগের গৃহ ও জনক জননীর উপর

সর্ব্বতোভাবে নির্ভর করে। ঐ সকল শুধু মুখে শিখাইলে অথবা পুস্তকে মুখস্থ করাইলে কোন উপকারের সম্ভাবনা নাই। কার্য্যতঃ শিক্ষার প্রয়োজন। একটি সদ্দৃষ্টান্তদ্বারা যাহা শিক্ষা হইয়া থাকে, শত শত মৌখিক উপদেশেও তাহা হইবার নহে। অনেকে আবার এরূপ আছেন যে, বালকবালিকারা ছুটা ছুটি করিয়া খেলা ধূলা করিবে, স্বাধীন ভাবে কথাবার্ত্তা বা চলা ফেরা করিবে, অথবা দয়াপরবশ হইয়া কাহারও কোন সাহায্য করিতে যাইবে, ইহা তাঁহাদিগের একেবারেই অসহনীয়। কেহ কেহ ঐ সকলকে এরূপ দূষ্য মনে করেন যে, ক্রোধে অধীর হইয়া প্রহার ও নানারূপ শারীরিক নির্য্যাতনদ্বারা শিশুগণকে ঐ সকল বিষয় হইতে নিরস্ত রাখিতে সর্ব্বদা প্রয়াস পান। ইহা যে তাঁহাদিগের কতদূর ভ্রম, তাহা বুঝিতে পারেন না। শিশুরা বিবেকের অধীন হইয়া যে সকল কাজ করিতে যায়, তাহাতে কখনও হস্তক্ষেপ করিতে নাই। সহসা তাহাদের কথায় অবিশ্বাস করিতে নাই। তর্জ্জন গর্জ্জন ও অযথা ভয় প্রদর্শনদ্বারা সর্ব্বদা তাহাদের শাসন করিতে নাই। উহাতে তাহাদিগের অন্তকরণে জড়তা জন্মে, এবং অধিকাংশ স্থলেই তাহারা উদ্যমহীন ও নিস্তেজ হইয়া পড়ে। মিষ্ট কথা মিষ্ট ব্যবহারে বনের পাখী ও দুর্দ্দান্ত শত্রুও বশীভূত হইয়া থাকে। সুতরাং তর্জ্জন গর্জ্জন অপেক্ষা শিশুগণকে মিষ্ট কথায় শিক্ষা দিলে এবং শাসন করিলেই অধিক ফল প্রাপ্তির সম্ভাবনা। ক্রোধশীল, ও উগ্রস্বভাব পিতামাতার সন্তান কর্ম্মঠ হইয়া বর্দ্ধিত হইতে পারে না।

যে গৃহ সুদৃঢ় ধর্ম্ম ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত এবং যে পরিবারে প্রেম, প্রীতি, ঔদার্য্য, দয়া, ন্যায়পরতা, কর্ত্তব্যনিষ্ঠা, ও বিশ্বাসের দৃঢ়তা আছে, সে পরিবারের সন্তানের ভবিষ্যতের উন্নতির পথ সুনির্ম্মল। কি দাস দাসী কি প্রতিবেশী মণ্ডলী এমন কি একদিনের নিমিত্ত ও যিনি সে গৃহে পদার্পণ করেন, সে পরিবারের মধুর সৌরভে তাঁহারও হৃদয় মন পবিত্র ও উন্নত হইয়া যায়।

এই নশ্বর ক্ষণভঙ্গুর মানব জীবনে একমাত্র ধর্ম্মই অমূল্য ও অবিনশ্বর পদার্থ। ধর্ম্ম আমাদিগের ঐহিক ও পারত্রিকের একমাত্র সারবস্তু। ধর্ম্মলাভ করিয়া আমরা এই রোগ শোক দুঃখ দরিদ্রতাময় বিশ্ব-সংসারের শত কশাঘাত অম্লানবদনে সহ্য করিতে পারি, কিন্তু ধর্ম্মহীন জীবনে আমরা অতি সামান্য একটি কুশাঙ্কুরাঘাতও সহিতে পারি না। অধিকন্তু অধার্ম্মিক রাজা অপেক্ষা কমণ্ডলুধারী ধার্ম্মিক ভিখারির জীবনই আমাদিগের অধিক বাঞ্ছনীয়। বস্তুতঃ সদ্বিবেচক ও ধর্ম্মপরায়ণ পিতা মাতার প্রাণাধিক পুত্র কন্যাকে মানব জীবনের শ্রেষ্ঠ পদার্থে সেই ধর্ম্ম অলঙ্কারে অলঙ্কৃত করাই সর্ব্ব প্রধান কর্ত্তব্য কার্য্য।

পরম কারুণিক পরমেশ্বর পিতা মাতার স্কন্ধে সন্তানের ভার, পতির স্কন্ধে পত্নীর ভার, উপযুক্ত পুত্রস্কন্ধে বৃদ্ধ পিতামাতার ভার, রাজার স্কন্ধে রাজ্যভার, এবং গৃহিণীর স্কন্ধে দাস দাসী ও গৃহের যাবতীয় পরিজনবর্গের ভার ন্যস্ত করিয়া আমাদিগের অশেষ মঙ্গল সাধন করিয়াছেন। এরূপ স্থলে আমরা যদ্যপি তাহাদিগের বিষয় উদাসীন থাকি, অথবা অবহেলা করি, তাহা হইলে আমরা প্রত্যেকেই স্ব স্ব কর্ত্তব্য অবহেলা জনিত মহাপাপে পাপী বলিয়া নিশ্চয়ই

ঈশ্বরের নিকট কঠিন দণ্ড পাইবার উপযুক্ত। পুত্র অপেক্ষাও কন্যার উপর মাতার অধিক দায়িত্ব। কারণ কন্যার শৈশবের শিক্ষা দীক্ষা যাহা কিছু সমুদয়ই মাতৃহস্তে। পুত্রগণের অধিকাংশ সময় বহির্ব্বাটীতে অবস্থান করিতে হয়, কিন্তু কন্যাদের সর্ব্বদা অন্তঃপুরে মাতৃসন্নিধানে অবস্থান এবং নিয়ত মাতৃ চরিত্র পরিদর্শন হেতু অধিকাংশস্থলে তাহারা মাতৃস্বভাবই প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এই নিমিত্তই কন্যার প্রতি মাতার সতত সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখা অধিক আবশ্যক।

আজকালকার নব্যধরণের মাতাদিগের মধ্যে তিন সম্প্রদায় দৃষ্ট হয়। প্রথম সম্প্রদায়—তাঁহারা কেবলমাত্র কন্যাদিগকে স্কুল কলেজে পাঠাইয়া বিদ্যাশিক্ষা দেওয়াকেই যথেষ্ট মনে করেন, তদ্ব্যতীত যে তাহাদিগের অপর কোন শিক্ষনীয় বিষয় থাকিতে পারে, তাহা তাঁহাদিগের আদৌ হৃদয়ঙ্গম হয় না। দ্বিতীয় সম্প্রদায়—তাঁহারা কন্যাদের কি লেখাপড়া কি গৃহকার্য্য, শিল্পকর্ম্ম, লজ্জা, বিনয়, দয়া, ধৈর্য্য, ধর্ম্মনিষ্ঠা প্রভৃতি স্ত্রীজনোচিত কোন রীতি নীতিই শিক্ষা দেন না, বরং তৎপরিবর্ত্তে লজ্জাহীনতা, বিলাসীতা কলহপ্রিয়তা, নাস্তিকতা, অলসতা, স্বার্থপরতা ইত্যাদি বহুতর কুশিক্ষাদানে তাহাদিগকে এক অদ্ভুততর জীব করিয়া তুলেন। তৃতীয় সম্প্রদায়— তাঁহারা কন্যাদের কেবলমাত্র গৃহকর্ম্ম ও কতকগুলি অযথা কুসংস্কারদ্বারা চিরদিনের মত তাহাদিগের উন্নতি ও জ্ঞানের পথ রুদ্ধ করিয়া দেন। নিরপেক্ষভাবে বিচার করিয়া দেখিতে গেলে, এই তিনের মধ্যে কোন প্রকারের শিক্ষা প্রণালীই যে প্রকৃত মনুষ্যত্বলাভের উপযোগী নহে তাহা বোধ হয় কাহাকেও আর বলিয়া দিতে হইবে না।

পুত্রের ন্যায় কন্যাদিগকেও সদ্বিদ্যারদ্বারা তাহাদিগের হৃদয় ও মনের উৎকর্ষ সাধন করা প্রত্যেক সন্তানবৎসল পিতামাতারই কর্ত্তব্য। কন্যাদের উচ্চ অঙ্গের বিদ্যাশিক্ষা দেওয়া বহু ব্যয় সাপেক্ষ হইলেও আমাদের দরিদ্র ভারতবাসীর পক্ষে তাহা যথাসম্ভব সকলেরই দিতে চেষ্টা করা উচিত এবং ঐ শিক্ষা কখনই আমাদিগের সমাজ, গৃহ ও অবস্থার অনুপযোগী হইবে না। অধিকন্তু আমাদের অভিভাবকগণ কন্যাদেরে বি, এ, এম,এ, পাশ করাইয়া তাহাদের লজ্জাশীলতা, হৃদয়ের কোমলতা প্রভৃতি স্ত্রীজনোচিত হৃদয়ের মাধুর্য্যসমূহ নষ্ট করিয়া, তাহাদিগকে পরুষ ভাষিনী দেখিতে ও তাহাদের মাতৃত্ব বিকাশের পথ রুদ্ধ করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারী পুত্রগণের সমকক্ষ দেখিতে আদৌ ইচ্ছা করেন না।

আমাদের ভারতবর্ষীয়া প্রসূতিগণ চিরদিনই সন্তানের লালন পালন ও পরিচর্য্যার ভার স্ব স্ব স্কন্ধে বহন করিয়া আসিতেছেন। কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয় যে বর্ত্তমানকালের অধিকাংশ মাতারা কুশিক্ষার প্রভাবে আমাদের সেই বহু কল্যাণপ্রদ প্রথাসমূহ পরিত্যাগ করিয়া জীর্ণ দরিদ্র সমাজকে আরো অধিকতর দরিদ্রতার পথে লইয়া যাইতেছেন। এবং এই কারণে আমাদিগের সমাজে নিত্য কত নূতন নূতন অভাব ও অশান্তির যে সৃষ্টি হইতেছে, তাহা সমাজের নেতৃবর্গের বিচার সাপেক্ষ। যেস্থলে মাতা স্বীয় কর্ত্তব্য বিস্মৃত হইয়া সামান্য বেতনভোগী নিরক্ষর স্বার্থপরায়ণ দাস দাসীর হস্তে সন্তান পালন এবং বেতনভোগী শিক্ষক হস্তে তাহাদিগের নীতি শিক্ষার ভার অর্পণ করিয়া আপনারা সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত রহেন। যে মাতা

অযথা গল্প গুজব, অসৎ আমোদ প্রমোদ করিয়া সময়ের অসৎ ব্যবহার করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হয়েন না বরং সন্তানবর্গকে আশৈশব সেই কুদৃষ্টান্ত দেখাইয়া তাহাতে অভ্যস্ত করাকে তাঁহারা একটা আমোদ ও গৌরবের কার্য্য মনে করেন। তাঁহাদিগের সন্তান সন্ততির সুস্থ সবল দেহ ও উন্নত চরিত্রের আশা কোথায়? বস্তুতঃ যে পরিবারে সত্যে অনুরাগ ও পাপে ঘৃণা নাই সে পরিবারের সন্তানের মনুষ্যত্ব লাভের আশা নিতান্ত দুরাশা মাত্র।

যে মাতা কন্যাকে সদ্বিদ্যার সহিত গৃহকর্ম্ম, শিল্পকর্ম্ম, রন্ধন, সন্তান পালন, রোগীর শুশ্রূষা, পরোপকার, মিতব্যয়, ভক্তি, শ্রদ্ধা, দয়া, সৌজন্য ও সর্ব্বোপরি ধর্ম্মশিক্ষা দ্বারা তাহাদিগের, সামাজিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক জীবনের উৎকর্ষ সাধন করিয়া তাহাদের ভবিষ্যতের সুমাতা, ও সুগৃহিণীর পথ সুগম করিতে পারেন, তিনিই যথার্থ আদর্শ জননী। তিনি আমাদের নমস্যা এবং আমাদের হৃদয়ের পূজা পাইবার সম্পূর্ণ উপযুক্ত। কিন্তু দুঃখের বিষয় আমাদিগের সমাজে সেরূপ সুমাতার বড়ই অভাব, একপ্রকার নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। যেদিন আমাদের গৃহে গৃহে উক্তরূপ মাতৃরূপিনী দেবী বিরাজ করিবেন সেদিন আমাদিগের এই চিরদুঃখময় অশান্তির সংসার স্বর্গের নন্দন কাননে পরিণত হইবে। কিন্তু হায় আমাদের দীনহীন বাঙ্গালী জাতির সেদিন এখনও সুদূর পরাহত।

শিক্ষায় মানুষ দেবত্ব এবং শিক্ষা অভাবে মানুষ পশুত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকে। আমাদিগের আদিমকালের কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞানশূন্য অনার্য্য অসভ্য বর্ব্বর জাতীয় মনুষ্যই কি তাহার নিদর্শন নহে? কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে সুসভ্য ইংরাজ জাতির অধিকার ও শিক্ষা প্রভাবে সে প্রকার নরপশু আর কয়জন দৃষ্ট হয়? একমাত্র শিক্ষাই কি তাহার মূলিভূত কারণ নহে? স্ত্রীজাতির পক্ষে অল্পবিদ্যা ভয়ঙ্করী, এবং অধিক বিদ্যা উপকারী, এই দেশপ্রচলিত কথা এখনও অনেকের মুখে শুনিতে পাওয়া যায় এবং আমরাও উক্ত কথার সম্পূর্ণ সমর্থন করি ও সত্য বলিয়া বিশ্বাস করি। কিন্তু আমাদের বঙ্গমহিলাবর্গের মধ্যে সেই অল্পবিদ্যা রহিত করিয়া কিরূপে অধিক বিদ্যার প্রচলন হইতে পারে, আমাদিগের সুশিক্ষিত সমাজসংস্কারগণের তাহা একবার কেহ চিন্তা করিয়া দেখিয়াছেন কি? চিন্তা করা দূরের কথা স্ত্রীশিক্ষা বিরোধী এক সম্প্রদায়ের লোক আছেন, প্রাচীনকালে যে এদেশে নারী জাতীর মধ্যে বিদ্যাশিক্ষা প্রচলিত ছিল, তাহা তাঁহারা আদৌ স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহেন, এবং বর্ত্তমানকালের স্ত্রীশিক্ষার নামে তাঁহাদিগের হৃদ্‌কম্প উপস্থিত হয়। কিন্তু তৎকালে স্ত্রীজাতির মধ্যে যে কিরূপ বিদ্যাশিক্ষার প্রচলন ছিল, নিম্নলিখিত প্রতিভাশালিনী বিদূষী রমণীগণই তাহার দৃষ্টান্ত স্থল। অতি প্রাচীনকালে অত্রি বংশীয়া বিশ্ববারা ঋগ্বেদের একটি সূক্তের রচয়িত্রী। ব্রহ্মবাদিনী গার্গী, মৈত্রেয়ী, লোপামুদ্রা, অনসূয়া, শকুন্তলা, বাহ্লট রাজকন্যা, দ্রৌপদী প্রভৃতি এবং অপেক্ষাকৃত অধুনাকালের লক্ষণ সেনের পত্নী, জ্যোতিষ শাস্ত্রে পারদর্শিনী খনা, অঙ্কশাস্ত্রে সুপণ্ডিতা লীলাবতী, দাক্ষিণাত্যের উজ্জ্বলতম রত্ন অহল্যাবাই, রাণী ভবানী, হটিবিদ্যালঙ্কার। এতদ্ব্যতীত ঝান্সীশ্বরী লক্ষ্মীবাই ও দুর্গাবতী স্বদেশার্থে যুদ্ধ পর্য্যন্ত করিয়াছিলেন। এত-

গুলি মনস্বিনী পুণ্যবতী বিদুষী রমণীরত্ন যে দেশে জন্মগ্রহণ করিয়া দেশকে পবিত্র ও অলঙ্কৃত করিয়া গিয়াছেন, সে দেশে যে পুরাকালে নারী জাতির মধ্যে বিদ্যাশিক্ষা প্রচলিত ছিল না, তাহা কে বিশ্বাস করিবে? অধিকন্তু তৎকালীন বিদ্যাশিক্ষায় কি পুরুষ কি রমণী, উভয় শ্রেণীর মধ্যেই যেপ্রকার শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক জীবনের বহুতর উৎকর্ষ সাধিত হইত, বর্ত্তমানকালে বিদ্যাশিক্ষায় তাহার তেমন দৃষ্ট হয় না। সে উদার বিশ্বজনীন প্রেম, সে গভীর জীবন্ত ধর্ম্মভাব, সে অগাধ পিতৃমাতৃভক্তি, কে বলিবে এখন কালের কোন্ অন্ধকার গুহায় চিরদিনের মত বিলীন হইয়াছে?

অনেকে বলেন যে পাশ্চাত্য অধিকার ও শিক্ষাই আমাদিগের এই অধঃপতনের এক মাত্র মূলীভূত কারণ; কিন্তু আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে আমরা তাহা সম্যক বিশ্বাস করিতে পারি না। আমরা বলিব উক্ত শিক্ষা ও অধিকার প্রভাবে আমাদিগের উন্নতি ও অবনতি দুই হইয়াছে, বরং অবনতি অপেক্ষা উন্নতিই অধিক হইয়াছে। আমাদের সমাজে যে যে বিষয়ে উন্নতি হইয়াছে, তাহার মধ্যে এই কয়টি বিশেষ উল্লেখ যোগ্য,—অরাজকতা, সহমরণ, গঙ্গাসাগরে সন্তান বিসর্জ্জন, বহুবিবাহ, কৌলিন্য প্রথা, স্ত্রী জাতিকে নিরক্ষর রাখা, তাহাদিগকে অযথা নির্য্যাতন করা ও তাহাদিগের সহিত দাসীর ন্যায় ব্যবহার (সে অবশ্য মধ্য কালের কথা পূর্ব্বকালের নহে)। এবংবিধ বহু অনর্থকারি ও ভ্রান্তিমূলক কুসংস্কার সকল, দেশ হইতে একপ্রকার তিরোহিত হইয়াছে; কিন্তু ঐ সমুদয় যে সম্পূর্ণরূপে তিরোহিত হইয়াছে তাহা বলা যায় না। তবে তখন কার তুলনায় যে কিছুই নহে তাহার সংশয় মাত্র নাই। অবনতির মধ্যে এই গুলি অধিক মাত্রায় দেখা যায়, বিলাসীতা, স্বার্থপরতা, অলসতা, উচ্ছৃঙ্খলতা, ঔদ্ধত্য, সর্ব্বপ্রধান—ধর্ম্মে অনাস্থা, ও গুরুজনে অশ্রদ্ধা, এবংবিধ বহুতর দোষ একবারে আমাদিগের মজ্জাগত হইয়া উঠিয়াছে, (সকলের চরিত্রেই যে উহা লক্ষিত হয় তাহা বলিতেছি না। তবে অধিকাংশই ঐ প্রকৃতির তাহা বোধ হয় অনেকেই অস্বীকার করিবেন না) এবং এই নিমিত্তই অধঃপতনের পথে দিন দিন আমরা অধিকতর অগ্রসর হইতেছি।

কিন্তু মোটের উপর এ শিক্ষাকে আমরা কখনই মন্দ বলিতে পারি না। হংসরাজের ক্ষীর গ্রহণের ন্যায় পাশ্চাত্য শিক্ষার মন্দ অংশ বর্জ্জন করিয়া শ্রেষ্ঠ অংশ গ্রহণ করিতে পারিলেই, আমাদিগের সর্ব্বপ্রকারে মঙ্গল হয়। কিন্তু হায়, আমাদিগের বাঙ্গালির জাতিয় প্রেম, ও জাতিয় একতা কোথায়? কে সমাজের সহস্র নিগ্রহ ও নির্য্যাতন সহ্য করিয়া জীর্ণের সংস্কারে বদ্ধপরিকর হইয়া জীবন উৎসর্গ করিবে?

যে শিক্ষায় আমাদের স্ত্রীজাতির হৃদয়ের কোমল বৃত্তিসমূহ ও মাতৃত্ব বিকাশের পথে অটুট রহিয়া, আমরা পুরুষের কর্ম্ম বুঝিয়া তাহাদের সাহায্য করিতে পারি, আমাদের নারীজাতিকে তদনুরূপ শিক্ষা দেওয়াই সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য ও মঙ্গলদায়ক। প্রকৃত পক্ষে স্ত্রীলোক নানাশাস্ত্রের অভিধান হওয়া অপেক্ষা, যাহাতে সাময়িক দুঃখ বিপদের সহিত সাহনুভূতি করিবার শিক্ষা পায়, বিশ্বজনীন প্রেম, ভগবানে আত্ম নির্ভর, এবং মঙ্গলময়ের মঙ্গল ইচ্ছা উপলব্ধি করিয়া সেই কার্য্যে জীবনমন উৎসর্গ করিয়া খাটিতে পারে, সেই প্রকার শিক্ষাই আমাদিগের নিতান্ত উপযোগী ও সর্ব্বথা প্রার্থনীয়।

শ্রীসরোজিনী দেবী।

সামাজিক ছোট কথা।

অদ্য আমরা পাঠিকাগণের অবগতির জন্য বসুমতী পত্রিকা হইতে, "সামাজিক ছোট কথা" সম্বন্ধীয় প্রবন্ধের সারাংশ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। এই ছোট কথার ভিতরে যে ভাব লুক্কায়িত রহিয়াছে, তাহা বড়ই মর্ম্মান্তিক। আমাদের সহযোগী মহাশয় এ বিষয়ে প্রবন্ধ লিখিয়া অভাগিনী নারীজাতির প্রতি বিশেষ সহৃদয়তার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। মহানুভব পুরুষদিগের সাহায্য ভিন্ন কখনও নারী জাতির দুর্দশা তিরোহিত হইবে না। আমরা বসুমতী পত্রিকার সম্পাদক মহাশয়ের "ছোট কথা" গুলির জন্য তাঁহাকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাইতেছি। তাঁহার লিখিত ছোট কথা গুলির প্রতি এতদ্দেশীয় সমাজ সংস্কারদিগের মনোযোগ প্রদান করা কর্ত্তব্য। পতিতা অবলাগণের দুরবস্থা অপনোদনের জন্য যদি এই গুরুতর বিষয়ে সকল সংবাদ পত্রের সম্পাদকগণ প্রবন্ধ দ্বারা আন্দোলন ও আলোচনা করেন, তাহা হইলে সাধারণের এ বিষয়ে মনোযোগ আকর্ষিত হইয়া বিশেষ উপকার সাধিত হইবে। পতিতাদিগকে আশ্রয় ও শিক্ষাদানার্থে ঢাকার উদ্ধারাশ্রম স্থাপিত হইয়াছে, কিন্তু এদেশীয় সদাশয় ধনী সম্প্রদায়ের সাহায্য ব্যতীত তাহার কার্য্য সুচারুরূপে পরিচালিত হইতে পারিতেছে না। শ্রদ্ধাস্পদ বাবু শশীভূষণ মল্লিক মহাশয় সস্ত্রীক এই আশ্রমে পতিতা বালিকাদিগকে সুশিক্ষা দানের জন্য যথাসাধ্য খাটিতেছেন, কিন্তু তাঁহারা অর্থাভাবে এই মহৎকার্য্য সুসম্পন্ন করিতে পারিতেছেন না। সমাজ পরিত্যক্ত অনাথা অবলাগণের আশ্রয়ের জন্য আশ্রম নির্মাণ এবং শিক্ষাদানার্থ উপযুক্ত আয়োজন করিতে হইলে একটী ধন ভাণ্ডার স্থাপন করা সর্ব্বপ্রধান কার্য্য। আমাদের আশা আছে যে এ বিষয়ে আমাদের সদাশয় পাঠিকাগণ ও বিশেষ ভাবে সাহায্য করিবেন। সামাজিক ছোট কথার প্রতি মনোযোগ প্রদান করিয়া ইহার প্রতিকার করিতে পারিলে, সমগ্র দেশ ও স্ত্রী জাতিকে ঘোর পাপের আবর্ত্ত হইতে রক্ষা করা হইবে।

এই যে প্রতিদিন বাঙ্গলা দেশের নানা স্থানে দানব-প্রকৃতি কামান্ধ পিশাচের হস্তে রমণীগণ নিগৃহীত হইতেছেন, তাহা ত সকলেই দেখিতেছেন। আদালতে মকর্দ্দমা হইতেছে, অত্যাচারকারী কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইতেছে, কারাগার হইতে বাহির হইয়া সে আবার দশ জনের একজন হইতেছে, সমাজ তাহাকে ফেলিতে পারিতেছে না; কিন্তু যে অসহায়া রমণী পিতামাতার নয়নের মণি, স্বামীর সোহাগিনী দুর্ব্বৃত্ত পাষণ্ডের হস্তে নিগৃহীত হইলেন, তাঁহার কি ব্যবস্থা হইল, তাহা কি আপনারা ভাবিয়া দেখিবেন না? মুসলমান রমণীর উপর অত্যাচার হইলে, সে স্বামীর ঘর করিতে না পারিলেও পুরুষান্তরকে বিবাহ করিয়া সমাজের মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে, মুসলমান সমাজ তাহাকে একবারে ত্যাগ করে না। কিন্তু হিন্দু রমণীর দশা কি হয়? এত দিন কি হইয়া আসিতেছে? সে কথা কি চিন্তার বিষয় নহে? অবলার অপরাধ কি; সে স্বামীর কোলে নিদ্রিত ছিল, বা সে প্রাণের পুত্র কি কন্যাকে কোলে লইয়া পরম শান্তিদায়িনী নিদ্রার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল, অথবা সে অসময়ে বিশেষ প্রয়োজনে ঘরের বাহিরে আসিয়াছিল,

আর কোথা হইতে কালান্তক যম আসিয়া তাহার সর্ব্বনাশ করিয়া গেল। তাহার অমূল্য সতীত্ব নষ্ট করিল; তাহার চিৎকার তাহার, ক্রন্দন, সকলই ব্যর্থ হইল, অবলার যথা সর্ব্বস্ব অপহৃত হইল। তাহার পর,—তাহার পর রাজদ্বারে বিচার হইল, অপরাধী শাস্তি পাইল—সে কয় বৎসরের জন্য জেলে গেল। কিন্তু সমাজ নিরপরাধিনী অবলার উপর যে শাস্তি বিধান করিলেন, তাহা যে পিনাল কোডের শাস্তি অপেক্ষা লক্ষগুণে গুরুতর। সে বিচারালয় ত্যাগ করিয়া যখন বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল, তখন দেখিল, তাহার এ জগতে কেহ নাই; সমাজের ভয়ে পিতা মাতা ভ্রাতা ভগিনী তাহার মুখের দিকে চাহিল না, প্রিয়তম স্বামী তাঁহাকে ঘরে লইয়া যাইতে পারিল না; এই সংসার সমুদ্রে সেই অসহায়া অবলা কাণ্ডারী হীন জীর্ণ তরির ন্যায় ভাসিয়া চলিল। এক মুষ্টি অন্নের জন্য সে দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়াও কৃতকার্য্য হইল না। সমাজ! চাহিয়া দেখ তখন সে কোন্ পথ অবলম্বন করিল? তাহার সম্মুখে এক পথ ছাড়া আর ত পথ নাই। যদি তাহার জীবনের মায়া থাকে, তবে সে সেই পথই অবলম্বন করিবে। তুমি যাহাকে গ্রহণ করিলে না, সে কোথায় যায়? তুমি বলিবে, সে গলায় দড়ি দিয়া আত্মহত্যা করুক; তাহার জন্য আমাদের হিন্দু সমাজ কোন ব্যবস্থাই করিতে পারে না। কিন্তু কাহার দোষে কাহার দণ্ড হইল। অবলার অপরাধ কি? অপরাধ তাহার সতীত্ব নষ্ট হইয়াছে। কে নষ্ট করিল? সে কি নিজে আত্মদান করিয়াছে? যে রমণী স্বেচ্ছায় ব্যভিচারিণী, তাহাকে সমাজ হইতে দূর করিয়া দাও; কিন্তু এই নিরাপরাধিনীকে বাহির করিয়া দাও কেন? তাহাকে হাটে বসাইয়া দাও কেন?

আমরা সংবাদ সংগ্রহ করিয়াছি, এতদিনের মধ্যে যে সমস্ত রমণী এই প্রকার অত্যাচারে প্রপীড়িতা হইয়াছে, তাহাদের অধিকাংশই দুইটী অন্নের জন্য পিশাচবৃত্তি অবলম্বন করিতে বাধ্য হইয়াছে। তাহারা অনেক চেষ্টা করিয়াও ঘরে ফিরিতে পায় নাই। তাহার পর কত প্রলোভন আসিয়া তাহাদের সম্মুখে দাঁড়াইয়াছে, ক্ষুধার জ্বালায়, আশ্রয়ের আশায় তাহারা তখন পাপ সাগরে ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু দোষ কাহার? আবার জিজ্ঞাসা করি দোষ কাহার? আমাদের হিন্দু শাস্ত্রে ইহার কোন প্রায়শ্চিত্তের বিধান নাই। আর থাকিলেই বা কি, বংশের যে কলঙ্ক হইবে। যথারীতি প্রায়শ্চিত্ত করিয়াও যদি সমাজে গৃহীত হওয়া যায়, তবু ও কুলের কলঙ্ক যে যায় না। লোকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিবে, "ঐ অমুকের কন্যার এই হইয়াছিল।" আমাদের হিন্দু সমাজ এই সকল রমণীকে ঠেলিয়া ফেলিয়াই দিবেন অসহায়া অবলার ক্রন্দনে আমাদের সমাজের প্রাণ গলিবে না।

তবে কি তাহারা ভাসিয়া যাইবে? তবে কি তাহারা—সেই সকল নিরপরাধিনী হতভাগিনীরা পাপের স্রোতই বৃদ্ধি করিবে? কেহই কি তাহাদিগকে তুলিয়া লইবেন না? ব্রাহ্মসমাজ ত তাহাদিগকে আশ্রয় প্রদান করিতে পারেন। তাহারা ত ব্রাহ্মসমাজের আশ্রয়ে পবিত্র ভাবে জীবন যাপন করিতে পারে। কিন্তু এতদিনের মধ্যে ব্রাহ্মগণ ত সে বিষয়ে কোন চেষ্টাই করেন নাই। আমরা যতদূর সংবাদ পাইয়াছি, তাহাতে কোন ব্রাহ্মই যে এ কার্য্যে অগ্রসর হইয়াছেন, তাহা

ত জানিতে পারি নাই। ব্রাহ্মসমাজের দলপতিদিগকে কি আমরা এ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে পারি না? এই সমস্ত নিরপরাধিনী অবলার একটা গতি হওয়া আবশ্যক; যাহাতে তাহারা পবিত্র ভাবে জীবন যাপন করিতে পারে তাহার ব্যবস্থা হওয়া কর্ত্তব্য। ঢাকার পতিতাশ্রম কি করিতেছেন? হিন্দু মুসলমান ব্রাহ্ম সকলেই এই ছোট সামাজিক কথাটা একবার চিন্তা করুন, একটা ব্যবস্থা করুন।

বর্ষায় আট দিন।

পরদিন প্রাতে উঠিয়া দেখিলাম আমাদের ট্রেণ বীর প্রসবিনী রাজপুতানার মধ্য দিয়া যাইতেছে। মনোহর প্রাকৃতিক দৃশ্যে মুগ্ধ হইলাম। তখনও সূর্য্যোদয় হয় নাই পূর্ব্বাকাশ রক্তিম ছটায় রঞ্জিত, বৃক্ষ লতায় তাহার আভা পড়িয়া বৃক্ষ পত্র সকল স্বর্ণ পত্রের ন্যায় শোভা ধারণ করিয়াছে। দুই পার্শ্বে সুবিস্তীর্ণ মাঠ ও মধ্যে মধ্যে জয়পুরী শ্বেত পাথরের ছোট ছোট পাহাড়। ট্রেনের ধীর মন্দ গতির জন্য নানাপ্রকার পক্ষীর কুজন শব্দ শুনা যাইতেছে। স্থানে স্থানে দলবদ্ধ হইয়া ময়ূর চরিতেছে কোন কোনটা বা ডাকিতেছে ও পেখম ধরিয়া নাচিতেছে। জয়পুরের পথে যত ময়ূর দেখিলাম এত ময়ূর আমি কখনও দেখি নাই। আর সে যে বন্য ছোট ছোট ময়ূর তাহা নহে; এ সকল ময়ূর খুব বড় বড় ও দেখিতে অতি সুন্দর। এই সকল দেখিতে দেখিতে ক্রমে বেলা সাড়ে নয়টার সময় আমরা জয়পুর ষ্টেশনে পৌঁছিলাম। জয়পুর প্রাচীন অম্বর রাজ্যের রাজধানী। শ্রীরামচন্দ্রের পুত্র কুশের বংশধর ঢোলারায় নামক একজন রাণা অম্বরের বর্ত্তমান রাজবংশের প্রথম প্রতিষ্ঠা করেন। পূর্ব্বে ইহা মৈনবাসীন নামক জাতির অধিকারে ছিল, এবং ইহার নাম ধুন্ধর ছিল। পরে ঐ মৈনদের উপাস্য অম্বাদেবীর নামানুসারে ধুন্ধরের নাম অম্বর হয়।* ঢোলারায় অতি জঘন্য বিশ্বাস ঘাতকতা করিয়া মৈনদিগের নিকট হইতে অম্বর আপন অধিকারে আনেন। সে সকল কথা পাঠিকাগণ জানিতে ইচ্ছা করিলে ইতিহাস পাঠে জানিতে পারিবেন। অম্বরপতি রাজা মানসিংহের নাম অনেকেই শুনিয়া থাকিবেন। তিনি আকবর সাহের দক্ষিণ হস্তস্বরূপ ছিলেন এবং অসাধারণ বীরপুরুষ ছিলেন কিন্তু দুঃখের বিষয় যে তাঁহার সেই বীরত্ব কেবল মাত্র বিদেশীর সেবায় এবং স্বদেশের বিরুদ্ধে ব্যয়িত হইয়াছিল। তিনি যদি বীরকেশরী প্রতাপ সিংহের সহিত মিলিত হইয়া সেই বীরত্ব স্বদেশের সেবায় নিয়ুক্ত করিতেন, তাহা

* প্রাচীন অম্বর নগর বর্ত্তমান জয়পুর হইতে কয়েক মাইল দূরে অবস্থিত। জয়পুরের অধিষ্ঠাত্রী অম্বাদেবীর মন্দির ও প্রতিমা সেখানে পর্ব্বতোপরি দুর্গের ভিতরে প্রতিষ্ঠিত। প্রাচীনকালে দেবীর সন্তোষবিধানার্থ নরবলি হইত। ইংরাজ প্রভাবে নরবলি বন্ধ হইয়াছে; কিন্তু অদ্যাপি প্রতি বৎসর মহিষ ও ছাগ বলি হইয়া থাকে।　অ, স,

হইলে একদিন ভারতবর্ষ হইতে বিদেশীকে বিতাড়িত করা অসম্ভব হইত না। ইনিই নিজ ভগিনীকে মোগল সম্রাট আকবরের হস্তে সম্প্রদান করিয়া নিজ পবিত্র বংশ কলঙ্কিত করিয়াছিলেন। মানসিংহের পঞ্চম পুরুষ পরবর্ত্তী রাজা জয়সিংহ কর্ত্তৃক এই জয়পুর নগর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। এই বংশে দুইজন জয় সিংহ ছিলেন। প্রথম জয় সিংহকে লোকে মিরজা রাজা জয়সিংহ বলিত। অনেকে ইহাকে জয়পুর নগরের প্রতিষ্ঠাতা মনে করিয়া বিষম ভ্রমে পতিত হন। ইনিও একজন বীর পুরুষ ছিলেন। বাবু রমেশচন্দ্র দত্তের জীবন প্রভাত নামক উপন্যাসে ইহার বিষয় উল্লিখিত আছে। ইহার পুত্র রামসিংহ পিতার উপযুক্ত পুত্র ছিলেন। তাঁহার পুত্র বিষণ সিংহ অতি অল্পকাল রাজত্ব করিয়া কালগ্রাসে পতিত হন, এবং তাঁহারই উত্তরাধিকারী এই দ্বিতীয় জয়সিংহ বা শোবে জয়সিংহ। ইনি অশেষ গুণে গুণবান ছিলেন, কি যুদ্ধ নীতি, কি রাজনীতি, কি ধর্ম্মনীতি, কি সমাজনীতি সকল বিষয়ে তিনি সমান অভিজ্ঞ ছিলেন। জ্যোতিষ শাস্ত্র তাঁহার অতীব প্রিয় ছিল এবং নিজেও একজন উৎকৃষ্ট জ্যোতিষতত্ত্বজ্ঞ ছিলেন। তিনি কাশী দিল্লী মথুরা প্রভৃতি নানা স্থানে মানমন্দির এবং নিজ ইচ্ছানুযায়ী নানারূপ যন্ত্রাদি প্রস্তুত করাইয়াছিলেন। রাজা জয়সিংহ ১৬৯৯ খৃষ্টাব্দে অম্বরের সিংহাসনে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন এবং চতুশ্চত্বারিংশ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। মধ্যে একবার দিল্লীর সম্রাট সাহ আলম তাঁহার নিকট হইতে অম্বর কাড়িয়া লইয়াছিলেন, কিন্তু তাহার অল্প দিনের পরেই তিনি স্ববলে অম্বর উদ্ধার করিয়া লয়েন। ১৭২৮ খৃষ্টাব্দে বর্ত্তমান জয়পুর নগর প্রতিষ্ঠিত হয়। আমাদের বড় আহ্লাদ ও গৌরবের বিষয় যে এই নগর একজন বাঙ্গালীর পরামর্শানুসারে নির্ম্মাণ করা হইয়াছিল। তাঁহার নাম বিদ্যাধর। ৺ বাবু কান্তিচন্দ্র মুখোপাধ্যায় জয়পুরের প্রধান মন্ত্রী ছিলেন। তাঁহার তত্ত্বাবধানে জয়পুর রাজ্যের অনেক উন্নতি হইয়াছে ইহাও বাঙ্গালীর কম গৌরবের বিষয় নহে। এক্ষণে তাঁহার পুত্র বাবু সংসারচন্দ্র মুখোপাধ্যায় তাঁহার স্থানে কর্ম্ম করিতেছেন। জয়পুর এখন ইংরাজ রাজের মিত্র রাজ্য এখানে একজন রেসিডেণ্ট আছেন। বর্ত্তমান জয় পুরাধিপতি মাধো সিং পরম হিন্দু এবং বৈষ্ণব। সম্রাট সপ্তম এডওয়ার্ডের অভিষেকোপলক্ষে তিনি হিন্দু মতে বিলাত যাত্রা করিয়াছেন। যাহা হউক আমরা জয়পুর পৌঁছিয়া একটা বাড়ী ভাড়া করিয়া সেই স্থানে আহারাদি করিলাম। এখানেও বৃষ্টি, বৃষ্টির জন্য আমাদের অনেক সময় নষ্ট হইল, তারপর বেলা একটার সময় আমরা জয়পুরের চিড়িয়াখানা দেখিতে গেলাম। চিড়িয়াখানায় নানা বর্ণের পক্ষী অন্য জন্তু খুব কম। জয়পুরের ব্যাঘ্রগুলা খুব তেজী, আলিপুরের ব্যাঘ্রদের মত মুদিত চক্ষু নহে। মানুষ দেখিয়া তাহারা এরূপ লাফালাফি ও গর্জ্জন করিতেছিল যে, আমাদের মত বাঙ্গালীর মেয়েদের পক্ষে সেখানে অধিকক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকা কেমন ভীতিজনক বোধ হইল। সেখান হইতে জয়পুরের প্রদর্শনী দেখিতে গেলাম। প্রদর্শনীর বাটীটি অতি সুন্দর। শ্বেত প্রস্তর নির্ম্মিত ও নানারূপ কারুকার্য্য খচিত। ভিতরে প্রাচীরের গায়ে নানারূপ চিত্র অঙ্কিত। দময়ন্তীর স্বয়ম্বর, দ্রৌপদীর বস্ত্র-

হরণ, রাম রাবণের যুদ্ধ ইত্যাদি, কিন্তু এ সকলের অপেক্ষা একটি ঘরের দেয়ালে জয়পুর প্রতিষ্ঠাতা রাজা জয়সিংহ ও তাঁহার পূর্ব্বপুরুষ হইতে বর্ত্তমান জয়পুর রাজ মাধো সিং পর্য্যন্ত রাজাদের যে প্রতিমূর্ত্তি অঙ্কিত আছে, তাহাই বিশেষ প্রশংসনীয়। জয়পুর প্রদর্শনীর দেখিবার সামগ্রী মৃত জন্তুর কঙ্কাল ব্যতীত অন্যান্য বিষয়ে কলিকাতার যাদুঘরের সহিত কোন অংশে ন্যূন নহে বরং স্থল বিশেষে প্রশংসনীয়। প্রদর্শনী দেখিতে আমাদের অনেক সময় লাগিল। একটা উল্লেখ যোগ্য বিষয় লিখিতে ভুলিয়া যাইতেছিলাম। প্রদর্শনীতে দুই শত পঁচিশ বৎসরের একটী স্ত্রীলোকের শব রক্ষিত আছে। এরূপ মাল মাসলা দিয়া রাখা হইয়াছে যে আজ পর্য্যন্ত নষ্ট হয় নাই। যাহা হউক সেখান হইতে আমরা জেলখানা ও পুরাতন সহর দেখিয়া নূতন জয়পুর নগর এবং চক দেখিতে গেলাম। জয়পুর সহর দেখিতে অতি সুন্দর। রাজপথ অতি প্রশস্ত, চৌরঙ্গির দিক ছাড়া কলিকাতাতেও এমন প্রশস্ত রাজপথ নাই। রাজপথের দুই পার্শ্বে উচ্চ উচ্চ লাল রঙের বাটীর গায়ে সাদা রঙের নানারূপ কাজ করা; হঠাৎ দেখিলে মনে হয় যেন লাল রঙের পাথরের উপর সাদা পাথরের কাজ করা। নানারূপ দ্রব্য-পূর্ণ দোকান, যাহার দোকান নাই সে ফুটপাতের উপর জিনিষ সাজাইয়া বসিয়াছে। যে দিকে চাই, সেই দিকেই উৎসাহ উদ্যম, কেহ কাহারও অপেক্ষা করিতেছে না, সকলেই আপন আপন কর্ম্মে ব্যস্ত। যে দিকে চাই সেই দিকই সুন্দর, কোন্‌দিক দেখিব ভাবিয়া পাই না। বাস্তবিক জয়-পুরের মত মনোহর নগর আমি আর কখনও দেখি নাই। কলিকাতা বাসিনী পাঠিকাগণ হাসিও না, তোমরাও যদি জয়পুর দেখ, তবে তোমরাও মুগ্ধ হইবে। আমি কলিকাতার সহিত তুলনা করিতেছি না, শুধু তাহারই মনোহারিত্বের কথা বলিতেছি। জয়পুর রাজের রাজবাটী এবং "হাওয়া মহল" নামক প্রাসাদ দেখিতে অতি সুন্দর, আমরা মহা রাজার অশ্বশালাও দেখিলাম। সেদিন ঝুলন, সেজন্য রাত্রি আটটার পূর্ব্বে গোবিন্দ-জির মন্দিরের দ্বার খোলা পাইব না, পূর্ব্বেই শুনিয়াছিলাম সুতরাং এই সকল দেখিয়াও জয়পুরের কয়েকখানা শ্বেত পাথরের বাসন ও খেলনা প্রভৃতি কিনিয়া সন্ধ্যার পর গোবিন্দজি দেখিতে গেলাম। ঝুলনের জন্য সেদিন মন্দিরে বড় সমারোহ ছিল অনেক লোক দেখিতে আসিয়াছিল। হরি সঙ্কীর্ত্তন ও ভক্তমণ্ডলীর জয়ধ্বনি এবং উজ্জ্বল দীপা-লোকে সে মূর্ত্তি অতি মধুর, সে স্থানের ভাব অতি পবিত্র। আমি অনেক বিগ্রহ দেখিয়াছি, কিন্তু গোবিন্দজির মত সুন্দর বিগ্রহ কোথাও দেখি নাই। গোবিন্দজি দেখিয়া বাড়ী ফিরিতে প্রায় নয়টা বাজিল। তাড়াতাড়ি কোন রকমে জিনিষ পত্র গাড়ীতে তুলিয়া ষ্টেশনে গেলাম এবং রাত্রি সাড়ে নয়টার গাড়ীতে আজমীর যাত্রা করিলাম।

শ্রীমনোরমা দেবী।

নলিনী।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

স্বামী ও স্ত্রী।

একদিন সুরজা ও তাহার মা নরেশবাবুর কোনও বন্ধুর বাড়ীতে বেড়াইতে গিয়াছেন, গিরিজা শরীর অসুস্থ বলিয়া যাইতে আপত্তি করিয়াছেন। বেলা প্রায় অপরাহ্ণ—নরেশবাবু কর্ম্মস্থান হইতে গৃহে প্রত্যাগত হইয়া বস্ত্রাদি পরিবর্ত্তনের পর গিরিজার গৃহে প্রবেশ করিলেন, দেখিলেন গিরিজা মলিন বদনে বসিয়া আছেন; স্বামীকে দেখিয়া কোন কথা বলিলেন না; ধীরে ধীরে উঠিয়া দাঁড়াইলেন মাত্র। নরেশবাবু বলিলেন, "গিরি! তুমি একা চুপ করে বসে আছ কেন? দিদি কোথায়? সুর কোথায়?"

গিরিজা। "তাঁরা উমেশবাবুর বাড়ী বেড়াইতে গিয়াছেন।"

নরেশ। "তাঁরা বেড়াইতে গিয়াছেন, তুমি যাওনি কেন?"

গিরিজা গৃহ হইতে বহির্গত হইতেছিলেন, অন্যমনস্কভাবে বলিলেন, "মনটা ভাল নাই তাই গেলাম না।"

নরেশবাবু ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন,—"তোমার ন্যায় প্রফুল্লমুখীর আবার মন খারাপ হ'ল কেন? আমি কোন অপরাধ করেছি নাকি?"

গিরিজা তাঁহার কথার উত্তর না দিয়াই গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন, এবং অল্প সময়ের মধ্যেই কিঞ্চিৎ জলখাবার লইয়া আসিয়া স্বামীর নিকটে রাখিলেন। নরেশবাবু বলিলেন, "আমার কথার উত্তর না দিলে আমি ওসব খাব না।" গিরিজা বলিলেন, "কি কথার উত্তর দিব?" নরেশবাবু বলিলেন, "ওই যে জিজ্ঞাসা করিলাম আমি কি অন্যায় করেছি—তা বল।" মলিন হাস্যে ওষ্ঠাধর শোভিত করিয়া গিরিজা বলিলেন,—"তুমি কি করিবে? তোমার উপর রাগিব কেন?" নরেশবাবু ধীর পাদবিক্ষেপে স্ত্রীর সমীপস্থ হইলেন, এবং সস্নেহে তাঁহার চিবুক ধরিয়া বলিলেন, "গিরি! তুমি বুঝি ভাব, আমি তোমার বুদ্ধির তলাই খুঁজে পাই না, তা কিন্তু ঠিক্ নহে।"

গিরিজা। "তা ভাব্‌বো কেন? তুমি একজন শিক্ষিত অধ্যাপক, আমি অশিক্ষিতা স্ত্রীলোক মাত্র, আমার আবার বুদ্ধি কি?" এবার নরেশবাবু উচ্চ হাস্য করিয়া উঠিলেন এবং বলিলেন,—"অধ্যাপকের বুদ্ধি বিদ্যালয়েই সাজে ভাল, তোমাদের স্ত্রী-বুদ্ধির গুরুত্বের নিকট অধ্যাপকের বুদ্ধি তুলারাশির ন্যায় উড়িয়া যায়—তা জান?"

গিরিজা। "কেন? আমি এমন কি একটা অন্যায় কাজ করিলাম যে, তুমি এত কথা বল্‌ছ, স্ত্রীলোক কি বড়ই মন্দ?"

নরেশ। না, না, গিরিজা ঠাট্টা করি নাই—ক্ষমা কর, তুমি যে সকলবিষয়ই আমার কাছে গোপন করিতে চাও তাই বলিলাম—রেগোনা।"

গিরি। "আমি রাগি নাই, তুমি জলখাবার খাও পরে অন্য কথা হইবে।"

নরেশ। "আগেই তো বলেছি, তোমার মন খারাপ হ'ল কেন, তাহা না বলিলে খাব না।"

গিরি। "বেশ তো মজা! আমার আবার মন খারাপ কি? আজ মাথাটা একটু ধরেছে।"

নরেশ। "মাথা ধরা নয়, তাহ'লে মুখের হাসি শুকিয়ে যেত না, আমি যদি তোমার সঙ্গে নূতন পরিচিত হ'তাম, তাহ'লে যা বল্‌তে তাই বিশ্বাস করিতাম, এখন আর তা পারি না, তুমি বল কি হয়েছে জানিবার জন্য আমি বড় ব্যস্ত হয়েছি। আমার তো কোনও অপরাধ হয় নাই?"

গিরি। "আর ঠাট্টা দিয়ে কাজ নাই, ঢের হয়েছে।" "তবে আর খাওয়াও হ'ল না, আমার কোনও দোষ নাই" এই বলিয়া নরেশ বাবু শয্যোপরি শয়ন করিলেন। গিরিজা পূর্ব্ববৎ মলিন বদনে বসিয়া রহিলেন; এবার তাঁহার মুখখানি আরও দুঃখ ভারাক্রান্ত হইল; চক্ষু দিয়া জল বাহির হইবার উপক্রম হইল। নরেশবাবু কিছুক্ষণ নীরবে শয়ন করিয়া রহিলেন, সেরূপ থাকা তাঁহার প্রীতিদায়ক বোধ হইল না; কিছু বলিবার জন্য স্ত্রীর দিকে চাহিলেন, দেখিতে পাইলেন, গিরিজা অঞ্চলে নয়ন মার্জ্জন করিতেছে; নরেশবাবু অন্তরে বড় ক্লেশ পাইলেন, সত্বরে উঠিয়া স্ত্রীর নিকটে যাইয়া উপবেশন করিলেন, সস্নেহে স্ত্রীর হস্ত ধারণপূর্ব্বক বলিলেন, "একি? গিরি! তোমার চ'খে জল কেন? ছিঃ, কেঁদোনা!" গিরিজা চক্ষু মুছিয়া বলিলেন, "না, কাঁদি নাই, তুমি জল খাও।" নরেশবাবু কি করিবেন? অগত্যা প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিতে বাধ্য হইলেন। স্বামীর জলযোগ শেষ হইলে, গিরিজার অশ্রুসিক্ত মুখখানি কিঞ্চিৎ হর্ষযুক্ত হইল,—বুঝি সে সময় আর তাঁহার চক্ষে জলও রহিল না। গিরিজা স্বামীর হস্তে পান দিলেন, নরেশবাবু পান মুখে দিয়া চিবাইতে লাগিলেন এবং স্ত্রীকে অন্যমনস্ক করিবার নিমিত্ত বলিলেন, "একটা কথা তোমার কাছে বলিবার ইচ্ছা ছিল, তা যদি তোমার মন খারাপ থাকে তবে আর বলা হয় না।"

গিরি। "যা বল্‌তে চাও বল, আমি শুন্‌ছি, মন আর খারাপ কি?"

নরেশ। "আমার ইচ্ছা, সুরজার বিবাহটী শীঘ্রই দিয়ে ফেলা যাউক, সুরজার যে প্রকার ভাব দেখ্‌ছি তাহাতে সে হয়তো দুদিন পরে বলে ফেল্‌বে 'আমি বিয়ে কর্‌বো না' কেমন? তুমি ইহাতে কি বল?" এই সময় গিরিজা একটি দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন, সেই নিশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার হৃদয়ের ভারও বুঝি কিছু নামিয়া গেল, বলিলেন;—"তুমি কাকে বিয়ে দিতে চাও? সুরজা বিয়ে কর্‌বে না।"

নরেশবাবু বিস্ময় প্রকাশপূর্ব্বক বলিলেন, "কেন? সুরজা বিবাহ কর্‌বে না তাহা তুমি কি প্রকারে জান্‌লে?"

গিরি। "আমি তার কাছেই শুনেছি।"

নরেশ। "সে তোমাকে বলেছে?"

গিরি। "তাহা শুনে তোমার প্রয়োজন নাই, আমি বলিলাম সে বিয়ে কর্‌বে না, তুমি ভবেশকে অন্যত্র বিবাহ দাও।"

নরেশ। "ভবেশকে বিবাহ দেওয়া আমার উদ্দেশ্য নহে, সুরজাকে বিবাহ দেওয়াই আমার উদ্দেশ্য।"

গিরিজা স্বীয় হস্তে স্বামীর হস্ত লইলেন, বলিলেন, "তা আমি জানি, কিন্তু সে যদি বিয়ে না করে তবে কি করিবে?"

নরেশ। "কি করিব তা বল্‌তে পারি না, সে তোমার কাছে কি বলেছে তাই বল।"

গিরি। "সত্যই শুনবে? তবে শোন, আমি তোমার কাছে বলিব বলিব করিয়া বলিতে পারিতেছি না, বড় কষ্ট হয়, বলিতে ইচ্ছা হয় না, কাল রাত্রে তোমার উপরে আসতে একটু বিলম্ব হয়েছিল তাই সে আমার কাছে এসে বসেছিল; সেই সময়ে আমি, তাহাকে এরূপ ভাবে থাকিবার কারণ কি, বার বার জিজ্ঞাসা করাতে সে তোমার লেখা একখানা পত্র আমাকে দেখাইল—"।

গিরিজার কথায় বাধা দিয়া নরেশবাবু বলিলেন, "আমার লেখা পত্র? আমি কবে তাকে পত্র লিখেছি? কৈ?—মনেত পড়ে না! আমি কখনো তার কাছে পত্র লিখি নাই।"

গিরিজা। "তাকে লেখ নাই, দিদির কাছে লিখেছিলে তাই সে দেখেছে।" নরেশবাবু চকিতের ন্যায় বলিয়া উঠিলেন, "দিদির কাছে লিখেছিলাম? কি লিখেছিলাম? দেখি সে চিঠি!"

গিরিজা আলমারী হইতে একখানা পত্র বাহির করিয়া স্বামীর হস্তে দিলেন, পত্র হাতে লইয়া নরেশবাবুর সমস্ত দেহ কণ্টকিত হইল, আর দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিলেন না, স্তম্ভিত হইয়া মেজেতেই বসিয়া পড়িলেন। ক্ষণেক পরে বলিলেন,—"এ চিঠি? এ সুরজা পাইল কিরূপে?"

গিরিজা তখন যাহা সুরজার নিকট শুনিয়াছিলেন, আদ্যোপান্ত স্বামীর নিকট ব্যক্ত করিলেন। নরেশবাবু আর কোনও কথা বলিতে পারিলেন না অবাক্ নয়নে স্ত্রীর দিকে চাহিয়া রহিলেন। গিরিজার নয়ন অশ্রুজলে পূর্ণ হইল তিনি বাষ্প গদ্‌গদ্ স্বরে বলিলেন, "আমি অনেক দিন থেকে আশা করেছিলাম, সুরজাকে ভবেশের হস্তে সমর্পণ করে সুখী হব কিন্তু তাহাতেও ঈশ্বর বিমুখ হইলেন, সুরজাকে আমি ঠিক্ ছোট বোনের ন্যায় মনে করি, ওর মলিন মুখ, বিধবার বেশ আমার বড় অসহ্য! কাল সুরজার নিকট থেকে এই চিঠিখানা পেয়ে অবধি আমার মন কতদূর খারাপ হয়েছে তাহা বলিবার অসাধ্য, তাই আমি বার বার তোমার অনুরোধ স্বত্বেও কিছু বলিতে পারিতে ছিলাম না, আমার মনে হচ্ছে সুবর্ণপুর না গেলে বুঝি এমন হত না।" নরেশবাবু চিত্তবেগ কথঞ্চিত সম্বরণপূর্ব্বক ধীরে ধীরে বলিলেন, "দুঃখ করিয়া কি হইবে? সকলি জগদীশ্বরের ইচ্ছা—সুরজা চিরজীবন পবিত্র ব্রহ্মচর্য্য ব্রত পালন করিতে পারে, তাহা হইলেই তাহার জীবনের কর্ত্তব্য সম্পন্ন হইবে।" গিরিজা ভগ্নস্বরে বলিলেন, "সুরজা কর্ত্তব্যের কাছে প্রেমকে বলি দিবে তা নিশ্চয়! কিন্তু ভবেশকে কি বলিবে? তিনি যে তাহাকে বিবাহ ক'রবার আশাতে বাড়ী ঘর ছেড়ে দিয়ে তোমার বাড়ী এসে বসে আছেন, তাঁর কি হইবে?"

নরেশ বাবু পূর্ব্ববৎ ধীর গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "সকলি জগদীশ্বরের ইচ্ছা!"

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

সুরজা কি?

রাত্রি দুইটা বাজিয়া গিয়াছে, মহানগরী কলিকাতার কোলাহলও যেন কিছুক্ষণের জন্য নিস্তব্ধ হইয়াছে। পৃথিবীস্থ প্রাণিগণ বিশ্রামাশায় নিদ্রা দেবীর উপাসনায় রত হইয়াছে।

নরেশবাবুর ক্ষুদ্র ভবনটিও নিস্তব্ধ মূর্ত্তি

ধারণ করিয়াছে, কিন্তু এই সময়ে একবার ভবেশের গৃহ পানে চাহিয়া দেখ, তিনি কি করিতেছেন! ভবেশের চক্ষে নিদ্রা নাই, বিকারগ্রস্ত রোগীর ন্যায় শয্যায় পড়িয়া ছট্‌ফট্ করিতেছেন, এবং মাঝে মাঝে তাঁহার যাতনাপূর্ণ দীর্ঘনিশ্বাস শূন্যে মিলাইয়া যাইতেছে। কিছুক্ষণ শয়ন করিয়া থাকিয়া ভবেশ শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিলেন এবং ধীর পদক্ষেপে বাতায়নের নিকটে আসিয়া দাঁড়াইলেন, দেখিলেন আকাশে অনন্ত নক্ষত্রাবলী পরিবেষ্টিত হইয়া চন্দ্রমা মৃদু মৃদু হাসিতেছে, সে হাসি বুঝি ভবেশের নিকটে ভাল লাগিল না, তিনি নত মস্তকে বসিয়া রহিলেন। যাহার হৃদয় সর্ব্বদা বিষাদে পরিপূর্ণ, হাসি যাহার নিকট হইতে চিরদিনের নিমিত্ত বিদায় গ্রহণ করিয়াছে, তাহার নিকটে অপরের হাসি কেনই বা ভাল লাগিবে? সে জন্যই শান্তিসুখ তিরোহিত ভবেশের চক্ষে চন্দ্রের হাসি বিরক্তি বোধ হইল। ভবেশের সুখ দুঃখে বা তোমার আমার সুখে দুঃখে প্রাকৃতিক নিয়মের কোনও পরিবর্ত্তন হইবে না, প্রকৃতির কার্য্য ঠিক সমভাবে অনন্তকাল পর্য্যন্ত চলিবে।

ভবেশ বসিয়া কি চিন্তা করিতেছেন, আবার প্রকৃতির উপহাস! নৈশবায়ু ধীরে ধীরে আসিয়া তাঁহার উত্তপ্ত ললাট স্পর্শ করিল, ভবেশ ভ্রূকুঞ্চিত করিলেন, বুঝি সমীরণের সে খেলাও তাঁহার নিকট আরামপ্রদ মনে হইল না। "কি উৎপাৎ!" বলিয়া ভবেশ তথা হইতে উঠিয়া তাঁহার পুস্তকাদি রক্ষিত টেবিলের নিকটে একখানি চেয়ারে উপবেশন করিলেন, এবং আপনা আপনি ভাবিতে লাগিলেন, "জীবনের সাধ আশা সকলি তো ফুরাইয়া গিয়াছে, তবে আর বাঁচিয়া থাকিয়া কি হইবে? যে জীবন নিরন্তর দুর্ব্বিসহ অনলে দগ্ধ হইবে, তাহা যত শীঘ্র ভস্মে পরিণত হয় সেই তো মঙ্গল! যাহাকে একমাত্র জীবনের অবলম্বন মনে করিয়াছিলাম, যাহাকে হৃদয়ের অধীশ্বরী করিয়া পৃথিবীতে সুখী হইব আশা করিয়াছিলাম, সে আমার নহে, সে আমাকে তাচ্ছল্য করে, ভ্রমেও আমার দিকে ফিরে চায় না, তবে আমি কি সুখের আশায় প্রাণ রাখিব? সত্য সত্যই কি সে আমাকে ঘৃণা করে? কেন? আমি এমন কি অপরাধ করিয়াছি, যাহাতে তাহার পূর্ব্ব স্নেহ হইতে বঞ্চিত হইলাম? আমি জানি, যদি আমার কোনও বিশেষ পাপ বা পুণ্য থাকে, তবে সে তাহার প্রতি ভালবাসা;—আরতো কিছুই আমার নাই! আমি কখনই তাহাকে পাইবার আশা করিতাম না, বামন হইয়া চাঁদে হাত বাড়াইতাম না, যেমন ছাত্রীরূপে পাইয়াছিলাম সেইভাবেই দেখিতাম, নরেশ বাবু আমাকে আশা দিলেন কেন? না—না নরেশ বাবুর দোষ কি? আমারি সম্পূর্ণ দোষ! আমিইতো তাহার সরলতায় মুগ্ধ হইয়া তাহাকে ভালবাসিয়াছি,—নরেশ বাবু বিবাহের কথা বলিয়াছেন মাত্র, কিন্তু সে বিবাহ কি হইবে? দুই বৎসরে যাহার এত পরিবর্ত্তন হইয়াছে, ভালবাসার কাছে বিস্মৃতিকে স্থান দিয়াছে, সে কি আর এই হতভাগাকে বিবাহ করিতে স্বীকৃত হইবে? অথবা সে আমার দুরাশা!—পাগলের প্রলাপ!

ভবেশ আর ভাবিতে পারিলেন না, হৃদয় অস্থির হইল, নয়নদ্বয় অশ্রুপূর্ণ হইল, তিনি উন্মাদের ন্যায় উঠিয়া দাঁড়াইলেন,

এবং দ্রুতপদবিক্ষেপে গৃহের একধারে যাইয়া দেরাজ হইতে একখানি তীক্ষ্ণধার ছুরিকা বাহির করিয়া পুনরায় চেয়ারে আসিয়া বসিলেন। প্রদীপের উজ্জ্বল আলোকে ছুরি ঝক্‌মক্ করিতে লাগিল, সেই সঙ্গে সঙ্গে ভবেশের মলিন ওষ্ঠাধরে মলিন হাস্যরেখা, প্রকটিত হইল, তিনি ক্ষীণস্বরে কহিলেন,—আর কেন? সকলিতো শেষ হইয়াছে, তবে আর বিলম্ব কি? হৃদয়ের সাথীতো কেহই হইল না, প্রাণের অসহ্য অনল নিভাইতে কেহই তো প্রয়াসী হইল না,—ছুরি! কি আমার এ উপকারটুকু করিবি?—উপকারটুকু আর বলি কেন? এইতো আমার দুঃখভারাক্রান্ত জীবনের শ্রেষ্ঠ এবং চিরশান্তিপ্রদ উপকার! ইহাপেক্ষা সাধ আর আমার জীবনে নাই, বড় আশা করিয়া তোকে ক্রয় করিয়াছিলাম, কিন্তু একদিনও তুই আমার ব্যবহারে লাগিস্ নাই, আজ তোর ক্রেতার প্রথম এবং শেষ কার্য্য করিয়া তাহাকে এ অসহ্য যন্ত্রণার হাত হইতে মুক্ত কর্।" বলিতে বলিতে ভবেশ সেই তীক্ষ্ণাগ্র ছুরিকা বক্ষোপরি স্থাপন করিলেন, আবার কি ভাবিয়া তাহা তুলিয়া লইলেন; বুঝি ভাবিলেন, মরিলেতো সকলি ফুরাইয়া যাইবে, সেই সঙ্গে সুরজার দর্শনতৃষাও তো অতৃপ্তই রহিয়া যাইবে। আহা! এ সাধ তো আমি সহজে ফুরাইতে চাহি না. আর একবার—একবার মরিবার পুর্ব্বে তাহাকে দেখিব, আর একবার তাহার সেই স্বর্গীয় পীযূষধারাসম কথা শুনিব, আর—আর—আর—একবার——"। ভবেশ কি বলিতে যাইতেছিলেন বলিতে পারিলেন না, আকুল হৃদয়ের প্রবল উচ্ছ্বাসে নয়নদ্বয় অশ্রুভারাক্রান্ত হইল।

ছিঃ ভবেশ! তুমি পুরুষ, তোমার হৃদয়ে বল নাই কেন? যে তোমাকে বিস্মৃত হইয়াছে, তুমি কি তাহাকে ভুলিতে পার না? তাহার ছায়া হৃদয় হইতে দূর করিতে পার না? যাহার উপেক্ষায় তুমি অমূল্য জীবন বিসর্জ্জন দিতে বসিয়াছ তাহাকে আবার দেখিতে সাধ কেন? তুমি পুরুষ হইয়া নারীর ন্যায় ভালবাসিতে শিখিলে কোথায়? ভবেশ আর স্থির হইতে পারিলেন না, তাঁহার প্রাণের ভিতর হইতে কে যেন ঐ কথা বলিয়া উঠিল। তিনি দৃঢ়মুষ্টিতে অস্ত্রখানা ধরিয়া বক্ষস্থলে বিদ্ধ করিলেন ক্ষতস্থান দিয়া বিন্দু বিন্দু শোণিত নির্গত হইয়া তাঁহার বস্ত্রের স্থানে স্থানে রঞ্জিত হইতে লাগিল, সেদিকে ভবেশের ভ্রূক্ষেপও নাই, তিনি ক্ষীণকণ্ঠে বলিলেন, "জগদীশ! পৃথিবীতে সুখী হইলাম না আমার এ মরণে বুঝি পরকালেও তোমার চরণে স্থান পাইব না,—আমার গতি কি হবে?—তাঁহার নয়ন দিয়া অবিরল ধারায় অশ্রু প্রবাহিত হইতে লাগিল। সহসা গৃহদ্বার উদ্ঘাটিত হইল, চকিতনেত্রে ভবেশ চাহিয়া দেখিলেন,—সুরজা। তাঁহার শরীর কণ্টকিত হইল ছুরিকা হস্তচ্যুত হইয়া পড়িয়াগেল, কেবল উন্মাদের ন্যায় ভাবশূন্য দৃষ্টিতে সুরজার মুখপানে চাহিয়া রহিলেন কোনও কথা কহিতে পারিলেন না,—বোধ হয় সে সময় তাঁহার কথা বলিবার ক্ষমতা ছিল না। সুরজা ধীরে ধীরে তাহার নিকটে আসিয়া দাঁড়াইল, এবং স্নেহমাখাস্বরে বলিল, "ভবেশ বাবু! আপনার শরীর আজ খারাপ হ'য়েছে?"

ভবেশ সে প্রশ্নের কোনও উত্তর না দিয়া ব্যাকুলভাবে বলিলেন, "সুর! আজ কি এই অভাগার কথা মনে হ'ল? আমাকে এত

কষ্ট দিয়া কি সুখ পাও? আর কষ্ট দিও না। সুর! আজ আমাকে বড় সুখী করিলে, আমার অতৃপ্ত হৃদয়কে পরিতৃপ্ত করিলে, আমার জীবনের শেষ আশা এবং শেষ সুখ এই, ইহাপেক্ষা সুখের আশা আমার আর নাই।" ভবেশ বালকের ন্যায় রোদন করিতে লাগিলেন। সুরজা স্বীয় অঞ্চলদ্বারা তাঁহার চক্ষু মুছাইয়া দিয়া বলিল, "ছি ভবেশ বাবু! আমার জন্য আবার কান্না? আমি কে?" সুরজার হস্ত স্বীয় হস্তে লইয়া ভবেশ বলিলেন, "সুর, প্রাণের সুর! তুমি কে? তুমি জান না তুমি কে? তুমি আমার হৃদয়ের সর্ব্বস্ব ধন! আমার আশা উদ্দেশ্য সকলি তুমি, তুমি ব্যতীত আমি স্বর্গেও থাকিতে চাই না।" সুরজা গম্ভীরস্বরে বলিল,—"আমি আসিলে আপনি এত কাঁদিবেন জানিলে আমি কখনই আসিতাম না, আমার জন্য আবার দুঃখ কি?"

"কেন সুর? এলে কেন? না আসিলে আমিও আর কিছু বলিতে যাইতাম না, এ দুঃখময় জীবনের শেষ করিতেই তো বসিয়াছিলাম, আবার তোমাকে দেখিয়া সকলি ভুলিয়া গিয়াছি! আজ তুমি আমাকে কাঁদিতে দেখিলে, আমি রাত্রিদিন এইরূপই কাঁদি.—তুমি কি তাহা ভাবিয়া থাক? কখনই ভাবনা। ভাবিলে অবশ্যই মাঝে মাঝে দেখা পাইতাম।" সংজ্ঞাহীনের ন্যায় উক্ত কথাগুলি বলিয়া ভবেশ স্থিরনেত্রে সুরজার পানে চাহিয়া রহিলেন,—সুরজার চক্ষুও তখন শুষ্ক ছিল না, ভবেশ তাহা দেখিতে পাইলেন কি না বলিতে পারি না। কিয়ৎক্ষণ পরে হৃদয়ের বেগ কিছু প্রশমিত হইলে সুরজা বলিল, "এ কি! ভবেশ বাবু! আপনি কি করিতেছিলেন? আপনার সমস্ত কাপড়েই রক্ত দেখিতেছি, ও কি? বুকদিয়া যে এখনো রক্ত পড়িতেছে, আপনি আত্মহত্যা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, আমি না আসিলে কি সর্ব্বনাশই ঘটিত! ছিঃ ছিঃ আপনি এখনো আমার জন্য এত চিন্তা করেন? তাহা তো আমি কখনই মনে করি না।" বাধা দিয়া ভবেশ বলিলেন, "তুমি তা মনে করিবে কেন? তুমি যদি মনেই করিবে, তবে আর আমার কি দুঃখ ছিল সুর?"

সুরজা মৃদুস্বরে বলিল, "তা ঠিক্!" ভবেশ উঠিয়া দাঁড়াইলেন, মাথা ঘুরিতে লাগিল আবার চেয়ারে বসিলেন, বলিলেন, "সুর! রাগিলে? বাস্তবিকই তোমার ব্যবহারে মনে হয় তুমি আমাকে পূর্ব্বের ন্যায় স্নেহের চক্ষে দেখ না।" সুরজা অন্যমনস্ক ভাবে একদৃষ্টে ভবেশের রক্তার্দ্র বস্ত্রেরপ্রতি চাহিয়া আছে সে পূর্ব্ববৎ অচঞ্চলস্বরে বলিল —"হাঁ তা ঠিক্!"

কথাটি শুনিয়া ভবেশের বড় ক্লেশ হইল, যাতনা পীড়িতস্বরে বলিলেন;—"কেন? আমি কি দোষে তোমার ভালবাসা হারাইলাম?" সুরজা তাঁহার কথার কোনও উত্তর না দিয়া আল্নার উপর হইতে একখানা কাপড় আনিয়া বলিল, "উঠুন কাপড়খানা বদ্‌লে ফেলুন।" ভবেশ সুরজারদিকে সে সময় চাহিলে দেখিতে পাইতেন, তাহার নয়নদ্বয় অশ্রুজলে পরিপূর্ণ। ভবেশ বলিলেন, "থাক্ ঐ ভাল, কিন্তু তুমি বল তুমি কি দোষে আমার প্রতি নির্দ্দয় হইলে?" সুরজা এবারেও কোন জবাব দিল না, স্বীয় পরিধেয় বস্ত্রের কতকটা ছিড়িয়া ভিজাইয়া আনিল এবং তদ্দ্বারা ভবেশের বক্ষের ক্ষতস্থান পরিষ্কাররূপে মুছিয়া দিল, তখন রক্ত-

পড়া বন্ধ হইয়াছে সুতরাং আর বান্ধিবার প্রয়োজন হইল না ত্বরিতপদে আপনার গৃহে যাইয়া একটা ঔষধ আনিয়া ক্ষতস্থানে লেপন করিয়া দিল,—ভবেশ কাষ্ঠপুত্তলিকার ন্যায় বসিয়া রহিলেন ; সুরজার কোনও কার্য্যের একটিও প্রতিবাদ করিলেন না। সুরজা আবার বলিল ;—"আপনি কাপড়খানা বদলাইয়া ফেলুন আমি যাই।" ভবেশ বলিলেন, "যাবে ? যাও, আমি এই ভাল আছি।"

সুরজা বলিল, "পূর্ব্বের কথা মনে করিয়াও তো এ অনুরোধটা শুনিতে পারেন!" সুরজার কথাটা ভবেশের প্রাণে বড় লাগিল, তিনি সুরজার হস্ত হইতে বস্ত্র লইয়া পরিধান করিলেন এবং বলিলেন, "এক সময়ে তোমার শিক্ষক ছিলাম; তাই আজ পূর্ব্বের কথা তুলিয়া আমাকে অনুরোধ করিলে, কিন্তু আমি সমস্ত হৃদয় সমর্পণ করিয়াও একটা কথার উত্তর পাইলাম না, যদি জানিতাম বাস্তবিকই তুমি আমাকে শিক্ষক ব্যতীত অন্য কিছু মনে কর না, তবে আমি সহস্র যন্ত্রণা পাইলেও তোমাকে জানাইতাম না কিন্তু সরল স্বর্গীয় স্নেহে আমাকে বন্ধন করিয়া এখন আবার নিষ্ঠুরের ন্যায় আচরণ কর কেন ? তাহাই আমি জানিতে চাই।"

সুরজার হৃদয় তখন উদ্বেগে পরিপূর্ণ বুঝি তখন তাহার নিকটে পৃথিবী ঘুরিতেছে। সুরজা! এমন কাজ করিলে কেন ? হৃদয়কে সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত না করিয়া প্রলোভনের নিকটে আনিলে কেন ? এইবার তোমার পরীক্ষা, প্রেম বড় কি কর্ত্তব্য বড় এইবার দেখাও। সুরজাকে নিরুত্তর দেখিয়া ভবেশ উঠিয়া দৃঢ় মুষ্টিতে তাহার হস্ত ধারণ করিলেন, এবং স্নেহোদ্বেলিত কণ্ঠে বলিলেন, "সুরজা! বল চির দিনই কি এই ভাবে যাইবে ? তুমি কি আমার হবে না ?" সুরজা তাঁহার হস্ত হইতে হস্ত মুক্ত করিয়া দ্বারাভিমুখে অগ্রসর হইল, ভবেশের প্রাণে বড় আঘাত লাগিল, তিনি বলিলেন, "সুর! আমাকে অবিশ্বাসী মনে করিলে ? আমি সহস্র দোষে দোষী হইলেও অবিশ্বাসী নহি।" সুরজা ধীর গম্ভীর স্বরে বলিল, "আপনাকে কখনই অবিশ্বাস করি না, তাহা হইলে এই গভীর রাত্রে কখনো একাকিনী আপনার কাছে আসিতাম না।"

ভবেশ। "তবে এস, সুর! সেই ছেলে বেলার সরল ভাবে আমার কাছে ব'সো তেমনি আপনার লোকের ন্যায় প্রাণ খুলিয়া কথা বল।"

সুর। "না আমি এখন যাই, বাড়ী যাইবার আগে আর একদিন আসিব, যদি আসি সেই দিন বসিব।"

ভবেশ। "তুমি কি বাড়ী যাবে ?"

সুর। "হাঁ, আমরা ৭।৮ দিনের মধ্যেই বোধ হয় বাড়ী যাব, যদি আর না পারি তাই আজ আপনার সঙ্গে দেখা করিতে আসিলাম।"

ভবেশ! "এত রাত্রে এলে কেন ? ইহার পূর্ব্বেও তো আসিতে পারিতে।"

সুর। "পারিতাম, কিন্তু আসিব কিনা তাই ভাবিতে ভাবিতে রাত্রি বেশী হ'য়ে গেল।"

ভবেশ। "আমার কাছে আসিবে তা এত ভাবনা কি ? তোমার মার কিম্বা মাতুলের ইহাতে অমত আছে না কি ?"

সুর। "মার কিম্বা মামার যে মত তাহা আপনি জানেন, সে বিষয়ে আমাকে জিজ্ঞাসা করা নিষ্প্রয়োজন, আমি তাঁহাদের মতের

অপেক্ষায় ছিলাম না, নিজের মতামত স্থির করিতেছিলুম—তবে এখন যাই।"

সুরজা যাইবার জন্য দু এক পা অগ্রসর হইল, ভবেশ আবার নিকটে যাইয়া তাহার হস্ত ধারণ করিয়া বলিলেন, "এখন যাবে? একটুকু বস বলিয়া ভবেশ সুরজাকে বসাইলেন, এবং নিজেও তাহার অনতিদূরে উপবেশন করিলেন।

নবম পরিচ্ছেদ।

বিদায়।

উভয়েই নিস্তব্ধ, নীরব, যেন পার্থিব জগতের সহিত কাহারও সম্বন্ধ নাই উভয়েই কি এক মহা ভাবে নিমগ্ন। প্রায় অর্দ্ধঘণ্টা এইরূপে অতিবাহিত হইল দেওয়ালস্থিত ঘড়িতে টুং টুং করিয়া চারিটা বাজিয়া গেল, ভবেশ চমকিয়া ঘড়ির পানে চাহিলেন এবং আপনা আপনি বলিলেন,—"চারিটা বেজে গেল যে? আজ কি রাত্রি শীঘ্রই পোহাইবে? রোজ দেখি রাত্রি পোহাইতেই চায় না।" সুরজা ভবেশের মুখ পানে চাহিয়া, বলিল, "ভবেশবাবু! আমি যাই, আপনিও ঘুমাতে যান একেই আজ আপনার শরীর খারাপ হ'য়েছে রাত্ জাগিলে আরও খারাপ হ'তে পারে।"

ভবেশ ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, "আমার শরীর খারাপ হ'য়েছে তা তুমি কি প্রকারে জানিলে?"

সুর। "আমি শুনেছি আপনার শরীর অসুস্থ হ'য়েছে, আপনি আজ রাত্রে আহার করেন নাই। আর মামা বাবুও আপনার জন্য বড় ব্যস্ত হ'য়েছেন।"

ভবেশ। "ওঃ সে কিছু নয়! তুমি একটু ব'স, তুমি কাছে থাকিলে আমি কোনও অসুখকেই অসুখ মনে করি না, আজ আর আমি তোমাকে যেতে দিব না—যদি বিরক্ত না হও!"

সুরজা দেখিল ভবেশ তাহাকে যাইতে দিতে ইচ্ছুক নহেন, অথচ এই গভীর নিশায় নির্জ্জনে তাঁহার নিকটে থাকাও সে ন্যায় সঙ্গত মনে করিল না, বলিল,—"আমি যাই, রাত্রে না ঘুমা'লে আমার শরীর ভাল থাকে না,—আমার ঘুমপাচ্ছে।"

সুরজার কথা শুনিয়া ভবেশের মুখ বিষাদমণ্ডিত হইল, নেত্রদ্বয় জলে পূর্ণ হইল, দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িয়া বলিলেন, "যাবে? যাও!—কিন্তু একটা কথা বলিতে চাই শুনিবে কি?" সুরজা উঠিয়া দাঁড়াইল বলিল, "কি কথা?" ভবেশও উঠিলেন, আবার উচ্ছ্বাসপূর্ণ হৃদয়ে দৃঢ় মুষ্টিতে সুরজার হস্ত ধারণ করিয়া বলিলেন, "সুর! বল আর কতদিন এভাবে থাকিব?" যাতনা প্রপীড়িত স্বরে সুরজা বলিল, "ভবেশ বাবু আমাকে ক্ষমা করুন, আজ আর কিছু বলিতে পারিতেছি না, অন্য একদিন সকল কথা খুলিয়া বলিব।" ভবেশ কাতর দৃষ্টিতে তাহার মুখপানে চাহিয়া বলিলেন, "আর কতদিন পরে? দিন তো আর যায় না। আমি যতই তোমার নিকটবর্ত্তী হইতে চেষ্টা করিতেছি, তুমি আমাকে ততই দূরে ঠেলিয়া দিতেছ; কেবল তোমার কথার উপরই আমার জীবন মৃত্যু নির্ভর করিতেছে জানিও। আজকেই একবার বলে যাও আমার হবে কি না।" ভবেশের সমস্ত শরীর কম্পিত হইল, তিনি সুরজার হস্ত ত্যাগ করিয়া বসিয়া পড়িলেন, আবার বলিলেন, "বল সুর একবার বল, আমার হবে কি না।" গৃহমধ্যে প্রতিধ্বনি হইল, "আমার হবে কি না।"

ভবেশ চাহিয়া দেখিলেন সুরজা নাই, তাহার হৃদয় অস্থির হইল, সেই স্থানে—সেই ধূলি মধ্যেই শয়ন করিলেন এবং ক্ষীণকণ্ঠে বলিলেন, "সুরজা কি ?"

রাত্রি প্রভাত হইল উন্মুক্তবাতায়ন পথে উষার নির্ম্মল স্নিগ্ধ আলো আসিয়া দগ্ধ হৃদয় ভবেশের গাত্রে পড়িল, তিনি উঠিয়া বসিলেন। দ্বারবান আসিয়া দ্বারদেশে দাঁড়াইয়াছিল, ভবেশকে ওরূপ অবস্থায় ভূপতিত দেখিয়া কিছুই বলিতে সাহস পায় নাই, এখন ভবেশকে বসিতে দেখিয়া সে নিকটে আসিয়া দাঁড়াইল, এবং অভিবাদনান্তর বলিল, "বাবু! ইয়া একঠো তার আয়া জল্‌দি ইস্‌কো রসিদ লিখ্‌কে দেনে হোগা, চাপরাশি বহুতেগড়ি খাড়া হ্যায়!" ভবেশ টেলিগ্রাম লইয়া নাম সাক্ষর করিয়া দ্বারবানকে বিদায় দিলেন, টেলিগ্রামের মর্ম্মে বুঝিলেন, তাঁহার পিতা পীড়িত শীঘ্র কাশিতে যাইতে হইবে।

ভবেশের মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল; কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ় হইয়া কতক্ষণ বসিয়া রহিলেন, পরে উঠিয়া দ্রুতপদে নরেশ বাবুর শয়নকক্ষের দিকে চলিলেন, নরেশ বাবুর তখনও নিদ্রা ভঙ্গ হয় নাই, গিরিজা এইমাত্র উঠিয়াছেন, ভবেশকে ত্রস্ত অথচ চিন্তাকুল ভাবে আসিতে দেখিয়া তিনি কিছু ভাবিত হইলেন, জিজ্ঞাসা করিলেন, "একি ভবেশ বাবু, এত সকালে উঠেছ যে? রাত্রে ঘুম হয়নি? কোনও অসুখ হ'য়েছে?

ভবেশ। "না অসুখ কিছু না, এইমাত্র কাশি হইতে টেলিগ্রাম এসেছে, বাবা অত্যন্ত পীড়িত আমাকে যেতে হবে।" ভবেশের নেত্রদ্বয় ছল্ ছল্ করিতে লাগিল। গিরিজা বলিলেন, "তা যাবে এখন, তারজন্য কান্না কেন? অসুখ তো লোকের হ'য়েই থাকে।" ভবেশ চলিয়া গেলেন। গিরিজা গৃহে গমন পূর্ব্বক নিদ্রিত স্বামীকে ডাকিয়া উঠাইয়া দিলেন, নরেশ বাবু যাইয়া দেখিলেন ভবেশ কাঁদিতেছেন, তিনি ভবেশকে সান্ত্বনা প্রদান পূর্ব্বক যাইবার বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন, ভবেশ সকলের নিকট বিদায় লইয়া কাশি যাত্রা করিলেন। (ক্রমশঃ)

বিবিধ প্রসঙ্গ।

মহাকলঙ্ক নারী বিক্রয় ব্যবসায়।—কালীঘাটে নারী বিক্রয়ের দোকান আছে অনেক দিন হইতে আমরা জানি। বঙ্গের নানাস্থান হইতে বালিকাদিগকে কখনও চুরি কখনও বা প্রলুব্ধ করিয়া কালীঘাটের দোকানে আনা হয়, তথায় খরিদদারগণ আসিয়া পছন্দমত সওদা করিয়া থাকে অথবা দোকানদার কাশী প্রভৃতি স্থানে মাল চালান দেয়। বৈদ্য ব্রাহ্মণ কায়স্থ কুলেও কত বালিকা ও যুবতীকে এইরূপ ক্রয় বিক্রয় করা হইয়া থাকে। এইরূপ এক ক্রীতা রমণীর সঙ্গে একবার আমাদের সাক্ষাৎ হইয়াছিল, তাহাকে কালীঘাটের ডিপো হইতে কাশীতে চালান দেওয়া হইয়াছিল, তথা হইতে একজন রাজ কর্ম্মচারী তাহাকে ক্রয় করিয়া আনিয়াছিলেন। অবশেষে পাপ হইতে সেই রমণী উদ্ধার পাইয়াছিল। এই নারী বিক্রয় ব্যবসায় কালীঘাটে খুব প্রচলিত। অল্প দিন হইল রাজকুমার মুখোপাধ্যায় ও অপর দুইজন স্ত্রীলোক ও ৩ জন পুরুষ সহচর এই পাপ ব্যবসায়ে লিপ্ত বলিয়া ধৃত হইয়াছিল। ইহারা একটী বালিকাকে বরিশাল লইয়া গিয়া দুইশত টাকাতে বিক্রয় করিয়াছিল। ৫ জন আসামীর মধ্যে ৪জনের কারাদণ্ড হইয়াছে।
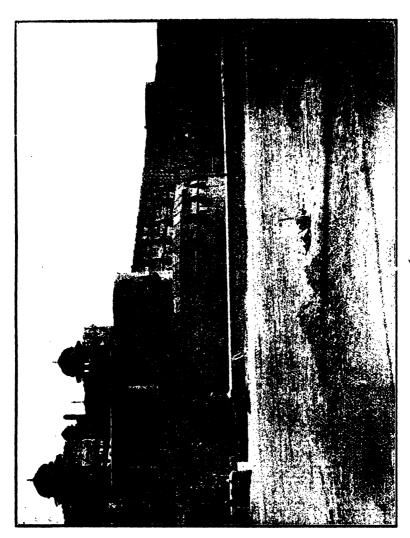
আগ্রা দুর্গ।

অন্তঃপুর

সচিত্র মাসিক পত্রিকা।

ANTAHPUR

AN ILLUSTRATED MONTHLY JOURNAL IN BENGALI

Edited and contributed to by the ladies only.

কেবল মহিলাগণ কর্ত্তৃক লিখিত ও সম্পাদিত।

বিশাল এ বিশ্বের মন্দিরে বিশ্বমাতা রাজ রাজেশ্বরী,
কি সুন্দর চালান সংসার সহস্র সন্তান বুকে ধরি।
বিশ্বজননীর প্রতিনিধি, তাঁর ছবি জননী ধরায়,
ধন্য যিনি পালেন সতত, এ মহাব্রত লইয়া মাথায়।

৬ষ্ঠ বর্ষ।	আষাঢ়, ১৩১০ বঙ্গাব্দ	VOL. VI.
৩য় সংখ্যা।	JULY, 1903.	NO. III.

প্রাচীন বৃটন জাতি।

পূর্ব্বকালে রোম নগরের অধিবাসী রোমানজাতি জগতে অতীব প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। রোমানগণ অতি সামান্য অবস্থা হইতে ক্রমে মহা ক্ষমতাশালী জাতির মধ্যে পরিগণিত হইয়া উঠে। এক সময়ে ইউরোপের প্রায় সমস্ত জনপদে ও সুদূর প্রাচ্য দেশসমূহে তাহাদের আধিপত্য বিস্তৃত হইয়া পড়ে। কালে রোমানজাতি পশ্চিমে ইউরোপ দক্ষিণে আফ্রিকা ও পূর্ব্বে এসিয়া পর্য্যন্ত প্রায় অর্দ্ধ জগতের অধীশ্বর হইয়াছিল। জগতের তদানীন্তন প্রায় সমগ্র জাতির মধ্যে রোমানেরা অধিক সভ্যতা লাভ করিয়াছিল। তাঁহাদের উন্নত রাজ ব্যবস্থা উৎকৃষ্ট সামাজিক রীতি নীতি ও আচার ব্যবহার সকল অন্য জাতিগণ দ্বারা সাদরে গৃহিত হইত। বহু সংখ্যক বিজিত অসভ্য জাতিগণ তাহাদের সংস্পর্শে আসিয়া উন্নত সভ্যতা লাভ করিয়াছিল। এইরূপে যখন রোমের সভ্যতা ও ক্ষমতার সমক্ষে বহু সভ্য ও অসভ্যজাতি অগণ্য দেশ ও রাজ্য সমূহ মস্তক অবনত করিয়াছিল, যখন তাহার বিজয়-ভেরী ধ্বনীতে অর্দ্ধ পৃথিবী প্রকম্পিত হইতেছিল, তখন ক্ষুদ্র বৃটন দ্বীপ (বর্ত্তমান ইংল্যাণ্ড) আমমাংসভোজি বন্য অসভ্য জাতির নিবাসভূমি ছিল। বৃটনে তখন অজ্ঞানতা ও অসভ্যতার নিশিথ রজনী বিরাজ করিতেছিল। তদানীন্তন অতি অল্প সংখ্যক ব্যক্তিমাত্র এই অজ্ঞাত দ্বীপের

বিষয় পরিজ্ঞাত হইয়াছিল। প্রথমে রোমান নাবিক ও বনিকগণ বৃটনের সন্ধান পাইয়া স্বদেশে গিয়া ইহার বিষয় প্রচার করে। তৎপরে রোমের প্রধান ব্যক্তিগণ বৃটনদ্বীপ আপনাদের স্বাধিকারে আনয়ন করিবার সঙ্কল্প করেন। রোমানগণের দ্বারা বৃটন অধিকৃত হইবার পূর্ব্বে ইহার অধিবাসিবর্গের কিরূপ অবস্থা ছিল, আমরা এক্ষণে তাহাই বিবৃত করিতেছি। বহু পূর্ব্বকালে আর্য্য-শাখা সম্ভূত কেলটিক জাতির একদল উপ-নিবেশি বৃটনে আসিয়া বসতি সংস্থাপন করে। কেলটিকগণের আগমনের পূর্ব্বে বৃটনে অনার্য্য জাতি সম্ভূত অসভ্য জাতিগণ বাস করিত। কেলটিকগণ তাহাদিগকে পরাজিত করিয়া বৃটনের পশ্চিম অংশে বিতাড়িত করিয়া দেয়। কেলটিক কিম্বা তাহাদের পূর্ব্ববর্ত্তী অসভ্যজাতিগণের বৃটনে আগমন সম্বন্ধীয় কোন লিখিত ইতিহাস নাই। কেবলমাত্র বিভিন্নকালিন ভূগর্ভে প্রোথিত, তাহাদের বিভিন্ন প্রকারের অস্ত্রশস্ত্র কাষ্টাসন ও ক্রমলিক নামক সমাধি মন্দির সকল দৃষ্টে ক্রমান্বয়ে যে এই দুই জাতির দ্বারা এই দ্বীপ অধিকৃত হইয়াছিল এইরূপ অনুমান করা হইয়া থাকে। কেলটিকগণের পূর্ব্বে যে অসভ্য জাতিগণ বৃটনে বাস করিত ভূগর্ভে সমাধিস্থ তাহাদের দেহাস্থির সহিত প্রস্তর নির্ম্মিত অস্ত্রশস্ত্র ও কুক্কুর বৃষ মেষ ছাগ শূকর ইত্যাদি পশু সমূহেরও অস্থি প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইহাতে তাহারা যে প্রস্তর নির্ম্মিত অস্ত্রশস্ত্র ও গৃহপালিত পশু প্রতি-পালন করিত, এইরূপ অনুমান করা হইয়া থাকে। কেলটিকগণের পূর্ব্ববর্ত্তি এই অসভ্য জাতিকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়। প্রথমতঃ যাহাদের দেহাস্থির সহিত প্রাপ্ত প্রস্তর নির্ম্মিত অস্ত্রশস্ত্রে তাদৃশ সূক্ষ্ম নিপুনতা লক্ষিত হয় না। তাহাদিগকে প্রাচীন প্রস্তর যুগের এবং দ্বিতীয়তঃ যাহাদিগের দেহাস্থির সহিত প্রাপ্ত প্রস্তর নির্ম্মিত অস্ত্রশস্ত্র অধিক সূক্ষ্ম নিপুনতাসহকারে নির্ম্মিত হইয়াছে, তাহাদিগকে নব্য প্রস্তর যুগের অসভ্যজাতি নামে অভিহিত করা হয়। বৃটনের নব্য প্রস্তর যুগের অসভ্যজাতিগণ স্পেনের প্রাচীন ব্যাস্‌কুয়েস্‌ কিম্বা আইবিরিয়ান জাতির সহজাতি ছিল, পণ্ডিতগণ এইরূপ নিরূপণ করিয়াছেন। কারণ স্পেনের ভূগর্ভে সমাধিস্থ এই আইবিরিয়ান জাতির প্রস্তর নির্ম্মিত অস্ত্রশস্ত্র, মস্তক ও দেহাস্থির গঠনের সহিত বৃটনের নব্য প্রস্তর যুগের অসভ্যগণের দেহাস্থি ও প্রস্তর নির্ম্মিত অস্ত্রশস্ত্রের আশ্চর্য্য সাদৃশ্য দৃষ্ট হইয়া থাকে। ইহাতেই যে তাহারা একজাতি সম্ভূত ছিল, পণ্ডিতগণ এই-রূপ সিদ্ধান্তে উপনিত হইয়াছেন। প্রাচীন আইবিরিয়ানগণের বংশধরগণ এখনও স্পেনের পার্ব্বতীয় বন্য প্রদেশ সকলে বাস করিতেছে। ইউরোপের সকল জাতির ভাষার সহিত তাহাদের ভাষার কোন সাদৃশ্য নাই। রুষিয়ার উত্তর বিভাগস্থ ফিনল্যাণ্ডের অধিবাসি ফিনস্‌ জাতীর ভাষার সহিত ইহা-দের ভাষার যা কিছু সাদৃশ্য লক্ষিত হইয়া থাকে। কেলটিকগণের আগমন কালে এই আইবিরিয়ানগণের সহজাতি নব্য প্রস্তর যুগের অসভ্যগণ বৃটনে বাস করিতেছিল। কেলটিকগণ তাহাদিগকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া দ্বীপের পশ্চিম অংশে বিতাড়িত করিয়া দেয়। রোমানেরা যখন বৃটন অধি-কার করে। তখন নব্য প্রস্তর যুগের অসভ্য

জাতিগণের অব্যবহিত পরবর্ত্তী এই কেলটিকগণ, ইহার প্রধান অধিবাসী ছিল। তাহারা আপনাদিগকে বৃটন নামে অভিহিত করিত। রোমানেরা বৃটনগণকে অতিহীন অবস্থায় দর্শন করে। বৃটনেরা তখন আম মাংসভোজন ও অসভ্যাবস্থায় কাল যাপন করিত। যদিও শীতকালে বস্ত্রের অভাবে শিকারে নিহত পশুচর্ম্মের দ্বারা তাহারা শরীর আচ্ছাদন করিত বটে, কিন্তু গ্রীষ্মকালে সর্ব্বদাই নগ্নদেহে থাকিয়া ওয়াড নামক এক প্রকার ক্ষুদ্র উদ্ভিজ্জের নীলবর্ণের নির্য্যাসের দ্বারা শরীর রঞ্জিত করিয়া রাখিত, এইরূপ নীলবর্ণের নির্য্যাষের দ্বারা শরীর রঞ্জিত করাতে দূর হইতে তাহারা নীলবর্ণের কষা পরিচ্ছদ পরিধান করিয়াছে, এইরূপ অনুমান হইত। শত্রুগণকে সন্ত্রাসিত করিবার জন্য তাহারা ওয়াডের দ্বারা শরীর রঞ্জিত করিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে গমন করিত। তাহারা যে গৃহে বাস করিত তাহা অতি অদ্ভুত প্রকারের ছিল। কতক গুলি সূক্ষ্ম বৃক্ষশাখা তির্য্যগভাবে একত্রে সংস্থাপন পূর্ব্বক তদুপরি মৃত্তিকা লেপিয়া তাহারা গৃহ নির্ম্মাণ করিত। এইরূপ প্রণালীতে নির্ম্মিত হওয়াতে তাহাদের গৃহগুলি ঠিক চুবড়ির ন্যায় আকার প্রাপ্ত হইত। বহিস্থ কোন শত্রু তাহাদের সন্ধান পাইলে যদি তাহাদের আক্রমণ করে এই আশঙ্কায় তাহারা অরণ্যের মধ্যস্থিত স্থানে কিম্বা কোন উচ্চ পর্ব্বতের উপর একস্থানে বহু সংখ্যক গৃহ নির্ম্মাণ পূর্ব্বক বাস করিত, এবং ব্যাঘ্র ভল্লুকের গ্রাস হইতে গোমেষ শিশু সন্তানদিগকে রক্ষা করিবার জন্য সেই সকল গৃহের চতুর্দ্দিক বেড়িয়া বহুসংখ্যক বৃক্ষের গুঁড়ি ও কাষ্ঠসমূহ উপর্য্যোপরি একত্রে সংস্থাপন সহকারে তাহারা বেড়া সংরচিত করিত। এই বেড়াগুলি খুব উচ্চ হইত। ব্যাঘ্র ভল্লুকগণ সহজে ইহা উলঙ্ঘন করিতে পারিত না। এইরূপ বেড়া বেষ্টিত বহু সংখ্যক গৃহই তাহাদের এক একটি নগর হইত। যখন তাহাদের বাসস্থানের এই অবস্থা তখন তাহাদের গৃহস্থালির অবস্থা যে তদনুরূপ ছিল, তাহা সহজে অনুমেয়। বৃটনেরা ধাতু নির্ম্মিত কোন তৈজস পাত্র নির্ম্মাণ করিতে জানিত না। আহারের জন্য কাষ্ঠ নির্ম্মিত এক প্রকার নিকৃষ্ঠ আকারের পাত্র ব্যবহার করিত। এই পাত্রগুলিতে তেমন কারুকার্য্য কিছুই লক্ষিত হয় না। শয়ন ও উপবেশনের জন্য তাহাদের এক প্রকারের কাষ্ঠাসন ছিল। রাত্রে এই কাষ্ঠাসনের উপর পশুচর্ম্ম ও শুষ্ক বৃক্ষপত্র বিছাইয়া শয়ন করিত। বৃটন দ্বীপের অন্যান্য প্রদেশের অধিবাসিগণাপেক্ষা দক্ষিণ প্রদেশের অধিবাসীগণ অধিক সুসভ্য ছিল। তাহাদের মধ্যে অনেকেই প্রতিবেশি গলজাতির সহিত ব্যবসা বাণিজ্য করিয়া অনেক ধন উপার্জ্জন করিত। ইহারা অন্যান্য প্রদেশের বৃটনগণের ন্যায় পশু চর্ম্মের দ্বারা শরীর আচ্ছাদন করিত না। সূত্র নির্ম্মিত বস্ত্র পরিধান করিত। ইহাদের পান আহারের পাত্রগুলি মৃত্তিকা নির্ম্মিত ছিল। এবং পশুচর্ম্মের আচ্ছাদনী ও বৃক্ষ কঞ্চি দ্বারা নির্ম্মিত চুবড়ীর ন্যায় আকারের “কোরালিস” নামক এক প্রকার নৌকা তাহারা নদী সমূহে গমনাগমনের জন্য ব্যবহার করিত এবং যুদ্ধকালে যুদ্ধরথ, কুঠার, কাষ্ঠ নির্ম্মিত ঢাল, প্রভৃতির ব্যবহারও তাহাদের মধ্যে প্রচলিত ছিল। তাহারা অপেক্ষাকৃত সুসভ্য গলজাতির

সংস্পর্শে আসিয়া অন্যান্য প্রদেশের বৃটন, গণপেক্ষা এইরূপ সভ্যতা লাভ করিয়াছিল। প্রায় সমস্ত বৃটনের অধিবাসীবর্গই শিকারোপার্জ্জিত পশু মাংসের দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিত। কেহ কেহ মাত্র দুগ্ধ হইতে পনির প্রস্তুত করিতে জানিত। বৃটনগণের এইরূপ নিকৃষ্ট আহার বিহার ও গৃহস্থালির অনুরূপ ধর্ম্মও অসভ্য কালোচিত ছিল। অসভ্য অবস্থায় মানুষ প্রকৃতির মধ্যে যাহা কিছু মহৎ ও বৃহৎ দেখে তাহাতেই দেবত্ব আরোপ করিয়া থাকে। বৃটনেরা তাহাদের অরণ্যের মধ্যে ওক বৃক্ষকে মহান ও বৃহত্তম দেখিয়া তাহাকেই দেবতা জ্ঞানে পূজা করিত। তাহাদের পুরোহিতগণ ড্রুইড নামে অভিহিত হইত। এই ড্রুইডগণ একাধারে পুরোহিত, কবি, চিকিৎসক সকলই ছিল। অতিপ্রাচীন ও জ্ঞানবান ব্যক্তিগণই ড্রুইড পদলাভ করিতে পাইত। ড্রুইডগণ সচরাচর শ্বেত পরিচ্ছদ পরিধান ও শ্বেত শ্মশ্রু রক্ষা করিত। সাধারণ ব্যক্তিরা ড্রুইডগণ সর্ব্বক্ষমতায় ক্ষমতাশালী এই বিশ্বাসে তাহাদিগকে অত্যন্ত ভক্তি ও ভয় করিত। অরণ্যোৎপন্ন কোন কোন উদ্ভিদের দ্বারা পীড়া সকল আরোগ্য হইয়া থাকে। ড্রুইডগণ তাহা অবগত ছিল। পীড়িত হইলে লোকে চিকিৎসার জন্য তাহাদের নিকট গমন করিত। কিন্তু কোন্ উদ্ভিদ তাহারা ঔষধ স্বরূপ ব্যবহার করিত, সাধারণের নিকট তাহা প্রকাশ করিত না। তাহারা চিকিৎসার মূল্য স্বরূপে চিকিৎসিত ব্যক্তির নিকট হইতে তাম্র, রৌপ্য, টিন, পশুর চর্ম্ম ইত্যাদি তাহার সম্পত্তির অর্দ্ধাংশের অংশ গ্রহণ করিত। ড্রুইডগণ যে সকল উদ্ভিদ ঔষধ স্বরূপে ব্যবহার করিত তন্মধ্যে মিসলেটো নামক এক প্রকার ক্ষুদ্র আগাছা সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান ছিল। এই আগাছা উচ্চ বৃক্ষ সমূহের উপর উৎপন্ন হইত। বৎসরের মধ্যে যে সময়ে মিসলেটোর ফল পরিপক্ক হইত, সেই সময় ড্রুইড ও সাধারণ বৃটনগণ যে বৃক্ষের উপর ইহা উৎপন্ন হইত, তাহার নিম্নে গমন করিয়া মহা আমোদ উৎসব করিত। একজন বৃদ্ধ ড্রুইড শ্বেত পরিচ্ছদ পরিধান পূর্ব্বক, সুবর্ণের কাস্তে হস্তে যখন বৃক্ষোপরি আরোহণ করিয়া মিসলেটো কর্ত্তন করিতেন তখন নিম্নস্থ সমবেত ব্যক্তিবর্গ উচ্চৈঃস্বরে সঙ্গীত গাহিত ও দেবতার নিকট প্রার্থনায় প্রবৃত্ত হইত। মিসলেটোতে অনেক কঠিন রোগ আরোগ্য হইতে দেখিয়া বৃটনগণ মিসলেটোকে অলৌকিক ক্ষমতাশালী কোন উপদেবতা মনে করিত। প্রধানত যে ওক বৃক্ষের উপর মিসলেটো উৎপন্ন হইত, তাহাকেই তাহারা সচরাচর অধিক ক্ষমতাশালি দেবতাজ্ঞানে পূজা করিত। বৃটনগণ শুধুমাত্র মিসলেটো ও ওক বৃক্ষের প্রতি দেবত্ব আরোপ করিয়া ক্ষান্ত থাকিত না। পর্ব্বত অরণ্য নদী ইত্যাদি প্রাকৃতিক পদার্থ সমূহকে দেবতাজ্ঞানে অর্চ্চনা করিত। তাহাদের পুরোহিত ড্রুইডগণ ওক-বৃক্ষদেবতার প্রসন্নতা লাভ করিবার জন্য সর্ব্বদাই তাহাদের নিকট নরবলি প্রদান করিত। এই ড্রুইডগণই বৃটনের রাজগণের রাজমন্ত্রীর ন্যায় পরামর্শানুসারে রাজ্য চালাইতেন। তাহারাই সাময়িক ঘটনা সম্বন্ধে কবিতা ও সঙ্গীত রচনা করিত। এবং বংশানুক্রমে বৃটনেরা সেই সকল কবিতা সঙ্গীত তাহাদের নিকট হইতে শিক্ষা করিত। এইরূপ সঙ্গীত ও কবিতা রচয়িতা ড্রুইডগণ

বার্ড অর্থাৎ ভাট কবি নামে অভিহিত হইত বৃটনগণের এইরূপ অবস্থাকালে রোমানেরা বৃটন জয় করিবার অভিলাসে তথায় আগমন করে। রোমানগণের অগ্রে খৃষ্ট জন্মিবার ছয়শত বৎসর পূর্ব্বে ফিনিসির জাতীয় বণিকগণ টিন ধাতুর ব্যবসা করিবার জন্য কর্ণওয়াল প্রদেশের সন্নিহিত সিলিদ্বীপে আগমন করিয়াছিল। এবং তাহাদের একশত বৎসর পরে গ্রীকগণ সম্ভবত ব্যবসা বাণিজ্যের উদ্দেশে বৃটনে আগমন করে। এই সময় তাহারা ইংল্যাণ্ডকে অ্যালবিয়ন, আয়ারল্যাণ্ডকে আইরিণ এবং ইংল্যাণ্ড আয়ারল্যাণ্ড ও স্কটল্যাণ্ড—একত্রিভূত এই তিনটি দ্বীপকে—বিট্রেনিয়া নাম প্রদান করিয়াছিল রোমের সুবিখ্যাত বিজয়ি বীর জুলিয়াস সিজার যখন রোমের শাসনকর্ত্তা ছিলেন, তখন গলগণকে যুদ্ধকালে বৃটনগণের নিকট হইতে সর্ব্বদা সাহায্য প্রাপ্ত হইতে দেখিয়া, বৃটন আক্রমণ করিবার মনস্থ করেন এই সঙ্কল্পানুসারে খৃষ্ট জন্মের পঞ্চান্ন বৎসর পূর্ব্বে তিনি একদল সৈন্য সহিত বৃটনে আগমন করিয়া দেশীয়গণের সহিত ভীষণ যুদ্ধের পর ওয়ালমোরের অন্তর্গত ডিল নামক স্থানে অবতরণ করেন। তিনি বৃটন অধিকার উদ্দেশে দুইবার ইহাতে যুদ্ধাভিলাষ করিয়াছিলেন; তাঁহার দ্বিতীয় যুদ্ধযাত্রায় বৃটনগণের একটি নগর তাঁহার দ্বারা অধিকৃত হয়। বৃটনের দক্ষিণ প্রদেশ মাত্র তিনি দর্শন করিয়াছিলেন। ইহার অভ্যন্তরভাগ তাঁহার অজ্ঞাত ছিল। ক্ষণস্থায়ী বিজয় ব্যতীত, তাঁহার দ্বারা বৃটন রোমানগণের রীতিমত অধিকৃত হয় নাই। সম্রাট ক্লডিয়াসের রাজত্বকালে রোমানগণ রীতিমত বৃটন বিজয় করিতে আরম্ভ করে। রোমানেরা দেশীয়গণের সহিত বহু ভীষণ যুদ্ধের পর, বৃটনে নিজের আধিপত্য সংস্থাপন করিতে সক্ষম হইয়াছিল। প্রথম দেশ অধিকার কালে রোমান রাজকর্ম্মচারিগণ দেশীয়গণের প্রতি অত্যন্ত অত্যাচার করিত। তাহাদের অত্যাচারে ঘোর নিপীড়িত হইয়া দেশীয়গণ সর্ব্বদা বিদ্রোহ উত্থাপন করিত।

বোডেসিয়া নাম্নী বৃটনের এক রাণী এক সময়ে তাহাদের দ্বারা ঘোরতররূপে অত্যাচারিত হইয়া ভীষণ বিদ্রোহ উত্থাপন করেন সুবিখ্যাত ইংরাজ কবি কাউপার বোডেসিয়া শিরস্ক এক খণ্ড কবিতা লিখিয়াছেন, তাহা পাঠ করিলে রোমানগনের অত্যাচারে বৃটনেরা তাহাদের প্রতি কতদূর বিদ্বেষ পরায়ণ হইয়া উঠিয়াছিল, তাহার আভাষ পাওয়া যায়। অন্তঃপুরের পাঠিকাগণের অবগতির জন্য আমরা নিম্নে তাহার কয়েক পংক্তির অনুবাদ প্রকাশ করিতেছি।

যবে রাজ্ঞী বোডেসিয়া রোমানের করে
হয়ে নিপীড়িত তীব্র ঘোর অত্যাচারে,
আসিলেক প্রজ্বলিত মহাক্রোধ বশে
যাচিবারে সুমন্ত্রনা দেবতা সকাশে।
বসি ওক বৃক্ষ তলে ড্রুইড প্রধান,
অতিবৃদ্ধ শুভ্র কেশ মহাজ্ঞানবান,
প্রতি দৈববাণী বাক্য সম্বোধি রাণীরে,
কহিলা যা ছিল পূর্ণ ক্রোধ শোকভারে।
হতাশ্বাস হয়ে আর ঘৃণিত সবার,
গভীর যেমন তার পাপ অত্যাচারে।
তেমনি পতনে রোম হইবে লুণ্ঠিত,
একথা তৎকৃত শোনিত পাতে হয়েছে লিখিত।
বিপুল সাম্রাজ্য গর্ব্বে হইয়ে গর্ব্বিত,
বহু রাজ্য দেশ করে চরণে দলিত।

শীঘ্র তার গর্ব্ব জেনো হবে ধূলি নত,
ওই শুন গলগণ দুয়ারে আগত।

গলগণ রোমানগণের দ্বারা ভীষণরূপে অত্যাচারিত হইয়া রোমের দ্বারদেশে আগমন পূর্ব্বক তাহাদের অত্যাচারের প্রতিশোধ স্বরূপ একমহা যুদ্ধে সম্পূর্ণ রূপে তাহাদিগকে পরাজিত করিয়াছিল।

রোমানেরা ক্রমেক্রমে বৃটনে আপনাদের অধিকার বিস্তার করিলে, বীজিত বৃটনেরা বিজয়ীদিগের আচার ব্যবহার সভ্যতা ও রীতিনীতি সকলি গ্রহণ করিতে লাগিল। প্রধান ব্যক্তির সন্তানেরা লাটিন ভাষা শিক্ষা ও রোমানগণের পোষাক পরিচ্ছদেরও অনুকরণ করিতে লাগিল। এই রূপে তিন শত বৎসরের আধিপত্যের পর রোমান সাম্রাজ্যের অধঃপতন আরম্ভ হইলে, পররাজ্য সংরক্ষণে শক্তিক্ষয়ে অসমর্থ হইয়া, রোমানেরা বৃটন পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়।

তিনশত বৎসরের অধীনতার পর বৃটনেরা রাজ্য শাসন বিষয়ে সম্পূর্ণ ব্যস্ত হইয়া পরিয়াছিল। রোমানেরা প্রস্থান করিলে এজন্য রাজ্যে ঘোর অরাজকতা উপস্থিত হয়। বৃটনের এই রূপ অরাজক অবস্থা কালে ক্রমাগত পিক্টস্, স্কট, সাক্সন, জাতীয় জলদস্যুগণ বৃটন আক্রমণ করিতে থাকে। পঞ্চম ও ষষ্ট শতাব্দিতে আর্য্যবংশীয় টিউটনিক শাখা সম্ভূত এঙ্গল জাটস্ ও স্যাক্সন এই তিন জাতি বৃটনের অধিকাংশ দখল করিলে পর এই তিন জাতির সংমিশ্রনে অ্যাংলো স্যাক্সন নামক এক জাতির উদ্ভব হয়। ইহারাই বর্ত্তমান ইংরাজ জাতির পূর্ব্বপুরুষ। তাহারা বৃটনের যে অংশে আধিপত্য সংস্থাপন করে তাহা তাহাদের জাতীয় নামানুসারে ইংলণ্ড নামে অভিহিত হইতে আরম্ভ হয়। কালক্রমে সমগ্র বৃটন দ্বীপই এই ইংল্যাণ্ড আখ্যাপ্রাপ্ত হয়।

প্রাচীন কেলটিক জাতি অর্থাৎ প্রাচীন বৃটন জাতি এই নব অ্যাংলো স্যাক্সন জাতীর নিকট পরাজিত হইয়া, ইংল্যাণ্ডের পশ্চিম বিভাগে অর্থাৎ বর্ত্তমান ওয়েলস্ প্রদেশে আশ্রয় গ্রহণ করে। তাহাদের বংশধরগণই এখন ওয়েলস্ জাতি নামে পরিচিত হইয়া থাকে। ইহার পর অ্যাংলো স্যাক্সন জাতীর সহিত আরো বহু অন্য জাতীরও সংমিশ্রন ঘটিয়াছিল। বাহুল্য ভয়ে তাহার উল্লেখ করিতে এখানে বিরত হইলাম। এক সময়ে যে বৃটন জগতের নিকট নগণ্য ও অজ্ঞাত ছিল, এখন সেই বৃটনই অতুল স্বদেশ হিতৈষনা অদম্য জ্ঞান পিপাসা ও উন্নত স্বাধীন ভাবের দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া জগতে অমর কীর্ত্তি সংস্থাপন করিতেছে, এবং দিনদিন দ্রুততর বেগে আরো বহুতর ও উন্নততর উন্নতির পথে ধাবিত হইতেছে। তাহাদের অগ্রসর পথে পর্ব্বতও চুর্ণিকৃত হইয়া যাইতেছে। কে তাহার গতি রোধ করিবে?

শ্রীলজ্জাবতী বসু।

লজ্জাশীলতা

নারীর প্রকৃত ভূষণ লজ্জা। এই লজ্জা রক্ষা করিতে ভারতনারী যেরূপ যত্নশীলা, তদ্রূপ অন্যত্র দৃষ্ট হয় না। চিরঅবগুণ্ঠনে মুখচন্দ্র লুক্কায়িত রাখিয়া, লজ্জাবতী লতার ন্যায় অন্তঃপুরের নিভৃত কোণে বসিয়া, গৃহ-ধর্ম্ম পালন ভারতনারীর ন্যায় অপর কোন দেশীয়া মহিলা করিতে পারেন কি না জানি না। যে গৃহে লজ্জাহীনা নারী বাস করেন, সে গৃহের অশেষ অকল্যাণ হইয়া থাকে। কিন্তু সকল স্থলেই যে অন্তঃপুরবাসিনীগণ কর্ত্তৃক লজ্জা প্রকৃতরূপে রক্ষিত হইয়া থাকে তাহা নহে। নারীগণ লজ্জা রক্ষা করিবার জন্য স্বয়ং উপযুক্তা না হইলে, পদে পদে বিপদে পতিতা হন। সত্যই হিন্দুশাস্ত্রকারগণ বলিয়াছেন,—

"অরক্ষিতা গৃহেরুদ্ধা পুরুষৈরাপ্তকারিভিঃ।
আত্মানমাত্মনা যাস্তুরক্ষেয়ুস্তাঃ সারক্ষিতাঃ॥"

বিশ্বস্ত ও আজ্ঞাবহ ব্যক্তিগণ কর্ত্তৃক গৃহমধ্যে রুদ্ধা থাকিলেও স্ত্রীরা অরক্ষিতা, যাঁহারা আপনাকে আপনি রক্ষা করিতে পারেন, তাঁহারাই সুরক্ষিতা।

বুদ্ধদেবের সহধর্ম্মিনী সাধ্বী গোপা—অতিশয় বুদ্ধিমতী, সুশীলা, ধর্ম্মপরায়না বিদ্যা-বতী, সংযতেন্দ্রিয়া ও পবিত্র স্বভাবা ছিলেন। নারীধর্ম্ম কি উপায়ে রক্ষা করিতে হয়, তাহা তিনি বিশেষরূপে জানিতেন, এবং সেইজন্যই বাহ্যিক বস্ত্রাবগুণ্ঠনের দ্বারা স্বীয় আনন আচ্ছাদন করা নিষ্প্রয়োজন জ্ঞানে স্বয়ং অবগুণ্ঠনবতী ছিলেন না।

অবগুণ্ঠনহীনা রাজবধূকে দর্শন করিয়া রাজ অন্তঃপুরবাসিনীগণ তাঁহাকে লজ্জাহীনা বলিয়া নিন্দা করিতে লাগিলেন। তদুত্তরে পবিত্র স্বভাবা গোপা অন্তঃপুরবাসিনীদিগকে বলিলেন,—"ধার্ম্মিক ব্যক্তি যে অবস্থায় থাকেন তাহাতেই শোভা পান, গুণবান ব্যক্তি কুশের বস্ত্রই পরিধান করুন, আর শতছিদ্র জীর্ণ বাসেই আচ্ছাদিত হউন, অথবা কৃষ্ণকায়ই হউন, তিনি আপনার তেজে আপনি শোভা পান। ধর্ম্মই মানবের আবরণ, ধর্ম্মই নারীর সৌন্দর্য্য। নানা অলঙ্কার ভূষিত বালকও যদি পাপানুসারী হয়, তবে আর তাঁহার লাবণ্য থাকে না। হৃদয় যাহার পাপের আগার, বাহ্যিক আবরণ তাহার কি করিবে? সে অমৃতমুখ বিষকুম্ভ। শারীরিক দোষ যাহার সংযত, বাক্য যাহার নিয়মিত, ইন্দ্রিয় সকল যাহার বশীভূত, চিত্ত-বৃত্তি যাহার নিরুদ্ধ ও মন যাহার প্রসন্ন, তাহার অবগুণ্ঠনে বদন ঢাকিবার প্রয়োজন কি? যাহাদিগের লজ্জা নাই, সম্ভ্রম নাই, যাহাদিগের চিত্ত বশীভূত হয় নাই, ইন্দ্রিয় সকল দুর্দ্দমনীয় শত অবগুণ্ঠনে আবৃত হইলেই বা তাহাদের রক্ষা কোথায়? আত্ম-বশ যাহার চিত্ত, পতিতে যাহার প্রাণ, তাহারা চন্দ্রসূর্য্যের ন্যায় সর্ব্বজন সমীপে প্রকাশিত হইলেই বা হানি কি? যে আপনাকে আপনি রক্ষা করে, সেই সুরক্ষিতা, নতুবা অবগুণ্ঠনবতী হইয়া গৃহমধ্যে রুদ্ধা থাকিলেও স্ত্রীগণ অরক্ষিতা। চরিত্র আমার আবরণ, গুণ সমূহ আমার অজেয় দুর্গ, ধর্ম্ম আমার রক্ষক, বসনাবগুণ্ঠনে আমার প্রয়োজন কি?" বস্তুতঃ লজ্জারক্ষার নিমিত্ত অবগুণ্ঠন বা অবরোধ অপেক্ষা নারী-

গণের ধর্ম্মবল, চরিত্রবল অধিকতর প্রয়োজনীয় ও কার্য্যকারী। এবং এবম্বিধ ধর্ম্ম ও চরিত্রলাভের জন্য বাল্যকাল হইতেই স্ত্রীজাতিকে ধর্ম্ম ও জ্ঞান শিক্ষা দানের সুব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য।

মাদ্রাজ ও বোম্বাই প্রদেশীয়া ভদ্রমহিলাগণকে অবগুণ্ঠনে আবৃতা হইতে দেখা যায় না। শ্বশুর, ভাশুর প্রভৃতি আত্মীয় ও অনাত্মীয় পুরুষদিগের সম্মুখে তৎপ্রদেশবাসিনী মহিলাগণ প্রয়োজন হইলে, স্বাধীনভাবে বিচরণ করেন। অনেক স্থলে তাঁহারা একাকী রেলপথে ও গোযানে যাতায়াত করিয়া থাকেন। ভারতনারীগণ জ্ঞানধর্ম্মে যতই উন্নতি লাভ করিবেন, অবগুণ্ঠনরূপ বাহ্যিক আবরণের প্রয়োজনীয়তা ততই তিরোহিত হইবে। পুরাকালে আর্য্যমহিলাগণ স্বাধীনভাবে নগরে, প্রান্তরে, সখীগণসহ অথবা পতিসহ বিচরণ করিতে কুণ্ঠিতা হইতেন না। সীতাদেবী শ্বশুর শাশুড়ীর ও প্রজামণ্ডলীর সম্মুখেই রাজপথ দিয়া স্বামী ও দেবরসহ বনগমন করিয়াছিলেন। গার্গী সাবিত্রী, মৈত্রেয়ী, দময়ন্তী, শৈব্যা, শকুন্তলা, দ্রৌপদী, সুভদ্রা প্রভৃতি আর্য্যনারীগণ সম্বন্ধেও রামায়ণ ও মহাভারতে এতদনুরূপ বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায়। মানুষ সামাজিক জীব। সমাজ স্ত্রী ও পুরুষকে লইয়া গঠিত। পুরুষের কার্য্যক্ষেত্র বিস্তৃত, কিন্তু বিচার করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারা যাইবে যে, রমণীর কার্য্যক্ষেত্র অধিকতর বিস্তৃত। রমণী গৃহকর্ত্রীরূপে আপনার কার্য্যক্ষেত্রে সর্ব্বে সর্ব্বা। সন্তান পালন হইতে আরম্ভ করিয়া রন্ধন পরিবেশনাদিও পরিবারস্থ ব্যক্তি মাত্রেরই সুখ সচ্ছন্দতার সুবন্দোবস্ত করা রমণীরই কর্ত্তব্য। সুগৃহিণী কার্য্যের সুশৃঙ্খলা ও সুসম্পাদনের নিমিত্ত ভৃত্যের কার্য্যও আপনি আহ্লাদের সহিত করিয়া থাকেন। অতিথি সেবাও রমণীরই কর্ত্তব্য। পরিতাপের বিষয় যে লজ্জাশীলতা সম্বন্ধে ভ্রান্ত সংস্কারবশতঃ অথবা এতদ্‌সম্বন্ধে প্রকৃত জ্ঞান অভাবে, অন্তঃপুরবাসিনীগণ অতিথি সেবারূপ মহৎকর্ত্তব্য পালন করিতে সকল সময়ে সমর্থা হন না। এবং "পরপুরুষ" বলিয়া অনেক পুরুষ অতিথি রুগ্ন শয্যায় পড়িয়াও মাতৃরূপিনী গৃহকর্ত্রীর সস্নেহ শুশ্রূষা হইতে বঞ্চিত হয়েন। পাশ্চাত্য দেশীয়া কত মহিলা, স্ত্রী পুরুষ জাতিবর্ণ নির্ব্বিশেষে পরসেবারূপ মহৎব্রতে জীবনদান করিয়াছেন। কিন্তু গভীর দুঃখের বিষয় যে, যে ভারতবর্ষ দয়া দাক্ষিণ্য ও অতিথি সেবার জন্য এক সময়ে বিখ্যাত ছিল, এখন সেই দেশীয়া রমণীগণ অস্বাভাবিক লজ্জাবশতঃ অবশ্য কর্ত্তব্য কার্য্য হইতে বিরতা হইয়া জীবনের উন্নতির পথ বন্ধ করিতেছেন। কবে সেদিন আসিবে যখন ভারত মহিলাগণ রমণীভূষণ লজ্জাশীলতা রক্ষা করিয়াও জীবনের কর্ত্তব্য সকল পালন করিতে পারিবেন। আশা করিতে পারি যে বিধাতার কৃপায় আমাদের প্রকৃতরূপে জ্ঞান চর্চ্চা ও ধর্ম্মসাধন দ্বারা অলীক সংস্কার বিদূরিত হইবে, এবং সমাজমধ্যে ভারতরমণী আপনার স্থান পুনঃ প্রাপ্ত হইয়া যশস্বিনী হইবেন।

জনৈক হিন্দু মহিলা।

মহিলার স্বাস্থ্য।

আজকাল আমাদের দেশের রমণীদের অকালে স্বাস্থ্যভঙ্গের কারণ সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা প্রয়োজন।

আজকালের মেয়েদের শরীরে একটা না একটা রোগ নিত্যই লাগিয়া আছে, নিত্যই তাঁহাদের মাথার ঠিক নাই, মনের ঠিক নাই, সর্ব্বদাই মেজাজ গরম, সকলের প্রতিই খিট্‌ খিট্‌ ব্যবহার, বোধ হয় প্রতি গৃহে গৃহে দুই একটী বা ততোধিক এই দৃষ্টান্তের অভাব নাই।

যাহাদের প্রকৃতি দত্ত স্বভাব ঐরূপ তাঁহাদের কথা ছাড়িয়া দিয়া যদি অন্য সকলের সম্বন্ধে ধরা যায়, তাহা হইলে দেখা যাইবে অনেকেরই শরীর অসুস্থ বলিয়া ঐরূপ প্রকৃতি। কারণ ইহাত সকলেই জানেন যে, শারীরিক ও মানসিক সম্বন্ধ কত ঘনিষ্ঠ। শরীরে যখন রোগ লাগিয়াই আছে, তখন মনের রোগও যে অনিবার্য্য।

যাহা হউক এই শারীরিক ও মানসিক রোগের কারণ কি তাহাই একটু আলোচনা করিব। যদিও মৎসদৃশ একজন সামান্য নারী এরূপ গুরুতর বিষয়ে কতদূর কৃত কার্য্য হইবে, তাহা বলিতে পারি না, তথাপি সাহসে ভর করিয়া ইহা বলিতে পারি যে, মোটামোটী ধরিতে গেলে, ইহার তিনটী কারণ প্রধান বলিয়া আমার মনে হয়। প্রথম কারণ অল্প বয়স হইতে বহু সন্তানের মাতা হওয়া, দ্বিতীয়, যুবকদের নৈতিক অবনতি, তৃতীয় গৃহকর্ম্মে অলস হওয়া। এক্ষণে এক একটী করিয়া সকল বিষয়েরই যথাযথ আলোচনা করিতেছি। আমাদের বঙ্গদেশে বাল্যবিবাহ বহুদিন হইতে প্রচলিত কিন্তু সেকালে পরিবারে যেরূপ রীতিনীতি ছিল, তাহাতে তখনকার লোকের স্বাস্থ্যভঙ্গ হওয়ার কোন সম্ভাবনা ছিল না। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে পারিবারিক যেরূপ বিশৃঙ্খলা হইতেছে, তাহাতে দেশকাল পাত্র বিবেচনা করিয়া কতক গুলি সামাজিক রীতিনীতি পরিবর্ত্তন করা একান্ত কর্ত্তব্য। তখন মেয়েদের যে বয়সে বিবাহ হইত, তাহার পর একবৎসর শ্বশুরালয়ে যাওয়া বা দ্বিরাগমনের ব্যবস্থা ছিলনা, এক বৎসর কেহবা দুই তিন বৎসর কন্যাকে নিজগৃহে রাখিয়া দিতেন। এক্ষণে অনেকেই সেই সামাজিক রীতিনীতি বা সেকালের প্রথার গণ্ডী ডিঙ্গাইয়া কন্যাকে বিবাহের পরই পতিগৃহে প্রেরণ করেন। ইহার যে কি বিষময় ফল তাহা বোধ হয় কাহাকেও বুঝাইয়া বলিতে হইবেনা। অবশ্য যাঁহারা বয়স্থা হইলে কন্যার বিবাহ দিয়া থাকেন, তাঁহাদের সম্বন্ধে আমার কিছুই বলিবার নাই, কিন্তু হিন্দুগৃহে যেখানে প্রতিনিয়ত বাল্যবিবাহের স্রোত বর্ত্তমান, সেইখানের সম্বন্ধে আমার এই বক্তব্য যে, দশম একাদশ বা দ্বাদশ বৎসরের বালিকাকে ইচ্ছামত পতিগৃহে পাঠান তাহার কোমল স্বাস্থ্যের পক্ষে দোষাবহ, বিশেষতঃ আজ কালকার ছেলেদের বিরুদ্ধে পিতা মাতা বা তাঁহাদের অভিভাবকগণ সাহস করিয়া কিছু বলিতে পারেন না। তবে যেখানে স্পষ্টবক্তা গুরুজন ছেলের মতের বিরুদ্ধে কিছু বলিতে যান, সেখানে গৃহবিবাদ উপস্থিত হয়, ফলে এই দাঁড়ায় যে নববিবাহিত যুবক দুপয়সা উপার্জ্জন করিতে শিখিলেই মাতা পিতার

সহিত পৃথক হইয়া যায়। মাতা পিতা যে তাহাদের মঙ্গলের জন্য বলিতেছেন, ইহ বলিবার বা বুঝাইবার দোষে তরুণমতি নব আনন্দে আনন্দিত দম্পতি বুঝিতে পারে না, না পারিয়া মনে করে যে, পিতামাতা তাহার এত সুখের এত আকাঙ্খার বিবাহিত জীবনের সকল সাধের অন্তরায় হইতেছেন, মনে করিয়া তাঁহাদের প্রতি জাতক্রোধ হয়। কিন্তু বিবাহ জিনিষটা আজ কাল যে "দিল্লীকালাড্ডু" বিশেষ হইয়া পড়িতেছে, তাহা দুদিন সবুর করিলে বোধ হয় এতটা পশ্চাৎ তাপ করিতে হইত না। ইহা পরবর্ত্তি জীবনে কাহাকেও বুঝিতে বাকী থাকে না। যখন একপয়সা উপার্জ্জনাক্ষম পিতামাতার নিকট বড় সাধের সন্তান আবদার করিয়া এটা দাও ওটা দাও বলিয়া আবদার করিতে থাকে, আর নিত্যরোগা স্ত্রীর চিকিৎসার জন্য ডাক্তারের খরচ ও গৃহকর্ম্ম নিপুনা প্রসন্না মধুর হাসিনী স্ত্রীর পরিবর্ত্তে, অনবরত কলহ পরায়ণা রোগ প্রবণা নাকে-কাঁদা স্ত্রী লইয়া জীবন কাটান কিরূপ কষ্টকর ব্যাপার তাহা বুঝিতে পারে। তখন হৃদয়ের নিভৃত কন্দর হইতে আপনা আপনিই ধ্বনিত হয়, "যোখায়া ওবি পস্তায়া যো না খায়া ওবি পস্তায়া।" তখনকার দিনে ক বয়স পর্য্যন্ত স্বামীগৃহে গমন একেবারে নিষিদ্ধ ছিল। এখন পর্য্যন্ত উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের অনেক স্থানে যৌবন প্রাপ্ত না হওয়া পর্য্যন্ত অনেকেই কন্যাকে শ্বশুরালয়ে পাঠায় না। এবিষয়ে সেকালের নিপুণা গৃহিনীরা কত সাবধান ছিলেন। অল্পবয়সে সন্তান হওয়ার ফলে এই হইয়াছে যুবক যুবতী দুদিন বিবাহিত জীবনের আমোদ প্রমোদ ভোগ করিতে না করিতে তাহাদের সন্তানের পিতামাতা হইয়া পড়িতে হয়। বালিকা তখন স্বামীর মনোরঞ্জন করিবে কি, শিশুপালন করিবে তাহার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে ঠিক করিয়া উঠিতে পারেনা। অবশ্য স্বামীর মনোরঞ্জন দুই এক ঘণ্টা না করিলেও চলিতে পারে, কিন্তু সদ্যোপ্রসূত সুকুমার শিশু তাহার ত আর মাতৃস্নেহ না হইলে চলে না,, অবশ্য যাঁহারা বড় লোক তাঁহারা যেন ধাত্রী রাখিয়া দিলেন, কিন্তু ঈশ্বরের কৃপায় দেশের সকলেই ত আর ধনবানের গৃহে জন্ম গ্রহণ করে নাই। শতকরা ৯০ জন লোক মধ্যবিত্ত ও গৃহস্থ ব্যক্তি। অল্প বয়সে প্রসবের পর অর্থাভাবে অনেকের গৃহে, তেমন রীতিমত পুষ্টিকর খাদ্যই প্রসূতি পায় না, উপযুক্তরূপে সেবা শুশ্রূষা হয় না। একে বালিকাবয়সে প্রসব, তাহার উপর সেবা শুশ্রূষা ও পুষ্টিকর আহারীয়ের অভাব, এই সব কারণে দিন দিন বালিকার দেহ ক্ষীণ হইতে থাকে। আশ্চর্য্যের বিষয় সাধারণতঃ বাড়ীর লোকে এসব বিষয় বড় একটা গ্রাহ্য করেন না। পুত্রবধূ পুত্র প্রসব করিল কি না ইহাই লোকে বেশীর ভাগ দেখিয়া থাকে, কিন্তু তাহার স্বাস্থ্য সম্বন্ধে দৃষ্টিপাত করিবার ততোধিক আবশ্যকতা কেহই দেখেন না। অনেক স্থানে প্রসবক্ষেত্রেই প্রসূতি বা প্রসূত সন্তান ভবলীলা সাঙ্গ করে। তাহারপর যাহারা বাঁচিয়া থাকে বৎসরে একবার প্রসব করিলে কয়দিন তাহার শরীর ভাল থাকিবে? আজকাল হিন্দুগৃহে ১৬।১৭ বৎসর বয়সের কন্যাকে তিন চারিটী সন্তানের মাতা হইতে দেখা যায়। সন্তানগণ মাতার নিকট স্নেহ যত্ন পাওয়া দূরে থাক, রোগপ্রাণে অথবা রুগ্না মাতার নিকট আবদার অভিমান

জানাইলে, নবনীত সুকোমল দেহে কতনা প্রহার ও তিরস্কার খাইয়া থাকে। তাহারা আর কি জানে যে মাতার শরীর বা মন ভাল নাই বা এসময় কি ওসময় আবদার করিতে নাই। মাতার মুখে সর্ব্বদাই লাগিয়া আছে, "পোড়াকপালে আমি আপনার জ্বালায় আপনিই জ্বলে মলুম, এখন আবার ওর আবদার, মারব চুপ কর" ইত্যাদি ইত্যাদি। এই সংশিক্ষায় সুকুমার শিশু কি শিক্ষা করিবে? তাহার উপর যুবকগণ একেত সমস্তদিন আফিশের কাজ লইয়া ও উপরওয়ালা সাহেবের বকুনি খাইয়া প্রাণান্ত সমস্তদিন খাটিয়া ক্লান্তদেহে, যথন বাড়ী ফেরে তখন কি "কেলো, ভোলা, মাণি, পটলি" প্রভৃতির বিকট চিৎকার ও গৃহিণীর কঙ্কন ঝঙ্কন সঙ্গে সঙ্গে "বাপরে গেলুরে মলুরে এমন কপালও করেছিলুম রে" ইত্যাদি অনুনাসিকস্বরে প্রিয় সম্ভাষণ ভাল লাগে? মানুষ হৃদয় স্বভাবত সৌন্দর্য্য ও শান্তিপ্রিয়। পেটের দায়ে সমস্তদিন আফিশে কাজ করিয়া সন্ধ্যার সময় সুবেশা সুহাসিনী স্ত্রী জল-যোগের আয়োজন করিয়া পানের ডিবাটী হাতে করিয়া সন্তানদের সুশিক্ষায় শিক্ষিত করিয়া স্বামীর প্রতিক্ষায় বসিয়া থাকিতে দেখিতে সকলেই ভালবাসে।

অল্প বয়সে ছেলে হওয়ার দরুণ গৃহস্থ ঘরে আজকাল বৌ-ঝিদের পরিষ্কার পরি-চ্ছন্নতা একেবারেই লোপ পাইয়াছে, কে না ইচ্ছা করে যে সেই ময়লা চিরকুট বেশভূষার খোলস ছাড়িয়া স্ত্রী একটু সাজিয়া গুজিয়া থাকে। এখনকার হিন্দুগৃহের মেয়েদের "চুল বাঁধিসনি কেন" জিজ্ঞাসা করিলে "কখন বাঁধিব একদণ্ড ছেলে ছাড়ে না" এই করিয়া উদর পুরিয়া আহার যোটে না তাহারা আবার ঝি চাকর কোথা হইতে রাখিবে? আবার এমন হয় যে আহারাদিও যুটিল তবে লোকজন রাখিবার ক্ষমতা নাই। কাজেই সন্ধ্যার সময় যদি গৃহে বিশুদ্ধ আমোদ পাইত, তবে বোধ হয় যুবকদিগকে এত অধঃপাতে যাইতে হইত না।

সন্ধ্যার সময় আফিশ হইতে আসিয়া একটু আমোদ-প্রমোদ গান বাজনা সকলেরই ভাল লাগে। আমারত বোধ হয় এখনকার মেয়েরা পরচর্চ্চাতে পটু না হইয়া যদি একটু সুকুমার বিদ্যা আরম্ভ করেন (অর্থাৎ একটু আধটু গান বাজনা শিক্ষা) তাহা হইলে তাঁহারা অনেকটা পতিদের মনোরঞ্জন করিতে পারেন; কিন্তু কেমন যে আমাদের দেশাচার ভালটুকুরদিকে কোনমতেই দেশের লোকের নজর পড়ে না। গৃহে যদি বৌ-ঝিরা পতির সহিত গান বাজনা ইত্যাদি আমোদ-প্রমোদ করিতে থাকে, তাহা হইলে শশুর শাশুড়ী ও অন্যান্য গুরুজনদের তীব্র বাক্যবাণে তাহাদিগকে একেবারে নাকের জলে চোকের জলে হইতে হইবে। ছেলে বাহিরে গিয়া রাশি রাশি অর্থ উড়াইবে, নৈতিক চরিত্র হারাইবে, তাহা প্রাণে সহ্য হয়, কিন্তু বৌ যদি ছেলেকে বাধ্য বশ করিতে পারে তাহা হইলেই মহা বিপদ। অবশ্য সকলেই এরূপ শশুর শাশুড়ী হন্ না, কিন্তু তাহাও হাজারে পাঁচটীর বেশী নয়। কেন যে এতদ্দেশে যুবকগণ চরিত্র হারাইয়া দিন দিন এত নূতন নূতন ব্যাধির করালকবলে পড়িয়া অকালে প্রাণ হারাইতেছে ও জীবিত অবস্থায় নানাবিধ কুৎসিত পীড়ায় আপনি পত্নী ও ভাবী বংশধরগণের স্বাস্থ্য পর্য্যন্ত

এসব বিষয় কি কেহ একবার ভাবিয়া থাকেন? সকলেই কিছু অসচ্চরিত্র নয়, কিন্তু বড় বড় নগরে কিরূপ হারে ঐরূপ প্রকৃতির লোক আছে বা বৃদ্ধি পাইতেছে তাহা সকলেই জানেন। আমারত বোধ হয় যে এ সকল কারণের মূল শুধু পত্নীর অক্ষমতা। গৃহে যদি লোক বিশুদ্ধ আমোদ পাইত, তবে সুধা ফেলিয়া হলাহল পান করিতে বাহিরে ছুটিত না। যে স্ত্রী স্বামীর সর্ব্ববিষয়ে সহকারিণী ও মনোরঞ্জন না করিতে পারেন তাঁহারই পতি বাহিরে যান। শুধু রূপ বা শুধু গুণ একঘেঁয়ে ভালবাসাতে কিছু যায় আসে না, সময়োচিত কতকগুলি কর্ম্মের অনুষ্ঠানে অনেক সময় অনেক সুফল প্রদান করে। তবেই দেখুন দ্বিতীয় কারণ স্ত্রীলোকের স্বাস্থ্যভঙ্গ হওয়ার এই যে যুবকগণের নৈতিক অবনতি। একত দেহ ব্যাধির মন্দির তাহার উপর স্বামীর পতনে মানসিক অবস্থা কিরূপ দাঁড়ায়, মনের সঙ্গে সঙ্গে স্বাস্থ্যভঙ্গ ও অনিবার্য্য। বুদ্ধিমতী পাঠিকা ভগ্নি বুঝিয়া দেখুন হিন্দুগৃহে প্রতিনিয়ত এরূপ ঘটনা বর্ত্তমান কি না।

তৃতীয় কারণ আলস্য। আমাদের সেকালের গৃহিণীরা প্রভাতে উঠিয়া ঈশ্বরকে স্মরণ করিতেন, পতিপুত্রের শয্যাত্যাগের পূর্ব্বে ছড়া ঝাঁট, প্রভৃতি নিত্যকর্ম্ম সারিতেন, ইহাতে অলক্ষিতে শারীরিক ব্যায়াম সাধিত ও গৃহকর্ম্ম সুচারু সম্পন্ন হইত। আমাদের দেশে ত আর রমণীদের প্রকাণ্ড ব্যায়ামশালা নাই, যে রমণীগণ অবলীলাক্রমে পুরুষগণের সহিত সমকক্ষভাবে ব্যায়াম করিবে। নিত্য সাংসারিক ক্রিয়াই সেকালের প্রধান ব্যায়াম ছিল। ইংরাজমহিলাদের প্রভাতের বায়ু সেবনার্থ পদব্রজে অথবা গাড়ী করিয়া ভ্রমণে বহির্গত হইতেন না অথচ প্রভাতে উঠিয়া স্নিগ্ধ বায়ু ও অরুণ-কিরণে আপনাদের দেহ ও মনকে স্ফুর্ত্তিযুক্ত করিয়া গৃহকর্ম্ম সম্পাদনে শারীরিক ও মানসিক অশেষ উন্নতি ও গৃহের কল্যাণ সাধন করিতেন। অলক্ষিতে প্রকৃতিরাণী তাঁহাদের কণ্ঠে সুখশান্তি ও স্বাস্থ্যের অমূল্য মুক্তাহার পরাইয়া দিতেন। তারপর স্নান আহ্নিক প্রভৃতি নিত্যক্রিয়া সাধন করিয়া রন্ধনশালায় অন্নপূর্ণারূপে পতিপুত্র অতিথি অভ্যাগত আত্মীয় স্বজন সকলকে স্বহস্তে রন্ধন করিয়া পরিতোষরূপে ভোজন করাইয়া নিজে সর্ব্বশেষ আহার করিতেন। ইহাতে মনের কত তৃপ্তি এবং পরিশ্রমজনিত ক্ষুধার উদ্রেকে আহারে রুচি সুতরাং শরীর মনের স্বাস্থ্য কত উন্নতিলাভ করিত। আজকালকার মেয়েদের মাথাধরা, ক্ষুধাহীনতা, অম্বলের পীড়া, এসব ঘরে ঘরে বিরাজিত। যাহার তাহার মুখে শোনা যায়, "খাব কি বল, যে অম্বলের ব্যামো!" সেকালে লোকের প্রবাদ বাক্য "অমন বয়েসে আমরা লোহা খেয়ে হজম করেছি, তোরা আর এটা খেতে পারবি না।" একেত দেশব্যাপী দুর্ভিক্ষ ও মহামূল্যতা দরুণ আজকাল পুষ্টিকর আহারীয় প্রচুর সংগ্রহ হয় না; তার উপর পরিশ্রম বিমুখ হওয়ার দরুণ আহারও বাবুগিরি হইয়াছে। কলিতে অন্নগত প্রাণ বাঙ্গালী কতটুকু পুষ্টিকর আহার করিয়া আপন স্বাস্থ্য ও আয়ু অক্ষুণ্ণ রাখিবে? প্রচুর পরিমাণ ভাত তরকারী দুধ ঘি ইত্যাদি খাইয়া সেকালে শরীর ভাল থাকিত। এখন লোকের পেটের স্থানও সেরূপ নাই। সেকালের লোকের

আহারের তুলনা হয় না। আমরা স্বচক্ষে দেখিয়াছি আমাদের পিতামহী যাহা আহার করিতেন, তাহা বোধ হয়, আমাদের তিন দিনেও আহার করা অসম্ভব। তবেই বুঝুন হাওয়া খাইয়াও আর শরীর ভাল থাকে না। আজকাল চাকরী ব্যপদেশে অনেকেই প্রবাসী। যাঁহার একশত টাকা বেতন, তাঁহার বাড়ীতে পরিবারের মধ্যে স্ত্রী মাতা ভ্রাতা ভগ্নী দুটী একটী বা তিন চারটী ছেলে মেয়ে সুতরাং একটী ঝি, একটী কি দুটী চাকর ও একটী ব্রাহ্মণ ঠাকুর না হইলে চলে না। এতগুলির ভরণপোষণ ব্যয় নির্ব্বাহ করিতে একশত টাকাতে কি হয়? এখানে বাড়ীর মেয়েরা যদি একটু আলস্য ঘুচাইয়া সকল কাজে মনোযোগ দেন, তাহা হইলে অল্প ব্যয়ে সুচারুরূপে গৃহকর্ম্ম সম্পন্ন হয় ও তাঁহাদের স্বাস্থ্য অক্ষুণ্ণ থাকে এবং গৃহে কমলার বৃদ্ধি হয়। যে গৃহে রমণীরা লক্ষ্মীস্বরূপিণী বলিয়া বর্ণিতা, আজকাল বেশীর ভাগ তাঁহাদের জন্যই বেচারী পুরুষদের দেহে অলক্ষ্মীর আবির্ভাব হইতেছে, এটা যেন মনে রাখেন। আর নিজের জীবনে যদি ইহা সংশোধনের উপায় না থাকে, তবে ভবিষ্যতে দুহিতা বা পুত্রবধূর জীবনের প্রতি যদি একটু অনুগ্রহ-দৃষ্টি করেন তাহা হইলেও আমার এই প্রবন্ধটী লেখা সার্থক হইবে।

এবিষয়ে প্রত্যেক রমণী মনোযোগ করিলে কৃতকার্য্য হইতে কতক্ষণ, ভগ্নীগণ! মনে রাখিবেন আমাদের দেহ আমরা না রাখিলে কে রাখিবে; ইহাতে অন্যের কিছুমাত্র ক্ষতিবৃদ্ধি নাই।

অনৈক হিন্দু মহিলা।

নলিনী।

দশম পরিচ্ছেদ।

জগদীশবাবু।

ভবেশ কাশী আসিলে তাহার পিতা চন্দ্রবাবু ধীরে ধীরে আরোগ্য লাভ করিতে লাগিলেন। পিতাকে সুস্থ দেখিয়া ভবেশ পুনরায় কলিকাতা যাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন, তাহাতে পিতা বলিলেন, "আমার এ বৃদ্ধ বয়সে আর তোমাকে ছাড়িয়া থাকিতে চাহি না। চাকুরী করিতে হয় এখানেই চেষ্টা করিয়া দেখা যাইবে।" ভবেশের যদিও কলিকাতা যাইবার ইচ্ছা নিতান্ত প্রবল, তথাপি তিনি পিতার আদেশ লঙ্ঘন করা উচিত মনে করিলেন না। পিতার আজ্ঞায় ভবেশ কাশীতে রহিলেন বটে, কিন্তু মনে কোনওরূপ সুখানুভব করিতে পারিলেন না। শরীরও দিন দিন শীর্ণ হইতে লাগিল, পিতা পুত্রের অবস্থা দেখিয়া বড়ই বিষণ্ণ হইলেন, কিন্তু ভাবিয়া কোনও স্থির মীমাংসা করিতে পারিলেন না। তিনি তাঁহার সরল অভিজ্ঞতায় এই মাত্র বুঝিতে পারিলেন যে, পুত্রকে কোন কার্য্যে নিযুক্ত করিতে হইবে, বিনা কর্ম্মে অলস ভাবে থাকিলে, পুত্রের শরীর ও মন ক্রমশঃই খারাপ হইবে।

একদিন সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে পিতা পুত্রে নানারূপ কথাবার্ত্তায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন। চন্দ্রবাবু প্রতি কথাতেই ভবেশের সংসারে প্রতি ঔদাসীন্য ও অন্যমনস্ক ভাব লক্ষ্য করিতে-

ছিলেন। অবশ্য তাঁহার একমাত্র পুত্রের এই প্রকার অবস্থা দর্শনে প্রাণে অতিশয় আঘাত পাইতে ছিলেন। কিয়ৎক্ষণ উভয়ে নীরবে আছেন, ইতিমধ্যে সোপানে কাহার পদধ্বনি শ্রুত হইল, চন্দ্রবাবু সেই দিকে চাহিলেন। অনতি বিলম্বে একজন ভদ্রলোক তথায় উপস্থিত হইলেন। ভদ্রলোকের পোষাক পরিচ্ছদে এবং আকৃতিতে তাঁহাকে ধনী ও সম্ভ্রান্ত বলিয়া মনে হয়। তাঁহাকে দেখিয়া পিতা পুত্রে সসম্ভ্রমে উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং আগন্তককে প্রণাম করিলেন। আগন্তক উপবেশন করিলে, তাঁহারাও উপবেশন করিলেন। চন্দ্রবাবু বলিলেন, "মহাশয়! আজ এত দয়া কেন?" আগন্তক হাসিয়া বলিলেন, "বিশ্বেশ্বর দেবের আরতি দেখিতে আসিয়াছিলাম, তা একবার আপনার সঙ্গে দেখা করে যাইব মনে করে এলাম! (ভবেশের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া) উনি আপনার ছেলে?" চন্দ্রবাবু বলিলেন "হাঁ"।

অনেক কথা কথাবার্তার পর চন্দ্রবাবু ভবেশের লেখাপড়ার পরিচয় প্রদানপূর্ব্বক তাঁহার কোনও কাজ কর্ম্মের চেষ্টা করিবার জন্য ভদ্রলোককে অনুরোধ করিলেন। তিনি বলিলেন, "ভবেশ যখন বি, এ, পাস করেছেন তখন আর চাকরীর জন্য চিন্তা কি? এখন, একটা পড়ালে হ'ত না?"

চন্দ্রবাবু। "পড়াইলে ক্ষতি ছিল না, কিন্তু আমার আর পড়াইবার ইচ্ছা নাই।"

আগন্তক। "আপনি যদি অনুমতি করেন, তবে আমার ভ্রাতুষ্পুত্রের পড়াইবার ভার আপনার পুত্রের উপরে দিতে ইচ্ছা করি। আপনার ছেলেকে দেখিয়া বেশ সুবোধ ও শান্ত বলে মনে হইতেছে।"

চন্দ্রবাবু। "আপনার ভাইপোকে পড়াইতে আমার কোন অমত নাই,—ভবেশকে ডাকি।"

বলাবাহুল্য ভদ্রলোকটীর আগমনের কিছুক্ষণ পরেই ভবেশ তথা হইতে প্রস্থান করিয়াছিলেন। এখন পিতার আহ্বানে পুনরায় তথায় আসিলেন, চন্দ্রবাবু বলিলেন, "ভবেশ! এই জগদীশবাবু আমার একজন সুহৃদ্ এবং পূজনীয় ব্যক্তি ইঁহাদ্বারা তুমি অনেক উপকার প্রাপ্ত হইবে। আপাততঃ ইঁহার একটী ভ্রাতুষ্পুত্রকে পড়াইবার ভার তোমাকে দিতে ইচ্ছা করেন, তোমার তাহাতে কি মত?" ভবেশ বিনম্র স্বরে বলিলেন, "পড়াইতে আমার কোনও আপত্তি নাই, কোন্ সময়ে যাইতে হইবে? কবে থেকেই বা যাইব?" চন্দ্রবাবু কিছু বলিবার পূর্ব্বেই জগদীশবাবু অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত ভদ্রলোক বলিলেন, "কবে আর? আমার সঙ্গেই চল, ওখানেই থাকবে।" ভবেশ পিতার মুখপানে চাহিলেন, পিতা হাসিয়া বলিলেন, "জগদীশবাবুর বাড়ী তুমি থাকবে তাহাতে আমার অমত নাই, তুমি যদি অসুবিধা মনে না কর, স্বচ্ছন্দে যাইতে পার।" জগদীশবাবু বলিলেন,—"কেন? অসুবিধা হইবে কেন? তুমি এখানেও যেমন আছ সেখানেও তেমনি থাকিবে, রোজ রোজ যাওয়া আসা বৃথা পরিশ্রম মাত্র। আমার ইচ্ছা চন্দ্রবাবুও আমার বাড়ী থাকেন, বেশ দুজনে এক সঙ্গে বাস করা যাবে।" চন্দ্রবাবু ঈষৎ হাস্যের সহিত বলিলেন, "না মহাশয়! আমাকে ক্ষমা করুন, আমি জীবনের শেষ কয়টা দিন বিশ্বেশ্বর দেবের চরণপ্রান্তেই পড়ে থাকবো, অন্য কোথাও যাইতে আর ইচ্ছা নাই। ভবেশকে আপনার

হস্তে সমর্পণ করিলাম, আশা করি আমার মৃত্যু হইলেও ভবেশ পিতৃহীন হবে না, ও বড় স্নেহের কাঙ্গাল!" বৃদ্ধ চন্দ্রবাবুর চক্ষে জল আসিল, বোধ হয় এই সময় তাঁহার পরলোকগত পত্নীর স্মৃতি তাঁহার মানসপথে উদিত হইয়াছিল।

জগদীশ। "আপনি যাবেন না তা জানি, সেই জন্যই আমি একদিন নিতান্ত ইচ্ছা থাকা সত্বেও আপনাকে ওবিষয়ে বলি নাই,—আর ভবেশের জন্য আমি সাধ্যানুসারে চেষ্টা ও যত্ন করিব। আপনার অনুরোধ নিষ্প্রয়োজন।"

চন্দ্র বাবু। "তাহা জানি, আপনার গুণ সংসারে অতুলনীয়।"

জগদীশ বাবু উঠিয়া দাঁড়াইলেন, চন্দ্র বাবুও উঠিলেন, জগদীশ বাবু বলিলেন, "চলুন মন্দিরে যাই, কাল্‌কে সকালে গাড়ী আসিলে ভবেশকে পাঠাইবেন।"

চন্দ্র। "গাড়ী আর কি জন্য? ভবেশ হেঁটেই যাবে।"

চন্দ্র বাবু ও জগদীশ বাবু আরতি দর্শনার্থ মন্দিরে গমন করিলেন, ভবেশ তাঁহাদের সহিত দ্বারদেশ পর্য্যন্ত আসিয়া, পরে স্বগৃহে গমন পূর্ব্বক পুস্তকে মনোনিবেশ করিলেন।

পরদিন প্রত্যূষে আপনার আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি ভৃত্যের মস্তকে দিয়া তৎসমভিব্যাহারে ভবেশ জগদীশ বাবুর আলয়াভিমুখে যাত্রা করিলেন। তাঁহাদের বাসা হইতে প্রায় দেড় মাইল দূরে জগদীশ বাবুর বাটী। যখন ভবেশ জগদীশ বাবুর বাড়ী আসিলেন তখন তিনি অট্টালিকা সংলগ্ন উদ্যানে প্রাতর্ভ্রমণে রত ছিলেন। ভবেশ সিংহদ্বারি কটক অতিক্রম করিয়া প্রাঙ্গনে আসিলেন, কোথায় দাঁড়াইবেন বা বসিবেন সহসা স্থির করিতে পারিলেন না। একটী ফুলের গাছের টবের নিকটে দ্রব্যাদি রক্ষা করিয়া নিজেও সেইস্থানে দণ্ডায়মান হইয়া রহিলেন। ধনীর বাড়ীর দাস দাসীরা সকলে এখনও শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করে নাই, দুই একজন যাহারা উঠিয়াছে, তাহারা অপরিচিত ভবেশকে প্রাঙ্গন মধ্যে দেখিয়া কিছু আশ্চর্য্যান্বিত হইল। কেহ অর্দ্ধ নিমীলিত নয়নে, কেহ বা হস্তদ্বয় যুক্ত করিয়া চক্ষু রগ্‌ড়াইতে রগ্‌ড়াইতে বঙ্কিম কটাক্ষে আগন্তুক ভবেশের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে লাগিল। একজন হিন্দুস্থানী দ্বারবান কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া তাঁহারদিকে অগ্রসর হইয়া বলিল, "বাবু আপ্‌কো কুছ্ মৎলব হ্যায়?" ভবেশ বলিলেন, "মৎলব তো কুছ্ হ্যায়! বাবুকো বৈঠেকে ঘর কাঁহা?"

দ্বা। "বাবুকে ঘর উপরসে হ্যায়,—বাবু আব্ বাগান্‌মে গিয়া, আপ্‌লোক বাবুকে সাথ্ ভেট করেঙ্গে?

ভবেশ। "হাঁ, বাবু কেৎনা ঘড়ি বাগানপর রহেঙ্গে?"

দ্বা। "হর্ রোজ তো কুছ্ ঠিক্ নেই, যো বখত্ বাবুকা খুসী হোবে সো বখত্ আয়েগা, আপ্ থোরা ঘড়ি বৈঠে?"

ভবেশ একবার মনে করিলেন বাবুকে একটী সেলাম পাঠাইয়া দেন, আবার মনে করিলেন, কি জানি বাবু তাহাতে যদি অভদ্রতা মনে করেন, অগত্যা সে ইচ্ছা ত্যাগ করিয়া দারোয়ান প্রদর্শিত ক্ষুদ্র একখানি খাটিয়ার উপবেশন করিলেন।

জগদীশ বাবু উদ্যান হইতে প্রাঙ্গনে আসিলেন, এবং ভবেশকে দেখিয়া তাঁহার নিকটে আগমন পূর্ব্বক বলিলেন, "একি! তুমি এখানে বসে আছ? এত সকালে

আসিবে তাহা তো জানি না আমি এখনি গাড়ী পাঠাইতাম, এস উপরে যাই।"

জগদীশ বাবুর সহিত ভবেশ উপরে চলিলেন। ভবেশের প্রতি বাবুজীর এতাদৃশ অনুগ্রহ দেখিয়া, দারোয়ানজীর মনটা কেমন-ধারা হইয়া গেল। তিনি ভবেশকে সামান্য একজন উমেদার মনে করিয়াছিলেন, তাই তাঁহাকে বৈঠকখানা গৃহ দেখাইয়া দেন নাই বা বসিবার নিমিত্ত একখানি চেয়ারও দিতে পারেন নাই। এখন তাহার প্রভুর দিকে চাহিয়া ভাবিতে লাগিল, বাবুজী না জানি কি মনে করিতেছেন।" বৈঠকখানার প্রবেশ করিয়া জগদীশ বাবু একখানি চেয়ারে বসিলেন, এবং ভবেশকে নিজের নিকটে অন্য একখানি চেয়ারে বসিতে বলিলেন। উভয়ে উপবেশন করিলে, একটী পঞ্চদশ বর্ষীয় বালক জগদীশ বাবুর নিকটে আসিয়া দাঁড়াইল এবং বলিল, "কৈ কাকা! নূতন মাষ্টার মহাশয় কখন আসবেন?" হাসিয়া জগদীশ বাবু বলিলেন, "ভারি ব্যস্ত যে? ইনিই তোমার মাষ্টার!" ভবেশকে বলিলেন, "ভবেশ! এইটি তোমার ছাত্র, এবার প্রবেশিকার জন্য প্রস্তুত হইতেছে, আশা করি তুমি ওকে নিজের ভ্রাতার ন্যায় যত্ন পূর্ব্বক পড়াইবে;— তোমার পিতার নিকটে তোমার চরিত্রের কথা শুনিয়া বড় সুখী হ'য়েছি।" ভবেশ স্বভাবোচিত বিনম্রস্বরে বলিলেন, "আমার সাধ্যানুসারে কোনই ত্রুটি হইবে না।" ঠিক্ এই কথাটী বলিবার সময় ভবেশের বদন মণ্ডলে কি একটা বিষাদময় চিত্র অঙ্কিত হইল;—বোধ হয় আট বৎসর পূর্ব্বে যখন তিনি সুরমাকে ছাত্রীরূপে পাইয়াছিলেন, সেইকথা এবং তাহারই সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার অতীত জীবনের কতকগুলি যাতনাদায়ক স্মৃতি তাঁহার হৃদয়মধ্যে জাগিয়া উঠিল।

জগদীশ বাবু বালককে বলিলেন, "বিনয়! তোমার মাষ্টার মহাশয়ের জন্য যে ঘর নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে সেখানে উঁহাকে নিয়ে যাও। ভবেশ! তুমি যাও একটু বিশ্রাম করগে তোমাকে বড় ক্লান্ত দেখাইতেছে, অনেক দূর হেঁটে এসেছ।" ভবেশ উঠিয়া বিনয়ের সহিত চলিলেন, এবং মনে মনে জগদীশ বাবুর ভদ্রতার প্রশংসা করিতে লাগিলেন। বিনয় তাঁহাকে দ্বিতলের একটি প্রকোষ্ঠে লইয়াগেল, গৃহটী অতি পরিষ্কাররূপে সজ্জিত, সমস্ত গৃহটী উৎকৃষ্ট বিলাতি কার্পেট দ্বারা আবৃত তদুপরি চেয়ার, টেবিল, এবং এক-পার্শ্বে খট্টার উপরে সুপরিস্কৃত শয্যা বিস্তৃত। টেবিলের উপর কয়েকখানা পুস্তক, লিখিবার আসবাব্ ইত্যাদি ব্যতীত দুইটী সদ্য প্রস্ফুটিত পুষ্প স্তবক আপনার সুগন্ধ বিকীর্ণ করিতেছে। দেওয়াল নানাবিধ দেশীয় ও বিলাতি আলেখ্য দ্বারা পরিপূর্ণ এবং সুবৃহৎ একটী ঘটিকা যন্ত্র তাহার মধ্যস্থলে বসিয়া আরও তাহাদের শোভা বর্দ্ধন করিতেছে। একস্থানে হারমোনিয়ম বেহালা প্রভৃতি বাদ্য-যন্ত্রও রহিয়াছে। এক কথায় বলিতে হইলে গৃহখানি ধনী এবং বিলাসীর বাসোপযোগী করিয়া সজ্জিত করা হইয়াছে। গৃহে প্রবেশ করিবামাত্র নানারূপ বিলাতি এসেন্সের গন্ধ তাঁহার নাসারন্ধ্রে প্রবিষ্ট হইল। ভবেশ ভাবিলেন, "জগদীশ বাবু কি আমার সহিত উপহাস করিতেছেন! আমি তাঁহার বেতন-ভোগী ভৃত্য হইয়া আসিয়াছি, আমার জন্য এত সুসজ্জিত গৃহ এত সুগন্ধির ছড়াছড়ি কেন?"

বিনয় তাঁহাকে বসিতে অনুরোধ করিলে তিনি বসিলেন, তাঁহার মস্তকের উপরস্থিত

কড়িকাষ্ঠ সংলগ্ন টানাপাখা চলিতে লাগিল। ভবেশ বলিলেন, "বিনয়! আমার আর বিশ্রাম করিবার প্রয়োজন নাই, চল তোমার পড়া দেখিগে," বিনয় কোনও কথা বলিবার পূর্ব্বেই জগদীশ বাবু তথায় আসিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া ভবেশ উঠিয়া দাঁড়াইলেন। জগদীশ বাবু হাসিয়া বলিলেন, "থাক্ থাক্ তুমি বোসো—ঘরটা পছন্দ হ'য়েছে তো?" ভবেশ অবনত মুখে বিনীতস্বরে বলিলেন, "আপনি আমার জন্য এরূপ সুসজ্জিত গৃহের বন্দোবস্ত করিয়া আমাকে উপহাস করিতেছেন বলিয়া মনে হইতেছে, আমি অতি সামান্য অবস্থার লোক, আপনার ভৃত্য, আমার জন্য এরূপ বন্দোবস্ত না করিলেই ভাল হইত।" জগদীশ বাবুর প্রফুল্ল মুখকান্তি গম্ভীরাকৃতিধারণ করিল, বলিলেন, "ভবেশ! তুমি আমাকে নিতান্ত পর মনে করিতেছ বলিয়া এ কথা বলিলে, তোমার পিতা এতদূর মনে করেন না! আমি তোমার জন্য কোনই আয়োজন করি নাই। আমরাও যেরূপ গৃহে বাস করি তোমার নিমিত্তও তাহাই হইয়াছে, আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি এখানে নিজের বাড়ীর ন্যায় মনে করিও, আশা করি ভবিষ্যতে তোমার মুখে এরূপ কথা শুনিতে পাইব না।"

ভবেশ কি বলিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন! কিন্তু জগদীশ বাবু আর তথায় দাঁড়াইলেন না। ভবেশ জগদীশ বাবুর সস্নেহ ব্যবহারে বড়ই সুখী হইলেন, এবং নিজে যাহা বলিয়াছিলেন, তজ্জন্য ততোধিক লজ্জাবোধ করিলেন। তাঁহাকে নীরবে থাকিতে দেখিয়া বিনয় বলিল, "মহাশয়! বই কি এইখানে আনিব?" "না না চল," বলিয়া ভবেশ তাহার সহিত পড়িবার ঘরে গেলেন। ক্রমশঃ

শ্রীকুমুদেন্দু দেবী।

পারস্যজাতি।

বিভিন্ন দেশীয় বিভিন্ন জাতির, রাজনৈতিক ও সামাজিক, রীতিনীতির ও আচার ব্যবহারের বৈচিত্র্যতা সম্বন্ধে আলোচনা করিলে সাতিশয় বিস্ময় উৎপন্ন হয়।

এসিয়া মহাদেশের অন্তর্গত পারস্যদেশ অতি প্রাচীন ও সুপ্রসিদ্ধ রাজ্য। আমাদিগের দেশের ন্যায় পারস্যদেশেও পরিবারে পুরুষের একাধিপত্য, কিন্তু তদ্দেশে ইহার এতই প্রাবল্য যে গৃহস্থিত সকলকেই গৃহকর্ত্তার মনস্তুষ্টি সাধন করিতে হয়। স্ত্রীজাতির বিন্দুমাত্রও স্বাধীনতা নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না। নারীজীবন যেন পুরুষের বিলাস সামগ্রী। ভীষণ বহুবিবাহ ও কঠোর অবরোধ প্রথা পারস্যনারীকে পুরুষের সম্পূর্ণ মুখাপেক্ষিনী করিয়া রাখিয়াছে। ধনী দরিদ্র সকল পুরুষই একাধিকবার দার পরিগ্রহ করিয়া থাকে বা করিতে পারে। সচ্ছলাবস্থাপন্নদিগের পত্নীদের জন্য স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র বাসস্থান নির্ম্মিত হয়। কিন্তু যাহারা দরিদ্র, তাহাদিগের পত্নীদিগকে অনন্যোপায় হইয়া সপত্নীগণসহ একত্রে বাস করিতে হয়, ও ভীষণ গৃহকলহের অগ্নিতে চিরজীবন দগ্ধীভূত হইতে হয়। বহুবিবাহের বিষময় ফলস্বরূপ পারস্যবাসীর জীবন অতিশয় অশান্তিপূর্ণ এবং প্রায় সকলেই ভুক্তভোগী হইলেও ইহার প্রতি-

কারের কাহারও যত্ন চেষ্টা বা উদ্যম দৃষ্ট হয় না। স্বামী ভিন্ন পরপুরুষের সম্মুখে নারীগণের বাহির হইবার অধিকার নাই। এমন কি বয়ঃপ্রাপ্ত পুত্র বা ভ্রাতার সহিতও রমণীগণের যথাতথা আলাপাদি অনুমোদনীয় নহে। পারস্যনারীর এবম্বিধ শোচনীয় অবস্থা প্রযুক্ত পুরুষদিগের নৈতিক জীবন অতি হীন হইয়া পড়িতেছে।

পারস্য সমাজে ভৃত্যগণ বড়ই স্বাধীন, তাহারা প্রভুর সহিত অবাধে মিশিয়া থাকে, এবং আহারে বিহারেও প্রায় প্রভুর গৃহে একপ্রকার স্বাধীনভাবে সুখে বাস করে। প্রভুও কার্য্যক্ষেত্রে ভৃত্যের পরামর্শাদি গ্রহণ ও ভৃত্যের সহিত রহস্যাদি করিতে লজ্জাবোধ করেন না। দাস দাসীর সন্তানগণ প্রভুর সন্তানদিগের সহিত সমভাবে শিক্ষিত ও পালিত হয়। সম্পন্ন পরিবারের পুত্রসন্তান শৈশবাবস্থা অতিক্রম করিলেই তাহাকে মাতার নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন করা হয় এবং পুরাতন ভৃত্যের উপরে তাহার সকল ভার অর্পিত হয়। তদবধি উক্ত পুত্রের শিক্ষা ও লালন পালন সম্বন্ধে ভৃত্যকেই সম্পূর্ণরূপে দায়ী হইতে হয়।

জ্যেষ্ঠ পুত্রের জীবন বাল্যকাল হইতে পিতার আদর্শে গঠিত হইয়া থাকে। এবং সামাজিক অনুষ্ঠানাদিতে পুত্রকে পিতার আদর্শে বেশভূষায় সজ্জিত হইয়া ধীরে ও গম্ভীরভাবে পিতৃপার্শ্বে অবস্থান করিতে হয়। শিশুর জন্মের পর হইতেই মাতা ও ধাত্রী তাহাকে গৃহে আবদ্ধ করিয়া রাখে, যেন কেহ সহজে তাহাকে দেখিতে না পায়। নীলবর্ণের রঞ্জিত বস্ত্রের দ্বারা শিশুকে সর্ব্বদা আচ্ছাদিত করিয়া রাখা হয়। ধারণা এই যে নীলবর্ণের বস্ত্র উপদেবতাদিগের কুদৃষ্টি হইতে সন্তানকে রক্ষা করিবার অক্ষয় কবচ স্বরূপ। এবং মক্কাতীর্থ হইতে আনীত ভেড়ার চক্ষুর মণিরদ্বারা কবচ নির্ম্মাণ করিয়া শিশুর গলদেশে পরান হইয়া থাকে। পারস্যদেশে শিশু চিকিৎসা এক অদ্ভুত ব্যাপার। কোন শিশু রোগাক্রান্ত হইলে, বহিপ্রাঙ্গনের ভূমিতে একটী সমাধিখনন করিয়া তদভ্যন্তরে অনাবৃতভাবে শিশুকে শয়ন করাইতে চিকিৎসকগণ শিশুর পিতাকে পরামর্শ দান করেন। একরাত্রি শিশু ঐ অবস্থায় থাকিবে। রাত্রি প্রভাত হইলে সৌভাগ্যবশতঃ শিশু যদি বাঁচিয়া থাকে, তাহাকে নীরোগ জানিয়া গৃহে ফিরাইয়া আনিতে হইবে। সাধারণ ধারণা এই যে, শিশুকে এইভাবে রাখিলে তাহার জীবন উপদেবতার কুদৃষ্টি হইতে মুক্তি লাভ করিবে। ঔষধের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান মৃত্যুঞ্জয় ঔষধ মণি মুক্তা বা মূল্যবান প্রস্তরের গুঁড়া যাহা রোগীকে মৃত্যুশয্যাতে প্রদান করা হয়।

বালকগণকে দৌড়াদৌড়ি বা লম্ফঝম্ফের দ্বারা ক্রীড়া করিতে দেওয়া হয় না। পঞ্চবর্ষ বয়সে বালকদিগের শিক্ষারম্ভ হয়। শিক্ষকের মাসিক বেতন পঞ্চদশ মুদ্রার অধিক নহে। অর্দ্ধশিক্ষিত শিক্ষকের নিকটে অধিকাংশ বালক শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়া থাকে। মুসলমানধর্ম্মশাস্ত্র কোরাণ পাঠ করিতে শিখিলেই বালকাদিগের শিক্ষা সমাপ্ত হইল। কোনও বালক পাঠাভ্যাস করিতে না পারিলে গুরুমহাশয় তাহাকে পাঠশালার বাহিরে দাঁড় করাইয়া কঠোররূপে শাস্তি প্রদান করেন। এবং সেইজন্য শিক্ষকের প্রতি ছাত্রগণের শ্রদ্ধাভক্তিহীনতা পরিলক্ষিত হয়। তাহারা গুরুমহাশয়কে যমদূত তুল্য জ্ঞান করে। কঠোর শাসনের প্রভাবে ও

প্রাণভয়ে আমোদ ক্রীড়ার অভাবে পারস্য বালকদিগের স্বাস্থ্য অতীব শোচনীয় অবস্থা প্রাপ্ত হয়। কথিত আছে প্রতি ছয় জনার মধ্যে দুইটী বালক অতি কষ্টে নীরোগ ও দীর্ঘায়ু হইতেছে।

পারস্যবাসী পুরুষগণ কুম্ভকর্ণের শিষ্য। অবস্থাপন্ন পুরুষগণ দিবানিদ্রাতে জীবনের অধিকাংশ সময় ব্যয় করেন। কথিত আছে কোন ব্যক্তি ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ১৬ ঘণ্টা সময় নিদ্রা যাইত। তাহাকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে এই বলিয়া উত্তর প্রদান করিত যে, সে বিছানায় শুইয়া নানা প্রকার সুখের কল্পনা করে। যে সুখ জীবনে কখনও পাইবার সম্ভাবনা নাই তাহা শয্যায় শায়িত হইয়া কল্পনাতে সম্ভোগ করে।

মধ্যবিত্ত গৃহস্থগণও স্বহস্তে কোন প্রকার পরিশ্রমজনক কার্য্য করা অতি লজ্জা ও অপমানের বিষয় মনে করে। জমিদার ও ব্যবসায়ীগণ কেবল ভৃত্যদের কার্য্য পরিদর্শন করেন। পারস্য স্ত্রী পুরুষ সদাই উপদেবতার ভয়ে ভীত ও ভুতপ্রেতাদির হস্ত হইতে নিস্কৃতি পাইবার জন্য নানা উপায় অবলম্বন করে। সঙ্গতিপন্ন ব্যক্তিগণ ওঝা মহাশয়কে স্বীয় জীবনের প্রহরী নিযুক্ত করে। স্ত্রী পুরুষ সকলেই ভুতের ভয়ে আহারের পূর্ব্বে অতি যত্নের সহিত হস্তপদ ও মুখ একাধিবার ধৌত করে। বিদেশযাত্রাকালে ওঝাদের পরামর্শাদি গ্রহণ করিয়া যাত্রা করে। অধিকাংশ পারস্যবাসীগণ মুসলমান ধর্ম্মাবলম্বী হইলেও অতিশয় কুসংস্কারাপন্ন, ভীরু ও বিলাসী। ভারতীয় পারসিক জাতির পূর্ব্ব-পুরুষগণ পারস্য হইতে আসিয়াছিলেন। কিন্তু ইহারা এত উন্নতি লাভ করিয়াছেন, যে ইহাদিগের আচার ব্যবহার পারস্যবাসী-দিগের আচার ব্যবহার হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন বলিলে হয়।

কবিতা।

কর্ম্মে—শান্তি।

কর্ম্মক্ষেত্র এ সংসারে, কর্ম্মই জীবন;
তাপ দগ্ধ হৃদি তলে কর্ম্ম শান্তি বারি,
কর্ম্মই তোমার নাথ! প্রেম নিদর্শন,
কর্ম্ম মূলে তোমারই করুণা নেহারি।
ব্যথিত দুর্ব্বল প্রাণ শোক তপ্ত হিয়া
এসো তুমি মরুময় সংসারের পথে,
দুর্ব্বহ জীবন ভার লইতে বহিয়া
সৃজন করেছ এই কর্ম্ম-পুষ্প রথে।
জীবনের মহাব্রত সেই কর্ম্ম মূলে
জ্যোতির্ম্ময়! তব জ্যোতি থেকে উদ্‌ভাসিত
দেখাইয়া দেহ যেন যাই যাহা ভুলে!
বিমল কর্ম্মের পথ করে প্রসারিত।
জানি শুধু কর্ম্ম শ্রেষ্ঠ অবনীমণ্ডলে,
কি ভাল কি মন্দ নাথ! তুমি দিয়ো বলে।

শ্রীশরৎকুমারী দেবী।

দেবতা।

হৃদয় নিভৃতে, রেখেছি যতনে,
প্রেমের মূরতি তব।
তোমারি চরণে, হৃদয়ের প্রেম
ঢালিয়া দিয়াছি সব॥
এ ক্ষুদ্র হৃদয়ে, যা'ছিল আমার
বিন্দুমাত্র ভালবাসা,
সকলি তোমারে, করেছি অর্পণ,
তবুও মেটে না আশা।

আমিলন হ'তে, বুঝিয়াছি মনে,
তুমিই দেবতা মম,
এ জীবনে আর, পাব কারকাছে
প্রেমপ্রীতি তোমাসম ?
তুমি জীবনের, চির প্রিয় সখা,
তুমিই আরাধ্য প্রভু!
তব হৃদয়ের, সুখ দুঃখভাগী
করেছেন মোরে বিভু।
দেখিলে তোমার, প্রফুল্ল অন্তর,
বড় সুখ হয় মনে,
তেমনি তোমায়, দেখিলে মলিন,
বড় ব্যথা বাজে প্রাণে।
সদা পরমেশে, ডাকি কায়মনে,
তোমার অশান্তি যাক্
চির সুখ শান্তি, তব প্রাণে মিশি,
জীবন ভরিয়ে থাক্।
তব প্রেমালোকে, কর দূরীভূত
প্রাণের আঁধার ঘোর
তোমার প্রেমের, দিতে প্রতিদান
নাহিক শকতি মোর।
দাও প্রেমশিক্ষা, কর প্রেমে দীক্ষা,
তুমিই আরাধ্য মম,
হৃদয় নিভৃতে, তোমারি মূরতি
পূজিছি দেবতা সম।

শ্রীসীরা।

"কোলখালি"।

"কোলখালি" "কোলখালি কত আর শুনিব
কত আর শূন্যবুকে এ জীবন যাপিব ?
শূন্যকোলে শূন্যমনে,
শূন্য এ সংসার ধনে,
হৃদয়ের অন্তর্জ্বালা হৃদয়েতে পুষিব॥
"কোলখালি" "কোলখালি" কত আর শুনিব!

প্রবাহিত স্রোতবারি নিবারিতে নারিব,
এমনি হৃদয়বেগ হৃদয়েতে বহিব।
প্রজ্বলিত শোকানলে,
পুড়িতেছি পলে পলে,
কত আর এ অনলে জলিয়া গো মরিব ?
চিরদিন এমনি কি শূন্যকোলে রহিব ?

অতীতের কথাগুলি পুনঃ মনে করিব,
সে সুখ স্বপনে মোর এ হৃদয় ঢালিব।
শৈশব ক্রীড়ার সনে,
পেয়েছিনু যেই ধনে,
এ জীবনে সেই ধনে পুনঃ কিরে পাইব ?
অতীতের স্মৃতিরাশি মনে গেঁথে রাখিব।

অতীত কাহিনী সখি! কভু নাহি ভুলিব,
সেই যে নিশার ঘোরে,
হৃদপিণ্ড ছিন্ন করে—
'আমার হৃদয়নিধি'—কেমনে তা' বলিব—
আঁখি ফেটে আসে জল পুনঃ নাহি ভাবিব।
সেই যে নূতন দেশে,
দেবশিশু দেববেশে,
গিয়াছে মরত ছাড়ি, আর নাহি দেখিব।

কঠোর হৃদয়খানি বজ্রসম বাঁধিব।
সে দিনের কথা হায়!
গিয়াছে স্বপন প্রায়—
তবু তাহে মালা গেঁথে হৃদয়েতে রাখিব;
রহিবে স্মরণে চির কভু নাহি ভুলিব।
প্রকৃতির চারু হাসি,
চন্দ্রমা সুষমা রাশি,
সকলি যে বিষ ঢালা কত আর জানাব ?

আমার প্রাণের ব্যথা আর কত শুনাব ?
আমার তৃষিত প্রাণ,
হয়েগেছে শতখান,

ভেঙ্গেচুরে গেছে তাহা ভাঙ্গা প্রাণে থাকিব
এমনিতো শূন্যবুকে চিরদিন কাটিব।
ভেবেছিনু একদিন,
ভুলিবে গো এই দীন,—
অসহ্য দারুণ শোক, চিরশান্তি পাইব;
সান্ত্বনা প্রলেপ দিয়ে সুশীতল হইব।
হায়! না পূরিল আশ
পূর্ণ নাহি অভিলাষ
আরো যে আহুতি দেয় তাহাতেই জ্বলিব—
কি কহিব কি যে জ্বালা কত আর সহিব?

শ্রীগিরিবালা দেবী—

হৃদয়ের ধন।

কাছে যাই, ধরি হাত বুকে লই টানি,—
তাহার সৌন্দর্য্য ল'য়ে আনন্দে মাখিয়া,
পূর্ণ করিবারে চাহি মোর দেহখানি;
আঁখিতলে বাহুপাশে কাড়িয়া রাখিয়া!
অধরের হাঁসি ল'ব করিয়া চুম্বন,
নয়নের দৃষ্টি ল'ব নয়নে আঁকিয়া,
নাই নাই কিছু নাই শুধু অন্বেষণ!
নীলিমা লইতে চাই আকাশ ছাঁকিয়া,
কাছে গেলে রূপ কোথা করে পলায়ন,
দেহ শুধু ফিরে আসে শ্রান্ত করে হিয়া।
প্রভাতে মলিন মুখে ফিরি যাই গেহে,
হৃদয়ের ধন কভু ধরা যায় দেহে?

শ্রীনির্ম্মলা।

দুটি চাঁদ।

ফুটেছে সোণার চাঁদ নীল গগনের কোলে,
আমার সোণার চাঁদ ওই বসে' ধরাতলে!
মুখখানি রাঙা রাঙা,
কথা বলে ভাঙা ভাঙা
"আয় আয় চাঁদা" ডাকে কচি দুটী হাত তুলে
কে যেন প্রীতির ধারা চাঁদ মুখে দে'ছে ঢেলে!
এখনি সে কেঁদেছিল,—করেছিল আব্দার,
নয়নে রয়েছে তাই দুই বিন্দু অশ্রু তা'র;—
এখন সে হাসিতেছে,
সে রোদন ভুলে গেছে,
উথলিছে সোণা মুখে হাসির লহরী তা'র,
ভুলেছে সে অভিমান, ভুলেছে সে আব্দার।
চাঁদে ও মাধুরী নাই, এত শোভা অনুপম,
অকলঙ্ক পূর্ণ শশী আমার হৃদয় ধন!
পবিত্র সোণার মুখে
জোছনা খেলিছে সুখে,
দুই বিন্দু অশ্রু তাই,—কনক কমল যেন,
শোভিত মুকুতা হারে,—কি মাধুরী অতুলন।
ছোট ছোট মেঘে কভু চাঁদেরে ঢাকিতে চায়,
কাল কাল চুলগুলি উড়ায়ে মলয় বায়,
তেমনি সে চাঁদ মুখে
খেলিছে সোহাগ সুখে,
ছোট হাতে ধীরে ধীরে সাজায়ে দিতেছে তায়
আবার হাসিছে তা'র মুখশশী সুধাময়!
অনিমেষে চেয়ে আছে ওই রাঙা চাঁদ পানে,
ত্রিদিবের কথা যেন জেগেছে সে ক্ষুদে প্রাণে!
স্বরগের সুখস্মৃতি,
কত স্নেহ, কত প্রীতি,
আদর, সোহাগ কত তা'র পড়ে গেছে মনে,
অনিমেষে চায় তাই ওই রাঙা চাঁদ পানে!
না জানি অমর পুরে ছিল সে কতই সুখে,
কত শান্তি প্রীতি ভরা ছিল সে কোমল বুকে!
কতই সুখের খেলা,
খেলেছে সে সারা বেলা,
পরাণে জেগেছে তাই, মধুর সহাস মুখে,
যেন—পরিচিত চাঁদে হেরে,
"আয় আয় চাঁদা" ডাকে!

শ্রীপূর্ণশশী দেবী।

বিবিধ প্রসঙ্গ।

মুসলমান সমাজে স্ত্রী-শিক্ষা—বর্ত্তমান সময়ে স্ত্রীশিক্ষার প্রতি সকল সম্প্রদায়স্থ লোকেরই দৃষ্টি পড়িয়াছে। স্ত্রীজাতি শিক্ষিতা না হইলে যে জাতীয় উন্নতি সম্ভবপর নহে ইহা এখন অনেকেই অনুভব করিতেছেন। মুসলমান সমাজ এ সম্বন্ধে এতদিন এক প্রকার নীরব ছিলেন, এবং অবরোধ প্রথাই ইহার কারণ বলিয়া বোধ হয়। এই দুর্ভেদ্য প্রথাকে ভেদ করিয়া স্ত্রীশিক্ষা প্রচার করা তাঁহাদের পক্ষে বড়ই কঠিন কার্য্য। বড়ই সুখের বিষয় যে, এই মুসলমান সমাজের কৃতবিদ্য ও মহানুভব ব্যক্তিগণ তাহাদের বালিকাদিগকে শিক্ষা দানের জন্য যত্ন করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। আলিগড়ের সুপ্রসিদ্ধ "মুসলমান কলেজের অধ্যক্ষ মরিসন সাহেব ও তদীয় পত্নী বিবি মরিসন মুসলমান বালিকাদিগের শিক্ষার সুবন্দোবস্ত করিবার জন্য সম্ভ্রান্ত বংশীয় মুসলমানদিগকে অনুরোধ করিয়াছেন। মরিসন সাহেব বলিয়াছেন, মুসলমান সমাজের অবরোধ প্রথাকে রক্ষা করিয়াও বালিকাদিগকে শিক্ষা দিবার সুবন্দোবস্ত করিতে পারা যায়।"

একটা বাড়ীর চতুর্দ্দিক্ পর্দ্দার দ্বারা আবৃত করিয়া দুইজন ইংরাজমহিলা, ২।৩ জন মুসলমানমহিলা সহকারিণী শিক্ষয়িত্রীর সাহায্যে কার্য্য করিতে পারিবেন। বালিকাদিগকে কোরাণ পাঠ গণিত, উর্দ্দু ভাষা, লিখন ও পঠন পাকপ্রণালী স্বাস্থ্যরক্ষা, চিত্র বিদ্যা, সঙ্গীত ও শিল্পকর্ম্ম শিক্ষাদান করা হইবে। অন্ততঃ ২০টী বালিকা সংগ্রহ করিতে হইবে। প্রত্যেক ছাত্রীকে ৭৫৲ টাকা মাসিক বেতন ও স্কুলে প্রবেশের জন্য ১০০৲ টাকা দিতে হইবে। কেবল সম্ভ্রান্ত ও ধনী লোকদের বালিকাদিগের দ্বারা স্কুল আরম্ভ করা হইবে। এরূপ অতিরিক্ত ফি দিলে আর সাধারণের সাহায্যের জন্য অপেক্ষা করিতে হইবে না। বিবি মরিসন বিদ্যালয়ের অবৈতণিক সম্পাদিকা হইতে পারিবেন। মরিসন সাহেব সম্ভ্রান্ত মুসলমানদিগের সহিত যেরূপ সুপরিচিত, তাহাতে এই শুভকার্য্য সুসম্পন্ন হওয়া কঠিন নহে। আশা করি মুসলমান স্ত্রীসমাজেও জ্ঞান জ্যোতি অবিলম্বে বিকীর্ণ হইবে।

লেডি কার্জ্জন ও মহাকালী পাঠশালা—কলিকাতা মহাকালী হিন্দু বালিকা বিদ্যালয়ের লেডি কার্জ্জন পৃষ্ঠপোষিকা হইয়াছেন।

আদর্শ সহধর্ম্মিনী—বিলাতের কেইন সাহেবের মৃত্যু সংবাদে ভারতবাসীমাত্রেই দুঃখিত হইয়াছেন। কেইন সাহেব ভারতের অকৃত্রিম হিতৈষী বন্ধু ছিলেন। ভারতে মাদক দ্রব্য বিক্রয় যাহাতে বন্ধ করা হয়, সে জন্য তিনি বহুকাল হইতে চেষ্টা করিতেছিলেন। তাঁহারই যত্নে ভারতে ও বিলাতে নানাস্থানে সুরাপান নিবারিণী সভা স্থাপিত হইয়াছে। সুবক্তাদিগের দ্বারা নগরে নগরে পল্লীতে পল্লীতে সুরাপানের বিরুদ্ধে বক্তৃতাদি প্রদান করাইয়া তিনি মহা আন্দোলন উপস্থিত করিয়াছিলেন। কেইন সাহেব ভারতে দুইবার আসিয়া স্বয়ং বক্তৃতাদি করিয়া গিয়াছেন বিলাতের পার্লিমেণ্ট মহাসভাতে সভ্যরূপে তিনি ভারতের পক্ষ সমর্থন করিতেন। এরূপ মহানুভব হিতৈষী মহাত্মার মৃত্যুতে সমগ্র ভারতকে যে শোকাকুল হইতে হইবে ইহা বিচিত্র নহে। কিন্তু এই শোকের

মধ্যে ও আমরা এক শুভসংবাদে সান্ত্বনালাভ করিয়াছি। কেইন সাহেবের মৃত্যুতে সকলেই মনে করিয়াছিলেন যে তাঁহার অভাব আর পূর্ণ হইবে না। কিন্তু তাঁহার বিধবা পত্নী বিবি কেইন সুরাপান নিবারিণী সভার সম্পাদিকা ও ভারত হিতৈষী সুযোগ্য জামাতা হার্বার্ট রবার্ট সাহেব কোষাধ্যক্ষ নিযুক্ত হইয়াছেন। পতির উপযুক্তা সহধর্ম্মিণী বিবি কেইন স্বামির প্রিয়কার্য্যের ভার গ্রহণ করিয়া যে সাধু দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছেন, ইহাকেই বলে স্বামীস্ত্রীতে একপ্রাণতা তাহা সকল রমণীরই অনুকরণীয়। এতদ্দেশে রমণীগন বৈধব্যদশা প্রাপ্ত হইলে এতদূর হতাশ হইয়া পড়েন যে নিজের বা অপরের উন্নতির দিকে কিছু মাত্র দৃষ্টি রাখিতে পারেন না। প্রকৃত সহধর্ম্মিণী স্বামীর পরলোক গমনে তাহার প্রিয়কার্য্যগুলি প্রাণমন দিয়া সুসম্পন্ন করিয়া প্রকৃত ব্রহ্মচর্য্য পালন করেন। শ্রীহট্ট নগরের টাউনহলে বিগত ২১শে তারিখ মহাত্মা কেইনের প্রতি সম্মান প্রদর্শনার্থ এক বৃহতী সভা হইয়াছিল। নগরের সমুদয় সম্প্রদায়ের গণ্য মান্য ভদ্র মহোদয়গণ, ছাত্রগণও কয়েকটী ভদ্রমহিলা সভাতে উপস্থিত ছিলেন। কেইন সাহেবর ভারতের প্রতি যে অকৃত্রিম অনুরাগ ছিল এবং তিনি কিরূপ সাধুব্যক্তি ছিলেন তৎসম্বন্ধে কয়েক জন ভদ্রমহোদয়গণ বক্তৃতা করিয়াছিলেন।

পণ্ডিতা মাতার আদর্শ কন্যা—সুবিখ্যাত পণ্ডিতা রমাবাই অনেক দিন হইল বোম্বাই প্রদেশে হিন্দু বিধবাদের সুশিক্ষার জন্য বিধবাশ্রম স্থাপন করিয়াছেন। আমেরিকাবাসিনী মহিলাগণ তাহার সমুদয় ব্যয়ভার বহন করিতেছেন। সম্প্রতি পণ্ডিতার সুযোগ্যা কন্যা শ্রীমতী মনোরমা দেবী অষ্ট্রেলিয়া দেশে গমন করিয়া ভারতীয় বিধবাদিগের দুঃখময় জীবনের সম্বন্ধে নানাস্থানে বক্তৃতা করিয়াছেন। ইতিমধ্যে তদ্দেশে তাঁহাকে যথেষ্ট সম্মান প্রদর্শন করা হইয়াছে। তাঁহার হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতার ও চরিত্রের মাধুর্য্যে অষ্ট্রেলিয়াবাসী নরনারীগণ মুগ্ধ হইয়াছেন। অষ্ট্রেলিয়ার সংবাদপত্র সমূহে তাঁহার বক্তৃতার প্রশংসা ধ্বনি গীত হইয়াছে। পণ্ডিতা রমাবাই এখন প্রৌঢ়া হইয়াছেন। তাঁহার একমাত্র কন্যা তাঁহার কার্য্যভার গ্রহণের জন্য প্রস্তুত হইয়াছেন। ইহাকেই বলে "মাতৃপ্রভাব।"

উচ্চশিক্ষিতা বঙ্গমহিলা—এ বৎসর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ২টী ব্রাহ্মমহিলা বি, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণা হইয়াছেন। বঙ্গদেশে দিন দিন উচ্চশিক্ষিতা মহিলাদের সংখ্যা বৃদ্ধি হইতেছে। অনেকেই বালিকাবিদ্যালয়সমূহে অধ্যাপনার কার্য্য করিতেছেন। কেহ কেহ বিবাহিতা হইয়া সংসার ধর্ম্মপালন করিতেছেন। যদি এই সকল বিদুষী ভগিনীগণ সমবেত হইয়া অন্তঃপুরবাসিনী ভারত নারীদিগের মঙ্গলার্থ বা দরিদ্র বালিকা ও বালবিধবাদিগের সুশিক্ষার জন্য কোন প্রকার সুবন্দোবস্ত করেন, তাহা হইলে এ দেশের বিশেষ কল্যাণ সাধিত হইবে। পুরুষদিগের ন্যায় মহিলাগণও শিক্ষালাভ করিয়া যে কেবল চাকুরীর প্রত্যাশী হইবেন ইহা বাঞ্ছনীয় নহে। রমণীদিগের জন্যও এই বিশাল ভারতের চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত কার্য্যক্ষেত্র পড়িয়া রহিয়াছে। তাঁহারা কি একবার তাঁহাদের ভগিনীদিগকে সাহায্য করিতে অগ্রসর হইবেন না?

বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষোত্তীর্ণা স্ত্রীলোকগণের নাম;—

বি, এ।

মিত্র কুমুদিনী — বেথুন কলেজ
রায় প্রভাবতী — ঐ

এফ, এ।

প্রথম বিভাগ।

মুখোপাধ্যায় সুরবালা — বেথুন কলেজ

দ্বিতীয় বিভাগ।

ভট্টাচার্য্য সুরমা — বেথুন কলেজ
বিশ্বাস ইন্দুপ্রভা — „
মিত্র বাসন্তী — „
রায় সুখলতা — „
সিংহ ক্ষণপ্রভা — „
জুসুরিটা — লামার্টিনো

তৃতীয় বিভাগ।

দাস ভক্তিউষা — বেথুন কলেজ

এণ্ট্রান্স।

প্রথম বিভাগ।

ঘোষ নির্ভরপ্রিয় — বাঁকিপুর বালিকাবিদ্যালয়

দ্বিতীয় বিভাগ।

গুহ প্রতিভা — ব্রাহ্মবালিকা শিক্ষালয়
সেন কমলা — ইডেন ফিমেল স্কুল

তৃতীয় বিভাগ।

বাগ্চী হেমন্তকুমারী — ব্রাহ্মবালিকাবিদ্যালয়
চট্টোপাধ্যায় মধুশ্রবা — বাঁকিপুর বালিকা-বিদ্যালয়
দত্ত লীলাময়ী — ব্রাহ্মবালিকাবিদ্যালয়
রক্ষিত শোভনাবালা — ইডেন ফিমেল স্কুল
গুপ্ত ললিতলীলা — লোরেটো হাউস।

প্রাদেশিক সমিতি—বোম্বাই প্রদেশের ধারোয়ারে যে প্রাদেশিক সামাজিক সমিতির অধিবেশনে হইয়াছিল, তাহাতে সর্ব্বসম্মতিক্রমে বিধবার বিবাহ, বিধবাশ্রম, স্ত্রীলোকের উচ্চ শিক্ষা, নিম্নশ্রেণীর লোকের উন্নতি, বালিকাদের বিবাহ বয়স ১৪ ও বালকদের ২২ বৎসর, অর্ণবযানে বিদেশগমন, ছাত্রদিগকে নীতি ও ধর্ম্মোপদেশ এবং অনুতপ্ত বিধর্ম্মাবলম্বীদিগকে পুনরায় হিন্দুধর্ম্মের গ্রহণ সম্বন্ধে প্রস্তাব নির্দ্ধারিত হইয়াছে। স্ত্রীজাতির অবস্থার উন্নতির জন্য আন্দোলন অনেক স্থানে হইতেছে, কিন্তু কার্য্যে পরিণত না হইলে বৃথা বাক্যারম্ভের ফল কি ?

বার্ত্তাবহ কপোত—সেদিন একটা বার্ত্তাবহ কপোত ২৪ ঘণ্টার মধ্যে পারিস হইতে মল্টায় আসিয়াছিল, একদমে ১৩৫০ মাইল উড়িয়াছিল। যে পাখী আমেরিকা হইতে ইউরোপে যাতায়াত করে সে একদমে ১৮০০ মাইল উড়িয়া থাকে।

আদর্শ কাজ—অষ্ট্রীয়ার রাজ পরিবারে এক সুন্দর রীতি প্রচলিত আছে। গুডফ্রাইডের পূর্ব্বদিন সম্রাট দ্বাদশজন অতি বৃদ্ধ দরিদ্রকে প্রাসাদে নিমন্ত্রণ করিয়া আনেন এবং স্বয়ং তাহাদের পদ প্রক্ষালন করিয়া তাহাদের সম্মুখে নানাপ্রকার উপাদেয় আহার সামগ্রী উপস্থিত করেন। সেই সকল আহার সামগ্রী দরিদ্রের গৃহে পাঠাইয়া দেন। তার পর সম্রাট প্রত্যেকের গলায় ৩০টা রৌপ্যমুদ্রা পূর্ণ থলিয়া ঝুলাইয়া দিয়া সসম্ভ্রমে তাহাদিগকে বিদায় করিয়া থাকেন। এবার গুডফ্রাইডের পূর্ব্বদিনে ৮৯ বৎসর হইতে ৯২ বৎসর বয়স্ক দ্বাদশটী বৃদ্ধকে নিমন্ত্রণ করা হইয়াছিল। বড় লোকদের এইরূপ দরিদ্রের সেবা দেখিতে কেমন সুন্দর! ইহাতে বড় লোকদের মন নির্ম্মল হয়, তাঁহারা পবিত্র আত্মপ্রসাদ অনুভব করেন। বড় লোকদের মন সচরাচর গর্ব্বে অশান্তিপূর্ণ থাকে দরিদ্রের সেবা করিলে কিয়ৎকালের জন্য অনাবিল আনন্দ উপভোগ করিতে পারেন। আমাদের দেশের ধনীরা বৎসরে অন্ততঃ একদিন নিজের হাতে দরিদ্রের সেবা করিয়া দেখুন, প্রাণে কি নির্ম্মল আনন্দ হইবে।
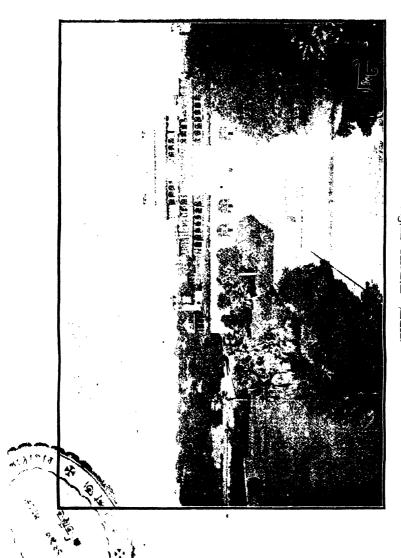
সেকেন্দ্রা—আকবরের সমাধি।

AN ILLUSTRATED MONTHLY JOURNAL IN BENGALI

Edited and contributed to by the ladies only.

কেবল মহিলাগণ কর্ত্তৃক লিখিত ও সম্পাদিত।

নবীন সৌন্দর্য্যরাশি সাথে লয়ে আজ
ওই আসে নব বর্ষ, পরি নব সাজ;
বিধাতার কাছে আজ এই ভিক্ষা চাই,
নূতন বরষে যেন নব প্রাণ পাই।

৬ষ্ঠ বর্ষ।	শ্রাবণ, ১৩১০ বঙ্গাব্দ।	VOL. VI.
৪র্থ সংখ্যা।	AUGUST, 1903.	NO. IV.

ফুলওয়ালী।

বসন্ত সূর্য্যের কমনীয় আলোকোদ্ভাসিত পাণ্ডু নদী ধীরে ধীরে বহিয়া যাইতেছে। তপন কিরণে জলের হিল্লোলগুলি হাস্য করিতে করিতে চলিয়াছে। উভয় পার্শ্বে সুন্দর বনরাজি, অদ্রিস্তরগুলির শোভা বর্দ্ধন করিতেছে। পাহাড়ের নীচে শ্যামল শস্য-ক্ষেত্র ও দুই একখানি গ্রাম দৃষ্ট হইতেছে প্রভাত কিরণ সেই সকলের গায়ে পড়িয়া হাসিয়া চলিয়া এক অভিনব সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি করিতেছে।

এমন সময়ে এক দীর্ঘাকৃতি যুবক অশ্বারোহণে গিরি-পথে বেড়াইতেছিলেন। গিরিনদীর কূলে শ্যামল তৃণরাজি বেষ্টিত একটি মনোরম স্থানে আসিয়া যুবক অশ্বকে কিঞ্চিৎ বিশ্রাম দিবার জন্য অশ্বপৃষ্ঠ হইতে লম্ফ দিয়া ভূমিতলে অবতীর্ণ হইলেন। রুমালদ্বারা ললাটের ঘর্ম্ম মোচন করিয়া রুক্ষ কেশগুচ্ছ ঈষৎ সরাইয়া ক্ষণকাল সেই প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের দিকে চাহিয়া রহিলেন। তখন মন্দ মন্দ বায়ু বহিতেছিল; যুবক একটি উপলখণ্ডে বসিয়া বিশ্রাম করিতে লাগিলেন।

এ ফুল ওয়ালী কে? সেই বনে একটি যুবতী পুষ্পচয়ন করিতেছিলেন। তাহাকে দেখিয়া যুবক একটু বিস্মিত হইলেন, কেননা রমণী পশ্চিম দেশ সম্ভূতা নহেন, পরিচ্ছদ

দেখিয়া তাহাকে স্পষ্টই বাঙ্গালীর মেয়ে বলিয়া প্রতীয়মান হইল। এই দূরবিদেশে স্বদেশীয়াকে দেখিয়া যুবকের হৃদয় আনন্দে নৃত্য করিয়া উঠিল। রমণী অনুমান ষোড়শ বর্ষীয়া। নিবিড় কৃষ্ণ কেশরাশি সুগোল গণ্ডস্থলে ও পৃষ্ঠদেশে লম্বিত রহিয়াছে। ওষ্ঠদ্বয় রক্তবর্ণ, বাহুযুগল সুগোল, পুষ্পবলয় ও শ্বেতশঙ্খের দ্বারা সুশোভিত। রমণীর সেই সুন্দর মুখমণ্ডলে প্রভাতের রক্তিমচ্ছটা পতিত হইয়া, তাঁহার কাঞ্চন বর্ণকে সমধিক উজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছে, কণ্ঠে ও উন্নত বক্ষস্থলে নানাবিধ পুষ্পহার সগর্ব্বে দুলিতেছে, যুবক অনিমেষ লোচনে সেই সৌন্দর্য্যের দিকে চাহিয়া রহিয়াছে। তাহার হৃদয় অননুভূত আনন্দ স্রোতে সিক্ত হইতেছিল। যুবতী ফুল তুলিতে তুলিতে কখনও সম্মুখে আসিতেছেন, কখনও পশ্চাৎ ফিরিতেছেন। কর্ণের পুষ্প কুণ্ডল বালসূর্য্যের কিরণে ঝলমল করিতেছে, যুবতী যেন পুষ্প চয়নচ্ছলে নৃত্য করিয়া বেড়াইতেছেন। অনেকক্ষণ পরে রমণীর পুষ্পচয়ন শেষ হইল। যেস্থানে সেই প্রতিভাশালী যুবক উপবিষ্ট, রমণী ক্রমে পুষ্পহেতু সেই দিকে অগ্রসর হইলেন। যুবকের বিশাল আকৃতি ও উজ্জ্বল সৌন্দর্য্য দেখিয়া রমণী চমকিত হইলেন; ঈষৎ লজ্জায় রমণীর মুখ রঞ্জিত হইল। তিনি মুখ অবনত করিলেন, যুবক অনেকক্ষণ সেই প্রস্ফুটিত চম্পক ফুলবৎ সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী গৌরবর্ণা যুবতীকে দেখিলেন। পরে কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া মধুর স্বরে কহিলেন, "সুন্দরী, যদি স্বদেশবাসীর ধৃষ্টতা মাপ করেন, তবে একটি কথা জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা করি।" যুবকের করুণ কণ্ঠস্বরে রমণী মুগ্ধ হইলেন। কে যেন তাঁহার হৃদয়পটে সজোরে আঘাত করিতে লাগিল। রমণী যুবকের দিকে সোদ্বেগচিত্তে চাহিলেন, যুবক ধীরে ধীরে কহিলেন, "বিদেশীর ধৃষ্টতা মাপ করিবেন, আপনার পরিচয় জানিতে বাসনা। আপনাকে দেখিয়া বাঙ্গালী মনে হইতেছে, সেই জন্যই আমার আরও কৌতূহল জন্মিয়াছে আপনি কে?" অবনত মুখে রমণী উত্তর দিলেন, "আমি একজন ফুলওয়ালী"। এমন সময় সহসা দূর হইতে কে মধুর কণ্ঠে ডাকিলেন "অম্বালিকে"। রমণী যুবকেরদিকে করুণ নয়নে একবার চাহিয়া সেই কণ্ঠস্বরের অনুসরণ করিয়া চলিয়া গেলেন।

এ যুবক কে ?

রজনী প্রভাত হইতে না হইতেই যুবক সেই নির্জ্জন স্থানে পুনরায় উপস্থিত হইলেন, কিন্তু আজ আর বসিলেন না,সেই সুন্দর বনের মধ্যে পদচারণা করিতে লাগিলেন। এতদিন তিনি যেন অন্ধ হইয়া অন্ধকারে বিচরণ করিতেছিলেন, সহসা তাহার স্থির জীবনাকাশের উপর একটি অভিনব আলোক রেখা প্রজ্জলিত হইল। তিনি যে বাঞ্ছিত বস্তুকে স্বর্গলতা ভাবিতে ছিলেন তাহা যেন মর্ত্তেই প্রাপ্ত হইলেন। সেই সুন্দরীর আনন্দময়ী মূর্ত্তি তাহার মানসপটে বার বার উদিত হইতে লাগিল! সেই তুলিকা দ্বারা লিখিত ভ্রূযুগল, সেই পদ্ম-বিনিন্দিত মধুমাখা ওষ্ঠ, কৃষ্ণ কেশ রাশী, সেই পুষ্প বলয়ালঙ্কৃত সুন্দর বাহু, সেই লজ্জাবনত নয়ন, সেই অতুল লাবণ্যময়ী চিত্তহারিণী রমণী কে? আবার কি তাহার সাক্ষাৎ পাইব? না এ আমার দুরাশা মাত্র। এমন সময় অদূরে তাহাকে পূর্ব্বদিনের ন্যায় পুষ্প চয়নে নিবিষ্টা দেখিতে পাইলেন। ক্রমে ক্রমে

ফুলওয়ালী রমণী সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন। ফুল ওয়ালীর হস্তে সেই ফুল সাজি, কিন্তু রমণীর গৌরবর্ণ কিঞ্চিত ম্লান দেখাইতেছে। ফুলওয়ালী পুষ্প চয়ন করিয়া বেড়াইতে ছিলেন। এবং ক্ষণকালের মধ্যেই যুবক তাহার দৃষ্টি পথে পতিত হইলেন, আবার ফুল ওয়ালীর মুখ ঈষৎ লজ্জায় অবনত হইল। যুবক সসংকোচে ধীরে ধীরে তাহার নিকট আসিয়া দণ্ডায়মান হইলেন, সহসা ফুল-ওয়ালীর হস্ত কম্পিত হইল, ফুলসাজি ভূমিতে নিপতিত হইল। সাজির ফুলরাশি চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল। ফুলওয়ালী নীরব রহিল। যুবকও বিনা বাক্য ব্যয়ে ফুল কুড়াইয়া সাজিতে রাখিতে লাগিলেন। ফুলওয়ালীর শরীর তখনও কাঁপিতে ছিল। যুবক তাহার সম্মুখীন হইয়া কহিলেন, "সুন্দরি! আপনার ফুলসাজি লউন, ফুলওয়ালী যুবকের ভদ্রোচিত ব্যবহার ও মধুর স্বরে মুগ্ধ হইয়া মুখ তুলিয়া চাহিলেন। সেই উদার বদন-মণ্ডল, সেই প্রশস্ত ললাট, সেই বিশাল চক্ষু, সেই দেবকান্তি তরুণ যুবক তাহার সম্মুখে দণ্ডায়মান রহিয়াছেন দেখিলেন। ফুল-ওয়ালীর সুন্দর মুখকমল পুনরায় রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল। দেহ লতা সবেগে কম্পিত হইতে লাগিল। ললাটে বিন্দু বিন্দু ঘর্ম্মজল সঞ্চিত হইতে লাগিল। তিনি আর দাঁড়া-ইতে পারিলেন না। পদতলস্থ দুর্ব্বারাশির উপর বসিয়া পড়িলেন, যুবকও ফুলওয়ালীর সম্মুখে অনতিদূরে একটি শীলাতলে উপবেশন করিলেন।

ফুলওয়ালী যুবকের মুখপানে অনিমেষ লোচনে চাহিয়া রহিলেন, মস্তকে অবগুণ্ঠন নাই নেত্রে পলক নাই, রমণী জনোচিত সম্ভ্রম ও যেন আজ তিনি জলাঞ্জলী দিয়াছেন। কি এক অতীত স্মৃতি যেন আজ তাহাকে অভিভূত করিয়া ফেলিয়াছে, যুবক সে চাহনীতে মুগ্ধ হইলেন এবং বহুক্ষণ পরে যেন ঈষৎ লজ্জিত হইয়া মুখ ফিরাইলেন কিন্তু রমণী পূর্ব্ববৎ চাহিয়া আছেন। যুবক ক্ষণেক অব-নতমুখে থাকিয়া কহিলেন, "দেবি! আপনি আমাকে পরিচয় প্রদান করেন, আপনার মঙ্গল হইবে। আমার বিশ্বাস ফুল-ওয়ালীর চিরজীবন শুধু ফুল তুলিয়াই অতি-বাহিত হয় নাই।" ফুলওয়ালী স্থির দৃষ্টিতে যুবকের মুখপানে চাহিয়া ধীরস্বরে কহিলেন, "আমার এ দুঃখের জীবনের ইতিহাস এক ব্যক্তি ভিন্ন দ্বিতীয় ব্যক্তির নিকট ব্যক্ত করিব না, মনের এইরূপ সংকল্প ছিল কিন্তু আজ তাহা রক্ষা করিতে পারিলাম না, আপনি পরপুরুষ আমি কুলনারী; এরূপ নির্জ্জন স্থলে বসিয়া আপনার নিকট আমার আত্ম পরিচয় দেওয়া অন্যায় ও ধর্ম্মবিরুদ্ধ জানি। তথাপি আপনার নিকট আজ পরিচয় দিব। অভাগিনীর পরিচয়ে যদি কিছু লাভ থাকে, তবে শুনুন।"

সহসা বৃক্ষান্তরাল হইতে কে স্নেহপূর্ণ স্বরে ডাকিলেন "হেম, হেম।" যুবক মান-নীয় ব্যক্তির কণ্ঠস্বর শুনিয়া অতিশয় চঞ্চল হইয়া উঠিলেন। ফুলওয়ালী বাতান্দোলিতা-চম্পক পুষ্পবৎ দুলিতে দুলিতে গিরিগহ্বরে লুক্কায়িত হইলেন।

আত্ম-কাহিনী।

পরদিন প্রভাতে সেই স্থানে বসিয়া ফুল-ওয়ালী তেমনিভাবে যুবকের পানে চাহিয়া আত্ম কাহিনী বিবৃত করিতেছেন। যুবক সেই শিলাতলে উপবিষ্ট হইয়া উদ্বেগচিত্তে

শ্রবণ করিতেছেন। ফুলওয়ালী কহিলেন, "বাঙ্গালা দেশে আমার জন্ম। আমি একজন দরিদ্র ব্রাহ্মণের কন্যা, আমি যখন সপ্তম বর্ষীয়া তখন দ্বাদশ বৎসরের এক বালকের সঙ্গে আমার শুভ বিবাহ সম্পন্ন হইয়াছিল।" যুবক দেখিল ফুলওয়ালী পূর্ব্ব কথা স্মরণ করিয়া নয়নের অশ্রু বস্ত্রাঞ্চলে মুছিতেছেন। ফুলওয়ালী পুনরায় আরম্ভ করিলেন, "একদিন গ্রামের বেগবতী নদী পার হইয়া আমরা উভয়ে ওপারে আম্র কাননে যাইতে ছিলাম। তখন আমি দশম বর্ষীয়া ও তিনি পঞ্চদশ বর্ষীয়, তখন স্বামী কি রত্ন বুঝি নাই, কিন্তু তাহাকে ভাল বাসিতাম সেই জন্য তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে বেড়াইতাম। শ্বশুর আদর করিয়া তাঁহাকে অল্প বয়সে বিবাহ দিয়াছিলেন। এবং এরূপ চলা ফেরা খুব ভাল বাসিতেন। উভয়ে এক সঙ্গে খেলিতাম, কিন্তু শ্বশুর আমাকে বরাবর সঙ্গে রাখিতে ভাল বাসিতেন। আমি শ্বশুরকেই বাবা বলিয়া ডাকিতাম। আকাশে পূর্ব্ব হইতেই একটু কালমেঘ দেখা দিয়াছিল। মাঝামাঝি আমাদের ক্ষুদ্র নৌকা যখন আসিয়াছে, তখন সেই মেঘ গুলা একত্র হইয়া চতুর্দ্দিক অন্ধকার করিয়া ফেলিল সঙ্গে সঙ্গে প্রবল ঝড়ও বহিতে লাগিল। আমাদের ক্ষুদ্র নৌকাখানা টলমল করিতে লাগিল, ক্ষেপনী দূরে নিক্ষেপ করিয়া তিনি আমাকে দৃঢ় করিয়া ধরিলেন, নৌকা লক্ষ্য শূন্য হইয়া ছুটিয়া চলিল। নৌকা কোন্ দিকে চলিল তাহা আমাদের জ্ঞান ছিল না। কিন্তু ক্ষুদ্র নৌকা আর বেশীক্ষণ বাতাসের সঙ্গে যুঝিতে পারিল না, শীঘ্রই জলমগ্ন হইল। আমাদের নৌকা যখন জলমগ্ন হয় তখন তিনি আমাকে ছাড়িয়া দিয়া কহিলেন, এই আমাদের চিরবিচ্ছেদ নহে, ভয় নাই অম্বালিকে নূতন দেশে নূতন বেশে আবার আমাদের সাক্ষাৎ হইবে। ভগবান জানেন আমার হৃদয় নিধি কোথায় গেলেন। আমিও অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া ছিলাম। যখন জ্ঞান হইল তখন দেখিলাম আমি একজন বৃদ্ধার গৃহে। বৃদ্ধা পশ্চিম দেশীয়া। তিনি আমাকে নদী কূলে কুড়াইয়া পাইয়াছিলেন। আমি সুস্থ হইলে বৃদ্ধা আমাকে লইয়া স্বদেশে আসিলেন, ঐ যে শ্যামবর্ণ গ্রাম দেখা যাইতেছে ঐ গ্রামে বৃদ্ধার বাস, বৃদ্ধা একটী মঠে একটী সন্ন্যাসীর আশ্রয়ে থাকে। ঐ গ্রামেই আমি এখন বাস করিতেছি। তাহাও আজ সাত বৎসরের কথা। সে স্থানের বা গ্রামের দুর্গমবন ও উচ্চ গিরি চূড়া কিছুই আমার অপরিচিত নহে। বন-পুষ্প চয়ণ করিয়া গ্রামের মেয়েদের নিকট বিক্রয় করি সেই জন্যই আজ আমি ফুল-ওয়ালী। পূর্ব্বের কথা এখন বিস্মৃত হই নাই কখনও হইতে পারিব কি না সন্দেহ। আমার সেই হারানিধি আমার সেই শৈশবের সঙ্গী আমার সেই হৃদয়ের দেবতা, আজ কোথায়— হেম—।" আর বাক্য নিসরণ হইল না। ফুলওয়ালী কাঁপিতে কাঁপিতে মুর্চ্ছিতা হইয়া শীলাতলে পতিত হইলেন।

কিছুক্ষণ পরে সংজ্ঞালাভ করিয়া ফুল ওয়ালী গৃহাভিমুখে চলিয়া গেল, হেমচন্দ্রও তাহার বৃত্তান্ত শুনিয়া কি এক রকম সন্দেহের মধ্যে পড়িয়া গেলেন। এ ফুলওয়ালী কে?

পুনর্ম্মিলন।

পাঠক, পাঠিকা, আপনারা ফুলওয়ালীর মুখে শুনিয়াছেন যে তাহার স্বামীও জলমগ্ন হইয়াছিল। যে যুবকের সঙ্গে ফুলওয়ালীর

কথা হইতেছিল, সেই যুবকই ফুলওয়ালীর স্বামী হেমচন্দ্র। হেমচন্দ্রও স্রোতে ভাসিতে ভাসিতে অনেক দূরে একটা চড়াতে অজ্ঞান অবস্থাতে পড়িয়াছিলেন, এমন সময় একটা মহাজনের নৌকার মাঝি তাহাকে দেখিতে পাইয়া নৌকায় তুলিয়া নেয়। মহাজন পশ্চিম দেশীয় ছিলেন, তিনি তাহাকে নৌকায় তুলিয়া খুব যত্ন করিতে লাগিলেন। কিন্তু এত যত্ন সত্বেও পরদিন তাহার ভয়ানক জ্বর এবং পরে জ্বর বিকার উপস্থিত হইল। মহাজন তাহার জন্য টাকা ব্যয় করিতে কুণ্ঠিত হইলেন না। তাহার অর্থ ব্যয়েও শুশ্রূষায় সে-বার হেমচন্দ্র বাঁচিয়া গেলেন। কিন্তু তাহার দুর্ব্বলতা সারিতে অনেক সময় লাগিয়াছিল, তিনি সুস্থ হইয়া দেশে না যাইয়া এই মহাজনেরই নিকট কাজ কর্ম্ম করিতে লাগিলেন। স্ত্রীকে হারাইয়া হেমচন্দ্র যেন দেশের প্রতি বাড়ী ঘরের প্রতি অনেকটা মমতা-শূন্য হইয়া পড়িয়াছিলেন। প্রায় ৭ সাত বৎসর পরে তিনি বাড়ীতে খবর দেন। তাহার পিতা তাহার মৃত্যু হইয়াছে ভাবিয়াছিলেন। হঠাৎ চিঠি পাইয়া অন্য কাহাকে কিছু না বলিয়া একবারে হেমচন্দ্রের কাছে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাহাকে বক্ষে লইয়া মুর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। কতক্ষণ পরে সংজ্ঞালাভ করিয়া সমুদয় বৃত্তান্ত অবগত হইলেন।

কিছুদিন পিতা পুত্রে তথায় অবস্থান করিয়া দেশে রওনা হইলেন। দেশে ফিরিবার পথে তাহারা একটা রমণীয় স্থল দেখিয়া কয়েক দিন এখানে বিশ্রাম করিতে মনস্থ করিলেন। আজ কয়েক দিন তাহারা এই ফুলওয়ালীর দেশে আসিয়াছেন।

ফুলওয়ালী যে মঠে থাকে, সেই মঠের সন্ন্যাসী অতি সাধু ও ভাল লোক। তিনি বিদেশাগত লোকদের সঙ্গে প্রায়ই আসিয়া দেখা করেন। এবং হেমের পিতার সঙ্গেও প্রায়ই আসিয়া দেখা করিতেন। আজ যাবার সময় সন্ন্যাসীর মঠে বেড়াইতে তাহাকে অনুরোধ করিলেন। তিনি পরদিন হেমকে সঙ্গে নিয়া মঠে বেড়াইতে গেলেন। সন্ন্যাসীজী তাহাকে আদর করিয়া একটা ঘরে নিয়া বসাইলেন। একটা যুবতী আসিয়া দুই খানা ব্যাঘ্রচর্ম্ম দিয়া গেল। তাহারা সকলে উপবেশন করিলেন।

মানুষের বিংশতি বর্ষ পর্য্যন্ত শারীরিক গঠনের বিশেষ পরিবর্ত্তন হয়। তাহার পর তত বেশী পরিবর্ত্তন হয় না। যখন বালিকা জলমগ্ন হয় তখন তাহার বয়স দশ, এখন সপ্তদশ; সুতরাং এতদিন পরে তাহাকে চিনা দায়। কিন্তু হেমের পিতার বিশেষ পরিবর্ত্তন হয় নাই। কেবল তিনি বৃদ্ধত্বের দিকে একটুকু অগ্রসর হইয়াছেন। তাহাকে দেখিয়াই অম্বালিকা চিনিতে পারিয়াছে। কিন্তু তবুও পরিচয় জানিবার জন্য বড়ই উৎকণ্ঠিত হইয়া পড়িল।

সেই পূর্ব্ব কথিত বৃদ্ধাকে বলিয়া সন্ন্যাসীকে একবার ডাকাইয়া আনিল—এবং বলিল, "বাবা যিনি আসিয়াছেন, (সন্ন্যাসীকে বাবা বলিয়া ডাকিত) তিনি কি রায়পুরের জমিদার প্রতাপ নারায়ণ চৌধুরী?" সন্ন্যাসী—"আমি জিজ্ঞাসা করিয়া বলিতেছি।" এই বলিয়া তিনি আগন্তুক ভদ্রলোকটীকে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কি রায়পুরের জমিদার প্রতাপ নারায়ণ চৌধুরী?" তিনি বলিলেন—"হাঁ, কেন আমার পরিচয় জানিবার কি প্রয়োজন হইল?"

সন্ন্যাসী।—আমার একটী পালিতা কন্যা আছে, যে আপনাদিগকে আসন দিয়া গেল, সে জানিতে চাহিয়াছে।

আ।—তিনি আমাদের কথা কি করিয়া জানেন?

সন্ন্যাসী।—তাহা বলিতে পারি না।

আ।—আপনার আপত্তি না থাকিলে তাহাকে এখানে আনিয়া জিজ্ঞাসা করিতে পারি।

সন্ন্যাসী।—কোনও আপত্তি নাই। ডাকিতে বল্‌ছি।

বালিকা নিকটে আসিয়াই প্রণাম করিয়া দাঁড়াইল। তাহাকে দেখিয়া যেন তাহার মন কেমন করিয়া উঠিল। তিনি সন্ন্যাসীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি ইহাকে কেমন করিয়া পাইলেন?"

সন্ন্যাসী।—আমার একজন শিষ্য্য তাহাকে জলে ভাসিয়া আসিতে দেখিয়া অনেক কষ্টে তাহাকে বাঁচাইয়াছে। এবং অবশেষে আমার কাছে রাখিয়াছে। এই কথা বলিবামাত্র—তিনি বলিয়া উঠিলেন তবে কি তুমি অম্বালিকা? অম্বালিকা আর কথা বলিতে পারিল না। বৃদ্ধ তাহাকে কাছে বসাইয়া সন্ন্যাসীকে সমুদয় পরিচয় দিলেন।

হেমচন্দ্র যে সন্দেহ দোলায় দুলিতে ছিলেন, এখন তাহা দূর হইল। তাহার পিতা পুত্র-বধূকে প্রাপ্ত হইয়া অপার আনন্দে অভিভূত হইলেন। পরদিন সন্ন্যাসী অশ্রুপূর্ণ লোচনে, তাঁহাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিয়া স্বদেশাভিমুখে যাইতে অনুমতি দিলেন।

স্ত্রীরোগ

(বাধক)

সংসারাশ্রমে বাস করিতে হইলে প্রত্যেক মনুষ্যকে অনেক বিষয়ে জ্ঞানলাভ করিতে হয়। বিশেষতঃ আমাদিগের দেশে যেরূপ রোগ-শোকাদির প্রাবল্য, তাহাতে প্রত্যেক ব্যক্তিরই চিকিৎসা সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ অভিজ্ঞতা থাকা নিতান্তই প্রয়োজন হইয়াছে। সুখের বিষয়, অধুনা অনেক শিক্ষিত নরনারীগণ চিকিৎসা সম্বন্ধীয় পুস্তকাদি পাঠ করত চিকিৎসা সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করিয়া তাঁহাদিগের সন্তানদিগের চিকিৎসাদি করিয়া অনেক সময় শুভফল প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

পীড়াদি কাহারও আয়ত্তাধীন নহে। শরীরং ব্যাধি মন্দিরং—কোন্ সময়ে কাহার শরীরে কোন্ ব্যাধি কিরূপ ভাবে প্রকাশ পাইবে, কে বলিতে পারে? অতএব শরীরে কোনরূপ রোগ প্রকাশ পাইবামাত্রই তৎ-প্রতিকার বিষয়ে যত্নবান হওয়া বুদ্ধিমানের কার্য্য। দুঃখের বিষয়, অস্মদ্দেশীয় অনেক স্ত্রীলোকই লজ্জাভয়ে তাঁহাদিগের দেহাভ্যন্তরস্থ দুঃসহ যন্ত্রনাদায়ক উৎকট পীড়াদি থাকা স্বত্বেও কাহারও নিকট এমন কি স্বামীর সন্নিকটেও প্রকাশ বা তৎপ্রতিকার বিষয়ে প্রয়াস পান না। আজীবন বাধক বা তদনুরূপ অন্যবিধ রোগাদির যন্ত্রণাভোগ ও পুত্রমুখ দর্শনে বঞ্চিত হইয়া দুঃখিতান্তঃকরণে কালাতি-

পাত করেন এবং নিজ অদৃষ্টের উপর সমস্ত দোষারোপ করিয়া নিশ্চিন্ত থাকেন। স্ত্রীলোকদিগের বাধকরোগ অত্যন্ত কষ্টদায়ক; তৎপ্রতিকার বিষয়ে অনেকরূপ চিকিৎসাদিরও ব্যবস্থা আছে; তন্মধ্যে যে ঔষধগুলি সচরাচর ব্যবহৃত হয়, তাহাই এইস্থলে উল্লেখিত হইল।

যদ্যপি রীতিমত ঋতু-শোণিত নির্গত না হয় ও তাহার সহিত তলপেটে বেদনা ও যন্ত্রণা থাকে এবং তজ্জন্য গর্ভের প্রতিবন্ধকতা ঘটে, তবে সাধারণতঃ সেই ঋতুকে বাধক ঋতু ও তাহার বেদনাকে বাধকের বেদনা বলা যায়। এই রোগ সন্তানাদি হওয়ার পূর্ব্বেই অধিক হইয়া থাকে। এই রোগে আক্রান্ত হইলে শরীরে জ্বরবোধ হয়; শরীর উষ্ণ ও নাড়ী দ্রুতগতি হয়; বিলক্ষণ তৃষ্ণাবোধ হয়; ব্যাকুলতা, উরু ও কটিদেশে বেদনা, বস্তিদেশে ভারবোধ, ও কখন কখনও শ্বাসে কষ্টবোধ হইয়া থাকে। এই সকল উপসর্গ দূর করিতে হইলে, প্রথমতঃ ঋতুকালে যাহাতে কষ্ট দূরীভূত হইয়া ঋতু-শোণিত নিয়মিতরূপ নির্গত হয়, এবং পরে যাহাতে অন্যান্য বারের ঋতুসময়ে রোগের যন্ত্রণা হইতে রক্ষা পাওয়া যায়, এই দুইটী বিষয়ে দৃষ্টি রাখিতে হইবে।

রোগ উপস্থিতকালে যন্ত্রণা নিবারণের জন্য অর্দ্ধ ছটাক পরিমাণ শীতল জলে ১০।১৫ বিন্দু লডেনম্ (আফিমের আরক) মিশ্রিত করিয়া পান করিতে দিবে। দুই এক ঘণ্টা অন্তর ৪।৫ বার উক্ত ঔষধ পান করিলে বেদনা ও যন্ত্রণা দূর হইয়া যাইবে। শোণিত অধিক পরিমাণে নির্গত হইলেই বাধকের বেদনা হ্রাস হইবে। গরম জলের টবে বসিলে অধিক পরিমাণে রক্তস্রাব হইয়া থাকে, অতএব প্রাতে ও বৈকালে দুই এক দণ্ড করিয়া রোগীকে গরম জলের টবে বসাইতে হইবে। সন্ধ্যার পর বসাইলেই বিশেষ উপকার দর্শে। যে পর্য্যন্ত ঋতুর সময় উত্তীর্ণ হইয়া না যায়, সেই পর্য্যন্ত প্রত্যহই রোগীকে গরম জলের টবে বসাইবে। এ ব্যবস্থাটী অতিশয় উপকারী। গরম জলের টব হইতে উঠিয়া শুষ্ক গামছা দ্বারা শরীরের জল মুছিয়া শুষ্ক বস্ত্র পরিধান করিবে ও একখানা মোটা কাপড়ে পা পর্য্যন্ত ঢাকিয়া শুইয়া থাকিবে, মধ্যে মধ্যে একটু গরম দুগ্ধ পান করিবে ও আবশ্যকমত অন্যরূপ লঘু আহার করিবে। অধিক চলাফিরা বা পরিশ্রম করিবে না। শীতল জল স্পর্শও করিবে না,—স্নান আহারাদি সমুদয় কার্য্যাদি উষ্ণ জলে সম্পন্ন করিবে; এবং শীতল বাতাসও গায়ে লাগাইবে না, বা অন্য কোনরূপ শীতল বস্তু ব্যবহার করিবে না। পুনরায় এই সকল কষ্ট উপস্থিত না হয়, তজ্জন্য ঋতু হওয়ার নির্দ্দিষ্ট দিবসের দুই তিন দিন পূর্ব্বে রোগীকে পূর্ব্বোক্তরূপ গরম জলের টবে বসাইতে হইবে ও ঋতু উপস্থিত হইলে যন্ত্রণা নিবারণের জন্য পূর্ব্বলিখিত প্রণালীতে আফিমের আরক পান করাইবে। আর ঋতুর সময় উত্তীর্ণ হইয়া গেলে ১ ভাগ হিরাকস, ২ ভাগ মুসব্বর, ও আবশ্যক হইলে বটিকা বাঁধিবার উপযুক্ত যৎকিঞ্চিৎ জল একত্র করিয়া ৩ রতি পরিমাণ এক একটী বড়ি বাঁধিয়া তাহার একটী বড়ি প্রাতে ও একটী বড়ি বৈকালে শীতল জলের সহিত সেবন করিবে। ঋতু উপস্থিত হইলে এই ঔষধ ব্যবহার করিবে না, বিরাম হইলে পুনরায় সেবন বিধি। যে পর্য্যন্ত রোগের উপশম না হয়, সেই পর্য্যন্ত এই ঔষধ ব্যবহার করিবে। ক্রমান্বয়ে চারি পাঁচ মাস

কাল পর্য্যন্ত উল্লিখিতরূপ প্রণালীতে চলিলেই বাধকের দোষ দূর হইয়া যাইবে। নিতান্ত পক্ষে উপশম না হইলে অন্যরূপ চিকিৎসা অবলম্বন করিবে।

অন্যরূপ ব্যবস্থা।

বাধক পীড়ায় ওলটকম্বল শিকড় মহোপকারী বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। ৪।৫ অঙ্গুলী পরিমাণ একটী শিকড় ৮।১০টী গোলমরিচের সহিত পিশিয়া একটী বড়ির মত প্রস্তুত করিবে এবং ঋতু উপস্থিতকালের আনুমানিক দুই তিন দিন পূর্ব্বে প্রত্যহ ঐরূপ এক একটী বড়ী খাইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমে আট নয় দিন পর্য্যন্ত সেবন করিবে। এক ঋতুতে উপকার না দর্শিলে পুনরায় সেবন করিতে হইবে। এইরূপে রোগের হাতে মুক্তিলাভ করিতে পারিলেই গর্ভের প্রতিবন্ধকতা দূর হইবে।

আয়ুর্ব্বেদ গ্রন্থাদিতে উল্লেখ আছে যে, এই রোগ অনিয়মিত আহার, আচরণ এবং দূষিত রজোরক্ত দ্বারাই সমুৎপন্ন হইয়া থাকে। বৈজিক দোষ অর্থাৎ পিতৃ-মাতৃ গত প্রকৃতির দোষেও জন্মিতে পারে, এবং কখন কখনও দৈবাধীনও হইয়া থাকে।

উক্ত ব্যাপদ রোগের কোন কোন অবস্থায় ফেনবৎ রজোরক্ত কষ্টের সহিত পরিত্যক্ত হয়; আবার কোন কোন অবস্থায় তলপেটে, কটিদেশে ও জননেন্দ্রিয় প্রভৃতিতে নিত্য বেদনা বর্ত্তমান থাকে। কোন কোন অবস্থায় বার বার গর্ভ রক্ষিত হইয়াও বিনষ্ট হয়; কোন অবস্থায় বা জননেন্দ্রিয় মধ্যে এক প্রকার মাংসগ্রন্থি উৎপন্ন হইয়া থাকে, এবং ইহা পিচ্ছিল, কণ্ডু বিশিষ্ট ও অতিশয় শীতল অনুভব হয়। কখন কখনও দাহের সঙ্গে শোণিতও পতিত হইয়া থাকে, কখনও বা বিজ্বরের লক্ষণও প্রকাশ পায়। এই সকল লক্ষণ ব্যতীত কাহারও হাতে পায়ে জ্বালা, তলপেটে বেদনা, শরীরে ভার ও উদ্বেগ বোধ হয় এবং অধিক পরিমাণে রক্তপাত হইয়া থাকে। কখনও বা ৩।৪ মাস কাল পরেও ঋতু-শোণিত নির্গত হইতে দেখা যায়। কোন কোন স্ত্রীলোকের স্তনদ্বয় স্থূল ও ভার, শরীর কৃশ, জননেন্দ্রিয়ের বেদনা, ও বহুকাল পর পর ঋতু হইয়া অল্পে অল্পে রক্তপাত হয়। কাহারও বা স্তনদ্বয় অতি ক্ষুদ্র ও শোণিতপাতের একেবারে অভাব লক্ষিত হইয়া থাকে।

এই রোগ প্রতীকারের জন্য অশ্বগন্ধার মূল দুই তোলা, দুগ্ধ এক পোয়া, জল এক সের ও ঘৃত আধ তোলা ব্যবস্থেয়। প্রথমে অশ্বগন্ধার মূল কুটিয়া দুধ ও জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া মৃদুতাপে সিদ্ধ করিবে, এবং এক পোয়া অর্থাৎ দুগ্ধের পরিমাণমাত্র অবঅবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া, ছাঁকিয়া লইয়া, ঘৃত মিশ্রিত করিয়া পান বিধি। যাঁহার সচরাচর ঘৃত খাওয়া অভ্যাস, তাঁহাকে ৩।৪ তোলা পর্য্যন্ত ঘৃতও দেওয়া যাইতে পারে। এই ঔষধটী ঋতুস্নানের দিন হইতে ২।৪ দিবস পান করিলেই বাধকের উপশম হইবে।

ক্বাথেন হয়গন্ধায়া সাধিতং সঘৃতং পয়ঃ।
ঋতুস্নাত বনাপীত্বা ধত্তে গর্ভং ন সংশয়ঃ॥

ঋতুস্নান দিবসে পিপুল, শুণ্ঠি, মরিচ, নাগেশ্বর, প্রত্যেকের চূর্ণ ১ মাষা ঘৃতের সহিত মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে গর্ভের বাধা নিবারিত হয়।

পিপ্পলি শৃঙ্গবেরঞ্চ মরিচং নাগকেশরম্।
ঘৃতেন সহ পীতব্যং বন্ধ্যাপি লভতে সুতম্॥

ওলটকম্বলের মূল গোলমরিচসহ সেবন করিলে যে বাধকের দোষ দূর হয়, তাহা পূর্ব্বেই উল্লেখিত হইয়াছে; তদ্ব্যতীত শ্বেত বেড়েলার (এক প্রকার গুল্ম) মূল দুই তোলা, যষ্টিমধু দুই তোলা, ও চিনি আট তোলা, উত্তমরূপে মিশ্রিত করিয়া, দুগ্ধ ও ঘৃতের সহিত পান, অথবা অর্দ্ধ তোলা শ্বেত কণ্টিকারীর মূল, অর্দ্ধ পোয়া গরম দুগ্ধের সহিত কিছু দিন সেবন করিলেও, গর্ভের প্রতিবন্ধকতা নিবারিত হইবে।

সোমঘৃত, ফলঘৃত, ও ক্ষারতৈল ব্যবহার দ্বারা এই রোগে বিশেষ উপকার সাধিত হইয়া থাকে। ইহা ভিন্ন নিম্নলিখিত প্রক্রিয়াটী দ্বারাও অনেক অবস্থায় বিশেষ উপকার দর্শে। মৎস্যপিত্তে রেশমী বস্ত্রখণ্ড একবিংশতিবার ভিজাইয়া তদ্দ্বারা জননেন্দ্রিয় আবৃত করিয়া রাখিবে, অথবা সুরাবীজ বা (খাখোর চূর্ণ) মধুর সহিত মিশাইয়া প্রসব দ্বারের উপর প্রলেপ দিবে; ইহাতে শোথ, কণ্ডু ও ক্লেদ, নিঃসরণ দূরীভূত হইবে।

বাধক-রোগাক্রান্তা রোগিনীকে পুষ্টিকর, স্নিগ্ধ ও লঘু আহার দিবে। রোগের প্রাবল্য সময়ে শাক, অম্ল, দধি ও মৎস্যাদি দশ পোনের দিন আহার করা নিষিদ্ধ।

(সময় পত্রিকা হইতে উদ্ধৃত)

নলিনী।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

জগদীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কাশীর একজন জমীদার এবং অনারেরি মাজিষ্ট্রেট, বিদ্যাবুদ্ধি দরিদ্র পালন, ধর্ম্মজ্ঞান, প্রভৃতি সদ্‌গুণে জগদীশবাবু একজন শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি। কাশীতে এমন অল্পলোকই আছে,যে জগদীশ বাবুর গুণাবলীর প্রশংসা না করে।

জগদীশ বাবুর বাড়ীটী ত্রিতল এবং সুবৃহৎ। বহির্ভাগে অনেকটা সাহেবি ধরণে প্রস্তুত কিন্তু ভিতরে বাঙ্গালীর সেই সাবেকি ধরন। প্রকাণ্ড সিংহদ্বারি ফটকের পরেই বৃহৎ প্রাঙ্গন,প্রাঙ্গনের চারিধারে বিবিধ প্রকার ফুল গাছ সুদৃশ্য টবের উপরে শোভা পাইতেছে। একস্থানে কাছারী ঘর, তথায় বাবুর দেওয়ান, আমলাবর্গ সহ জমীদারি সংক্রান্ত কাজকর্ম্ম দেখেন। সম্মুখে প্রকাণ্ড চণ্ডিমণ্ডপ, নাটমন্দির এবং অন্যান্য কতক গুলি দেবালয় শোভা পাইতেছে। দেবালয়ের পশ্চাতে পুষ্পোদ্যান, পুষ্পোদ্যানের সন্নিকটে মালিদের ও পূজারিদের গৃহ।

জগদীশবাবুর আমলাদের মধ্যে কেহ কেহ তাঁহার আলয়েই বাস করিতেন তাঁহাদের জন্যও কতগুলি গৃহ আছে। এতদ্ব্যতীত দ্বারবান ও দাস দাসীদিগেরও স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র গৃহ আছে। দ্বিতলের উপরে রন্ধন গৃহ,ভাণ্ডার গৃহ, স্নানাগার ও বাবুর বৈঠক খানা। বৈঠক খানার কিঞ্চিদ্দূরে বিনয়ের পাঠাগার এবং তাহার পার্শ্বেই ভবেশ চন্দ্রের বাসগৃহ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

ত্রিতলের উপরে বাবুর পরিবারেরা বাস করেন তাঁহাদিগকে আর নীচে নামিতে হয় না। তাঁহাদের স্নানাহার সেখানেই সম্পন্ন হয়। পরিবারের মধ্যে বাবুর ষোড়শ বর্ষীয়া স্ত্রী, বিধবা ভ্রাতৃবধূ, এবং একটী দূর সম্পর্কীয়া ভগিনী। জগদীশ বাবুর বয়স প্রায় ৫০ পঞ্চাশ পার হইয়াছে, তাঁহার স্ত্রীর বয়স

ষোড়শ বৎসর শুনিলে কেহ কেহ হয়তো আশ্চর্য্য মনে করিবেন। বলা বাহুল্য নলিনী জগদীশ বাবুর দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী। প্রথমা স্ত্রীর পরলোকপ্রাপ্তি হইলে কিছু দিবস পর্য্যন্ত জগদীশ বাবু শোকে ব্যাকুল চিত্ত ছিলেন। একজন স্ত্রীলোককে আজীবন মনে রাখিয়া, তাহার জন্য চিরদিন ক্রন্দন করা দুর্ব্বল হৃদয়ের পরিচায়ক বলিয়াই হউক, অথবা পুরুষ জাতি মাত্রই যে নিয়মের অধীন, তাই বলিয়াই হউক, তাঁহার রাশি রাশি সদ্‌গুণ থাকিলেও তিনি সে নিয়মের ব্যতিক্রম করিয়া আইনের মর্য্যাদা নষ্ট করিতে পারিলেন না। তাই আট চল্লিশ বৎসর বয়সে চতুর্দ্দশ বর্ষীয়া বালিকার পাণিগ্রহণ করিলেন। নলিনী দেখিতে মন্দ নহে কিন্তু তাহার সেরূপে চক্ষু ঝলসাইয়া যায় না; সেরূপ অতি মধুর! শারদীয় জ্যোৎস্নার ন্যায় স্নিগ্ধোজ্জ্বল! কিন্তু বুঝি বিবাহের পর হইতে, সেই নয়নানন্দবর্দ্ধক রূপরাশি ধীরে ধীরে মলিন ছায়ায় আবৃত হইতেছে। নলিনী স্বামীগৃহে আসিয়া দেখিল সংসারে তাহার কোনই অপ্রতুল নাই, গৃহসজ্জা, অলঙ্কার, দাস দাসী প্রভৃতি কিছুরই অভাব নাই। দাস দাসীদের মধ্যে একজনকে এক কার্য্যে হুকুম করিলে পাঁচ জনে সেই কার্য্যে ছুটিয়া যায়, নূতন গৃহিনীর মনস্তুষ্টি সাধনের জন্য সকলেই ব্যগ্র! দূর সম্পর্কীয়া ননদিনী এবং বিনয়ের মাতাও নলিনীকে স্নেহের চক্ষেই দেখিতেন, স্বামী কখনও নলিনীর প্রতি অযত্ন বা তাচ্ছিল্য প্রদর্শন করিতেন না, তথাপি তাহার মুখে সর্ব্বদাই কি একটা যাতনার ছায়া কি একটা আঁধার আঁধার ভাব খেলা করিত তাহা কেহ বুঝিয়া উঠিতে পারিত না। নলিনীর মুখখানি সকল সময়েই যেন বিষাদ ভাবে নিপীড়িত! স্বামী নিকটে আসিলে সময় সময় সে প্রফুল্লতা দেখাইতে চেষ্টা করে বটে, কিন্তু সকল সময় তাহার সেযাতনার মর্ম্মভেদী দীর্ঘ নিঃশ্বাস গোপন করিতে পারে না।

বাল্যকাল হইতেই নলিনীর লেখা পড়ার প্রতি কিছু অনুরাগ ছিল। সে তাহার এবং পিতা মাতার যত্নে বাঙ্গালী মেয়ের উপযুক্ত কিঞ্চিৎ লেখা পড়াও শিক্ষা করিয়াছিল। হিন্দুশাস্ত্রে স্বামী, স্ত্রীর দেবতা, স্বামী ব্যতীত হিন্দু স্ত্রীর অন্য উপাস্য দেবতা নাই, তাহা বুঝিতেও. নলিনীর বাকী ছিল না। বিবাহ হইলে নলিনী স্বামী সমীপে নীতা হইল, বলা বাহুল্য স্বামীকে দেখিয়া তাহার প্রাণে তেমন আনন্দ হইল না, স্বামী দেবতা তাহা সে যেমন বুঝিয়াছিল, কিন্তু বিবাহিত স্বামীকেই যে হৃদয়ের সম্পূর্ণ প্রেম ভালবাসা ঢালিয়া দিতে হইবে এবং একমাত্র হৃদয়ের বন্ধু আত্মীয় বা অভেদাত্মা ভাবিতে হইবে, তাহা বুঝি নলিনী শিক্ষা করেন নাই বা তাহার পিতা মাতাও তাহাকে সে শিক্ষা দেন নাই।

আজ বাহিরে বড় কাজকর্ম্ম নাই, বেলা ৪টা না বাজিতেই জগদীশ বাবু একবার অন্তঃপুরে আসিলেন, দেখিলেন তাহার নূতন গৃহিণী শয়ন করিয়া আছেন, নিদ্রা যায় নাই। নলিনী কি চিন্তায় মগ্ন ছিল, স্বামীর পদ শব্দ কর্ণকুহরে প্রবেশ করিল না, জগদীশ বাবু নিকটে যাইয়া ডাকিলেন, "নলিনি!" নলিনী ত্রস্তে উঠিয়া বসিল, এবং ঘোমটা টানিয়া দিল। জগদীশ বাবু বলিলেন, "তুমি ঘুমাইতেছিলে। তবে আমি ডাকিয়া বড় অন্যায় করেছি।" নলিনী আর একটু সরিয়া বসিল, এবং সঙ্কুচিত স্বরে বলিল, "না তাতে আর দোষ কি? আমি এই মাত্র শুয়ে ছিলাম; ঘুমাই নি।"

জগদীশ বাবু বলিলেন, "নলিনি! তুমি আমাকে দেখিয়া এত লজ্জা কর কেন? আর সর্ব্বদা এমন মলিন মুখেই বা থাক কেন? আমাকে কি বলিবে?" নলিনী আর একটু ঘোমটা টানিয়া দিল, কি বলিতে ইচ্ছা করিল বলিতে পারিল না। জগদীশ বাবু আবার বলিলেন, "চুপক'রে রহিলে কেন? বোধ হয় জান, স্ত্রী অসুখী হইলে স্বামী তজ্জন্য ঈশ্বরের নিকট দায়ী!"

কর্ত্তব্য পরায়ণ ধার্ম্মিক জগদীশ! একথা অগ্রে বুঝিলেন না কেন? একজনকে হৃদয় সমর্পণ করিয়া তাহাই ফিরাইয়া লইয়া অন্যকে দিতে চাও? তোমার উচ্ছিষ্ট হৃদয় লইয়া যদি কেহ সুখী না হয় তবে তাহাকে কি করিবে?

জগদীশ বাবু নলিনীকে নিরুত্তর দিখিয়া পুনরায় বলিলেন, "আমার সাধ্যানুসারে সংসারিক বিষয়ে তোমাকে কোন ক্লেশ পাইতে দেই না; তবে কি"—কম্পিত গদ্গদ্ কণ্ঠে জগদীশ বলিলেন "তবে কি আমার সহিত বিবাহ হইয়া সুখী হও নাই?" এবার নলিনী অনেক চেষ্টা করিয়া স্বামীর কথার জবাব দিয়া বলিল, "আপনি ওসব কথা বলেন কেন? আমি কি করেছি?" "করেছ! আর কি করিবে! তুমি কি স্বামী স্ত্রীর সম্বন্ধ জান না? স্বামীকে কি কেহ তোমার ন্যায় পর ভাবে? যাউক, তুমি আমাকে যাহাই মনে কর, তাহা জানিয়া আমার আর প্রয়োজন নাই, তুমি সর্ব্বদা কেন মলিন মুখে থাক, তাহাই আমাকে বল!" বলিতে বলিতে জগদীশ বাবুর আয়ত নয়ন দুইটী অশ্রু ভারাক্রান্ত হইল, নলিনী বুঝিল স্বামী তাহার ব্যবহারে ব্যথিত হইয়াছেন। নারী স্বভাব সুলভ কোমল হৃদয় আর্দ্র হইল, ধীরে ধীরে উঠিয়া স্বামীর নিকটে আসিয়া স্বীয় অঞ্চলদ্বারা স্বামীর অশ্রুজল মুছাইয়া দিতে গেল কিন্তু তাঁহার মুখপানে চাহিতেই তাহার কেমন ভয় ও লজ্জা হইতে লাগিল, চক্ষু মুছাইয়া দিতে পারিল না, আনত বদনে দাঁড়াইয়া রহিল। জগদীশচন্দ্র হৃদয়ে গুরুতর যন্ত্রণা লইয়া নয়নে অশ্রু লইয়া ধীরে ধীরে গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন।

জগদীশ বাবু গৃহ হইতে বহির্গত হইলে নলিনী বড়ই অপ্রতিভ ও দুঃখিত হইল, প্রতিজ্ঞা করিল আর কখনও স্বামীর সহিত অপ্রিয় ব্যবহার করিবে না, সাধ্যানুসারে স্বামীর সহিত প্রাণ খুলিয়া কথা বলিবে; তাহার দ্বারা যদি স্বামী অসুখী হয়েন তাহা হইলে তাহার নরকেও স্থান হইবে না, ইহা নলিনী বুঝিল। সন্ধ্যার পর জগদীশ বাবু উপরে আসিলেন, এবার নলিনী স্বামীকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য বদ্ধ পরিকর! সে উঠিয়া স্বহস্তে সরবত্ লইয়া স্বামীকে দিতে গেল, হাতে দিতে সাহস পাইল না, টেবিলের উপরে রাখিয়া চুপ করিয়া তথায় দাঁড়াইয়া রহিলেন। জগদীশ বাবু সরবত্ পান করিলেন না, নলিনীকেও কিছু বলিলেন না, দেওয়াল স্থিত একখানি চিত্রের দিকে অনিমেষ লোচনে চাহিয়া রহিলেন। চিত্র একজন সুন্দরী রমণীর প্রতিমূর্ত্তি, উহা যেন সজীব মূর্ত্তির ন্যায় তাঁহার পানে চাহিয়া আছে। বলা বাহুল্য এই ছবিখানি জগদীশ বাবুর প্রথমা স্ত্রীর। জগদীশ বাবু ভাবিতেছেন, "এই মূর্ত্তি কি আজকেই এত সুন্দর দেখিতেছি? না চিরদিনই এইরূপ মনোরম ছিল?"

জগদীশ! তোমার দারুণ ভ্রম! এমূর্ত্তি যেমন নির্ম্মল, উজ্জ্বল, নয়নানন্দদায়ক ছিল

তেমনই আছে তুমিই ইহাকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক আর এক নবরাজ্যে প্রবেশ করিতে গিয়াছিলে, নূতন লোককে ভালবাসিয়া নূতন ভালবাসায় আপনাকে সুখী করিতে গিয়াছিলে। তখন তোমার পূর্ব্ব প্রণয়িনীর মূর্ত্তি তোমার চক্ষে নিষ্প্রভ প্রতীয় হইতেছিল ;—আজ তুমি তোমার অভিলষিত পথে বাধা প্রাপ্ত হইয়াছ, নূতন প্রেমিকার নিকট প্রত্যাখ্যাত হইয়াছ, তাই এই পুরাতন মূর্ত্তি এত সুন্দর দেখিতেছ এত মধুর মনে করিতেছ।

চিত্রের দিকে চাহিতে চাহিতে জগদীশ বাবুর নয়ন প্রান্তে দুই বিন্দু অশ্রু দেখা দিল, নলিনীর মুখ অবগুণ্ঠনাবৃত ছিল বলিয়া সে তাহা দেখিতে পাইল না, কিন্তু নির্ব্বাক হইয়া স্বামীকে চিত্রের দিকে চাহিয়া থাকিতে দেখিয়া সে কিছু বিস্মিত হইল, সে জানিত না যে এই চিত্র তাহার সপত্নীর। আজ নলিনী প্রতিজ্ঞা করিয়াছে, স্বামীর সহিত কথা বলিবে, তাহার মলিন মুখ দেখিবে না, তাই একবার অনেক চেষ্টার পর ভয়ে ভয়ে মৃদুস্বরে বলিল, "আপনি সরবত্ খেলেন না?" জগদীশবাবু নলিনীর দিকে চাহিলেন, দেখিলেন সে মুখে, স্নেহ, ভালবাসা, প্রেম কিছুই নাই বিরক্তি স্বরে বলিলেন, "আজ খাব না।" নলিনীর বড় দুঃখ হইল, বুঝিল স্বামী তাহার প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়াছেন, নতুবা প্রতিদিন পরিচারিকা প্রদত্ত সরবত্ পান করেন, আজ তাহার স্বহস্তে প্রস্তুত সরবত্ পান করিলেন না কেন? নলিনী আর কোনও কথা বলিতে সাহস পাইল না, ধীরে ধীরে গৃহ হইতে চলিয়া গেল ভাবিল "আজ একটা বলিতে পারিয়াছি কাল্ আর দুইটা বলিব, উহার উপর তো আমার অশ্রদ্ধা নাই, তাহা হইলেও কি আমার পাপ হইবে?

জগদীশ বাবু উঠিয়া ধীরে ধীরে দেওয়াল হইতে চিত্রপট খানি খুলিয়া লইলেন, ধীরে ধীরে তাহার জীবত্ব হীন মুখ খানি চুম্বন করিয়া তাহাকে হৃদয়ে চাপিয়া ধরিলেন ;—আবার তাঁহার চক্ষে জল আসিল। অতীত জীবনের ঘটনাগুলি মনে হইয়া যাতনায় প্রাণ পুড়িয়া যাইতে লাগিল। চিত্রখানি বক্ষে চাপিয়া ধরিয়া জগদীশ বাবু ধীরে ধীরে বহির্বাটিতে চলিয়া গেলন।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

"খুড়িমা! খুড়িমা! একটা মজা দেখ্‌বে এস" বলিয়া বিনয়কুমার নলিনীর নিকটে আসিয়া দাঁড়াইল, এবং সোৎসাহে তাহার মুখ পানে চাহিয়া রহিল। নলিনী বলিল, "কি মজা আগে শুনি!"

বিনয়। আমার মাষ্টার মহাশয় গান কচ্ছেন, কেমন সুন্দর শুন্‌বে এস!

নলিনী গান শুনিতে ভালবাসে, বিনয় তাহা জানিত। নলিনীর মুখখানা প্রফুল্ল হইল বলিল, "কোথায়?"

বিনয়। তিনি তাঁর ঘরে বসে গান কচ্ছেন, তুমি আমার পড়িবার ঘরে গেলেই শুনিতে পাবে।

নলিনী। সেখানে গেলে তো কেউ দেখ্‌তে পাবে না?

বিনয়। না, সেখানে কেউ নাই।

তবে চল বলিয়া, নলিনী বিনয়ের পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইয়া তাহার পাঠাগারে উপস্থিত হইলেন। ভবেশের মধুর কণ্ঠ নিঃসৃত গীতধ্বনি স্পষ্ট শ্রুত হইতে লাগিল। নলিনী গৃহের এক পার্শ্বে উপবেশন করিয়াছিল, এমন সময় বিনয় একখানা চেয়ার আনিয়া তাঁহাকে বসিতে অনুরোধ

করিল, নলিনী বলিল, "থাক্ থাক্ চেয়ারে আর প্রয়োজন নাই, এখানেই বেশ বসেছি।"

বিনয় আজ আপনার আলয়ে খুড়িমাকে আদর অভ্যর্থনা করিবে, সে নলিনীর আপত্তি শুনিবে কেন? নলিনী অগত্যা চেয়ারে বসিতে বাধ্য হইল।

ভবেশ গাহিতেছেন,—

"দুঃখের কান্না কাঁদ্‌বো না আর
গাইব তোমারি জয়।
কিসেরি ভাবনা আমার কিসেরি বা এত ভয়,
সুখে দুঃখে দিন যাবে;
তুমি যা কর তাই হবে,
বিপদে সম্পদে হরি তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হয়।
বাসনা বিকার ঘোরে,
হাসায় কাঁদায় মোরে,
হাসি কান্না সবি মিছে
তুমি সার দয়াময়।"

ইত্যাদি।

গীত সমাপ্ত হইল, নলিনী গান শুনিয়া প্রাণে বড় আনন্দ অনুভব করিল ভবেশের সুমিষ্ট স্বর তাহার হৃদয়ের স্তরে স্তরে বাজিতে লাগিল। নলিনী নীরবে বসিয়া রহিল, বিনয় বলিল, "খুড়ি মা! কেমন শুনিলে?" খুড়ি মা নিরুত্তর! এমন সময় ভবেশ ডাকিলেন "বিনয়!" বিনয় তাঁহার নিকটে গেল, তিনি বলিলেন, "কাল রবিবার, আজ সন্ধ্যার পূর্ব্বেই আমি বাবার ওখানে যাইব, তুমি ভাল ক'রে পড়া ঠিক্ করে নাও।" "আচ্ছা" বলিয়া বিনয় ত্বরিত পদে পড়িবার গৃহে আসিল এবং ব্যস্ততা সহকারে বলিল, "খুড়িমা! শীগ্‌গির উপরে চল, মাষ্টার মহাশয় এখনি আমাকে পড়াতে আসিবেন;" নলিনী আর দ্বিরুক্তি না করিয়া মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় বিনয়ের পশ্চাদানুসরণ করিল। যখন তাহারা সোপানে আরোহণ করিতেছিল, সেই সময় ভবেশ নিজের গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া বিনয়ের পাঠাগারের দিকে চলিলেন; নলিনী ভবেশকে দেখিল; তাহার অচঞ্চল, সুখবিহীন হৃদয়, কি এক অপ্রত্যাশিত অচিন্তনীয় সুখে এবং মধুরভাবে ক্ষণকালের জন্য চঞ্চল ও পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। নলিনী বিস্ময় বিস্ফারিতনেত্রে বিনয়ের দিকে চাহিয়া বলিল, "বিনয়! বিনয়! উনিই তোমার মাষ্টার?" বিনয় বলিল, "হাঁ।" নলিনী মনে মনে বলিল, "গলাও যেমন মিষ্টি, চেহারাও তেমনি সুন্দর! এমন সুন্দর কি মানুষ থাকে?" বস্তুতঃ ভবেশ তাদৃশ সুন্দর পুরুষ নহে, নলিনীর রূপের সহিত তুলনায় ভবেশের রূপ আকাশ পাতাল ব্যবধান।

নলিনী ভবেশকে দেখিল;—যেন অকূল সমুদ্রে পতিত কাণ্ডারীবিহীন ক্ষুদ্র তরণী দৈববলে কূল প্রাপ্ত হইল। সেইদিন হইতে নলিনীর স্বভাবের কেমন একটা পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইল। যে দিন জগদীশবাবু তাঁহার প্রথমা স্ত্রীর চিত্রপটখানি বুকে লইয়া বহির্ব্বাটীতে গিয়াছেন, তাহার পর প্রায় অষ্টাহ অতীত হইল, তিনি আর অন্তঃপুরে আসেন নাই, নলিনী সে বিষয় খুব অল্প সময়ই চিন্তা করিত। স্বামীর সম্বন্ধে চিন্তা করিবার ইচ্ছা থাকিলেও সে ভাব তাহার মনে অধিকক্ষণ স্থান পাইত না। সে সর্ব্বদাই ভাবিতেছে—"ভবেশ কি সুন্দর! তাঁহার কেমন মিষ্ট গান! আহা! ভবেশের আত্মীয়েরা এই অনুপম রূপ দেখিয়া সুমধুর এই গান শুনিয়া, না জানি কতই পরিতৃপ্ত হয়;—আর যে তাঁহার স্ত্রী হইবে, সে বুঝি পৃথিবীর অন্য কোন সুখেরই আকাঙ্ক্ষা করিবে না! দীন হীন দরিদ্র পর্ণকুটীর-

বাসিনীও যদি ভবেশের ন্যায় স্বামী রত্নলাভ করে, তাহা হইলে বুঝি তাহার আর প্রাসাদবাসিনী রাণী হইতেও সাধ থাকে না! যাহার এত রূপ, এত সৌন্দর্য্য, তাহার মুখখানি সদাই মলিন কেন? বিনয় বলে উনি কখনও প্রাণ খুলিয়া হাসেন না। "কেন? উনি কি কাহাকেও ভালবাসিয়া প্রতিদান পান নাই?" এই কথাটি নলিনী যখনই ভাবিত, তখনই তাহার প্রাণের ভিতর কেমন দুঃসহ বেদনা অনুভূত হইত, কখন বা তাহার নয়ন প্রান্তেও অশ্রু দেখা দিত। ভবেশকে দেখিবার জন্য সর্ব্বদাই ব্যস্ত হইত—তাঁহার গান শুনিবার জন্য উৎকর্ণ হইয়া থাকিত।

আজ অষ্টম দিবস পরে জগদীশবাবু উপরে আসিয়াছেন। বেলা প্রায় অপরাহ্ণ; জগদীশ বাবু শয়নগৃহে প্রবেশ করিলেন, দেখিলেন নলিনী তেমনই ঘরের মেজেতে শুইয়া আছে তাহার অযত্নসম্ভূত কেশরাশি দেহের চারিধারে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে জগদীশ বাবু ভাবিলেন, তিনিই বুঝি নলিনীর এরূপভাবে অবস্থিতির কারণ মনে করিয়া বড় অনুতপ্ত হইলেন। নলিনীর নিকটে উপবেশন করিয়া তাহার ভ্রমর-কৃষ্ণ কেশগুলি হস্তদ্বারা যথাস্থানে বিন্যস্ত করিয়া দিলেন এবং বলিলেন, "নলিনি! এমন করে শুয়ে আছ কেন? নলিনীর চক্ষে বুঝি একটু নিদ্রা আসিয়াছিল, স্বামীর স্বর কর্ণে প্রবেশ করিবামাত্র সে ঘুমটুকু ভাঙ্গিয়া গেল, সে ত্রস্তভাবে উঠিয়া বসিল, এবং কাপড় টানিয়া মাথায় দিল, কোনও কথা বলিল না। জগদীশবাবু বলিলেন, "এখানে শুয়ে ছিলে কেন? শরীর ভাল আছেত?" নলিনী বিনম্র স্বরে বলিল, "হাঁ, ভালই আছে।"

জগদীশ বাবু ভাবিতেছিলেন, গত আট দিবস তিনি অন্তঃপুরে আইসেন নাই বলিয়া, না জানি নলিনী কতই দুঃখিত হইয়াছে, সে জন্য হয় তো অভিমান করিয়া তাঁহাকে কত প্রকারেই লাঞ্ছনা করিবে; জগদীশ বাবুর সে ভ্রমবিশ্বাস কার্য্যে পরিণত হইল না। তাঁহার মনের ভ্রান্তি দূর হইল, বুঝিলেন নলিনী তাহার প্রতি বিন্দুমাত্রও রুষ্ট হয় নাই বা তাঁহার ব্যবহারে সে দুঃখিতও হয় নাই। নলিনী সেই পূর্ব্বের মতনই নবোঢ়া বধূর ন্যায় লজ্জাবনত মুখে তাঁহার নিকট বসিয়া রহিয়াছে। জগদীশ বাবু একটী দীর্ঘ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন, নলিনী সভয়ে সলজ্জভাবে স্বামীর দিকে চাহিল, কি যেন বলিবার ইচ্ছা করিল, বলিতে পারিল না। জগদীশ বাবু বলিলেন, "দেখ নলিনি! আমি দেখিলাম আমার নিকটে থাকিয়া তুমি সুখী হইতে পারিতেছ না, তোমার কি ইচ্ছা? কি হইলে তুমি সুখী হও আমাকে বল?" নলিনীর ক্ষুদ্র হৃদয়, স্বামীর গম্ভীর তিরস্কার শুনিয়া কাঁপিয়া উঠিল, কি উত্তর দিবে সহসা কিছুই স্থির করিতে পারিল না, একটু থাকিয়া, প্রাণকে একটু সংযত করিয়া, ধীরে ধীরে বলিল, "কেন আপনি একথা বলিতেছেন? আমি কি তাই বলছি?" "বল নাই, বলিবে কি আবার? তোমার প্রত্যেক ব্যবহারে আমাকে সেই কথা জানাইতেছে, তুমি ক্ষুদ্র বালিকা হইয়া আর কত আত্মগোপন করিবে?" জগদীশ বাবু নলিনীর নিকট হইতে উঠিয়া একখানি চেয়ারের উপরে উপবেশন করিলেন। নলিনী আর ইহার উত্তর কি দিবে? যখন স্বামী স্পষ্টই বলিলেন, তাহার প্রত্যেক ব্যবহারে তিনি তাহার ভালবাসা হীনতার পরিচয় পাইতেছেন, তখন আর সে কি বলিয়া তাঁহাকে বুঝাইবে, সে

পতিপরায়ণা 'স্বাধ্বী স্ত্রী? নলিনী মৃত্তিকা পৃষ্ঠে দৃষ্টি সংলগ্ন করিয়া রহিল, জানি না বালিকার ক্ষুদ্র হৃদয় খানি তখন কি মহা ভাবনার উচ্ছ্বাসে উচ্ছ্বসিত হইতেছিল।

নলিনীকে নীরব দেখিয়া জগদীশ বাবু বলিলেন, "বল, তুমি যদি পিত্রালয়ে গিয়া সুখী হও, আমি তাহার বন্দোবস্ত করিয়া দিতেছি,—আমি আর তোমাকে অসুখী দেখিতে চাই না, এখন তোমার যাহা মত বল?"

নলিনী ভাবিল, "তাই তো এখানে থাকিয়া তো আমার কোনও সুখই নাই, বাপের বাড়ী যাইতে যদি স্বামীর আপত্তি না থাকে তবে যাইতে ক্ষতি কি?" প্রকাশ্যে কিছুই বলিল না। জগদীশ বাবু আবার বলিলেন, "চুপকরে রইলে কেন?" আমিই যদি তোমার অসুখের কারণ হইয়া থাকি তবে এখানে থেকে আর প্রয়োজন কি?" বাপের বাড়ী যাবে?" নলিনী কি করিবে, আজ তাহার স্বামীর গম্ভীর মূর্ত্তি ও রষ্টভাব দেখিয়া বাস্তবিকই প্রাণে বড় ভয় পাইয়াছে এদিকে স্বামী বার বার, তাহার কি ইচ্ছা জানিবার জন্য জিজ্ঞাসা করিতেছেন, তাহারি বা কি উত্তর দিবে, কিছুক্ষণ চিন্তার পর নলিনী, বলিল, "তা আপনি যদি যাইতে দেন তবে যাইতে পারি।" জগদীশ বাবু যাতনায় মর্ম্মভেদী দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন, "আমি? আমি আর যাইতে দিব না কেন? তুমি স্বচ্ছন্দে বাপের বাড়ী গিয়া সুখী হও— তবে কাল সকালে রওনা হইও।" জগদীশবাবু উঠিলেন, নলিনী আর একবার ভয়াকুল নেত্রে স্বামীর দিকে চাহিলেন। জগদীশ বাবু আর তথায় দাঁড়াইলেন না, নলিনীর সহবাসও তখন তাঁহার নিকট বিরক্তিকর মনে হইতে ছিল। নানারূপ ভাবনা চিন্তায় নলিনীর রাত্রি অতিবাহিত হইল। পর দিবস প্রাতঃকালে জগদীশ বাবু উপরে আসিয়া তাহার সম্পর্কীয়া ভগিনীকে সম্বোধন পূর্ব্বক গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "প্রমদা! আমার স্ত্রীকে বলে এস, দুই তিন ঘণ্টার মধ্যেই তাঁহার পিত্রালয়ে যাইবার বন্দোবস্ত হইতেছে প্রস্তুত হউন"। প্রমদা দাদার অমন গম্ভীর অথচ বিষাদ মণ্ডিত মুখ দেখিয়া কোনও কথা জিজ্ঞাসা করিতে সাহস পাইলেন না, ধীরে ধীরে—"আচ্ছা!" বলিয়া নলিনীর গৃহাভিমুখে চলিয়া গেলেন। প্রমদা মনে ভাবিয়াছিলেন, নলিনীর নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া জানিবেন তাঁহাদের এত মনান্তর হইল কেন? হঠাৎ নলিনীর পিত্রালয়ে যাইবার কথাই বা উঠিল কেন? কিন্তু নলিনীরও স্বামীর ন্যায়ই বিষাদ গম্ভীর বদনমণ্ডল দেখিয়া তিনি সে সম্বন্ধে আর কিছু না বলিয়া কেবল বাবুর আদেশে এখনই নলিনীকে পিত্রালয়ে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে ইহাই জ্ঞাত করাইয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। আমরা বিশ্বস্ত সূত্রে অবগত হইয়াছি, সেদিন জগদীশ বাবুর পরিচারিকা মহালে একথা লইয়া খুব আলোচনা হইয়াছিল। প্রমদা সুন্দরীও বিনয়ের মাতার নিকটে বসিয়া সমস্ত দিন ঐ প্রসঙ্গের আলোচনাতেই নিযুক্ত ছিলেন। বিনয়ের মাতা বলিলেন, "ওঁর অদৃষ্টে সুখ নাই, তা না হলে বড় বউ মারা যাবে কেন? আহা! এমন যে ভাল মানুষ তাঁকে ভগবান সাংসারিক সুখ কিছুমাত্রও ভোগ করিতে দিলেন না?" প্রমদা ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, "তা দাদা বুড় বয়সে আর বিয়ে না করিলেই হইত!" বিনয়ের মাতা বিরক্তি সহকারে

বলিলেন, "তোমার তো ঐ বুদ্ধি! সংসারে উহার আর কি অবলম্বন আছে? উনি কি নিয়ে থাকিবেন? এমন বিয়ে তো অনেকেই করে থাকে, ইহার চাইতে বেশী বয়সে বিয়ে করেও লোকে কত সুখে সংসার করে, সকলি অদৃষ্ট!" এবারেও প্রমদা মৃদু মৃদু হাস্যের সহিত বলিলেন, "পুরুষ মানুষের আবার অদৃষ্ট কি বউদিদি? একটা স্ত্রী পছন্দ না হইল, আর একটা বিবাহ করিলেই সব ঠিক।" হাসিয়া বিনয়ের মাতা বলিলেন, "তুই কুলীনের স্ত্রী ভালবাসার মর্ম্ম কি বুঝিবি? সকলে তো আর কুলীন নয় যে পঞ্চাশটা বিয়ে করবে?" প্রমদা আপনা আপনি বলিলেন; "পুরুষ মানুষের আবার ভালবাসা! একটার চিতা না নিবিতেই যে আর একটাকে ভালবাসিতে যায় তার ভালবাসার মর্ম্ম বাস্তবিকই স্ত্রীলোকে বুঝে না।"

এই সময়ে নলিনী তথায় আসিয়া মলিন ভাবে দাঁড়াইলেন, তাহাকে দেখিয়া উভয়ে সে প্রসঙ্গ ত্যাগ করিলেন। বিনয়ের মাতা সস্নেহে নলিনীর চিবুক ধারণ করিয়া বলিলেন, "হাঁরে ছোট বউ! এখন আবার বাপের বাড়ী যাবার সাধ হ'ল কেন? ক'দিনই বা এখানে এসেছিস্?" নলিনী নত মুখে বলিল, "দিদি! আমি তো তা জানি না।"

বিনয়ের মাতা।—"তবে কি ঠাকুর পোর সঙ্গে বিবাদ করেছিস্? তাই তিনি রাগ করে ওকথা বলে গেলেন?"

নলিনী।—"না দিদি, রাগ নয়, সত্যি সত্যিই আমাকে যেতে হবে, সদর দরজায় গাড়ী প্রস্তুত, ঐ দেখ নীচে পাল্কী এসেছে, আমাকে বিদায় দাও।"

স্নেহশীলা বিনয়ের মাতার চক্ষে জল আসিল, চক্ষু মুছিয়া বলিলেন, "কেন বোন? তোমাদের এত কি মনান্তর হ'ল? আমি কি কিছুই জানিতে পাই না?"

নলিনী আবার বলিল, "আমি তো কিছুই জানি না দিদি!"

বিনয়ের মাতা।—"সমস্তই যখন প্রস্তুত তখন আর রাখিবার উপায় নাই, কিন্তু তোমাকে আনিতে গেলেই চলে এস, বোধ হয় বাবু তোমার প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়াছেন তাই এসব বন্দোবস্ত হ'য়েছে।"

অশ্রুপূর্ণ নেত্রে নলিনী বিদায় হইল। অশ্রুপূর্ণ নেত্রে বিনয়ের মাতা তাহাকে বিদায় দিলেন। শিবিকা হইতে শকটারোহণের সময় নলিনী দেখিতে পাইল ভবেশ অন্য একখানি গাড়ীতে উঠিলেন, এবং উভয় শকট ষ্টেসনাভিমুখে ধাবিত হইল, এই সময় নলিনীর অশ্রুসিক্ত বদনে একটু হর্ষ চিহ্ন দৃষ্ট হইল। তাহার নিকটস্থ পরিচারিকার যদি মানব হৃদয়-শাস্ত্র পাঠে অভিজ্ঞতা থাকিত, তাহা হইলে সে বুঝিতে পারিত তাহার কর্ত্রী ঠাকুরাণীর অশ্রুসিক্ত মুখখানি হাস্য ছায়ায় আলোকিত হইয়া, মেঘমুক্ত চন্দ্রমার ন্যায় শোভা ধারণ করিয়াছে। ক্রমশঃ

শ্রীকুমুদেন্দু দেবী।

রন্ধন।

মাংসের কারী।—মাংস টুক্‌রা ২ করিয়া কাট। একটা ঢাকনীওলা ডেকচি উনানে চড়াও, তার পর ঘি ডেকচিতে দাও, ঘির গেঁজলা মরিলে তাহাতে জিরার মত সরু সরু পেঁয়াজ কাটা ফেলিয়া দিয়া নাড়িতে থাক, নাড়িতে ২ যখন পেঁয়াজের রং বাদামি হইবে তখন জিরে মরিচ, ধনে, হলুদ, লঙ্কা আদা বাটিয়া জলে গুলিয়া ঢালিয়া দাও, এইবার ডেকচির মুখ ঢাকিয়া খুব জ্বাল দাও, মাঝে২ মুখ খুলিয়া নাড়িয়া দিবে, এবং দেখিবে জল সমস্ত মরিয়া গিয়াছে কি না, যখন দেখিবে জল আর নাই তখন ডেকচির মুখ খুলিয়া নাড়িতে থাক, কারণ নাড়িতে নাড়িতে মসলা ভাজা হইবে এবং হলুদের গন্ধ বাহির হইয়া যাইবে তখন মাংস টুকরোগুলি ডেকচিতে দিয়া নাড়িয়া ঢাকিয়া দাও, মাঝে মাঝে নাড়িয়া দিয়া যখন মাংস বেশ সাঁতলান হইবে বুঝিবে, তখন জল ও তেজ-পাতা দিয়া মুখ ঢাকিয়া দাও। মাংস বেশ সিদ্ধ হইলে আন্দাজ মত ঝোল রাখিয়া নামাইবার সময় জিরা মরিচ খোলায় ভাজিয়া গুড়ো করিয়া ঐ কারীতে দিয়া নামাইয়া রাখিবে।

শ্রীকমলে কামিনী গুপ্তা।

কলাকন্দ।—খুব ঘন ক্ষীর ১ সের, চিনি খুব পরিষ্কার দেড় পোয়া। চিনির রস খুব চট্‌চটে করিয়া ক্ষীর তাহাতে দিয়া হাতা বা তাড়ু দিয়া খুব নাড়িতে হইবে। বেশ ঘন হইলে নামাইয়া তাহাতে ছোট এলাচের গুঁড়া দিবে। পরে একখানা থালাতে ঘি মাখাইয়া তাহার উপরে ঢালিয়া থালা ধরিয়া নাড়িবে, যেন সব দিকে সমান হইয়া পড়ে। তাহার উপরে বাদাম পেস্তার কুঁচি ছড়াইয়া দিবে। কিছু ঠাণ্ডা হইলে ছুরির দ্বারা চৌকোণা ভাবে কাটিয়া তুলিতে হইবে। ইহাই কলাকন্দ বলিয়া বিখ্যাত, কেহ কেহ উপরে গোলাপ জল ছড়াইয়া দেয় তাহাতে বেশ সুগন্ধি হয়। কলাকন্দের ক্ষীর ও চিনি যত পরিষ্কার হইবে ততই সুন্দর হইবে।

মতিচুরের নাড়ু।—ছোলার ডালের বেসন ৴১ সের, চিনি ৴১ সের। চিনির রস দুই তারবন্দ হওয়া উচিত, রস ছাঁকিয়া একটি পাত্রে রাখ। পরে বেসনকে জল দিয়া গুলিয়া ফেলিতে হইবে (যেমন বড়ির ডাল)। একটা কড়াতে আধ সের আন্দাজ ঘি চড়াও। একখানা বড় বড় ছিদ্রযুক্ত ঝাঁঝরি হাতা কড়ার সম্মুখের উপর উচু করিয়া একটা লোহার তিপায়ার উপরে রাখ। তারপরে গুলা বেসন হাতার উপরে ঢালিয়া নাড়া দিলে ছোট ২ ফোঁটার ন্যায় দানা ঘিতে পড়িবে সেই গুলি একটু লাল হইয়া ভাজা হইলে আর একটা ঝাঁঝরি হাতার দ্বারা তাড়াতাড়ি তুলিয়া নেও। সব দানা ভাজা হইলে রসের সহিত আগুনের জ্বালে চড়াও। জ্বাল খুব কম দিতে ইহবে যেন পুড়িয়া না যায়। রসের মধ্যে দিয়া খন্তির দ্বারা ধীরে ধীরে নাড়িতে হইবে। বেশ: মাখা মাখা হইলে তাহাতে এলাচের দানা কিসমিস পেস্তা দিয়া নাড়ু গড়িতে হইবে। নাড়ুগুলি একখানা থালার উপরে পৃথক পৃথক রাখিতে হইবে।

শ্রীক্ষেমঙ্করী চৌধুরাণী।

কবিতা

বাসনা অন্তিমে।

জগদীশ !

মরণের সুকোমল কোলে
পেতে দাও সুখের শয়ন ;
নিরালা ঘুমাব মন সাধে
চাহিনা এ দুঃখ জাগরণ।
কত দিন রয়েছি জাগিয়া,
আরত জাগিতে নাহি চাই
কত দুঃখে কত অশ্রু ঢালি,
দিবা নিশি জ্বলিতেছি তাই।
সুখ আশে যেথা যাই ছুটে,
নিয়তি ভ্রুকুটি শুধু যায় !
জগতের শত উপেক্ষায়,
এ পরাণ দহিছে আমায়।
নৈরাশ্যের সুতীব্র দহনে
হৃদয়ের সাধ আশা কলি,
একে একে অভাগা পরাণে
অনুদিন শুকা'ল কেবলি।
কোন্ সুখে রহিব বাঁধিয়া
বল পিত ! বলনা আমায়,
দিবা নিশি আগুণে জ্বলিতে
বল দেহী কে পারে কোথায় ?

পরমেশ !

এ অভাগা কি আর চাহিবে
সুখ সাধ চাহেনা পরাণে
দাও মোরে মরণের অঙ্কে
বিছাইয়া অনন্ত শয়নে।
ভুলিয়া এ অসহ্য যাতনা ,
রবে দিন সুষুপ্তির মাঝে,
হতভাগ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্রতম,
এ জগতে লাগে কোন্ কাজে ?

তারলাগি !

রোদন সম্বল শুধু যার
এক বিন্দু অশ্রু ঝরিবে না,
বারি কণা মিশিবে অন্তিমে
সে অভাব কেহ জানিবে না।

দয়াময়,

তবে কেন—দাও তারে দাও,
মিটিবারে অন্তিম বাসনা ;
এক মাত্র মরণ লভিলে
হতভাগা কিছু চাহিবে না।

শ্রীসরলা বালা সেন

আঁধারে কাঁদিয়া।

সংসার অনন্ত সিন্ধু কর্ম্ম স্রোত তার,
উত্তাল তরঙ্গ মালা ঘটনা অপার ;
আশা সমীরণ লাগি অনিবার হায় !
তৃণ সম মুগ্ধনর ডুবে ভেসে যায়।
কেহ যায় ডুবে ডুবে কেহ ভেসে যায়,
কেহ পথ ভ্রষ্ট হয়ে লক্ষ্যহারা হয়
তেমনি বিমুগ্ধ আমি পালাই কোথায়,
নিরাশা তামসি নিশি অন্ধ আমি তায়।
ক্রমে ক্রমে ঘূর্ণা মাঝে এসেছি ভাসিয়া
হেথাই জীবন যাবে আঁধারে কাঁদিয়া।

শ্রীসরলা সেন।

খোকার হাসি।

১

খোকার হাসির ঘটা,
প্রস্ফুট গোলাপ ছটা,
করিয়াছে সমুজ্জ্বল খোকা মণিফুল—
ফুট্ ফুট্ ফুটে ছিলে,
সরগের ফুল দলে,
আসিয়াছ আমাদের করিতে আকুল।

শিশুর আনন হেরে,
পরাণ আকুল করে,
রবি শশী গ্রহ তারা সবে লজ্জা পায়—
যত ফল ফুল ভরা,
সাজিয়া রয়েছে ধরা,
এরাও খোকার রূপে সবে লজ্জা পায়।

৩

খোকার মুখের হাসি,
ঝরিছে অমিয় রাশি,
সুন্দর গোলাপ সম সংসার বিজনে
অনন্তের প্রেম ভরা,
ফুল্ল ফুল লয়ে মোরা,
হৃদয়ের থাল ভরি রাখিব যতনে।

৪

সুধাগন্ধ সমীরণ,
প্রবাহে পুলকে প্রাণ,
শোক তাপ দুখ জালা নিবারিত হয়—
শিশুর সুন্দর প্রভা,
জগজন মনোলোভা,
নিরখি নীরবে বলি নিয়তির জয়।

৫

শিশুর শকতি যিনি,
অনন্ত মহান তিনি,
হউক মহিমা তাঁর সদা মহীয়ান—
তাঁহার দয়ার দান,
সুকোমল শিশু প্রাণ,
নতশিরে করি তাঁরে কৃতজ্ঞতা দান।

শ্রীতরঙ্গিণী ঘোষ।

কার তরে ?

(১)

কার প্রাণে চন্দ্রমার
মধুর অমিয় হাসি,
ধরণীর অঙ্গে করি,
জাগায় মাধুরী রাশি ?

(২)

কার তরে উপবন
মলয় হিল্লোলে নাচি,
বিতরে সুবাস মৃদু
কুসুম ভূষণে সাজি ?

(৩)

কার প্রাণে আলো দিতে
নিশার ভীষণ গ্রাসে
হীরকের দীপমালা,
নীরব সাগরে ভাসে ?

(৪)

কার প্রাণ বাঁচাইতে
পাপের তরঙ্গ হ'তে,
যুগে যুগে দেবরূপে
জন্ম সাধুর জগতে ?

(৫)

কার অশ্রু ঝরিবারে
বিষাদে ঝরিয়া যায়,
প্রকৃতির আঁখি হ'তে
বরষা আসার হায় ?

(৬)

কার মুখে ফুটাইতে
বিমল সরল হাসি,
জননীর অঙ্কে হাসে
সুপ্ত শিশু সুখে ভাসি ?

(৭)

কার প্রেম জাগাইতে
সাগর সন্ধানে নদী,
সুখ দুঃখ গৃহ ফেলি
ধায় দেশে দেশে কাঁদি ?

(৮)

কার প্রাণ সন্ধ্যাকালে
হেরি সমুখে রজনী,
চমকে শিহরি উঠে
বিফল দিবস গণি ?

(৯)

কার প্রাণে নিশাভাগে
বিষাদ তমসাবৃত
ধরণীর ম্লান মুখ,
জাগায় যাতনা শত ?

(১০)

কারে হায় তৃণ সম
দলিতে, বিদায় লয়ে,
একে একে প্রিয়জন
চলি যায় কোন্ গেহে ?

(১১)

কার প্রাণে মহা-সিন্ধু
পাষাণে ধরিয়া বক্ষ
ঘোষিছে সমর জয়
লভিয়া জলধি পক্ষ ?

(১২)

জীবন সমরে হত
কোন্ সে দীনের তরে
বিধির বিরাম বিধি
মরণের শান্তি ক্রোড়ে।

শ্রীপ্র—দেব।

একি শুধু ভুল ?

১

একি শুধু ভুল ?
এই যে বিপুল ধরা, এই রবি, শশী, তারা,
বিহগের কলকণ্ঠ, লতাপাতা ফুল—
একি শুধু ভুল ?

২

একি শুধু ভুল ?
এই প্রকৃতির শোভা, জগতের মনোলোভা
করে প্রাণ মাতোয়ারা বিভোর আকুল !
একি শুধু ভুল ?

৩

একি শুধু ভুল ?
এই সুখ এই আশা এই প্রীতি ভালবাসা
মানব জীবনে এই বাসনা-ব্যাকুল !
একি শুধু ভুল ?

৪

একি শুধু ভুল ?
এই নিরাশার খেলা ! এই হতাশার মেলা !
নিদাঘের ঘোর তাপে ঝরে যায় ফুল !
একি শুধু ভুল ?

৫

একি শুধু ভুল ?
মানব জীবন হায় ! শুধু স্বপনের প্রায় !
দুদিনের তরে শুধু— শেষে সবি ভুল ?
একি শুধু ভুল ?

৬

একি শুধু ভুল ?
অণু হ'তে অণু আমি তুমি যে মহান স্বামি !
আমিও পেয়েছি ওই পুত পদমূল !
একি শুধু ভুল ?

৭

একি শুধু ভুল ?
না,না, অনন্তজীবনেতুমিআমারিআরাধ্যস্বামী !
সাধনায় হব আমি ওই পদ ধূল
এত নহে ভুল।

শ্রীসরোজিনী বসু।

মধু।

গাছেতে ফুটেছে ফুল, মধু লোভে অলিকুল
দ্রুত ছুটি চলিছে !
সুরভ পাইয়া তায়, মক্ষিকারা বেগে ধায় ;
ধবল কমল আহা কিবা শোভা ধরেছে !

সুবাসে মাতিয়া হের অলিকুল ধাইছে!!
ঐ সে গোলাপ কলি, আধ ফোটা ফুলগুলি
আঁখি মুদি রয়েছে!
আবার দেখনা চেয়ে, লতাগুলি রয়ে রয়ে
প্রাচীর ভিতরে বড় গাছটাকে ছেয়েছে
পবন হিল্লোলে ঐ মৃদু মৃদু দুলিছে!
দেখিছ ও রাঙ্গা ফুল, ঠিক যেন কর্ণ দুল
কেউ কাণে পরেছে!
পবন হিল্লোলে ঐ মৃদু মৃদু দুলিছে!
নিশীর শিশির পরে কিবা শোভা হয়েছে!!
কোকিল কুহুকুতানে, অমিয় ঢালিছে কাণে
কুহু, কুহু গাহিছে!
কুঞ্জের মাঝারে বসে, ভাবের তরঙ্গে ভেসে
পাপীয়া পিপিউ তানে মৃদু স্বর তুলিছে!
খেচর খেচরী মরি কিবা সুখে ভাসিছে!!
সরলা অবলা বালা, হাতে লয়ে ফুল ডালা
বাগানেতে ঢুকেছে!
পিও পি, পিউপি তানে, পাপিয়ারা সঙ্গোপনে
মধুস্বরে চিত্ত তার চুরি করে নিতেছে
সরলা অবলা বালা ফুল নিতে এসেছে!
কমলের মধুগুলি, খাইতেছে দুষ্ট অলি
বড় জ্বালা হয়েছে!
সাধের এ বাগানেতে কত কষ্ট দিনে রেতে
থরে থরে তাই ত রে এত ফুল ফুটেছে!
মুখ পোড়া ভ্রমরেরা ঐ এসে জুটেছে!
ঐ সে গোলাপ কলি, আধ ফোটা ফুলগুলি
কত জ্বালা সহিছে!
হেমের বাগান ওই, যাথি, যুথী, বেলী, জুঁই
কত দেশ ঘুরে হেম তবে খুঁজে এনেছে
দুর, দুর, পোড়া অলি কোথা থেকে জুটেছে!
থরে থরে, থরে থরে, ফুলগুলি আছে ধরে
কিবা শোভা হয়েছে!
মুখ পোড়া দুষ্ট অলি, চুষে খেয়ে মধুগুলি,
সরলা অবলা দিকে কেন পুনঃ ছুটেছে!
হেমের সাধের দ্রব্য সব লুটে নিতেছে!!
দুর দুর মূর্খ অলি, এ যেরে এখন কলি
মধু কি রে ঝরিছে?
থোপা ২ ফুলগুলি, তবে কেন ছেড়ে এলি
ফুল হতে মিষ্ট মধু এতে কিরে রয়েছে?
তবে বুঝি মধুগুলি সব ফুরে গিয়েছে!

শ্রীসরযূবালা দত্ত গুপ্তা।

যাবে কি জীবন?

এমনি হেলায় পিতঃ, যাবে কি জীবন?
ওগো যাবে কি জীবন?
জীবনের সুখ উষা কর্ত্তব্য পরম ভূষা
মানব জীবন কিগো সুখের স্বপন।
এমনি হেলায় পিতঃ, যাবে কি জীবন?
ওগো যাবে কি জীবন?
ভেবেছিনু একদিন চরণে হইব লীন
কর্ত্তব্য পরম ব্রত করিব পালন।
এমনি হেলায় পিতঃ, যাবে কি জীবন?
ওগো যাবে কি জীবন?
সংসার কঠোর ঘায় প্রাণ যদি ভেঙ্গে যায়
তখনো চরণে তব লইব শরণ।
এমনি হেলায় পিতঃ; যাবে কি জীবন?
ওগো যাবে কি জীবন?
ভজিয়ে তোমার নাম পাইব অক্ষয় ধাম
এহেন প্রতিজ্ঞা কেন করিনু লঙ্ঘন।
এমনি হেলায় পিতঃ, যাবে কি জীবন?
ওগো যাবে কি জীবন?
আজি কেন ক্ষুদ্র প্রাণ কাতরে কাঁদিয়া ম্লান
ঘুচে গেছে জীবনের শান্তি প্রস্রবণ।
এমনি হেলায় হায় যাবে কি জীবন?
ওগো যাবে কি জীবন?
আশার মোহিনী মন্ত্রে হৃদয়ের যন্ত্রে যন্ত্রে
করেছে কেবলি ঘোর দুরাশা সৃজন।
এমনি করিয়ে হায় যাবে কি জীবন?
ওগো যাবে কি জীবন?

(আজ)
এসেছি তোমারি দ্বারে যাইতে দিও না ফিরে
তোমার চরণে শেষ হোক এ জীবন।
এমনি করিয়ে মম বহুক জীবন
ওগো বহুক জীবন।
প্রভো গো, প্রেমের সিন্ধু তোমার করুণা বিন্দু
করে যেন প্রাণে মম সুখ বরিষণ।
এমনি করিয়ে মোর বহুক জীবন
ওগো বহুক জীবন।
শ্রীজ্যোতির্ম্ময়ী সেন।

যাচনা।

প্রতি দিন প্রভু একটুকু কাজ
দিও মোর শিরে তুলে,
যাহে রত রহি চিত্ত আমার
বিপথে যাবে না ভুলে।
প্রতিদিন প্রভু বক্ষে আমার
একটু আঘাত দিও
যাহার পরশে জাগিয়া চিত্ত
তোমারে স্মরিবে প্রিয়।
প্রতিদিন দিও দিবস শেষে
তব নির্ম্মল শান্তি
যাহার পরশে দূরে যাবে সখা!
সারা দিবসের ক্লান্তি।
প্রতিদিন প্রভু করুণা ভরিয়া
তোমারি দুয়ারে ডেকো
প্রতিদিন মোরে হে চির শরণ,
তোমার চরণে রেখো।
শ্রীশান্তিময়ী দেবী

বিবিধ প্রসঙ্গ।

কলাগাছের সূতার কাপড়।—কলাগাছ যে এক বিশেষ সম্পত্তি, আমরা জানি। কলা, মোচা, থোড় উৎকৃষ্ট খাদ্য সামগ্রী—কলা গাছের বাকলের ক্ষার আসামে লবণের কাজ করে, নানাস্থানে ধোপার সাবান রূপে ব্যবহৃত হয়। সম্প্রতি কলা হইতে ময়দা প্রস্তুত করা হইতেছে। এই ময়দার আদর দিন দিন বৃদ্ধি হইতেছে—শরীর পোষণকারী এমন পদার্থ নাকি কমই আছে। অল্পদিন হইল কলা গাছের বাকল হইতে সূত্র বাহির করিবার প্রণালী আবিষ্কৃত হইয়াছে। আমরা শুনিয়া আনন্দিত হইয়াছি, আমাদের ভারতবর্ষেই এই কলার সূতার কাপড় প্রস্তুত হইতেছে। সে বস্ত্র দেখিতে রেসমের ন্যায় মসৃণ উজ্জ্বল ও চিক্কণ হইয়াছে।

কলার বাকলের মোটা সূতা হইতে মোটা কাপড়, দড়ী, মশারি ও গালিচা প্রস্তুত করা হইয়াছে। কলার সূতার একখানা গালিচা দিল্লী দরবারের শিল্প প্রদর্শনীতে প্রেরিত হইয়াছিল। এই সূতা দ্বারা অতি সূক্ষ্ম কারুকার্য্য হইতে পারে।

বালকের অনুকরণ প্রিয়তা দৃষ্টান্তের ফল—এক ইংরেজ রমণী তাহার ৭ম বর্ষ বয়স্ক পুত্রের সম্মুখে স্বহস্তে একটা ছাগল বধ করেন এবং তীক্ষ্ণ অস্ত্র দ্বারা তাহার মাংস খণ্ড খণ্ড করেন। তারপর ঐ স্ত্রীলোক কি কিনিবার জন্য বাহিরে যান। মা কিরূপে পাঁঠা কাটিয়াছিলেন, পুত্র তাহা বেশ মনোযোগ করিয়া দেখিয়াছিল। মা যখন বাড়ীর বাহিরে গেলেন, পুত্র সেই ধারাল অস্ত্র লইয়া তাহার ছোট ভগিনীকে কাটিয়া ফেলিল। এবং মা যেমন পাঁঠার চামড়া ছাড়াইয়া তাহার মাংস

কাটিয়াছিলেন, ঐ বালকও ভগিনীর চামড়া ছাড়াইয়া তাহার মাংস টুকরা টুকরা করিয়া কাটিল। মা বাজার হইতে আসিয়া এই ভয়ঙ্কর ব্যাপার দেখিয়া পাগল হইলেন, এবং এক আঘাতে পুত্রকে বধ করিয়া উন্মাদের ন্যায় প্রলাপ বকিতে লাগিলেন। সেই দিন হইতে মা পাগল হইয়াছেন, আর প্রকৃতিস্থ হইতে পারেন নাই। তিনি এখন পাগলা গারদে বাস করিতেছেন। সন্তানেরা মা বাপের কার্য্য কেমন অনুকরণ করে, এই ঘটনা তাহার অন্যতম প্রমাণ। মা বাপের কেমন সাবধান হইয়া চলা উচিত, এই ঘটনা তাহারও প্রমাণ।

নিউগিনিতে পায়ের পাতাহীন মানুষ আবিষ্কৃত হইয়াছে। তাহাদের পায়ের পাতা এত ছোট যে, নাই বলিলেই চলে, তাহারা যাতায়াত করিতে পারে না। তাহারা হ্রদের মধ্যে ক্ষুদ্র সালতীতে বিচরণ করে এবং কাঠের ভেলার উপর কাঠের ঘর বাঁধিয়া বাস করে।

সম্রাটের জন্মদিন।—৯ই নবেম্বর সম্রাট এডওয়ার্ডের জন্মদিন। কিন্তু সম্রাটের আদেশে ২৬এ জুন বাং ১১ই আষাঢ় শুক্রবার ভারতবর্ষে তাঁহার জন্মদিন উপলক্ষে আফিস আদালত বন্ধ হইয়াছিল। সেই দিন জন্ম দিনের উপাধি বিতরিত হইয়াছে।

একদল নারীদস্যু।—নারীদস্যু ও মেয়ে বোম্বেটে পূর্ব্বে ইউরোপে অনেক ছিল। রবিন্‌সন্‌ক্রুসো প্রভৃতি গ্রন্থে মেয়ে বোম্বেটের পরিচয় আছে। আমাদের বঙ্গেও দুই দশটা মেয়ে ডাকাইত দেখা গিয়াছিল, দস্যুপত্নী অপেক্ষা দস্যু কন্যা ও দস্যু ভগ্নীই অধিক বাহাদুরী দেখাইয়া গিয়াছে। এখনও ইউ-রোপে বিশেষতঃ সুবিশাল রুষরাজ্যে কখনও কখনও মেয়ে দস্যু দেখা যায়। কয়েক বৎসর হইল, ককাসাস্‌ প্রদেশে এক 'শী'-দস্যু অনেক 'হি'-দস্যুকে লজ্জা দিয়াছিল, সংপ্রতি রুষের রাজধানী নিজ সেণ্টপীটসবর্গ নগরেই একদল নারীদস্যু পুলীসের হাতে পড়িয়াছে। দলে আছে ১৮ জন রমণী, একটী ১৮ বৎসরের নব যুবতী দলের কর্ত্রী। সাহসে এ দল অদ্বিতীয়, নরহত্যা শোণিতপাতেও অকুণ্ঠিত। ইহাদের গৃহে বহু লক্ষ টাকার হীরা জহরত পাওয়া গিয়াছে। পুলীসের বিশ্বাস এরূপ দল আরও আছে। মেয়ে চোর মেয়ে গাইট কাটা সকল সভ্য দেশেই অসংখ্য। বিলাতে ইহাদেরই পসার অধিক।

কাগজের দাঁত।—কাগজে ঘর বাড়ী, শকট গাড়ী, নৌকা ডিঙ্গি, রেলগাড়ীর চাকা, ঘরের দরজা জানালা, চৌকাট কপাট, কড়ী বরগা প্রভৃতি সবই প্রস্তুত হইতেছে। মার্কিণ মিস্ত্রীর প্রস্তুত কাগজ গৃহ সৌধ অপেক্ষা স্থায়ী হইতেছে। কাগজে না হইতেছে, এরূপ দ্রব্য নাই, কাগজে কৃত্রিম দন্ত আর সকল প্রকার কৃত্রিন দন্তকে পরাস্ত করিয়াছে। এ দাঁতে দোষ নাই, সবই গুণ। পোর্সিলেন ও মিনের দাঁত ভাঙ্গিয়া যায়, ফাটিয়া চটিয়া যায়, অম্লরসে টকিয়া যায়। কাগজদন্ত যেমন তেমনি থাকে। অথচ খুবই সস্তা।

কীট।—অনেক প্রকার সরীসৃপ ও কীট পতঙ্গ আছে যাহারা সমস্ত জীবনেও একবার ঘুমায় না। কয়েক জাতীয় মৎস্যও সমস্ত জীবনে একবারও ঘুমায় না। কোন কোন মৎস্য মাসে এক মুহূর্ত্তমাত্র ঘুমায়। প্রায় ১২ জাতীয় পতঙ্গ জীবনে কখন ঘুমায় না। চারি পাঁচ রকম সর্পও কখন সমস্ত জীবনে নিদ্রার বশীভূত হয় না।

জর্ম্মণদেশে স্ত্রীশিক্ষার স্রোত প্রবলবেগে প্রবাহিত হইতেছে। বার্লিনের কৃষি-কলেজে

কয়েকজন মহিলা ভর্ত্তি হইয়াছেন। ম্যাক-থরণ নামক এক শিক্ষিতা সুইস নারী ব্যবহারজীবের ব্যবসায় অবলম্বন করিয়াছেন। জুরিক নগরের জজের নিকট তিনি আসামীর পক্ষে সম্প্রতি যে বক্তৃতা করিয়াছেন, তাহা শুনিয়া জজ বিস্মিত হইয়াছিলেন, এবং পুরুষ ব্যবহারজীবগণ তাঁহাকে একবাক্যে ধন্যবাদ, করিয়াছেন।

পুরস্কার।—বিক্রমপুর সম্মিলনীর সহকারী সম্পাদক মহাশয় লিখিয়াছেন—এই বৎসর "সুগৃহিণী ও আদর্শমাতা" বিষয়ে বিক্রমপুরের যে মহিলা সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রবন্ধ লিখিতে পারিবেন, তাঁহাকে পরলোকগত রজনী নাথ রায় মহাশয়ের পত্নী তাঁহার স্বামীর স্মৃতি উপলক্ষে পঁচিশ টাকা মূল্যের একটী পুরস্কার দিবেন। প্রবন্ধ উপযুক্ত বিবেচিত হওয়া চাই এবং বর্ত্তমান সনের ১৫ই আগষ্টের পূর্ব্বে ২৯নং হ্যারিসন রোডস্থ সম্মিলনী কার্য্যালয়ে পৌছান আবশ্যক। প্রতিবৎসরই এইরূপ নির্ব্বাচিত কোনও বিষয়ে যিনি সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রবন্ধ লিখিবেন, তাহা উপযুক্ত বিবেচিত হইলে, তাঁহাকেই উক্ত মূল্যের পুরস্কার প্রদত্ত হইবে।

শ্রীহট্টেমহিলাসম্মিলনী।—এই সম্মিলনী প্রতিমাসে অধিবেশন হইতেছে। ২৫।৩০ জন বঙ্গমহিলা একত্রিত হইয়া স্ত্রীসমাজের উপকারার্থে নানা বিষয় আলোচনাদি করিতেছেন। গত জুন মাসের ৩০শে সভার অধিবেশন হইয়াছিল, তাহাতে "সন্তানশিক্ষা ও তৎ সম্বন্ধে মাতার দায়ীত্ব বিষয়ে প্রবন্ধ পাঠ ও উপদেশ প্রদত্ত হয়।" পরিবারের স্বাস্থ্য ও স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে পাঠ ও আলোচনাদি হইয়া থাকে।

কবির মৃত্যু।—বঙ্গদেশের সুবিখ্যাত কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বঙ্গভূমিকে শোকসাগরে ভাসাইয়া পরলোক গমন করিয়াছেন। ইঁহার রচিত অনেক কবিতা গ্রন্থ বঙ্গ সাহিত্যের মুখোজ্জ্বল করিয়াছে। বঙ্গের নর নারী অনেকেই ইহার কবিতা পাঠে মুগ্ধ হইয়াছেন। কবিবর শেষ জীবনে অন্ধ হইয়া বড় কষ্টে কালযাপন করিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুতে সকলেই শোকাকুল। বঙ্গের নগরে নগরে তাঁহার প্রতি সম্মান প্রদর্শনার্থ সভা সমিতি আহূত হইয়াছে।

স্ত্রীশিক্ষা।—মান্দ্রাজে বিধবাদিগের শিক্ষার জন্য বিশেষ সুবন্দোবস্ত হইয়াছে। মিসকার নাম্নী জনৈক ইংরেজ রমণী তত্রস্থ স্ত্রী বিদ্যালয় সমূহের ইন্‌স্পেক্টরের কার্য্য করেন। তিনি প্রস্তাব করিয়াছিলেন যে হিন্দু ও মুসলমান বিধবাদিগকে শিক্ষয়িত্রীর কার্য্যের জন্য প্রস্তুত করিলে এদেশে স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের সুবিধা হইতে পারে। এবং এই জন্য শিক্ষার্থিনী বিধবাদিগকে গবর্ণমেণ্টের বৃত্তি দেওয়া উচিত। তাঁহার প্রস্তাব গৃহীত হয় এবং গবর্ণমেণ্ট কয়েকটী বৃত্তি দান করেন। আরও অধিক সংখ্যক বৃত্তির জন্য মিসকার অনুরোধ করিয়াছেন। তাঁহার প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত হওয়াতে মান্দ্রাজ প্রদেশে স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের বিশেষ সুবিধা হইয়াছে। ভারতবাসিনী হিন্দু ও মুসলমান বিধবাদিগের জন্য প্রত্যেক প্রদেশের শিক্ষা বিভাগ হইতে বৃত্তি দান করিয়া তাহাদিগকে শিক্ষয়িত্রীর কার্য্য শিক্ষা দিবার সুবিধা করিলে নিশ্চয়ই এতদ্দেশের স্ত্রীশিক্ষার উন্নতি সাধিত হইবে। কিন্তু ঘোর অবরোধ প্রথা আমাদের শিক্ষার অন্তরায় হইয়া রহিয়াছে। পুরুষ শিক্ষকদিগের দ্বারা বালিকাদিগের শিক্ষার সুবিধা হয় না। এই মহৎ কার্য্যে অনাথিনী, সম্বল বিহীনা বিধবাদিগকে শিক্ষয়িত্রী প্রস্তুত করিলে তাহাদিগের জীবিকার সদুপায় হইবে।
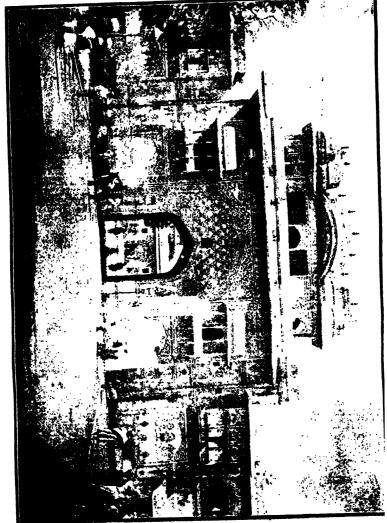
জয়পুর মহারাজের প্যালেস্।

অন্তঃপুর

সচিত্র মাসিক পত্রিকা।

ANTAHPUR

AN ILLUSTRATED MONTHLY JOURNAL IN BENGALI

Edited and contributed to by the ladies only.

কেবল মহিলাগণ কর্ত্তৃক লিখিত ও সম্পাদিত।

আত্মত্যাগ যে নারীর প্রধান সাধন,
সরলতা প্রফুল্লতা সুন্দর বসন,
শীলতা বিনয় যার শ্রেষ্ঠ অলঙ্কার,
সেই নারী এজগতে সৌন্দর্য্যের সার।

৬ষ্ঠ বর্ষ।	ভাদ্র, ১৩১০ বঙ্গাব্দ।	VOL. VI.
৫ম সংখ্যা।	SEPTEMBER, 1903.	NO. V.

রমণীর প্রভাব।

কোন সময়ে পারস্য দেশে এক বাদসাহ ছিলেন, তাহার নিকটে সামান্য কিম্বা কোন গুরুতর বিষয় সম্বন্ধীয় কোন ঘটনার উল্লেখ করিলেই, তিনি স্বতঃই বলিয়া উঠিতেন যে, এই ঘটনার মধ্যে কোন রমণী জড়িত আছেন। বাস্তবিক সংসারের মধ্যে ধর্ম্ম কিম্বা অধর্ম্ম যে কোন বিষয় হউক না কেন, পরোক্ষভাবে রমণীর প্রভাব তাহার মধ্যে প্রধানরূপে সংশ্লিষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। খৃষ্টান ধর্ম্মশাস্ত্রে বর্ণিত আছে যে, আদিম মানব দম্পতি আদম ও ইভের মধ্যে ইভই প্রথম সর্পের প্ররোচনায় ভুলিয়া নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল ভক্ষণ করিয়া ছিল। এবং তাহার পরে আদম তাহার পরামর্শে ঈশ্বরের আদেশ লঙ্ঘন করিতে প্রলুব্ধ হয়। ইভ যদি আদমকে জ্ঞানবৃক্ষের ফল ভক্ষণ করিতে পরামর্শ প্রদান না করিত, তবে ইহা নিশ্চয় যে, আদম কখনও নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল ভক্ষণ করিতে প্রলুব্ধ হইতেন না। মানবও স্বর্গভ্রষ্ট হইত না। ইংরাজ কবি সেক্সপিয়ার একজন প্রথম শ্রেণীর কবি ছিলেন। মানব চরিত্র চিত্রনে বিশেষতঃ রমণী চরিত্র চিত্রনে তাঁহার ন্যায় সুদক্ষ কবি জগতে অতি অল্পই জন্মগ্রহণ করিয়াছেন তাঁহার নাটক সকল পাঠ করিলে পাপ পুণ্য সকল কার্য্যের মধ্যে সংসারে রমণীর কতদূর

প্রভাব, তাহা বিশেষরূপে অবগত হওয়া যায়। তাঁহার ম্যাকবেথ নামক নাটকে দেখা যায় যে, যখন ম্যাকবেথ স্কটলণ্ডের রাজা ডানকানকে হত্যা করিবার সঙ্কল্প করিয়া পুনরায় সে সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিতে মনস্থ করিয়া, লেডি ম্যাকবেথকে বলিলেন যে, যিনি আমায় এত সম্মানে ভূষিত করিয়াছেন, সেই আমার প্রভুর গাত্রে হস্তোত্তোলন না করাই উচিত। তখন পিশাচিনী লেডি ম্যাকবেথ তাঁহাকে তাহার সঙ্কল্পিত কার্য্যে মত লওয়াইবার জন্য তীব্র ভৎসনা করিয়া বলিলেন,—

যদ্যপি শপথবদ্ধ হইতাম আমি,
তব সম, এইরূপে, তাহলে নিশ্চয়
নিজ স্তন পান রত সন্তানেরে মম
মস্তক বিদীর্ণ করি হত্যা করিবারে,
হতাম না এই মত সঙ্কুচিত কভু।

পিশাচিনী লেডি ম্যাকবেথের তীব্র ভৎসনা ও প্ররোচনায় ম্যাকবেথের সাধু সঙ্কল্প ভাসিয়া গেল। তিনি উপকারী প্রভুকে হত্যা করিলেন।

সেক্সপিয়ারের কোরায়ালেনাস নামক অন্য একখানি নাটকেও রমণী প্রভাবের জলন্ত দৃষ্টান্তের চিত্র দেখিয়া আমরা বিস্মিত হই। একদা কোরায়ালেনাস নামক রোমের একজন সম্ভ্রান্ত পেট্রিসিয়ান কোন গুরুতর দোষের কারণে তাহার স্বদেশবাসীগণের দ্বারা রোম নগরী হইতে নির্ব্বাসিত হয়েন। কোরায়ালেনাস নিজকৃত প্রকৃত দোষের জন্য স্বদেশ হইতে নির্ব্বাসিত হইয়াছিলেন বটে। কিন্তু তাঁহার এই বিশ্বাস জন্মিয়াছিল যে, তিনি সম্পূর্ণ নির্দ্দোষী। কেবল অন্যায় বিচারপূর্ব্বক তাহার স্বদেশবাসীগণ তাহাকে নির্ব্বাসিত করিয়াছে। তিনি তাহাদের সেই অন্যায় বিচারের প্রতিশোধ লইবার জন্য, রোমের এক প্রবল শত্রুর সহিত মিলিত হইয়া সমূলে রোম নগরী ধ্বংস করিবার জন্য সসৈন্যে তাহার প্রাচীরতলে আগমন করিলেন। কোরায়ালেনাস রোমের একজন প্রবল পরাক্রান্ত বীরপুরুষের মধ্যে গণ্য ছিলেন। তিনি অনেকবার অনেক যুদ্ধে স্বদেশের ললাটদেশ বিজয় কিরীটদ্বারা সুশোভিত করিয়াছিলেন। তাঁহাকে স্বয়ং শত্রু সৈন্যের নেতৃত্বগ্রহণ করিয়া রোমের দ্বারদেশে আগমন করিতে দেখিয়া নগরবাসীগণ অত্যন্ত শঙ্কিত হইয়া উঠিল। এবং দুএকটি যুদ্ধেই রোমানগণ কোরায়ালেনাসের নিকট পরাজিত হইয়া সম্পূর্ণ হতবল হইয়া পড়িল। তখন তাহারা কোরায়ালেনাসের হস্ত হইতে আপনাদের আর কোনরূপে পরিত্রাণের উপায়ান্তর না দেখিয়া, নগরের সমবেত সম্ভ্রান্ত সম্প্রদায়, সেনেট সভার বৃদ্ধ সভ্যগণ ও পুরোহিত সম্প্রদায়, সকলের সহিত একত্রে মিলিত হইয়া তাঁহার নিকট গমন পূর্ব্বক, অতি দীনভাবে তাঁহাকে তাঁহার স্বদেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হইতে অনুরোধ করিতে লাগিল। এবং নগরের প্রধান শাসনকর্ত্তা কন্সলগণ তাঁহার সম্মুখে বহুধন রত্ন সংস্থাপনপূর্ব্বক তাঁহাকে রোমনগরীতে পুনরায় আহ্বান করিলেন। কিন্তু কোরায়ালেনাস তাহাদের সমস্ত ধন রত্ন ও বিনীত অনুরোধ অগ্রাহ্য করিয়া নিজ প্রতিজ্ঞা হইতে বিচলিত হইতে অস্বীকৃত হইলেন। সকল চেষ্টাই যখন নিষ্ফল হইল, তখন নগরের অধিবাসীগণ মন্ত্রণা করিয়া তাঁহার মাতাকে তাঁহার নিকট প্রেরণ করিলেন। এইরূপে যখন কোরায়ালেনাসের মাতা তাঁহার নিকট গমনপূর্ব্বক তাঁহাকে স্বদেশের

বিরুদ্ধে যুদ্ধ হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইতে বলিলেন, তখন কোরায়ালেনাসের অটল প্রতিজ্ঞা মুহূর্ত্তে ভাসিয়া গেল। সহস্র ধনরত্নের প্রলোভন সমস্ত নগরবাসীগণের অনুরোধে যাহা সাধিত হয় নাই, তাহা মাতার একটি বাক্যে সাধিত হইল। কোরায়ালেনাস মাতাকে সম্মুখে পতিত দেখিয়া আর প্রতিজ্ঞায় স্থির থাকিতে পারিলেন না। তিনি অশ্রুপূর্ণ নয়নে মাতাকে উঠাইয়া বলিলেন,—

হে মাতঃ একি? এ কার্য্য করিতেছ তুমি.
দেখ দেবগণ, হাসিছেন হেরি এই
দৃশ্য অদভুত। উঠ, উঠ, জেনো মাতঃ
রোমের জয়শ্রী হলো লব্ধ তোমা হতে।

মাতার প্রার্থনায় কোরায়ালেনাস নিজ প্রতিহিংসা চেষ্টায় জলাঞ্জলি প্রদানপূর্ব্বক রোমের দ্বারদেশ হইতে সসৈন্যে প্রস্থান করিলেন। একটি রমণীর প্রভাবে রোম আসন্ন শত্রুর কবল হইতে রক্ষা পাইল। যদি সে সময় সদ্যজাত শিশু রোম শত্রুদ্বারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হইত তবে জগতের কি মহান ক্ষতি সংসাধিত হইত। ইয়োরোপে যে খৃষ্টধর্ম্মের আজি এতদূর প্রভাব, সেই খৃষ্টধর্ম্মের প্রতি ইয়োরোপের রমণীগণই প্রথমে অনুরাগ প্রদর্শন করেন, তৎপরে পুরুষগণ এই ধর্ম্ম গ্রহণ করেন। রোম ও গ্রীসের অধিকাংশ রমণী যখন খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত হইতে লাগিলেন, তখন তদ্দেশস্থ পুরুষগণ সহস্র নিপীড়ন সত্বেও দলে দলে উক্ত ধর্ম্মে দীক্ষা গ্রহণ করিতে আরম্ভ করিলেন। কথিত আছে ইংলণ্ডের একজন রাণী প্রথম খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিলে, তৎপরে রাজা ও রাজ্যের প্রজাবর্গ তাহার অনুসরণ করেন। এই সূত্রে সমগ্র ইংলণ্ড ক্রমে খৃষ্ট ধর্ম্মাবলম্বী হইয়া পড়ে।

ফরাসী রাষ্ট্র বিপ্লবের ইতিহাসে দেখা যায়, যে ফরাসী রমণীগণই সেই মহাবিপ্লবের প্রধান উত্তেজক ও নিয়ন্ত্রী। ফরাসী রমণীগণই প্রথম যাজক ও সম্ভ্রান্তজনবর্গের মস্তক রাজপথে সিদ্ধ করিয়া ভক্ষণ করিয়াছিল।

বহুকাল পূর্ব্বে কার্থিজ নগরে সেণ্ট আগষ্টিন নামে একজন ঋষি বিদ্যমান ছিলেন। তাহার যৌবনকাল নানা প্রকার বিলাসব্যসনে কাটিয়াছিল। তিনি নাস্তিকগণের মধ্যে একজন অগ্রগণ্য ব্যক্তি ছিলেন। তাহার মাতা মনিকার ধর্ম্মজীবনের প্রভাবেই তিনি পূর্ণ যৌবনকালে সেণ্ট আগষ্টিন অর্থাৎ ঋষি আগষ্টিন এই আখ্যা প্রাপ্ত হয়েন। এই সেণ্ট আগষ্টিনের দ্বারাই প্রথম ইংলণ্ডে খৃষ্টধর্ম্ম প্রচারিত হয়। সেণ্ট আগষ্টিনের মাতা অত্যন্ত ধর্ম্মপরায়ণা রমণী ছিলেন। তিনি পুত্রের নাস্তিকতা ও বিলাসপ্রবণ প্রকৃতি দর্শন করিয়া অত্যন্ত ব্যথিত হইতেন। এবং তাঁহার মন ফিরাইবার জন্য সাধ্যমত চেষ্টা করিতেন। কিন্তু সেণ্ট আগষ্টিনের হৃদয় পর্ব্বত অপেক্ষাও অচল অটল। মাতার যত্ন চেষ্টা ও উপদেশ সে হৃদয়ে কিছুই কার্য্যকরী হইত না। একসময়ে মনিকা শুনিলেন যে, আগষ্টিন বিদেশে গমন করিয়া নানা বিলাসে লিপ্ত হইয়াছেন, তাঁহার সম্পূর্ণ অধঃপতনে যাইবার আর অধিক বিলম্ব নাই। নিরুপায় মাতা আর কি করিবেন মন্দিরে মন্দিরে পুত্রের মন ফিরাইবার জন্য ঈশ্বরের অর্চ্চনা করিয়া ফিরিতে লাগিলেন। মন্দিরের যাজকবর্গ তাঁহার এরূপ একনিষ্ঠতা দর্শনে বিস্মিত হইল। মনিকা যাহা চিরকাল বাসনা করিয়া আসিতেছিলেন, একদিন সত্য সত্যই তাহা সফল হইল। তাঁহার

ধর্ম্ম প্রভাবে পবিত্র বারিধৌত কুসুমের ন্যায় পুণ্যধৌত সেণ্ট আগষ্টিন গত জীবনের পাপের জন্য একদিন আসিয়া মাতার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। সেণ্ট আগষ্টিন বলিয়া গিয়াছেন যে, তাঁহার মাতার ধর্ম্ম জীবনের প্রভাবেই তিনি সেণ্ট পদবী লাভ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। এইরূপে দেখা যাইতেছে যে, রমণীর প্রভাব সংসারে অতি প্রবলরূপে বহমান। রমণীর প্রভাব যখন সংসারে এত প্রবল তখন রমণীর কর্ত্তব্যভার যে ততোধিক তাহা সহজে অনুমেয়। যে সমাজে রমণীগণ আপন কর্ত্তব্য বুঝিয়া চলিতে শিক্ষা করেন, সেই সমাজেরই তত উন্নতি হইয়া থাকে। রমণীর কর্ত্তব্যজ্ঞানের উপর সমাজের উন্নতির ভিত্তি সংস্থাপিত।

যে সমাজের যত অবনতি পরোক্ষভাবে প্রধানত রমণীগণই তাহার জন্য দায়ী হইয়া থাকেন। ফ্রান্সের কোন জ্ঞানী ব্যক্তিকে একদা কোন ব্যক্তি, জাতীয় উন্নতি কাহার উপর নির্ভর করিতেছে, এই কথা জিজ্ঞাসা করিলে তিনি তাহাকে, "রমণীগণের উপর" এই উত্তর প্রদান করিয়াছিলেন। বাস্তবিক রমণীগণই পরোক্ষভাবে সমাজের উন্নতি অবনতির নিয়ন্ত্রী। তাঁহাদের হস্তেই জাতীয় উন্নতি অবনতির কষ্টিপ্রস্তর সংস্থাপিত; ইহা বুঝিয়া উন্নত অবনত সকল সমাজের রমণীগণেরই নিজ নিজ জীবন সুগঠিত করা উচিত।

শ্রীলজ্জাবতী বসু।

দ।

জাতি।

আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য কি, এবং কি উদ্দেশ্যেই বা আমরা এ জগতে আগমন করিয়াছি, কতজন চিন্তাশীল তাহা লক্ষ করিয়া থাকেন? এক একটী জীবন এক এক দিকের স্রোতে ভাসিয়া যাইতেছে, কেহ স্বকৃত কার্য্যের ফলানুসারে সৎপথ অবলম্বনপূর্ব্বক জীবনের উন্নতস্তরে অগ্রসর হইতেছেন, কেহ বা চিরজীবন কষ্ট ভোগ করিয়া জীবনকে অসার ও শান্তিবিহীন বলিয়া মনে করিতেছেন। কেহ বা অপরদিকে শরীর ও মনের উৎকর্ষ সাধনার্থ সময়ের সদ্ব্যবহার করত হৃদয়ে সদগুণের কুসুম কানন সুসজ্জিত করিয়া উন্নতি শৈলে আরোহণ পূর্ব্বক এ সংসারকে মধুময় ও আনন্দের শান্তিভবন রূপে মনে করিতেছেন। স্বকৃত কার্য্যের ফলানুসারে বিরুদ্ধ অবস্থাপন্ন এই উভয়বিধ মানবজীবন সংসারে পরিলক্ষিত হইতেছে। বাস্তবিক ভাবিয়া দেখিলে বুঝা-যায় যে দয়াময় পরমপিতা এ সংসারকে মধুময় ও শান্তি নিকেতন রূপে সৃষ্টি করিয়াছেন। আমাদের সুখ সাচ্ছন্দ্যের জন্য তিনি কত অসংখ্য পদার্থ সন্নিবেশিত করিয়া এ সৌন্দর্য্য শালিনী পৃথিবী সৃষ্টি করিয়াছেন।

আমাদের জীবন রক্ষার্থ জল বায়ু উত্তাপ ও বিবিধরূপ খাদ্য প্রদান করিতেছেন। জীবনের উন্নতির জন্য জ্ঞান বুদ্ধি মেধা বিবেক প্রভৃতি কতই গুণের দ্বারা আমাদেরে সুখী হওয়ার প্রকৃত পথ প্রদর্শন করিয়াছেন। এ সকল অতুল সম্পত্তির সদ্ব্যবহার করিলেই মানব জীবন প্রিয় কার্য্য সাধন করিয়া ধন্য ও সুখী হইতে পারে। কিন্তু অতি দুর্ভাগ্যের বিষয় যে, আমরা এরূপ অমূল্য রত্নের অধিকারী

হইয়া তাহা পদে দলন করত, হিংসা, দ্বেষ, পরশ্রীকাতরতা পরনিন্দা লইয়াই উন্মত্ত রহিয়াছি। আমরা অমৃত আশে বিষ পান করিতেছি হায়! আমাদের জীবনের কার্য্য গুলি কেবল স্বার্থসাধন ও আত্মসুখান্বেষণের জন্যই অনুষ্ঠিত হইতেছে। অন্যের উন্নতি ও সুখ দর্শন করিলে প্রাণ যেন শতশিখায় জ্বলিয়া উঠে। এইরূপ অবস্থার কলঙ্কিত চরিত্র চিত্রের গৌরব প্রদর্শনার্থ ব্যাকুল হইয়া দেশের চিরপরিচিত বাঙ্গালী জাতি উন্নতি সাধনে ব্যস্ত হইতেছেন। কেহ বা উন্নতির ধ্বনি তুলিয়া আস্ফালন করত, আকাশ পথ বিদীর্ণ করিতেছেন এবং নিজের স্বার্থ ও সুবিধা অন্বেষণ করিয়া বেড়াইতেছেন। যে স্থানে একতা সৌজন্য ও স্বার্থত্যাগ নাই, সে স্থানে উন্নতির আলোকমালা কিরূপে বিস্তারিত হইবে? বাস্তবিক বাঙ্গালী জাতির উন্নতি অন্ধকারময়। হৃদয়াকাশে বিদ্যুৎ ক্রিয়া ঘন ঘন পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। আজি যাহাকে বন্ধু ভাবে গ্রহণ করিয়া হৃদয়ের সুখ দুঃখ সকল কথা জানাইলাম, যাহাকে প্রাণারাম অমৃত ও পবিত্রময় বলিয়া মনে করিলাম, কাল সেই হৃদয়বন্ধু ভীষণ কাল সর্পে পরিণত হইয়া দংশন করিল। বাস্তবিক বাঙ্গালী মানব জীবন বহুরূপী চিত্র প্রদর্শন করিতেছে, সর্প যেমন সময় বিশেষে দেহবল্কল পরিত্যাগ করিয়া থাকে, মানব প্রকৃতিও ঠিক সেইরূপ বিভিন্ন রূপ ধারণ করিয়া অমৃত সুখ বিষাক্ত গরলে পরিণত করিয়া থাকে। তাই এ শান্তিময় পবিত্র সংসারে বিষ অগ্নি নিয়ত প্রজ্বলিত হইতেছে। হায়! বাঙ্গালী জাতির শান্তি সুখ ও পবিত্রতা কোথায় গেল? যেখানেই যাও দেখিবে পরশ্রীকাতরতা হিংসা পরনিন্দা প্রভৃতির অশেষ রূপে পূজা হইতেছে।

পরের উন্নতি, সুখ শান্তি বা সুখ্যাতি দেখিয়া যাহাদের হৃদয়ে কাতরতার তীব্র দংশন একবার প্রকাশ পাইয়াছে, তাহারা ক্রমশঃই সদ্‌গুণাবলী পদদলিত করিয়া জঘন্যতার সর্ব্বোচ্চ স্থান লাভ করিয়া থাকে। অধিকাংশ বাঙ্গালী জাতির মন নিয়ত এইরূপ অসৎভাবে কলুষিত হইয়া মাদক সেবীর ন্যায় নিশ্চিন্ত মনে জাতীয় সর্ব্বনাশ সাধন করিতেছেন। যে জাতির মন এরূপ ভাবে আক্রান্ত হইয়া পড়িতেছে, তাহাদের উন্নতি সাধন আর কিরূপে সম্ভবপর হইবে? তাহাদের শান্তি ও সুখ স্বপ্নবৎ কল্পনা মাত্র। এই মনুষ্যত্ব বিহীন গুণগুলি অন্তঃকরণে পরিপোষণ করিয়া মানব কি অপরূপ রূপই ধারণ করিয়া থাকেন। প্রাণী জগতে জগদীশ মানব জাতিকে কিরূপ অশেষ গুণে শক্তি সম্পন্ন করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। মানবগণ কি সুন্দর মনোবৃত্তি সকল লাভ করিয়াছেন। কিন্তু ভ্রমান্ধতাবশতঃ সে সকলের অসদ্ব্যবহার করিয়া মানব কি ছার ক্ষণিক সুখে উন্মত্ত হইয়া থাকে। একের উন্নতি সোপান অপরে প্রাণপণ চেষ্টায় পদাঘাত করিয়া ভগ্ন করিতে উদ্যত হইয়াছেন। কেহ কাহারও উন্নতি ব্যঞ্জক কথা শুনিলেই হৃদয়ে যেন অগ্নি সঞ্চার হইয়া উঠে বস্তুত হিংসুক ব্যক্তি ও হিংস্রক জন্তু এক শ্রেণী মধ্যেই পরিগণিত। হিংসা অগ্নির ন্যায় দহনশীল, ইহার এক কণিকা শত শিখায় প্রদীপ্ত হইয়া প্রাণ মনকে দগ্ধ করিতে থাকে বাস্তবিক হিংসাই মানব জাতির অবনতির একটী প্রধান পরিচালক। এই জন্যই "অহিংসা পরম ধর্ম্ম" বলিয়া সাধু মুখে কীর্ত্তিত হইয়া থাকে। এই সর্ব্বনাশ সাধক বৃত্তি যাহাদের হৃদয়ে প্রবল

রূপে আধিপত্য বিস্তার করিয়াছে ; তাহাদের মানবত্ব অচিরেই বিলুপ্ত হইয়া যাইবে সুতরাং তাহারা বৃথা মানব নাম ধারণ করিয়া নামের অবমাননা করিয়া থাকেন। সভ্য ইংরেজ জাতীর সহিত এ নীচ জাতির তুলনা করিলে তাঁহাদের পূজা করিতে কেন না ইচ্ছা হইবে ? তাঁহাদের মনোবৃত্তি কখনই এরূপ নীচতায় সংস্পৃষ্ট নহে। তাঁহাদের অহিংসা মূলক পবিত্র সদ্ভাব তাঁহাদের প্রকৃত উন্নতি শৈলে আরোহণের প্রধান অবলম্বন। এরূপ উচ্চ প্রকৃতির যে জীবন তাঁহাদের উন্নতি না হইলে আর কাঁহাদের হইবে ? প্রতিযোগীতা না থাকিলে উন্নতি হয় না বটে কিন্তু তাঁহাদের প্রতিযোগীতা প্রতিযোগীতা নহে। পরশ্রী কাতরতা মূলক তাঁহারা জাতীয় অনিষ্ট সাধন করিয়া উন্নতি লাভ করিতে চায় না। বাঙ্গালী জাতির হিংসা ও পরশ্রীকাতরতাই জীবনের সম্বল এবং এ অস্ত্রের সহায়তাতে তাহারা সমস্ত জীবন অতিবাহিত করেন। আমার উন্নতি হক্ অপরের যেন হয় না, আমি সুখী হই আর অপরে যেন চিরদিন কষ্ট পায়, এই হীন ভাব সর্ব্বদা আমাদের হৃদয়ে খেলিতে থাকে। হায়! আমরা মানব নাম ধারণ করিয়াও যে পশু অপেক্ষা অধম হইয়াছি, তাহার প্রতি আমাদের একবারও লক্ষ্য হয় না। কোথায় উন্নতি করিবার চেষ্টা করিব, তাহা না করিয়া আমরা নীচ মনোবৃত্তির পূজার জন্য নানারূপ পুষ্প আহরণ করিতেছি। পরনিন্দা ও আমাদের জীবনের একটী মহৎ কাজ বলিয়া মনে হইয়া থাকে তাই পরনিন্দা করিতে আমরা বড় ভালবাসি। পৃথিবীতে কতকগুলি অতি নীচ প্রকৃতির লোক আছেন তাহারা কেবল পরনিন্দা করিয়া সমস্ত জীবন কাটাইয়া নিজকে ধন্য মনে করেন, যেন পরনিন্দাই তাহাদের জীবনের একমাত্র মুখ্য উদ্দেশ্য বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে। কোথাও কাহাকে উন্নতি করিতে দেখিলে বা কোথাও কাহার উন্নতি ব্যঞ্জক কথা শুনিলে তাঁহার নিন্দা বা কোন একটী দোষারোপ না করা পর্য্যন্ত প্রাণ যেন তৃপ্তি লাভ করে না সুতরাং বাঙ্গালী জাতির মধ্যে ধীরে ধীরে এ রোগটী দিন দিনই অতি সংক্রামক হইয়া দাঁড়াইয়াছে, আমাদের নিন্দা ও কপটতার প্রধান অস্ত্র "কিন্তু" ইহার সাহায্যে আমরা কতরূপ ছন্দে ও ভাবে বাক্‌পটুতা প্রকাশ করিয়া থাকি। যদি কাহার সমক্ষে একজন সর্ব্ব গুণ সম্পন্ন ব্যক্তির প্রশংসা করিতে প্রবৃত্ত হই, তবে তাহাকেও উপসংহার কালে কিন্তুর বাণ যোগ করিয়া সাধ্যমত চিম্‌টি কাটিয়া অভ্যস্ত বিদ্যার পরিচয় প্রদান করিয়া থাকি। আমাদের বাঙ্গালী জাতির উন্নতি এখন বহুদূরে অবস্থিতি করিতেছে। তাহারা স্বজাতিকে ঘৃণা করে ও স্বজাতির দোষ অন্বেষণেই সর্ব্বদা ব্যস্ত।

ইংরেজ জাতির অনুকরণ করিতে যাইয়া অনেক বাঙ্গালী কেবল বিলাসী হইয়া পড়েন, কিন্তু যে গুণাবলী অনুকরণে স্বদেশের উন্নতির সম্ভাবনা তাহা আয়ত্ত করিতে বড়ই ভয় পান। ইংরেজ জাতির একতা সৌজন্য পরোপকার দেখিলে হৃদয় আনন্দে অভিষিক্ত হয় তাঁহারা স্বজাতির জন্য প্রাণদানেও প্রস্তুত। বাঙ্গালী একে অপরের সর্ব্বনাশ সাধন করিতে পারিলেই নিজকে ধন্য মনে করে। আমাদের হৃদয় অতি দুর্ব্বল তাই আমরা পরনিন্দাকে এত ভয় করি যে, সময় বিশেষে নিজ কর্ত্তব্য কাজের হেলা করিতে ক্রটী করি না। কর্ত্তব্য পরায়ণ ব্যক্তিগণ নিন্দাবাদ শ্রবণ করিয়া কখনও মনকে ভগ্ন হইতে দেন না। এসম্বন্ধে মনকে বলশালী করা

চাই, নতুবা কর্ত্তব্য পালনের ব্যাঘাত হইবে বাঙ্গালীর সংসর্গ এমনই খারাপ হইয়া পড়িয়াছে যে আমরা যতই ঘনিষ্ঠ ভাবে সংসর্গ লাভ করিতে অগ্রসর হই, ততই যেন মহা অশান্তি বর্দ্ধিত হইতে থাকে। প্রায়ই ৪।৫ জন বাঙ্গালীকে একত্র আলাপ করিতে দেখিলেই বুঝা যায় যে, কাহার নিন্দা করিয়া হিংসা ও কপটতার যাগযজ্ঞ আরম্ভ হইয়াছে। এজাতি নিন্দা ছাড়া ভাল আলাপ করিতে জানে না বা অবসর পায় না।

আমাদের এরূপ নীচ প্রকৃতি সম্পন্ন জাতিকে শতধিক। আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য কি আমরা কেন আসিয়াছি, কি কার্য্য সাধন করিতেছি, হায়! তাহা ত একবারও চিন্তা করি না কেবল পরনিন্দা, পরচর্চ্চা, হিংসা ও কপটতার আশ্রয়ে সুখময় জীবনকে অশান্তিময় করিতেছি। আমরা ভালমন্দ বুঝিয়াও কেন কর্ত্তব্য পালনে বিমুখ হইতেছি। দৃঢ় সঙ্কল্প না করিলে কি কার্য্য সাধিত হয়?

শ্রীহিরণ্ময়ী সেন গুপ্তা।

রন্ধন

পাকা আমের বড়া।—সুমিষ্ট পাকা আমের রস, ময়দা বা চাউলের গুঁড়ী ছোট এলাচের কয়েকটা দানা ও একটু চিনি একত্রে মিশাইয়া ঘিতে ছোট ছোট করিয়া বড়া ভাজিতে হইবে। বড়াগুলি মচমচে লাল রঙ্গের হইলেই তুলিয়া আহার করিতে দিবে।

ডিমের কচুরী।—আজকাল ডিমের উপকারিতা অনেকেই বুঝিয়াছেন। এবং সেই জন্য ডিমের দ্বারা নানাবিধ খাদ্য প্রস্তুত হইয়া থাকে। ডিম অতি পুষ্টিকর বস্তু। ডিমের কচুরী প্রস্তুত করিয়া পাঠিকারা জল খাবার দিতে পারেন।

৩।৪টা ভাল ডিম সুসিদ্ধ করিয়া প্রথমে উপরের খোসা ছাড়াইয়া তাহাকে নিম্নলিখিত মসলার গুঁড়ার সহিত মাখিতে হইবে। ধনে জিরে একটু ভাজিয়া লঙ্কা হলুদ ছোট এলাচ ২টা লবঙ্গ পেঁয়াজ কুচি (ঘিতে পূর্ব্বেই একটু ভাজিয়া লইতে হইবে) এইরূপে কচুরীর পুর প্রস্তুত করিয়া স্বতন্ত্র থালাতে ময়দা ঘিয়ের ময়ানি একটু লবণ ও জল দিয়া উত্তমরূপে মাখিতে হইবে। ময়দা যত ঠাসা হইবে ততই কচুরী সুস্বাদু হইবে। ময়দার ছোট ছোট গুঠুলী করিয়া তাহার ভিতরে অল্প ২ পুর দিয়া মুখ উত্তমরূপে বন্ধ করিয়া ধীরে ধীরে বেলুনের দ্বারা বেলিবে। যেন মুখ খুলিয়া না যায়। কড়াতে ঘি উত্তমরূপে গরম হইলে বেলা কচুরী তাহাতে দিবে। ঈষৎ লাল রঙ্গের হইলেই তুলিয়া লইবে। এই কচুরী গরম গরম খাইতে হয়। আলুর দম বা চাটনির সহিত খাইতে সুস্বাদ হয়।

ডিমের বল।—ডিমকে ভাঙ্গিয়া ভিতরের কেবল কুসুম তুলিয়া ঘিয়ে ভাজিতে হইবে। তারপর তাহাকে দোবারা চিনি রসে (ঠিক গজার রসের ন্যায় ঘন) দিয়া নাড়িতে হইবে। যখন কুসুমের চারিদিকে চিনি বেশ করে জমিয়া শক্ত হইবে তখন নামাইয়া পৃথক পৃথক্ রাখিবে। ঠাণ্ডা হইলে টীনের ভিতর মুখবন্ধ করিয়া রাখিয়া দিবে। ছোট ছেলেদের জন্য এই খাবার বেশ উপাদেয়।

ডিমের নিম্‌কি।—কাঁচা ডিমকে ভাল করিয়া ফেনাইয়া তাহার সহিত ঘি ময়ান দিয়া, ময়দা একটু বুটের ডালের বেসন একটু লবণ ও কয়েকটা গোলমরিচ ছেঁচিয়া উত্তমরূপে শক্ত করিয়া মাখিতে হইবে। তারপর ছোট ছোট লেচি করিয়া তাহাকে ত্রিকোণ করিয়া বেলিতে হইবে। কড়াতে ঘি গরম হইলে তাহাতে ছাড়িয়া বেশ লাল করিয়া ভাজিয়া লইবে। এই নিম্‌কি গরম গরম খাওয়া উচিত। বাসি হইলে ডিমের গন্ধ হয়।

রুটীর মোরব্বা।—ইহা প্রস্তুত করিতে এক পোয়া ওজনের বাসি পাউরুটী, ওজনে প্রায় চৌদ্দ ছটাক পরিমাণ জল এবং চা চামচের দুই চামচ চিনি লাগে।

প্রথমে রুটী কাটিয়া পাত্‌লা পাত্‌লা টুক-রায় বিভক্ত কর এবং ঈষৎ পিঙ্গল না হওয়া পর্য্যন্ত আগুনে ঝল্‌সাইয়া লও। তারপর রুটীর টুকরা নির্দ্দিষ্ট চিনিও জলের সহিত কড়ায় করিয়া আগুনে চড়াও এবং মোরব্বার ন্যায় না হওয়া পর্য্যন্ত আস্তে আস্তে জ্বাল দিতে থাক। তারপর ঐ উষ্ণাবস্থাতেই কোনও পাত্রে ছাঁকিয়া ফেল। এইরূপে ইহা প্রস্তুত হয় এবং চা কিম্বা কাফির সহিত ব্যবহার করা যাইতে পারে। এই মোরব্বা উষ্ণাবস্থায় ও শুধু ব্যবহার করা যাইতে পারে।

ডিমের সর্‌বত্‌।—ইহা প্রস্তুত করিতে একটী টাট্‌কা হাঁস কিংবা মুরগীর ডিমের মধ্যস্থ হরিদ্রা অংশটুকু, এবং চা চামচের এক চামচ গুঁড়া চিনি, দুই চামচ দুধ ও আধ পাইণ্ট সোডার জল আবশ্যক। প্রথমে একটী ডিম ভাঙ্গ, খোলা ও তন্মধ্যস্থ সাদা অংশটুকু ফেলিয়া দিয়া হরিদ্রা অংশটুকু রাখ। উহার সহিত নির্দ্দিষ্ট চিনি মিশাইয়া কাষ্ঠ নির্ম্মিত একখানি চাম্‌চে দিয়া ১০ মিনিট পর্য্যন্ত উহা নাড়িলে যখন সরের ন্যায় আকার ধারণ করিবে, সেই সময়ে নির্দ্দিষ্ট দুধ মিশাইতে হইবে। এবং কোমল না হওয়া পর্য্যন্ত চাম্‌চে দিয়া নাড়িতে হইবে। তারপর একটী কলাই অথবা কাঁচের গ্লাসে ঢালিয়া তন্মধ্যে আধ পাইণ্ট সোডার জল দিয়া পূর্ণ করিতে হইবে। এইরূপ করিলেই উৎকৃষ্ট ডিমের সর্‌বত্‌ প্রস্তুত হইবে। ইহা খুব বলকারী। সকলেই ব্যবহার করিতে পারেন।

শ্রীইন্দুবালা ঘোষ।

বিধবা।

এই বিধবা শব্দে আমাদিগের মনে কি একটী করুণ স্মৃতি জাগাইয়া তুলে তাহা বোধ হয় সহৃদয় সকলেই অনুভব করিয়া থাকিবেন। সুকবি সুভাবুকগণ বিধবাকে হৃদয়রাজ্যে কল্পনার স্বর্ণ সিংহাসনে বসাইয়া মূর্ত্তিমতী পবিত্রতা স্বর্গের দেবী ভাবিয়া তাবে ভক্তির পুষ্পাঞ্জলী প্রদান করেন। সে আদর্শ বড় উচ্চ, বড় পবিত্র, কিন্তু হায়! কেবল কাব্য কবিতায় বাস্তব জীবন চলে না,—বিশেষতঃ হিন্দু রমণীর। অনেকে বলে বিধবার মুখে একাদশী দিন পবিত্র জ্যোতিঃ দেখিতে পান। নৃশংস অত্যাচারে, অনাহারে শুষ্ক, করুণ কচি মুখে জ্যোতিঃ কল্পনা করিয়া যাঁহারা আনন্দ উপভোগ করেন, আমার বোধ হয় ভীষণ দুর্ভিক্ষের সময় শত শত অনাহারক্লিষ্ট মুখে

জ্যোতি দর্শন করিয়া তাঁহারা উল্লাসে নাচিতেও পারেন। আমার এই প্রবন্ধে যুবতী ও বালিকা বিধবাদিগকেই লক্ষ্য করিতেছি; এক্ষণে এই বালবিধবার সংখ্যা এত অধিক যে, বিধবার কথা ভাবিতেই যৌবনে যোগিনীর এক করুণ কোমল চিত্র চোখের উপর ভাসিয়া উঠে!

কাব্য ছাড়িয়া কবির চস্‌মা খুলিয়া এক বার হিন্দু সমাজে বিধবার অবস্থা ভাবিয়া দেখা যাউক; এজন্য বেশী দূর যাইতে হইবে না। কোন সময় আমাদের আশ্রয়ে একটি সরলা সুকুমারী বিধবা বালিকা ছিল; তাহার পিতা ভ্রাতাও সে সময় উপস্থিত ছিলেন। একাদশীর দিন, দিবস কোন রূপে যাইত কিন্তু সন্ধ্যা হইতেই বালিকা ক্ষুধায় এমন অবসন্ন ভাবে ছিন্ন লতিকার ন্যায় শয্যায় পড়িয়া থাকিত যে, সে দৃশ্য দর্শনে অতি পাষাণ হৃদয়ও বিগলিত হইয়া যায়! মুখে কথা বাহির হইত না, বোধ হইত নিশ্বাস প্রশ্বাসও যেন অতি কষ্টে বহিতেছে। একটু দুগ্ধ, একটু জল পান করাইবার জন্য কত চেষ্টা করিয়াছি কিন্তু হায়, ধন্য নিষ্ঠুর সমাজের পৈশাচিক শাসন! দারুণ গ্রীষ্মের দিনে পিপাসায় প্রাণ যায় তবু কেবল সমাজের ভয়েই মুখে জল বিন্দুও দেওয়ার উপায় নাই; ধিক সমাজ! শত ধিক সমাজের নেতৃগণকে!!

সেই সময়েই বিধবার প্রতি বিভৎস অত্যাচার আমি যেন জলন্ত ভাবে অনুভব করিয়াছি। একাদশীর রাত্রে অশ্রু রাখিতে পারি নাই, আমার আহার হয় নাই; কিন্তু তাহারই জ্যেষ্ঠ সহোদর পরিতৃপ্ত ভাবে আহার করিয়া আনন্দ মনে গান করিতে করিতে শয়নার্থে গিয়াছে—আর পার্শ্বের ঘরে ভগিনী অনাহারে অনিদ্রায় বিশুষ্ক ব্রততীর ন্যায় পড়িয়া আছে। ভ্রাতার বোধ হয় তাহা মনেই নাই; কি ভীষণ নিষ্ঠুর হৃদয়বিদারক দৃশ্য!!

এইরূপে বিধবাদিগের প্রতি হৃদয় হীনতার আরও শত শত দৃশ্য আমার পরিচিত আত্মীয়গণের মধ্যেই দর্শন করিয়া প্রতিকারের অক্ষমতায় হৃদয়ে অসীম ক্লেশ অনুভব করিতেছি।

আমার ভক্তি ভাজনীয়া সরলা সহৃদয়া একটি বিধবা একদা আবেগ আপ্লুত স্বরে আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "বলিতে পার বিধবার কি অপরাধ? বিধবা হইয়া কি অপরাধ করিয়াছি?" পরে জানিতে পারিলাম শিল্প শিখিতে ইচ্ছা প্রকাশ করায়, "বিধবার আবার সেলাই শিখার সখ", বলিয়া অভিভাবক বর্গের নিকট তাঁহাকে নিষ্ঠুররূপে লাঞ্ছিত হইতে হইয়াছে। জানিনা হিন্দুর কোন শাস্ত্রে এই সব বিধি লিখিত আছে।

বরাবর শুনিয়া আসিতেছি প্রীতি প্রেম স্নেহ দয়ায় বাঙ্গালী আদর্শ, বাঙ্গালী হৃদয় ভালবাসার আকর; কিন্তু হায়! বাস্তব জীবনে বাঙ্গালীর কার্য্য কলাপে তাহার তো নিদর্শন কিছুই দেখি না। বিধবার প্রতি—রমণীর প্রতি আপন বনিতা দুহিতা ভগ্নীর প্রতি সাধারণতঃ বাঙ্গালীর যেরূপ ব্যবহার, সেই অহৃদয়তা, নিষ্ঠুরতা অত্যাচার, স্মরণ করিতেও বক্ষফাটিয়া চক্ষু হইতে অশ্রু পড়িতে থাকে। তাহাতে মনে হয়না ভালবাসা ইত্যাদি বলিয়া কোন মানবীয় বৃত্তি ইহাদের হৃদয়ে আছে। এই নিষ্ঠুরতা দর্শনেই প্রাণের জ্বালায় কবি গাহিয়াছেন।

"নিষ্ঠুর জনক ভ্রাতা নিষ্ঠুর বিমুখ ধাতা
নিষ্ঠুর বিমুখ তিনি, পতি নাম যাঁর।"

হায়! ইহাপেক্ষা ক্ষোভের কথা আর কি

আছে? আপন ভাই ভগিনীর মুখপানে চায় না? পিতা কন্যার প্রতি কর্ত্তব্য পালন করেন না? পতি পত্নীকে সুখী করে না!! ইহাপেক্ষা মানব সমাজে আর কি অবনতি অধোগতি সম্ভব? যে দিকে চাই সেই দিকেই পিশাচের ভীষণ অভিনয়।

আপন গৃহে যাহার ব্যবস্থার "ব" নাই তাহারাই আবার ব্যবস্থাপক সভার সভ্য হইবার জন্য লালায়িত হয়! ধিক! এই সকল জীবকে শতধিক!! কি করিতে ইহারা বাঁচিয়া থাকে? ভারতের কলঙ্ক জগতের ভার!

হায়, হায়, ইহার কি কিছুই প্রতিকার নাই? হায় শিক্ষিত সভ্য বঙ্গবাসীগন! উন্নতির জন্য লালায়িত তোমরা সবই কি তোমাদের মুখে? এখনও কি কৃত্রিমতার খোলস ছাড়িবার সময় হয় নাই? উঠ! বস! একবার চাহিয়া দেখ, তোমাদের আশ্রিতা নির্ভরশীলা সবলা কুমারী বিধবা-ললনার অবস্থা কিরূপ হৃদয়বিদারক!!

আমি এখানে বিধবার বিবাহের কথা তুলিতে চাহিনা। বিবাহের মধ্যে সকল সুখ শান্তি কর্ত্তব্য আবদ্ধ আছে, একথা কখনই সম্ভব নহে। আমাদিগের মত আমাদিগের প্রার্থনা; মন্দভাগিনী স্বামী-হীনা, বালিকা দিগের প্রতি করুণ কোমল দৃষ্টি পাত করিয়া তাহাদিগের সুশিক্ষার ব্যবস্থা করুন, যাহাতে তাহারা আপন পবিত্র জীবনের গুরুতর দায়ীত্ব বুঝিতে ও বহিতে সক্ষম হয়।

শ্রীপ্রমীলাসুন্দরী দেবী।

সূতিকাগারে প্রসূতির শুশ্রূষা

সূতিকা গৃহে প্রসূতি এবং শিশুর পদে পদে বিপদের আশঙ্কা। অতি সন্তর্পনে সূতিকাগৃহে বাস করা উচিত। আমাদের দেশে অধিকাংশ লোকে সূতিকা গৃহকে অতি অশুচি ভাবেন, তজ্জন্য এক মাস অবধি প্রসূতি এবং শিশুকে স্পর্শ করেন না। সামান্য একজন মূর্খা ধাত্রীর হস্তে প্রসূতি এবং শিশুর প্রাণ সমর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত থাকেন।

সোনার পুতুলি দুগ্ধ পোষ্য শিশু নীচ জাতীয়া স্ত্রীলোকের হস্তে নিক্ষেপ করিয়া নিশ্চিন্ত হওয়া যে, কতদূর বিপজ্জনক তাহা আমরা, জাতীয় সংস্কার বশতঃ বুঝিতে অবসর পাই না। সূতিকাগৃহকে অশুচি জ্ঞানে প্রায় মাসাবধি শিশুকে তাচ্ছল্য করিয়া অকালে কত শত সোনার পুতুলিকে কালের করাল গ্রাসে নিক্ষেপ করিয়া থাকি। ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত দ্বারাও আমাদের জ্ঞান হয় না। এক ব্যক্তির সন্তান হয় নাই, সন্তান না হইলে বংশ থাকিবে না, বাটীর সকলেই ক্ষুণ্ণ, সকলেই দুঃখিত, যাহাকে সকলে বন্ধ্যা বলিয়াই জানেন, ঈশ্বরানুগ্রহে তাঁহার একটী সন্তান হইল। সকলে আনন্দে উৎফুল্ল হইলেন। উঠানের এক পার্শ্বে সদ্য প্রস্তুত একটী আঁতুর গৃহে প্রসূতি এবং শিশু রক্ষিত হইল। স্যাঁত সেঁতে এবং বায়ুবদ্ধ গৃহে শীঘ্রই শিশুর রোগ জন্মাইল, প্রসূতি কোন প্রকারে সে যাত্রা রক্ষা পাইলেও শিশু রক্ষা পাইল না। পেঁচো চুয়ালে রোগে অতি আশার ধন বংশধর কাল গ্রাসে পতিত হইল। আমোদ আহ্লাদ সকলই ফুরাইল! তবুও আমরা নিজের দোষ বুঝিব না, এমনি আমাদের সংস্কার! যদি কেহ বলেন, কিসে ছেলেটি মারা গেল, তাহার

উত্তর হইবে এই, "তার পরমায়ু নাই গো বাছা, তাকে পেঁচো পাইয়াছে, সে কি আর বাঁচে।" নিজের দোষ কেহই বুঝিবেন না।

সূতিকাগৃহে প্রসূতি এবং সন্তানকে নীরোগ রাখিবার জন্য কতকগুলি সুবন্দোবস্ত একান্ত প্রয়োজন। প্রথমত সূতিকাগৃহ পরিস্কার পরিচ্ছন্ন হওয়া চাই। স্যাঁত সেঁতে না হয়, নিকটে কোন দুর্গন্ধ না থাকে, বায়ু গমনাগমনের জন্য ঘরটীতে অন্ততঃ দুটী গবাক্ষ থাকা উচিত। গ্রীষ্মকালে দক্ষিণদ্বারী, শীতকালে আর বর্ষাকালে পূর্ব্বদ্বারী সূতিকাগার ভাল।

প্রসবের পর যাহাতে প্রসূতির ঘুম হয়, সে বিষয়ে যত্ন করা উচিত। ভাদালির কামড়ের জন্য যদি প্রসূতি বিশেষ কাতর হয়, অথবা কোন অন্য প্রকার উৎসর্গ ঘটে, তাহা হইলে চিকিৎসকের পরামর্শ লওয়া আবশ্যক। প্রসবের পর দশদিন পর্য্যন্ত প্রসূতির উঠিয়া দাঁড়ান উচিত নহে। একদিন এক রাত তো মোটেই উঠিবে না, তবে দশ দিন পর্য্যন্ত যত কম উঠে বসে ততই ভাল। প্রসূতিকে তিন দিন দুধ, সাগু খাইতে দিবে। চতুর্থ দিনে ভাত দেওয়াই শ্রেয়।

আমাদের দেশে প্রসূতিকে ঝাল খাওয়ানের বড় ধুম, কিন্তু ঝাল খাওয়ানের তো প্রয়োজন করে না। আমরা পুস্তকেও পাঠ করিয়াছি এবং চিকিৎসকের প্রমুখাত অবগত হইয়াছি যে, ঝাল খাওয়ানের প্রয়োজন নাই। তবে শুঁট পিপুলের গুঁড়ো ভাতের সহিত সামান্য মাত্র খাইতে দিতে পারা যায়।

বেশী পরিমাণে ঝাল কিম্বা ঘৃত খাইলে প্রসূতির কঠোর ব্যামো হইতে পারে। প্রসূতিকে সেক তাপ দেওয়া মন্দ নহে, সহ্যমত সল্প পরিমাণে সেক তাপ দিলে প্রসূতি আরাম বোধ করিবে, এবং গাত্র বেদনা নিবারণ হইয়া শীঘ্র সুস্থতা লাভ করিবে, তাই বলিয়া যে আগুণ জ্বালিয়া অতিরিক্ত সেক তাপে প্রসূতিকে পুড়িয়া ফেলা তাহাও বিধেয় নহে।

আমাদের দেশে শিশুকে সেক তাপ দিবার প্রথা কমিয়াছে তাই মঙ্গল, কিন্তু নাভিতে সেক দেওয়ার প্রথা এখনও আছে, নাভিতে সেক দেওয়া কুফল বই সুফল প্রদ নহে।

নাভিতে সেক দিলে নাভি শুখান দূরে থাক বরং পাকে। নাভি পাকিলে শিশু বড় কষ্ট পায়। এবং তাইতে পেঁচো চুয়ালে প্রভৃতি নানা রকম রোগ হয়। শিশুর নাভি পাকিলে ছাগল নাদি আনিয়া পোড়াইয়া পাতলা ন্যাকড়ায় ছাঁকিয়া (বালি না থাকে) শিশুর নাভিতে দুই তিন দিন দিলে আরোগ্য হয়। মোট কথা কয়েকটী বিষয়ে খুব সাবধানে থাকিতে পারিলে, আর শিশুর আঁতুর ঘরে রোগ বালাই হয় না। প্রধানতঃ ছেলের গায়ে হিম লাগান উচিত নয়, ছেলেকে অপরিষ্কার রাখা উচিত নয়, ভূমিষ্ঠ হইবার পরে ছেলের কোষ্ঠ পরিষ্কার সম্বন্ধে লক্ষ রাখা উচিত। যাহাতে ভাল রূপ নাড়ী কাটা হয়, এবং শিঘ্র নাভি শুক হয়, সে বিষয়ে লক্ষ রাখা উচিত। ছেলেকে অতিরিক্ত দুধ খাওয়ান উচিত নয়। অনেকে মনে করেন বেশী করিয়া দুধ খাওয়াইলে ছেলে বেশ হৃষ্ট পুষ্ট হইবে, কিন্তু তাহা ভুল। ছেলেকে অতিরিক্ত দুধ খাওয়াইলে হজম করিতে পারিবে না, শীঘ্রই পেটের ব্যামো হইবে। আঁতুর ঘর স্যাঁত সেঁতে না হয়, এবং যেন উত্তম রূপ বাতাস খেলিতে পারে। এই কয়টী বিষয়ে

সাবধান না হইলে ছেলের পেঁচো চুয়ালে হইবার সম্ভাবনা। পনর দিবস পর্য্যন্ত শিশুর পেঁচো চুয়ালে প্রভৃতি রোগ হইবার সম্ভাবনা, তাহার পরে তত ভয় নাই! তবে সাবধান থাকা একান্তই কর্ত্তব্য, সাবধানের মার নাই।

তিন দিন পর্য্যন্ত প্রসূতির স্তনে দুধ হয় না, সেই তিন দিন ব্যতীত শিশুকে গো দুগ্ধ খাওয়ান ভাল নহে। যদি প্রসূতির দুগ্ধ কম হয় কিম্বা না থাকে তাহা হইলে শিশুকে গাধার দুগ্ধ খাওয়ান কর্ত্তব্য। গাধার দুগ্ধও যদি সুবিধামত না মিলে অগত্যা গরুর দুধে জল মিশাইয়া ছেলেকে খাওয়াইবেন, ছেলের দাঁত বাহির না হইলে বার্লি, মেলিন্সফুড্ কিম্বা অন্য কোন দ্রব্য খাওয়ান কর্ত্তব্য নয়।

ছেলেকে বাসি দুধ খাওয়ান উচিত নয়। সকালের দুধ বৈকাল পর্য্যন্ত এবং বিকালের দুধ রাত্রে খাওয়ান যাইতে পারে।* ছেলেকে খাওয়ার উপর খাওয়ান, কিম্বা ঘণ্টায় ঘণ্টায় খাওয়ান উচিত নহে, তা গো দুগ্ধই হউক কিম্বা মাই দুধই হউক। উপর্য্যুপরি খাওয়াইলে পেটের ব্যাম হয়। আঁতুড়ের ছেলেকে দিনে রাত্রে বার চৌদ্দবারের বেশী দুগ্ধ দেওয়া উচিত নহে। পেট ফাঁপা কিম্বা কোষ্ঠবদ্ধ, আঁতুড়ের ছেলের পক্ষে বিপদের কারণ।

প্রসূতির খাওয়ার বিষয়ে সতর্ক হওয়া নিতান্ত প্রয়োজন। প্রসূতির খাওয়ার অনিয়মবশতঃ ছেলের পেটের পীড়া হইতে পারে। কিম্বা শীতল জল ব্যবহারের নিমিত্ত শিশুর সর্দ্দি হয়। প্রসূতির মন সর্ব্বদা প্রফুল্ল রাখা উচিত। প্রসূতির অনিয়ম অথবা অন্য কোন কারণ না থাকিলে শিশুর পীড়া হয় না। একটু কষ্ট স্বীকার করিয়া সুনিয়মে শিশু পালন করিলে অনেক রোগ, অনেক বিপদের হস্ত হইতে মুক্ত হওয়া যায়। তাহা হইলে প্রত্যেকে অতি কষ্টের ধন সন্তানকে বুকে লইয়া জীবন সার্থক করিতে পারেন। আঁতুড় গৃহের সুবন্দোবস্তগুলি বাটীর গৃহিণীর দ্বারাই সম্পন্ন হওয়া বিধেয়। ধাত্রীরা মনোযোগের সহিত প্রসূতি এবং শিশুর যত্ন করে না। কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয় যে অনেকেই অশুচি জ্ঞানে আঁতুড় গৃহে প্রবেশ করেন না। তাঁহাদের স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে, অশিক্ষিতা নীচ জাতীয়া ধাইয়ের হস্তে প্রসূতির এবং শিশুর জীবন সমর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হওয়া কখনই নিরাপদ নহে। বিশেষতঃ এরূপ অবস্থায় সর্ব্বদা প্রসূতি ও শিশুর নিকটে থাকিয়া সেবা শুশ্রূষা করা আত্মীয় স্বজনের একান্ত কর্ত্তব্য। ক্রমশঃ

শ্রীননীবালা দাসী।

নলিনী।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

অনুরাগ।

যথাসময়ে বাষ্পীয় শকট বর্দ্ধমান ষ্টেসনে পৌছিল। নলিনীর পিত্রালয় বর্দ্ধমান, সুতরাং তাঁহাকে তথায় গাড়ী হইতে অবতরণ করিতে হইবে। গাড়ী আসিলে, নলিনী যে কামরায় ছিলেন তথায় আসিয়া ভবেশ পরিচারিকাদেরে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "এই বর্দ্ধমান, এখানে নামিতে হইবে"। গৃহিণী ঠাকুরাণীর ভ্রাতা পাল্কীগাড়ী লইয়া

ষ্টেসনে উপস্থিত আছেন। দেখিতে দেখিতে শিবিকা লইয়া বাহকেরা বাষ্পীয় শকটের সমীপবর্ত্তী হইল, নলিনী গাড়ী হইতে নামিয়া শিবিকারোহণ করিলে, ভবেশ আবার বলিলেন, "ঝি! গৃহিণী ঠাকুরাণীকে বল, আমি এই ট্রেণেই কলিকাতা যেতে ইচ্ছা করি আর আমার সঙ্গে যাইবার বোধ হয় প্রয়োজন নাই?" পরিচারিকা নলিনীকে কিছু বলিবার পূর্ব্বেই নলিনী তাহাকে পাল্কীর পরদা তুলিয়া নিকটে ডাকিল, সে আসিলে বলিল, "না না তুই বল্, মাষ্টার মহাশয় এখন যেতে পারিবেন না, আমাদের বাড়ী গিয়া বিশ্রাম করিয়া পরে যাবেন।" ভবেশের যাইতে ইচ্ছা ছিল না, কি করিবেন কর্ত্রীঠাকুরাণীর অনুরোধ, অগত্যা যাইতে সম্মত হইলেন। নলিনী পাল্কীতে চলিলেন, সঙ্গে দুইজন দ্বারবান ও দুইজন ঝি। ভবেশ ও নলিনীর ভ্রাতা অশ্ব শকটে চলিলেন।

নিয়মিত সময়ে আহারাদি হইলে ভবেশ রাত্রির ট্রেণে কলিকাতা যাইবার জন্য নলিনীর নিকটে বিদায় প্রার্থনা করিয়া পাঠাইলেন। এবারেও বিদায় পাইলেন না। নলিনীর একটি দশম বর্ষীয়া ভগিনী আসিয়া আর এক দিন তাঁহাকে থাকিবার জন্য দিদির বিশেষ অনুরোধ জানাইয়া গেল। ভবেশ মনে মনে কিছু বিরক্ত হইলেন, কারণ এই সুযোগে তাঁহার একবার কলিকাতা যাইবার নিতান্ত ইচ্ছা ছিল, সপ্তাহ মধ্যে কাশীতে পৌছিতে হইবে, অনর্থক এখানে বিলম্ব হইলে কলিকাতা যাইয়া আর ক'দিন থাকিতে পাইবেন?

ভবেশ বিষন্নমনে বারাণ্ডায় বসিয়া আছেন, নলিনী দ্বিতলের বাতায়ন হইতে এক দৃষ্টে তাঁহার মুখপানে চাহিয়া আছে। নলিনী কি ভাবিতেছিল, তাহা আমরা জানিতে পারি নাই। নলিনী অনেকক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া চক্ষু ফিরাইল, অজ্ঞাতসারে একটি সুদীর্ঘ নিশ্বাস পতিত হইল, ধীরে ধীরে অস্পষ্টস্বরে নলিনী বলিল, "উনি বিবাহ করেন না কেন?" ইতিমধ্যে তাহার একজন সমবয়স্কা তথায় আসিল এবং সস্নেহে তাহার চিবুক ধারণ করিয়া বলিল, "নলি! তুই একা একা এখানে কি কর্চ্ছি্ ? এমন জায়গা নেই যেখানে তোকে না খুঁজেছি, কেনলা? জগদীশ বাবু কি তোকে লোকালয়ে মুখ দেখাতে মানা করে দিয়েছেন?"

মলিন হাসি হাসিয়া নলিনী বলিল, "কেন? ওকথা না বলিলে কি আর কথা নাই?" সমবয়স্কা দ্বিগুণ হাস্যের সহিত বলিল, "বুড়োর কথা কি তোর ভাল লাগে না? আমরা তো ও আলাপ না হ'লে থাকিতেই পারি না, তোর যে দেখি বুড়োর নামেই মুখ শুকিয়ে যায়, মনে লাগে নাকি লা?"

নলিনীর বুঝি সে প্রসঙ্গ ভাল লাগিলনা সে বলিল, "তুই ওসব ছাড়্, আমি একটা কথা বলি তাই শোন্।"

"কি কথা?" বলিয়া যুবতী সোৎসাহে নলিনীর মুখপানে চাহিল, নলিনী বলিল, "আমার সঙ্গে যে বাবুটি এসেছেন, তিনি বড় চমৎকার গাইতে পারেন, তুই গান শুনবি?" "শুনিব, তিনি কোথায়?" নলিনী অঙ্গুলী সঙ্কেতপূর্ব্বক ভবেশকে দেখাইয়া দিল। যুবতী বলিল, "কাহাকে দিয়া ব'লে পাঠাই?" নলিনী পরিচারিকাকে তাহার ভ্রাতাকে ডাকিতে বলিল, পরিচারিকা ডাকিয়া আনিলে নলিনী ভবেশকে গান গাহিবার নিমিত্ত অনুরোধ করিতে ভ্রাতাকে

বলিলেন, অবিলম্বে আদেশ প্রতিপালিত হইল। ভবেশ প্রথমে গান গাহিতে আপত্তি জানাইলেন, কিন্তু তাঁহার সে আপত্তি টিকিল না, বাধ্য হইয়া দুই চারিটি গান গাহিলেন। ভবেশ সচরাচর ধর্ম্মবিষয়ক গানই গাহিতেন অদ্যও তাহাই গাহিলেন, কাহারও কাহারও নিকট তাহা ভাল লাগিল না, তিনি একটি ভালবাসা বিষয়ক গান শুনিবার জন্য বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিলেন, ভবেশের সেই শেষ গানটিই আমরা এস্থানে উল্লেখ করিলাম,

কই গো বাসনা আর হ'লনা পূরণ।
দিনে দিনে আয়ুহীন হইল জীবন!
পিয়াসে দগধ হৃদি অশ্রু ঝরে নিরবধি,
হা বারি হা বারি করি চাতক মতন,
আর কতদিন ধরে, ডাকিব সে জলধরে,
কতদিনে জুড়াইব পিপাসিত মন!
অথবা সে শেষদিনে, জলন্ত চিতার সনে,
প্রাণের পূর্ণাহুতি করিব অর্পণ!

গান গাহিতে গাহিতে গায়কের সমস্ত শরীর দিয়া ঘর্ম্ম নির্গম হইতে লাগিল, কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিল। "মহাশয়! আর না" বলিয়া তিনি আসন ত্যাগ করিয়া উঠিয়া গৃহমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। যিনি হারমোনীয়াম্ বাজাইতে বসিয়াছিলেন, তিনি কিছুক্ষণ-ধরিয়া অমনই কাঁদিয়া কাঁদিয়া গানের স্বরটি বাজাইলেন। যাঁহারা গান শুনিতে বসিয়াছিলেন, তাঁহারা গায়কের এ বিষম ভাবান্তর দেখিয়া কিয়ৎক্ষণ অবাক্ হইয়া গায়কের শূন্য চেয়ারেরদিকে চাহিয়া থাকিয়া পরে স্ব স্ব স্থানে চলিয়া গেলেন। শ্রোতাদের মধ্যে যাঁহারা গান সমাপ্তে গায়ককে অসংখ্য ধন্যবাদ দিবেন মনে করিয়াছিলেন, তাঁহাদের সে আশা মনেই বিলীন হইল! সকলেই উঠিয়া গেল দেখিয়া বাদক মহাশয়ও বাদ্যযন্ত্র ছাড়িয়া উঠিলেন।

এদিকে অন্দর মহলে যে সকল মহিলারা গান শুনিবার জন্য সমবেত হইয়াছিলেন, তাঁহারা সহসা এরূপ সভা ভঙ্গ হওয়াতে আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। বর্ষিয়সী মহিলাগণ উঠিয়া চলিয়া গেলেন। যুবতীরা কিয়ৎক্ষণ ভবেশের প্রসঙ্গ লইয়া আলোচনা করিবার লোভটা সম্বরণ করিতে পারিল না। সকলেই নলিনীর নিকটে ভবেশের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল। নলিনী কি জানে? কি বলিবে? সে নিজেই তাঁহার পরিচয়, তাঁহার জীবনের ঘটনাবলী জানিবার জন্য সর্ব্বদা সমোৎসুক। নলিনী কেবল এই মাত্র বলিল, "উনি বি, এ, পাস করেছেন, কলিকাতা ওঁর বাড়ী, এখন আমাদের বাড়ী থাকিয়া আমার ভাসুরপোকে পড়ান।" একজন যুবতী বলিল, "হাঁ নলি? ওঁর কি বিয়ে হয়নি?" "বিয়ে? হয়নি বোধ হয়, নিশ্চয় না।" নলিনীর মুখ খানি রক্তবর্ণ হইল, সে আর কিছু বলিল না। আর একটি যুবতী বলিল, "দূর তুই যেমন পাগল, বিয়ে হ'লে আর প্রণয়ে পূর্ণাহুতি দিতে বসিয়া কাঁদিয়া ফেল্‌বেন কেন?" নলিনী ঈষৎ হাসিয়া বলিল, "কাঁদিলেন আবার কখন?" দ্বিতীয়া বলিল, "ওরই নাম কান্না, তা না হলে গান গাহিতে বসে অমন করে পালালেন কেন? লজ্জা হ'ল নাকি?"

প্রথমা বলিল, "না কাঁদিলেও প্রাণের ভিতরে ভাই, নিশ্চয় কেঁদে উঠেছে, আমার বোধ হয়, উনি কাকেও ভাল বাসিয়া থাকিবেন। তার সঙ্গে বিয়ে হয়নি বলে মনে একটা কষ্ট আছে।" নলিনীর মুখখানি আঁধার হইল, সে ধীরে ধীরে বলিল, "তা

হবে।" প্রথমা বলিল, "তা ভাই, ওঁর কষ্ট যাহাই হোক্ গানগুলি বড়ই চমৎকার গেয়েছেন, আর গলাও কি এমন মিষ্টি!"

নলিনী। "হাঁ ভাই সত্যি, আমার তো সর্ব্বদাই ওঁর গান শুনিতে ইচ্ছা হয়, সেইজন্যই আজ এখানে থাক্‌তে বলেছি।"

দ্বিতীয়া যুবতী হাসিয়া বলিলেন, "দেখিস্ নলি! সাবধান গান শুনে একেবারে আত্মহারা হস্‌নে। "ছি ছি" বলিয়া দ্রুতপদে নলিনী বারাণ্ডা হইতে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল। যুবতীদ্বয়ও "নলিনী নলিনী!" বলিয়া ডাকিতে ডাকিতে তাহার পশ্চাতে ছুটিল। তখন সন্ধ্যা ঘোর হইয়া আসিয়াছে, অন্ধকারে নলিনীকে আর খুঁজিয়া পাওয়া গেল না, যুবতীদ্বয় বুঝিল, এই কথাটিতে নলিনী রাগ করিয়াছে, আজ আর তাহাদের সহিত দেখা করিবে না। যে যুবতী কথাটী বলিয়াছিল সে ক্ষুণ্ণ মনে, অপ্রতিভ ভাবে স্বীয় আবাসে চলিয়া গেল, তাহার সঙ্গিনীও নীরবে বিষণ্ণ অন্তরে তাহার অনুগমন করিল।

পর দিবস সকালে উঠিয়া ভবেশ নলিনীর নিকট বিদায় লইয়া কলিকাতা যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। একজন দ্বারবান ও দুইজন পরিচারিকা নলিনীর নিকটে রাখিয়া আর একজন দ্বারবানকে কাশীতে পাঠাইয়া দিলেন। বলা বাহুল্য এ বন্দোবস্ত জগদীশ বাবুর ইচ্ছানুসারেই হইল। ভবেশের যাত্রা কালে নলিনী আর একবার তাঁহাকে লুকাইয়া দেখিল, আর একবার তাহার নিবিড় কৃষ্ণ তারাময় নয়ন দুইটি বাষ্প বারিতে পূর্ণ হইল। আর একবার তাহার বাসনা বিক্ষোভিত হৃদয় ক্ষণকালের জন্য সুখে পরিপূরিত হইয়া উঠিল।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

পূর্ব্ব স্মৃতি।

ভবেশ হাওড়া ষ্টেশনে গাড়ী হইতে অবতরণ করিলেন। তখন ১৩০৫ সালের শেষ দশা, সুতরাং কলিকাতা সহরে প্লেগ রোগের নূতন রাজত্ব আরম্ভ। এদিকে ইংরাজ রাজও তদ্দূরীকরণ মানসে বদ্ধ পরিকর! প্লেগ বিধানের কড়াকড়ি, সমস্ত ভারত বিশেষতঃ কলিকাতায় তখন পূর্ণমাত্রায় বিরাজিত। ভবেশকে বিশেষ ভাবে পরীক্ষা গ্রহণের পর প্লেগ কর্ম্মচারীরা বাহিরে যাইবার আদেশ দিলেন। ভবেশ ষ্টেসনের বাহিরে আসিয়া ঘোড়ার গাড়ী ভাড়া করিয়া কলিকাতা অভিমুখে ছুটিলেন। সন্ধ্যা প্রায় হইয়া আসিয়াছে, রাস্তায় রাস্তায় আলো জ্বালিয়া দেওয়া হইয়াছে। ভবেশ, দুই বৎসর পরে কলিকাতায় আসিয়াছেন, সকল দৃশ্যই যেন নূতন নূতন অথচ পূর্ব্বস্মৃতি বিজড়িত দেখিতে পাইলেন। দেখিতে দেখিতে অশ্ব শকট হ্যারিসন্‌রোডে নরেশচন্দ্রের দ্বিতল গৃহের দরজায় দাঁড়াইল, ভবেশ গাড়ী হইতে নামিলেন। নরেশ বাবু গাড়ীর শব্দ পাইয়াই বৈঠকখানা হইতে বাহিরে আসিলেন, এবং সহাস্যবদনে সস্নেহে ভবেশকে আলিঙ্গন করিয়া কুশলাদি জিজ্ঞাসা করিলেন। নরেশবাবু ভবেশকে সঙ্গে লইয়া উপরে গেলেন, গিরিজা দেবী ভবেশকে দেখিয়া পূর্ব্বের মতনই হাসিতে হাসিতে আনন্দ সহকারে তাঁহার কুশলবার্ত্তা জিজ্ঞাসার পর কাশীর সম্বন্ধে নানারূপ কথাবার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। ভবেশ গিরিজার সহস্ত প্রস্তুত খাদ্য সামগ্রী তৃপ্ত সহকারে আহার করিতে করিতে যথাসাধ্য কাশীর সম্বন্ধে সমুদায় বর্ণনা করিলেন।

গিরিজা বলিলেন, "ভবেশবাবু! কাশীর তো খুব সুখ্যাতি করিলে, কিন্তু এমন ভাল জায়গায় থেকে তোমার শরীর তো কৈ একটুও সারে নাই, ইহাপেক্ষা এখানেই ভাল ছিলে যে?" ভবেশ ঈষৎ হাস্যে বলিলেন, "তা হইতে-পারে, এখানে আপনাদের কাছে যেমন সুখে ছিলাম, এমন আর কোথাও হয় না।" গিরিজা বলিলেন, "অত বড় লোকের বাড়ী, কত সুখে সচ্ছন্দে থাকিতে তাহাপেক্ষাও কি এই গরীবের বাড়ীতে বেশী সুখে ছিলে?"

ভবেশ জলযোগ শেষ করিয়া উঠিয়া চেয়ারের উপরে বসিলেন; পরে ধীরে ধীরে বলিলেন, "সেটা আপনি বুঝিতে পারিলেন না, আমি গরীব বড় লোকের কথা বলিতেছিনা, দেখুন, একজন দরিদ্র তাহার পর্ণকুটীরে তাহার মাতা, ভগ্নী, প্রভৃতি আত্মীয়ের নিকটে বাস করিয়া, যেমন বিমল আনন্দ উপভোগ করিবে, সে কি অপরের নিকটে রাজ প্রাসাদে রাজভোগ, আহার করিয়া সেইরূপ বা তাহার অর্দ্ধাংশও সুখী হইতে পারে?" গিরিজা কিয়ৎক্ষণ ভবেশের কথায় কোনও উত্তর দিলেন না, মনে মনে ভাবিলেন; "ইনি দেখিতেছি এখনও সম্পূর্ণ মোহ মগ্ন। সংসারে একমাত্র স্নেহের আধার পিতার নিকটে বাস করিয়াও ইনি পরের কাছে থাকিয়া আসিলেন, আর আমরা হ'লাম পরমাত্মীয়;। মানুষ এমনই ভ্রমান্ধ বটে!" প্রকাশ্যে বলিলেন, "হ্যাঁ তা সত্যি. এখানে তুমি কতদিন থাকিবে?" ভবেশ—"আমি এক সপ্তাহের বিদায় পাইয়াছি আবশ্যক হয় আরও দুই একদিন থাকিব।"

গিরিজা—"তা বেশ! এখন দেখে-শুনে একটি বিয়ে ক'রে সংসারি হও, বুড়ো বাপের অবলম্বন তুমি, তাঁহাকে পুত্রবধূর মুখ দেখাও।"

ভবেশ একথার কোনও উত্তর দিলেন না। গিরিজা ভবেশের দিকে চাহিয়া দেখিলেন, তাঁহার সহাস্য বদন মলিন হইয়াছে, গিরিজার কথার উত্তর দিতে তাঁহার ইচ্ছা বা সাধ্য নাই, যেন কতকষ্টে তাঁহার নিঃশ্বাস ত্যাগ করিতে হইতেছে। গিরিজা বলিলেন, "যাও এখন তোমার ঘরে গিয়া বিশ্রাম কর, তোমার সঙ্গে আমার একটা বিশেষ কথা আছে সময়ান্তরে বলিব।"

এবারও ভবেশ কোনও কথা বলিলেন না। তিনি গিরিজার কথায় কর্ণপাত করিয়াছিলেন কিনা সন্দেহ। ভবেশ যেমন বসিয়াছিলেন তেমনই বসিয়া রহিলেন, উঠিলেন না, বা উঠিবার ইচ্ছাও প্রকাশ করিলেন না। গিরিজা ও বাক্‌শূন্য হইয়া তাঁহার বদনোপরি চক্ষু স্থাপন করিয়া রহিলেন। ইতিমধ্যে গিরিজার তিন বৎসর বয়স্ক পুত্রটী আসিয়া ভবেশের চিন্তা ভঙ্গ করিয়া দিল। সে মাতার গলদেশ বেষ্টন করিয়া ধরিয়া আধ আধ স্বরে বলিল, "মা! ওকে? ও দাদা!" মাতা বলিলেন, "হাঁ"। "আমি দাদার কুলে যাই" বলিয়া ছুটিয়া ভবেশের নিকটে গেল এবং হাসিতে হাসিতে তাঁহার উভয় জানুমধ্যে মুখ লুকাইল, এবং বলিল, "তুমি দাদা?" ভবেশ হাসিয়া বালককে কুলে টানিয়া লইলেন, এবং তাহার মুখ চুম্বন করিয়া বলিলেন, "হাঁ আমি দাদা, তুমি আমাকে চেন?" বালক তাহার শিশুসুলভ বাক্যে বলিল, "আমি তোমাকে ভালবাসি, আমি পুতুল কিনে দেব।"

"চল দাদা আমরা পুতুল কিনিগে।" বলিয়া ভবেশ বালককে লইয়া বহির্বাটীতে

চলিয়া গেলেন। গিরিজা মনে মনে বলিলেন, "কি আশ্চর্য্য প্রণয়ের মোহ, শতবার নিরাশ হইয়াও লোকে সেই আরাধ্য বস্তুর ধ্যান করিতে পরাঙ্মুখ হয় না। ভাবিয়াছিলাম দীর্ঘকাল বিদেশে থাকিয়া ভবেশ বুঝি সুরজার আশা ত্যাগ করিয়াছেন, এখন দেখিলাম তাহার বিপরীত। এখন উহার অন্যত্র বিবাহ না দিলে, দেখিতেছি উনি কিছুতেই সংসারী হইবেন না, এইরূপেই জীবন কাটাইবেন, ধরে বেঁধে বিয়ে দেয় এমন লোকও তো কৈ সংসারে উহাঁর কেহ নাই। আমাকেই বুঝি এভার গ্রহণ করিতে হইবে। আহা! আমাদের একটু যত্নের অভাবে কি একটি জীবন অন্ধকারময় হইবে? সংসারের কোন সুখই কি সে ভোগ করিবে না?" স্নেহশীলা দয়াবতী গিরিজার চক্ষে জল আসিল, তিনি বস্ত্রাঞ্চলে চক্ষু মুছিয়া কার্য্যান্তরে প্রস্থান করিলেন।

রাত্রে আহারাদির পরে ভবেশ সেই পূর্ব্ব পরিচিত শয়ন প্রকোষ্ঠে শয়ন করিতে গেলেন। নরেশ বাবুর পুত্রটি তখনও তাঁহার সঙ্গ ছাড়ে নাই। সে আজ "দাদার" কাছে শুইবে বলিয়া আব্দার আরম্ভ করিয়াছে। ভবেশ শিশুকে লইয়া তাহার নানারূপ অর্থহীন প্রশ্নের উত্তর দিতে দিতে গৃহমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। সেইরূপই সুসজ্জিত গৃহ, সেইরূপই টেবিলের উপরে দীপাধারে দীপ জ্বলিতেছে। ভবেশের হৃদয়ে পূর্ব্বস্মৃতি সুস্পষ্ট রূপে জাগিয়া উঠিল, কিন্তু শিশুটি তাঁহাকে সে সকল কিছু ভাবিতে দিল না, ভবেশ তাহাকে লইয়া শয্যায় শয়ন করিলেন, অচির কাল মধ্যেই শিশু নিদ্রাভিভূত হইয়া পড়িল, শিশুর সেই সরলতা মাখা স্বর্গীয় সৌন্[illegible] রাশি দেখিতে দেখিতে ভবেশ উঠিয়া বসিলেন। পরে সস্নেহে তাহাকে চুম্বন করিয়া শয্যাত্যাগ করিয়া ঘরের মেজেতে উপুর হইয়া শুইয়া পড়িলেন। মনে বড় যাতনা হইতে লাগিল। বালকের ন্যায় রোদন করিতে লাগিলেন। দুই বৎসর পূর্ব্বে যেদিন কাশীতে গিয়াছিলেন, তৎপূর্ব্ব রজনীতে এই ঘরেই সুরজার সহিত দেখা হইয়াছিল, এই স্থানেই সুরজা স্নেহভরে তাঁহার অশ্রুজল মুছাইয়া দিয়াছিল, এই স্থানেই "আর একদিন দেখা হইবে" বলিয়া আশা দিয়াছিল—কৈ সে দিন তো আর হইল না, এজনমে কি আ[illegible] হইবে? পিতা আরোগ্য হইলেই যদি কাশী হইতে চলিয়া আসিতাম, তাহা হইলে নিশ্চয় তাহার সহিত দেখা হইত। চাকুরীতে আমার কি প্রয়োজন ছিল? তাহার শেষ কথা শুনিয়া জীবনের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য স্থির করিলেই পারিতাম। চাকুরী করিলাম কাহার জন্য? আর করিবই বা কাহার জন্য? পিতা আমার উপার্জ্জিত অর্থের প্রত্যাশী নহেন, স্নেহময়ী জননী এনরাধম পুত্রের [illegible]মমতা বিসর্জ্জন দিয়া বহুকাল স্বর্গারোহণ করিয়াছেন, যাহাকে লইয়া পৃথিবী[illegible] সুখী হইব আশা করিয়াছিলাম, [illegible]কেও বোধহয় পাইব না, (ভবেশ চক্ষু [illegible]লেন) তবে আর কিসে[illegible]? টাকা কড়ি দিয়া আমি কি করি[illegible] আমাদ্বারা [illegible]ের কোনও কার্য্য হই[illegible]া, স্বদেশের কোনও উন্নতি করিতেও পা[illegible]না, যাহার জীবন শ্মশান, রাত্রিদিন যা[illegible] বুকে চিতা জ্বলিতেছে, সে আবার [illegible]র কোন্ উপকারে লাগিবে? আর [illegible] কাশী যাইব না, আর চাকুরী করিব না, [illegible] কাজ আর? যত দিন বাঁচিয়া থাকিব, [illegible] এ ভস্মাবশেষ জীবনের শেষ না [illegible]ত দিন নরেশ বাবুর এই বাড়ীতে

এই ঘরে এমনি পড়িয়া কাঁদিব। নরেশ বাবুর স্ত্রী, আমাকে বিবাহ করিয়া সুখী হইতে বলেন, তিনি জানেন না আমার বুকে রাত্রিদিন কি আগুণ জ্বলিতেছে (ভবেশ দুই হস্তে চাপিয়া ধরিলেন) তিনি ভাবিয়াছেন আমি সুরজাকে ভুলিয়া গিয়াছি, কি সর্ব্বনাশ! আমি যে ভুলিবার কথা স্বপ্নেও ভাবিতে পারিনা, যে জীবন তাহার প্রেমে পূর্ণ হইয়াছে, যে নয়ন তাহার রূপে মুগ্ধ হইয়াছে, যে কর্ণ তাহার বাক্য সুধা পান করিবার জন্য উৎসুক হইয়া রহিয়াছে, সেকি আর পরের অনুরোধে তাহাকে ভুলিতে পারে? পাষাণে যে মূর্ত্তি অঙ্কিত হয়, পাষাণ ভগ্ন না হইলে কি সে মূর্ত্তি কেহ তুলিতে পারে?"

ভবেশ উঠিয়া বসিলেন, যদি সে সময় তাঁহাকে কেহ দেখিতে পাইত তবে উন্মত্ত বলিয়া ভ্রম জন্মিত। কাঁদিতে কাঁদিতে দুই চক্ষু রক্তবর্ণ হইয়াছে আলু থালু বেশ ভূষা। ভবেশ উঠিয়া চেয়ারের উপরে বসিলেন দোয়াত কলম ও একখানি কাগজ টানিয়া লইলেন। কতক্ষণ চিন্তার পর কাগজের উপরে কত কি লিখিতে গেলেন কিন্তু পারিলেন না, অবশেষে অন্য একখানি কাগজ লইয়া লিখিলেন "স্নেহের সুরজা!" ভাবিলেন, "ইহাই লিখি, সে যদি আমার না হয়, যদি আমার সম্বোধনে রাগ করে, যদি চিঠির উত্তর না দেয়, তবে আর কি লাভ হইবে? ভগবান যদি কখনোও তাহাকে মিলাইয়া দেন, যদি সে আমার হয়, সেই সময় প্রাণ ভরিয়া আমার বলিয়া ডাকিয়া হৃদয়ের অতৃপ্ত সাধ পূর্ণ করিব।

ক্রমশঃ

শ্রীকুমুদেন্দু দেবী।

গৃহিণী ও গৃহ শৃঙ্খলা।

গৃহ শৃঙ্খলা রমণীদিগের একটী প্রধান কার্য্য। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ভাবে সুশৃঙ্খল রূপ গৃহের যাবতীয় কার্য্য সুসম্পন্ন করা, সকল রমণীরই একটী বিশেষ কর্ত্তব্য কর্ম্ম। যিনি এই সকল বিষয়ে সর্ব্বদাই উদাসীন থাকিয়া অলস ভাবে দিন যাপন করেন, সেই গৃহের অবস্থা যে কতদূর শোচনীয় তাহা বলাই বাহুল্য। বিশৃঙ্খলা গৃহের একটী প্রধান অসুখের কারণ, এটী সকল রমণীরই স্মরণ রাখা একান্ত উচিত।

কোন বাড়ী বেড়াইতে গিয়া সেই গৃহের পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা ও সুবন্দোবস্ত দেখিলে মনে অত্যন্ত ভক্তির সঞ্চার হয়। অপরিষ্কার দুর্গন্ধ যুক্ত বন্দোবস্তহীন গৃহ দেখিলে সহসাই মনে ঘৃণার উদয় হয়, ইহা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবে না।

সুগৃহিণীর গৃহ, একটী দেখিবার জিনিস সেই গৃহের বিছানা বাক্স ডেস্ক এবং ছেঁড়া নেকড়া খানি হইতে সামান্য মৃণ্ময় পাত্রটী পর্য্যন্ত সুসজ্জিত ভাবে সাজান রহিয়াছে।

গৃহের নিত্যাবশ্যকীয় জিনিস গুলি এরূপ ভাবে যথাস্থানে সন্নিবেশিত থাকিবে যে, যখন যেটীর দরকার সেটীর জন্য আর কাহাকেও ঘুরিতে না হয়। গৃহের অপরাপর ব্যক্তিদিগকে এরূপভাবে পরিচালিত করা আবশ্যক যে জিনিসটী যেখানে রাখিবেন সেটী জায়গা নাড়া

না হয়। অন্ন চাউলের ডেবাটী এক স্থানে, কল্য আবার আর এক স্থানে, এরূপ হইলে বড় অসুবিধা।

গৃহিণী যেখানে যাহা সাজাইয়া রাখিবেন অন্তঃপুরস্থ পরিবার মণ্ডলীর সেই অনুকরণই কর্ত্তব্য।

কোন কোন গৃহে এরূপ বিশৃঙ্খলা দৃষ্টি গোচর হয় যে, বধূরা রান্না চড়াইতে গিয়াছেন, কিন্তু কাঠ নাই চাউল আনিতে গিয়া সের পাইলেন না, তিন ঘর খুঁজিয়া তাহা মিলিল না, কে কোথায় লইয়া গিয়াছে। রান্না চড়াইয়া দেখা গেল লবণ তৈলে হইবে না, তখন এক-জন বাজারে দৌড়িল, নিকটে বাজার না থাকিলে আরও বিপদ। এদিকে কর্ত্তা মহা-শয়েরা স্নান করিয়া আসিয়া ভাত পাইলেন না, হয়তো না খাইয়াই তাঁহাদিগকে অন্য কার্য্যে যাইতে হইল। এগুলি গৃহিণীর ঔদাসীন্যেই বেশী ঘটিয়া থাকে। গৃহিণীর অধীনে কন্যা, বধূ, কিম্বা চাকর চাকরাণী যাঁহারা গৃহে কার্য্য সম্পন্ন করে, তাঁহাদের প্রত্যেক কার্য্যের প্রতি দৃষ্টি রাখা গৃহিণীর এক অতীব কর্ত্তব্যকার্য্য। বধূগণ নিজেদের ইচ্ছামত দুই একটি কাজ সারিয়া রাখিল। আহারান্তে কর্ত্তারা একটি পান পাইলেন না এক ঘণ্টা-কাল একটা পানের জন্য দাঁড়াইয়া রহিলেন, শেষে শুনিলেন "তৈরি নাই", এরূপ ঘটনা আমি অনেক গৃহে প্রত্যক্ষ করিয়াছি। গৃহিণী ঘরে গিয়া দিখিলেন পানগুলি শুকাইয়া গিয়াছে। বধূরা তাহাতে একবিন্দু জলও দেয় নাই, চুনের পাত্রটী শুকাইয়া আছে, হয়তো খয়েরও নাই, এই প্রকার সকল কার্য্যের মধ্যেই একটা বিশৃঙ্খলা দেখা যায়।

গৃহিণীগণের কার্য্যপটু ও তীক্ষ্ণ বুদ্ধি সম্পন্না হওয়া চাই; এবং হিসাবী হওয়াও দরকার, প্রত্যহ গৃহে কতগুলি লোক খাইবে, তাহাদের আন্দাজে চাল্ ডাল্ রান্না করিতে হিসাব করিয়া দেওয়াই উচিত। আন্দাজে হয়তো ৩০ জনের লোকের ভাত রাঁধিতে দেওয়া হইল, ৫ জনের ভাতই বেশী হইল, এক বেলার ভাত ঠাণ্ডা বলিয়া অন্য বেলা কেহই খাইল না, সেগুলি একেবারেই নষ্ট হইল, এরূপ হইলে সেই গৃহের পরিণাম ফল বড়ই কুফলপ্রদ হয়।

কোন কোন বাড়ী ঢুকিয়াই দেখিবে ওখানে ছেলে মেয়েরা মল ত্যাগ করিয়া রাখিয়াছে, এখানে প্রস্রাব করিয়া রাখিয়াছে, গৃহিণী বা বধূরা তাহা পরিষ্কারের ভার চাকর চাকরাণী-দের উপর ফেলিয়া রাখিয়াছেন, তাহাদের যখন ইচ্ছা হয় পরিষ্কার করিবে, না হয় না করিবে। স্থানে স্থানে উঠান ঝেঁটান জঙ্গল, স্থানে স্থানে পচা গোবর, বাড়ী ময় এটো ছড়ান, এই প্রকার আবর্জ্জনা ও দুর্গন্ধযুক্ত বাড়ী অপরিচ্ছন্নতার পরিচায়ক। এগুলি অব-শ্যই গৃহিণীদিগের অলসতা ও তাচ্ছল্যতা হেতুই ঘটিয়া থাকে। পাকা গৃহিণী হইলে তাঁহার কড়াশাসনে এ সব ঘটিতে পারে না। ঘরে ঢুকিয়াই দেখ বাক্স গুলি চুণ মাখা' বিছানা গুলি ময়লা, কাপড় গুলা এখানে ওখানে পড়িয়া আছে, অন্যান্য জিনিস পত্র গুলি অযত্নে ছড়ান রহিয়াছে, সে দিকে কাহারও ভ্রূক্ষেপ নাই যিনি যার যার মত নিজের সুখ সচ্ছন্দতা লইয়াই ব্যস্ত।

গৃহিণীর সকল বিষয়েরই চারিদিক দৃষ্টি রাখিতে হইবে। কে কোন্ কার্য্যটি কিরূপ ভাবে করিল, বধূরা কাহার সহিত কিরূপ ব্যবহার করিল, চাকরাণীরা কাহার সঙ্গে কিরূপ ব্যবহার করিল, পরিজন গণের কাহার কি রোগ হইল, কে না খাইয়া রহিল,

কে রাগ করিল, কোন জিনিসটি কোথায় নষ্ট হইল, ইত্যাদি তত্ত্ব তালাস করা গৃহিণীরই কার্য্য। সুগৃহিণীর গৃহে কোন জিনিসই নষ্ট হইতে পারে না। তিনি ভাঙ্গা ছুঁচটি হইতে ছেঁড়া কাগজ টুকু পর্য্যন্ত, যত্ন করিয়া তুলিয়া রাখেন। যদি বা বাজারের জিনিসের ফর্দ্দ লিখিবার সময় ঐ কাগজ টুকুর দরকার হয়। ডালচালের খুদ গুলি পর্য্যন্ত যত্নপূর্ব্বক তুলিয়া রাখেন, গরুকে রাঁধিয়া দিলে বেশ উপকার হয়। গৃহিণীর নিকট বৃহৎ হইতে ক্ষুদ্র জিনিস টুকুও আদর পায়। সুগৃহিণী যিনি তিনি মিতব্যয়ী হইবেন, সাংসারিক খরচ পত্রাদির হিসাব নিজ হস্তে রাখিয়া আয় বুঝিয়া ব্যয় করিবেন। ছোট ছোট হিসাব অর্থাৎ দুগ্ধের হিসাব ধোপার হিসাব সব ঠিক রাখিবেন। অবসর সময়ে বৃথা গল্প বা দিনে না ঘুমাইয়া দর্জ্জিকে বৃথা পয়সা না দিয়া লেপের খোল বালিশের খোল ছেলে মেয়েদের আট পড়ে জামা ফ্রকগুলি নিজে সেলাই করিয়া লইবেন। পুরাতন কাপড় গুলি না ফেলিয়া দিয়া তদ্দ্বারা কাঁথা প্রস্তুত করিয়া লইলে অনেক কাজ দেয়। অবস্থানুসারে ময়লা বালিশের খোল ইত্যাদি সোডা দ্বারা কাঁচিয়া লইলে অনেক উপকার হয়।

গৃহিণী তাঁহার অধীনস্থ ব্যক্তিদিগকে সুনিয়মে পরিচালিত করিবেন, সকলের সহিত সদ্ব্যবহারে, সকলকে সৎপরামর্শ দানে এবং সমভাবে মিথ্যা কথা ঝগড়া বিবাদ দ্বেষ হিংসা হইতে পারিবারিক সকলকে বিরত করিয়া গৃহ শান্তিপূর্ণ করা গৃহিণীর কর্ত্তব্য।

গৃহের যাবতীয় ব্যক্তিরও অবশ্য কর্ত্তব্য গৃহিণীর বাধ্য এবং অজ্ঞানুবর্ত্তিনী (অবশ্য গুরুজন নন) হইয়া সর্ব্বদা তাঁহার কার্য্যের অনুকরণ করিয়া চলেন।

শ্রীহেমন্ত কুমারী গুপ্তা

কবিতা।

সুমিত্রা।

রমণীর শিরোভূষা সুমিত্রা জননী
ধন্যা ধন্যা বীর নারী পূত তেজস্বিনী।
প্রজার বিষাদ নাদে—
ত্যজিলে প্রণয়সাধে—
অযাচিত প্রেমসুধা সন্তাপহারিণী।
বুঝেছিলে সত্যধর্ম্ম,
নারীর কর্ত্তব্য কর্ম্ম,
প্রেমে সচেতন করা, "কর্ত্তব্যের বাণী"।
হয়ে ব্যর্থ মনোরথ
"দেব ভক্ষ্য কোকনদ,"
ত্যজিলে দেহের কোমলতা-মণি।
বাস্তবিক দেবীরাণি!
ধিক্ সে প্রেমেতে জানি,
যে প্রেমে কর্ত্তব্য কার্য্যে করিয়ে বিমুখ—
দেশ রাজ্য চিন্তাহিত
শুষিয়ে জলোকামত
লেগে রবে বীর হৃদে, তাহে কিবা সুখ!
তাই ছাড়ি পতি দেশ,
প্রেমিক মোহিনী-বেশ,
ধরিয়া কুমার রূপ, কুমারের তরে,
বন উপত্যকা ভূমি
গিরি শির অতিক্রমি'
উপনীতা হলে রাণী! দুর্গম কাশ্মীরে।

ভ্রাতার সাহায্য লয়ে
দেশ শত্রু পরাজিয়ে
আসিলে স্বামীর পাশে হয়ে উৎসাহিত,
"হিতে হ'লো বিপরীত,
সবি বিধাতার রীত"
অপমানে নির্য্যাতনে হলে উপেক্ষিত।
হায়! দীন প্রজা দুঃখে,
জলাঞ্জলি দিলে সুখে,
প্রজা আর্ত্তনাদে গলি দয়াময় বাণী!
অভাগা প্রজার তবু
ঘুচিল না দুঃখ কভু
অন্ন বস্ত্রাভাবে তারা, আকুল পরাণি।
হৃদপিণ্ড ছিঁড়ে ফেলি
হৃদয় চরণে দলি
সাধিলে অসাধ্য দেবি! কার্য্য মহিয়সি!
জীবনে কর্ত্তব্য নিষ্ঠা
করুণার পরাকাষ্ঠা
বিশ্বপ্রেমে মাতোয়ারা নিঃস্বার্থ মহিষি!
ভাইবোনে বিচারিয়া
অপমান উপেক্ষিয়া
করিলে সৌহৃদ্যভাবে সন্ধির প্রস্তাব
তাও না ঘটিল ভালে
সকলি ঘটায় কালে
বিফল বাসনা হায়! সুধু মনস্তাপ!
উপেক্ষায় অপমানে
ঘুরিলেগো বনে বনে
গুহায় গুহায় কভু শৈলেন্দ্র শিখরে।
বীর্য্যবতী তুমি নারী
বীর সহোদরা, অরি—
তব, হৃদয় দেবতা তীক্ষ্ণ খড়্গ করে।
মাগিছে ভ্রাতার শির,
"ভগ্নী কি রহিবে স্থির!
তাহারো হৃদয়ে বহে বীর রক্তধারা!
ভ্রাতার প্রশ্নের পরে
বলিতেছে অকাতরে
"মৃত্যু শ্রেয়! ধন্য ধন্য বীর সহোদরা।"
হইবে প্রশান্ত স্থির
লইবে ভ্রাতার শির
বসিয়া শিবিকা মাঝে অবরুদ্ধ দ্বার
নয়নে নাহিক জল
অগ্নিসমা কি উজ্জ্বল!
জ্বলিছে নয়ন তারা একি চমৎকার?
হেমাঙ্গিনী সাধ্বীসতী
হয়েছে বিবর্ণা অতি,
রক্তহীন হইয়াছে সে মুখ কমল,
শিরায় রক্তের গতি
সচঞ্চল দ্রুত অতি
এই সে থামিয়ে এলো নিশ্চল! নিশ্চল!
অমূল্য অতুল্য ধন
ভ্রাতৃস্নেহ, সে রতন
চরণে দলিয়া বীরা, বীরের সম্মান,
রাখিলে অটুট সতি!
শুনালে মহত্ব গীতি
বলিলেগো অমরতা পূত যশোগান!
পাষাণ প্রতিমা সমা
দাঁড়াইয়া মনোরমা
বলিলেগো সভা মাঝে, হস্তে ভ্রাতৃশির,
হে রাজন! ধর ধর
স্বর্দ্ধশ্রেষ্ঠ রাজশির
আতিথ্যের উপহার দিলা ভ্রাতা বীর!
পূর্ণ তব মনস্কাম
শান্ত হোক রাজধাম
নিবে যাক্ জগতের নরকাগ্নিরাশি।
জননী অম্বিকে! বলে
চলেগেলে মাতৃকোলে
রহিল জগতে শুধু! তব পুণ্যরাশি।

অ-

অভাগিনী মা।

(হেম বাবুর মৃত্যুপলক্ষে লিখিত)

ওরে রে নিঠুর কাল
বুঝিলি না কালাকাল,
আমার হৃদয় নিধি লইলি হরিয়া
একটি একটি করি
সকল লয়েছ হরি,
বুকের পাঁজর মোর দিয়াছ ভাঙ্গিয়া।
কিসের লাগিয়া আজ
হেন বিষময় বাজ
দিলিরে মায়ের বুকে নিঠুর শমন,
জলন্ত আগুন দিয়া
পোড়ালি মায়ের হিয়া
হৃদ্‌পিণ্ড দিলি ছিঁড়ে জন্মের মতন।
কে আর রহিল বল,
মুছাইতে অশ্রুজল,
কার মুখপানে চেয়ে ঘুচাব বেদন ?
কোথা হেম, বাপ ধন
দিয়ে তোরে বিসর্জ্জন,
কোন প্রাণে বল হেন সহিব যাতনা ?
সহিতে পারিনা হায়,
বুক যে গো ফেটে যায়,
শত বৃশ্চিকের জ্বালা উঠিছে হৃদয়ে,
কোথা ওরে বাপধন,
ভেঙ্গেছ মায়ের মন,
অভাগিনী মারে তোর রবে কত স'য়ে ?
কোন্ তারকার পথে,
স্বরগের স্বর্ণ রথে,
চলিয়া গিয়াছ বাপ কোন নব দেশে,
খুঁজে খুঁজে হয় সারা
দাওনা বারেক সাড়া,
এত কি মমতা হীন হইয়াছ শেষে ?
কোন্ পথে গেলে চলে,
এক বার যাও বলে,
কোন্ জ্যোতির্ম্ময় লোকে তোমার আবাস।

ওরে বাপ যাদুধন,
পাগল মায়ের মন,
কেমনে ছিঁড়িলে তুমি মাতৃ স্নেহ-পাশ।
সকলিত গেলে চলি,
মায়ের পরাণ দলি,
তুমি একমাত্র ছিলে মাতৃভক্ত ছেলে
তুমি ও ত গেলে ছাড়ি,
এস ফিরে এস বাড়ী,
ছাড়িব না তোরে বাছা একবার পেলে।
তোমার যে গান গুলি,
গেয়েছ পরাণ খুলি,
শুনাও মায়েরে আসি শুনাও আবার,
তোমার অমিয় গাঁথা,
শুনিয়া ভুলিব ব্যথা,
নিরখিব চাঁদমুখ সর্ব্বস্ব আমার
দীনা পাগলিনি মত
ঘুরিতেছি অবিরত
কোথায় তোমার বাছা পাব দরশন ?
গেছ তুমি কত দূরে
কোথা সে অমর পুরে ?
সেথায় কি আছে তব আপনার জন ?
সেথায় কি ফুল ফোটে,
এমনি চাঁদিমা ওঠে,
করেছে তোমার বাছা উদ্‌ভ্রান্ত মন ?
স্বর্ণ সিংহাসনে বসে,
ডুবে কোন্ কাব্যরসে,
ভুলিয়া গিয়াছ মারে দুঃখিনীর ধন।
এস বাছা, এস ফিরে
আমার মাথার কিরে,
স্বরগ বারতা আনি বলে যাও আজ,
তোমার শুনিলে সুখ,
উথলিবে মার বুক,
ভুলিয়া যাইবে তব দরিদ্রের সাজ।

শত সুখ পেয়ে সেথা,
ভুলেছ মায়ের ব্যথা,
তাই বুঝি বাছা তুমি কথা নাহি কও।
শুনে হাহাকার রোল,
কেন গো ফুটেনা বোল,
তুমি বাছা মোর এত নিরমম নও।
আহারে বাছারে মোর,
দারিদ্র্যের পূর্ণ ঘোর
তোমার জীবন মন দিছিল ভাঙ্গিয়া।
যাতনার অশ্রুভার,
ছিল জীবনের সার,
দুঃসহ জীবন যাদু গিয়াছ যাপিয়া।
ভাবিতে তোমার দুখ
ভেঙ্গেযায় মার বুক,
শত ধারা উছলিয়ে বহে দুনয়ন।
বড় কষ্ট পেয়ে হেথা,
চলিয়া গিয়াছ সেথা,
দুখিনী মায়ের তুমি দরিদ্র রতন।
কোন্ জগতের কোলে
ঘুমায়ে রয়েছ বলে,
সান্ত্বনা করিতে নারি অশান্ত পরাণ,
আবার দেখিব মরি,
অযুত নয়ন ভরি,
ডুবে যাব স্নেহনীরে ভাসাব বয়ান!
কেন হরে নিলে বিধি,
বাঙ্গালার হেন নিধি,
কাঙ্গালিনী করিয়াছ রাজলক্ষ্মী সতী,
হরিয়ে পতির আঁখি
কিবা রেখেছিলে বাকী,
পতি বিনা তার আর ছিলনাক গতি!
চির জনমের তরে,
তাহারে ভিখারী করে,
অমূল্য জীবন তার লয়েছ কাড়িয়া,
কোথা তুমি শ্রেষ্ঠকবি,
দারিদ্র্যের পূর্ণ ছবি
বাঁচিয়া রহিব হেথা তোমারে স্মরিয়া।
ধরায় যে পেয়ে ক্লেশ
ছাড়িয়া গিয়াছ দেশ,
কেমনে ভুলিব সব ওরে বাপধন?
সে সুধা সঞ্চয় করে,
রেখেছ ভাণ্ডার ভরে
পান করি বঙ্গবাসী জুড়াবে জীবন।
তোর গাঁথা বুকে করি,
আকিঞ্চন যেন মরি,
জুড়াব সকল জ্বালা শূন্য ধরাতলে,
গেছ বাপ সেই দেশে
সুখে থাক দেব বেশে,
যেন তোরে পাই পুনঃ দেব পুণ্যফলে।

শ্রীগিরিবালা দেবী।

স্বর্গীয়

কবি হেমচন্দ্র।

ভারতে কেন গো আজি এত হাহাকার?
কাঁদে কেন পশু পাখী, জলে ভরা দুটী আঁখি
কোন রত্ন হারাইল ভারত আবার?
ভারতেতে কেন পুনঃ এত হাহাকার?
তরুলতা হুহু স্বরে, কার তরে শোক করে,
আঁখি ভরা জল কেন ভারত মাতার?
বুঝিয়াছি আমি এবে ভারত মাতার,
উপযুক্ত পুত্রবর, হেমচন্দ্র কবিবর
হরণ করেছে কাল, দুরন্ত অপার।
নির্দ্দয় নিষ্ঠুর কাল! হরিয়াছ হায়!
ভারত মাতার কত, উপযুক্ত পুত্র শত
নির্দ্দয় নির্ম্মম কাল! রহ তৃপ্ত তায়?
কত দুঃখ পেতে কবি! ভারত দুয়ারে,
উপেক্ষিত তারা সবে, চেয়ে দেখ এবে সবে,
অনুতাপানলে দগ্ধ ভাসে আঁখি নীরে।
যাও তবে যাও কবি! ছাড়িয়া স্বজন,

যেখানে বাল্মীকি রাজ, পরি পূত শুভ্র সাজ
কালিদাস, ভবভূতি, শ্রীমধুসূদন।
যাইতেছ স্বরগেতে ভারত রতন,
স্বদেশ দুর্দ্দশা হেরে, গাইয়াছ দুঃখ ভরে
গভীর উন্মাদ গীতি হৃদয়-মাতান।
যাও আর্য্য কবিবর! লইতে তোমায়,
দাঁড়াইয়ে বীণাপাণী, বহে যথা মন্দাকিনী
অর্থাভাব, শোক, দুঃখ নাহিক যেথায়।
স্বরগের সুধা কবি করিও বর্ষণ,
ভারত মাতার তরে, যায় যেন ধীরে ধীরে
দুঃখ চলি, থামে যেন মাতার ক্রন্দন।

শ্রীআশালতা।

বিবিধ প্রসঙ্গ।

স্ত্রীশিক্ষা।—বাঁকিপুরে উচ্চ শ্রেণীর বালিকা বিদ্যালয়ের পারিতোষিক বিতরণ কার্য্য অতি সমারোহের সহিত সম্পন্ন হইয়াছে। বঙ্গের ছোটলাট পত্নী পুরস্কার বিতরণ করিয়াছেন। উক্ত বিদ্যালয়ের নিম্নলিখিত ছাত্রীরা বিশেষ পুরস্কার লাভ করিয়াছে।—কুমারী নির্ভর প্রিয়া ঘোষ নাম্নী যে বালিকা এবার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষায় বালিকা পরক্ষার্থিনী দিগের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করিয়া ও ষোল টাকার বৃত্তি প্রাপ্ত হইয়া বেথুন কলেজে প্রবেশ করিয়াছেন, তাঁহাকে "মিসেস্ হোম-উড্" রৌপ্য পদক ও কুমারী শৈলবালা সমাদ্দার নাম্নী যে বালিকা বিদ্যালয়ের বাৎসরিক পরীক্ষায় শিল্পে প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছেন, তাঁহাকে "মিসেস্ বোডিলন" রৌপ্যপদক প্রদান করা হইয়াছে। কুমারী বিধাননন্দিনী মজুমদার, কুমারী ইন্দুপ্রভা বন্দ্যোপাধ্যায় ও কুমারী সুশীলা চৌধুরী নাম্নী যে তিনটী অল্পবয়স্কা বালিকা এবার এই স্কুল হইতে নিম্ন প্রাথমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণা হইয়াছে, তাহাদিগকে এবং আরও কয়েকটী বালিকাকে শিল্প রন্ধন রচনা প্রভৃতিতে বিশেষ নিপুণতার জন্য "কালীতারা "পুরস্কার" অঘোর পুরস্কার" "সুকুমারী পুরস্কার" ও "সুবাসিনী পুরস্কার" প্রভৃতি বিশেষ পুরস্কার প্রদত্ত হইয়াছে।

পুরস্কার-বিতরণ স্থলে!—স্থানীয় অনেক ইংরাজ কর্ম্মচারী ইংরাজ মহিলা, অনেক উকীল বারিষ্টার অধ্যাপক ও অন্যান্য গভর্ণমেণ্টের উচ্চ কর্ম্মচারী উপস্থিত ছিলেন।

বিদ্যাসাগর স্মৃতিসভা।—গত শ্রাবণমাসে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের স্মরণার্থ শ্রীহট্ট টাউন হল গৃহে স্থানীয় ভদ্রমণ্ডলীর সভা হইয়াছিল। অনেকেই বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জীবনের পবিত্র গুণাবলী সম্বন্ধে বক্তৃতা করিয়াছিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় হিন্দু বালবিধবাগণের দুঃখ মোচনার্থ প্রাণপণ চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার নাম এই মহৎ কার্য্যের দ্বারা চিরস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে। হিন্দু বাল বিধবা গণের দুঃখময় জীবনের অবস্থার পরিবর্ত্তন করিবার জন্য এখন আর কাহাকেও তেমন চেষ্টা করিতে দেখা যায় না। দুঃখিনী বিধবাগণের সুশিক্ষা ও জীবনের উন্নতির উপায়সূচক কোনরূপ সদনুষ্ঠান করিতে পারিলেই ৺বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রতি যথার্থ ভক্তি শ্রদ্ধা প্রদর্শিত হইবে!

শ্রীহট্ট মহিলা সম্মিলনী।—বিগত ২৮এ জুলাই শ্রীহট্ট মহিলা সম্মিলনীর মাসিক অধিবেশন হইয়াছিল। অনেকগুলি ভদ্র মহিলা সভাতে উপস্থিত ছিলেন। "সময়ের সদ্ব্যবহার" বিষয়ে পাঠ ও আলোচনা হয়। যাহাতে "গৃহিণীগণ বৃথাকাজে সময় নষ্ট না করিয়া" সময়ের সদ্ব্যবহার করিয়া গৃহশৃঙ্খলা ও সন্তানদের সুশিক্ষা দিবার সুব্যবস্থা করেন সে সম্বন্ধে বিশেষ ভাবে আলোচনা হয়,

তাজমহলে প্রবেশ-দ্বার।

// অন্তঃপুর

সচিত্র মাসিক পত্রিকা।

ANTAHPUR

AN ILLUSTRATED MONTHLY JOURNAL IN BENGALI

Edited and contributed to by the ladies only.

কেবল মহিলাগণ কর্ত্তৃক লিখিত ও সম্পাদিত।

এ জীবন নহে শুধু সুখভোগ তরে,
কঠিন দায়িত্ব আছে মাথার উপরে ;
দুঃখ যদি পাই কভু কিবা ক্ষতি তায়,
কর্ত্তব্য সাধিতে যেন এ জীবন যায়।

৬ষ্ঠ বর্ষ।	আশ্বিন, ১৩১০ বঙ্গাব্দ।	VOL. VI.
৬ষ্ঠ সংখ্যা।	OCTOBER, 1903.	NO. VI.

আত্মোৎসর্গ

বা

করুণা প্রতিমা কুমারী কেট মার্সডেন।

পুণ্যতোয়া ভাগিরথী যেমন হিমালয় বক্ষ ভেদ করিয়া শত ধারায় নিম্নভূমিতে প্রবাহিত হইয়াছে এবং দেশ দেশান্তরবাসী নরনারী তাঁহার নির্ম্মল সলিল পান করিয়া সুশীতল হইতেছে, তদ্রূপ কোমলপ্রাণা রমণী স্বীয় হৃদয়নিসৃত করুণাপ্রস্রবণে কত শত দূর দেশান্তর বাসী নিরাশ্রয় নরনারীকে আলিঙ্গন করিয়া রোগে শোকে শান্তি দান করিতেছেন। আজ আমরা দেবীরূপিণী করুণার প্রতিমা কুমারী মার্সডেনের জীবনীর পুণ্যকাহিনী পাঠিকা গণকে উপহার প্রদান করিতেছি।

কুমারী মার্সডেন ইংলণ্ডবাসিনী। শুশ্রূষা কার্য্যে সুনিপুণা। যে সকল দেবভাবে ভূষিত হইলে মানব এ-মরজগতে থাকিয়াও অমরত্ব লাভ করিতে সমর্থ হয়, কুমারী মার্সডেন তৎসমুদয়ে বিভূষিতা। নারীজীবনের প্রকৃত সৌন্দর্য্যে তিনি অতুলনীয়া। পার্থিব ধন রত্ন ও ক্ষমতা কিছুই ছিল না। সবলা সুস্থকায়া তিনি ছিলেন না, তথাপি এবম্বিধ প্রতিকূলতার মধ্যেও তাঁহার প্রাণ সুদূর সাইবেরিয়ার অরণ্যবাসী নিরাশ্রয় কুষ্ঠ রোগীদিগের জন্য কাঁদিয়া উঠিল। তাহাদিগের জীবনের দুঃখময় কাহিনী মার্সডেনের কর্ণে প্রবেশ

করিয়া তাঁহার কোমল প্রাণকে অসহায় কুষ্ঠরোগীদের জন্য অধীর করিয়া তুলিল। তিনি সাইবেরিয়াতে গমন করিয়া কুষ্ঠরোগীদের দুঃখ দুর্দ্দশা মোচনের জন্য দৃঢ়সঙ্কল্প হইলেন। আত্মীয় স্বজন বন্ধুবান্ধব সকলে তাঁহাকে নিবৃত্ত করিবার জন্য কত ভয় প্রদর্শন করিলেন। কিন্তু বিশ্বপ্রেমে যাঁহার প্রাণ পূর্ণ হইয়াছে, তাঁহার পথে কি মুহূর্ত্তের তরেও বাঁধা বিঘ্ন দাঁড়াইতে পারে? অদম্য উৎসাহে প্রাণকে পূর্ণ করিয়া কুমারী মার্সডেন স্বদেশ পরিত্যাগপূর্ব্বক রুষদেশের রাজধানী সেণ্টপিটার্সবর্গ যাত্রা করিলেন। তথায় গমন করিয়া রুষ সম্রাজ্ঞীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহার সাহায্য ভিক্ষা করিলেন। সম্রাজ্ঞী মার্সডেনের প্রার্থনা পূর্ণ করিয়া তাঁহাকে স্বহস্তে একখানি পরিচয় লিপি লিখিয়া দিলেন। রাজ্ঞীর লিখিত লিপি খানি লইয়া মার্সডেন কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণা হইলেন। রাজ্ঞীর আদেশ অনুসারে রজকর্ম্মচারীগণ যথাসম্ভব প্রহরী অশ্ব প্রভৃতির দ্বারা তাঁহাকে রুষ রাজ্যে সর্ব্বত্র যাতায়তের সুবিধা করিয়া দিলেন। তিনি প্রথমেই ইয়াকুটস্ক এবং ভিলিস্কক (অরণ্যে) ২০০০ দুই সহস্র মাইল পরিভ্রমণার্থ তিন মাসের উপযুক্ত খাদ্য সংগ্রহ করিয়া ১৫ জন প্রহরীর সমভিব্যাহারে ২২এ জুন ১৮৯১খৃষ্টাব্দে অশ্বারোহণে যাত্রা করিলেন। যেন কোন দেব কন্যা মহোৎসাহে বীর সাজে সজ্জিতা হইয়া মর্ত্ত্যধামে অবতীর্ণা হইলেন। মার্সডেন অপূর্ব্ব বেশভূষায় সুশোভিতা হইয়াছিলেন। তিনি মশক দংশন হইতে অব্যাহতি পাইবার জন্য, নেটের (net) চাদর সংযুক্ত একটা মস্তকাবরণ, সুদীর্ঘ বাহুসংযুক্ত জ্যাকেট, জানু পর্য্যন্ত লম্বিত ইজার, এবং পদদ্বয়ে সুদীর্ঘ ও কঠিন চর্ম্মপাদুকা পরিধান করিয়াছিলেন। একটি বন্দুক একগাছি বেত্র এবং ছোট একটী ব্যাগ পৃষ্ঠের উপরে লইয়া বীরপুরুষের ন্যায় তিনি অশ্বারোহণ করিলেন।

সুবিস্তীর্ণ প্রান্তরে কোন নির্দ্দিষ্ট পথ ছিলনা। কখনও নিম্নে কখনও উচ্চে অশ্ব অতিকষ্টে চলিতে লাগিল। কখনও জলাভূমির উপরে চলিতে অশ্ব পতনোন্মুখ হইল। কুমারী মার্সডেন অত্যন্ত দৃঢ়তার সহিত রজ্জু ধারণ পূর্ব্বক অগ্রসর হইতে লাগিলেন। সমস্ত দিবস এইরূপে যাত্রা করিয়া রাত্রিতে পথ পার্শ্বে কোন পান্থনিবাসে গিয়া উপস্থিত হইলেন। সেখানেও সুখে নিদ্রা যাওয়া অসম্ভব। অতি সংকীর্ণ স্থান, মশকের দংশনে সমস্ত রাত্রি আর নির্ব্বিঘ্নে নিদ্রা হইত না। এত অসুবিধা ও কষ্টের মধ্যেও মার্সডেনের উৎসাহ তিল মাত্র খর্ব্ব হইল না। এই দুর্গম অরণ্যে পথিকদিগকে সতত বন্যভল্লুকের ভয়ে ভীত হইয়া মধ্যে মধ্যে অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া ভল্লুকের আক্রমণ হইতে নিষ্কৃতি পাইতে হইত। অনেক সময় দূর হইতে বন্য জন্তুর গন্ধ পাইয়া অশ্ব ক্ষিপ্ত হইয়া নিবিড় অরণ্যে প্রবেশ করিত। একদা এমন ভীষণ কাণ্ড সংঘটিত হইয়াছিল, যে এক দিন বিস্তীর্ণ অগ্নিময় অরণ্যের পার্শ্বস্থ পথ দিয়া ভারবাহী অশ্ব গমন করিতে করিতে অগ্নি দর্শনে ক্ষিপ্ত প্রায় হইয়া কুমারী মার্সডেনের অশ্বের উপরে আসিয়া পড়িল। জনৈক প্রহরী ত্বরায় বেত্রাঘাতে অশ্বকে দূরে ফেলিয়া মার্সডেনের জীবন রক্ষা করিল। এত বিপদগ্রস্তা হইয়াও তিনি কিছুমাত্র ভীতা হন নাই, বরং ইহাই বলিয়াছিলেন, যে দরিদ্র কুষ্ঠরোগীদিগকে এই দুর্গম অরণ্য হইতে উদ্ধার করিবার জন্য তিনি বিংশতিবার

এইরূপ ক্লেশ ও অসুবিধা মস্তক পাতিয়া বহন করিতে প্রস্তুত আছেন। ধন্য মানব প্রীতি!

অবশেষে কোমল প্রাণা মার্সডেন যখন কুষ্ঠরোগীদিগের বাসস্থানে উপনীতা হইয়া স্বচক্ষে তহাদিগের অবর্ণনীয় দুর্দ্দশা দেখিলেন তখন ব্যথিত হৃদয়ে অশ্রুপাত করিতে লাগিলেন। যদিও রমণীর একমাত্র সম্বল অশ্রু, তথাপি এই বীর রমণী কেবল অশ্রুপাত করিয়াই নিবৃত্ত হন নাই। তিনি তাঁহার জীবনের মহৎব্রত পালনের জন্য যত্ন করিতে লাগিলেন। মার্সডেন কুষ্ঠরোগীদের অবস্থা সম্বন্ধে লিখিয়াছেন। যখন কোন পুরুষ, স্ত্রী, বালক বালিকা অথবা ক্ষুদ্র শিশুর দেহে এই ব্যাধির লক্ষণ প্রকাশ পাইত, অমনি তাহার আত্মীয়বর্গ তাহাকে গ্রাম হইতে সুদূর প্রান্তরে ক্ষুদ্র কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া সামান্য খাদ্য ও বস্ত্র সহযোগে নির্ব্বাসন করিত। নির্ব্বাসিত ব্যক্তি ইহজীবনে কুত্রাপি স্বদেশে আত্মীয়জনের নিকটে স্থান প্রাপ্ত হইত না।

আত্মোৎসর্গ ব্রতধারিণী মার্সডেন এবম্প্রকারে ন্যূনাধিক ত্রয়োদশটী কুষ্ঠরোগীদের উপনিবেশ পরিদর্শন করিয়াছিলেন। উপনিবেশবাসী কুষ্ঠরোগীদের মধ্য হইতে মার্সডেন কুষ্ঠরোগাক্রান্তা মাতার সহিত স্বজন কর্ত্তৃক তাড়িতা সম্পূর্ণ নিরোগী একটী ক্ষুদ্র বালিকাকে উদ্ধার করিলেন। অতঃপর যখন অনাথ অনাথাগণ শুনিতে পাইল যে,তাঁহাদের সম্রাজ্ঞী করুণা রূপিনী দেবী মার্সডেনকে তাহাদের দুঃখমোচনের জন্য প্রেরণ করিয়াছেন, তখন তাহারা শতধারায় আনন্দ ও কৃতজ্ঞতার অশ্রুবর্ষণ করিতে লাগিল। তাহাদিগের তৎকালীন হৃদয় বিদারক করুণ বিলাপধ্বনী শ্রবণে পাষাণ হৃদয়ও বিগলিত হইয়া যাইত!

মার্সডেন একটী কুকুর সমভিব্যাহারে প্রত্যহ নির্জ্জন অরণ্যে কুষ্ঠরোগীদিগকে পরিদর্শন করিতে লাগিলেন। কুষ্ঠরোগীগণ কেবল মাত্র পঁচা অখাদ্য মৎস্য, বৃক্ষের বল্কল ও পত্র আহার করিয়া জীবনধারণ করিত ; এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দুর্গন্ধময় স্যাঁতসেঁতে কুটীরে অতিকষ্টে দিন যাপন করিত। একদা কয়েকজন বসন্ত রোগাক্রান্ত হইল। মার্সডেন তাহাদিগের ভীষণ অবস্থা স্বচক্ষে দর্শন করিলেন, তিনি বুঝিলেন যে ইহাদিগের জন্য স্বাস্থ্যকর বাসস্থান, চিকিৎসার ও পথ্যাদির সুবন্দোবস্ত করা ভিন্ন গত্যন্তর নাই। যাহাতে এই হতভাগ্যগণ পুনর্ব্বার সুখে বাস করিতে পারে মার্সডেন তাহার উপায় বিধানে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। কিন্তু পার্থিব ধন সম্পত্তি বিহীনা বিদেশবাসিনী রমণীর পক্ষে এরূপ দুরূহ কার্য্য একা সম্পন্ন করা সম্ভবপর হইতে পারে না ভাবিয়া, তিনি মস্কো নগরে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। তত্রস্থ জনসাধারন মার্সডেনের অসীম সাহসিক কার্য্য দর্শনে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার যথাযোগ্য সমবর্দ্ধনা করিল। এবং তাঁহার পর সেবা-ব্রত সিদ্ধিকল্পে রুশিয়াবাসী নরনারীগণ বিশেষরূপে সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। তাঁহার বীরত্বকাহিনী রুশিয়ার এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত প্রচারিত হইতে লাগিল এবং নরনারীর হৃদয় দেবী মার্সডেনের প্রতি আকৃষ্ট হইল। তিনি এক প্রকার বনৌষধি সংগ্রহ করিয়া তদ্দারা অনেক কুষ্ঠরোগীকে রোগমুক্ত করিতে লাগিলেন। রুশিয়ার নানাস্থান হইতে এই সৎকার্য্যের সাহায্যার্থ অর্থ সংগৃহীত হইয়া মার্সডেনের নিকট প্রেরিত হইল। অবশেষে তিনি একটী স্বাস্থ্যকর স্থানে উপনিবেশ স্থাপন করিয়া কুষ্ঠরোগীদের জন্য বাসস্থান,

চিকিৎসালয় প্রভৃতি নির্ম্মাণ কার্য্যে কৃতকার্য্য হইলেন। "রাজকুমারী শাহকুন্সী-ভগিনী-সম্প্রদায়" কর্ত্তৃক পাঁচ জন শুশ্রূষাকারিণী রমণী কুষ্ঠরোগীদের সেবার জন্য প্রেরিত হইলেন। এইরূপে কুষ্ঠরোগীদিগকে দুর্দ্দশা হইতে মুক্ত করিয়া মার্সডেন অর্থ সংগ্রহের জন্য স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

ইংলণ্ডেও সর্ব্বত্র এই পরোপকারিণী মহিলার যথাযোগ্য অভ্যর্থনা হইল। লণ্ডনে ও অপর নগর সমূহে সাইবেরিয়ার কুষ্ঠরোগীদের দুরবস্থা সম্বন্ধে মার্সডেন বক্তৃতা প্রদান করিতে লাগিলেন, এবং তাঁহার মহৎ ব্রত সুসম্পন্ন করিবার জন্য একটা স্থায়ী ধনভাণ্ডার স্থাপনের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। অদ্যাপিও কুমারী মার্সডেন অদম্য উৎসাহের সহিত কুষ্ঠরোগীদিগের শারীরিক ও নৈতিক জীবনের উন্নতির বিধান কল্পে অবিশ্রান্ত খাটিতেছেন।

তাঁহার হৃদয় নিসৃত করুণা স্রোত শত ধারায় প্রবাহিত হইয়া হতভাগ্য মহাব্যাধিগ্রস্ত নরনারীকে দুরবস্থা হইতে মুক্ত করিতেছে। বিশ্বপ্রেমিকা মার্সডেনের এই দেবোপম জীবনের উজ্জল দৃষ্টান্ত কত রমণীর হৃদয়কে প্রেমে সিক্ত করিয়া সেবাব্রতে দীক্ষিত করিতেছে। ধন্য নারী জন্ম! ইহাকেই বলে আত্মোৎসর্গ, ইহাই মাতৃত্ব বিকাশ।

আখ্যান মালা।

আলেকজেন্দ্রিয়া পুস্তকালয়।

গ্রীসের সুবিখ্যাত সম্রাট আলেকজাণ্ডারের মৃত্যুর পর মিশরের টলেমিসটার নামক এক নৃপতি আলেকজেন্দ্রিয়া নগরে সুবিখ্যাত আলেকজেন্দ্রিয়া পুস্তকালয় প্রথম সংস্থাপন করেন। টলেমিসটার যখন ইহার প্রথম সংস্থাপন করেন, তথন ইহার সংগৃহীত পুস্তক সমষ্টির সংখ্যা অধিক ছিল না। তাঁহার পরবর্ত্তী রাজগণ ইহার প্রসারণ ও উন্নতিকল্পে বহুসংখ্যক পুস্তক সংগ্রহপূর্ব্বক ইহাতে সংস্থাপন করেন। এইরূপে ক্রমে ক্রমে ইহার পুস্তক সংখ্যা সপ্তলক্ষে পরিণত হয়। রোমের সুবিখ্যাত জুলিয়াস সিজার যখন আলেকজেন্দ্রিয়া নগর আক্রমণ করেন তখন তিনি এই পুস্তকালয়ের এক অংশ অগ্নি সংযোগে দগ্ধ করিয়া ফেলেন। কথিত আছে যে তৎসঙ্গে ইহার দুইলক্ষ পুস্তক ভস্মে পরিণত হইয়া যায়। এই ঘটনার পর ক্লিওপেট্রা নাম্নী মিশরের সুবিখ্যাতা রাজ্ঞী এই পুস্তকালয়ের দগ্ধীভূত পুস্তকের সংখ্যা পূর্ণ করিবার উদ্দেশে পার্গামিন নামক পুস্তকালয় হইতে দুইলক্ষ পুস্তক সংগ্রহ পূর্ব্বক পুনরায় ইহাতে সংস্থাপন করেন। রোমসাম্রাজ্যের অধঃপতনকালে এই পুস্তকালয় পুনঃ পুনঃ লুণ্ঠিত হইয়াছিল। কিন্তু লুণ্ঠিত হইবার পরও ইহাতে পুনঃ পুনঃ বহুলক্ষ পুস্তক সংস্থাপিত করা হইত। মুসলমানগণের মিশরে প্রথম রাজ্য সংস্থাপন কালে তাহাদিগের দ্বারা এই পুস্তকালয়সমূহ ধ্বংশ প্রাপ্ত হয়। খলিফা ওমারের রাজত্বকালে মুসলমান সৈন্যাধ্যক্ষ আমরুর, দ্বারা প্রথম আলেকজেন্দ্রিয়া নগর আবিষ্কৃত হয়।

আমরু অত্যন্ত বিদ্যানুরাগী ব্যক্তি ছিলেন। সর্ব্বদা পণ্ডিত ব্যক্তিগণের সহিত আলাপ পরিচয় করিতে ব্যগ্র থাকিতেন।

আলেকজান্ড্রিয়া নগরে পিলোপোলাস নামক একজন দার্শনিক পণ্ডিতের সহিত তাঁহার পরিচয় হয়। ক্রমে এই ব্যক্তির সহিত তাঁহার অতি ঘনিষ্ঠ বন্ধুতা সংস্থাপিত হয়। একদা কথা প্রসঙ্গে পিলোপোলাস আমরুর নিকট আলেকজেন্ড্রিয়া পুস্তকালয়ে সংস্থাপিত দর্শন সম্বন্ধীয় পুস্তক সকল প্রার্থনা করেন। আমরু তাহার প্রার্থনা শুনিয়া এ সম্বন্ধে ওমারের আদেশ পাইলে তাঁহার ইচ্ছা পূর্ণ করিবেন এই উত্তর প্রদান করেন। এই ঘটনার পর তিনি ওমারকে আলেকজেন্ড্রিয়া পুস্তকালয়ের সম্বন্ধে কি ব্যবস্থা করিবেন তাহা জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠান। ওমার তাঁহার জিজ্ঞাসার এইরূপ উত্তর প্রদান করেন, যে "যদি আলেকজেন্ড্রিয়া পুস্তকালয়ে সংস্থাপিত পুস্তক সকলের সহিত মুসলমান ধর্ম্মশাস্ত্র কোরানের কোন ঐক্য থাকে তবে যেন উক্ত পুস্তকালয়ের কোন ক্ষতি করা না হয়। কিন্তু যদি কোন অনৈক্য দৃষ্ট হয়, তবে যেন তাহা সমস্ত নষ্ট করিয়া ফেলা হয়।"

আমরু ওমারের এই আদেশে আলেকজেন্ড্রিয়া পুস্তকালয়ের পুস্তক সকলের সহিত কোরানের সম্পূর্ণ অনৈক্য দর্শনে উহা একেবারে ধ্বংস করিয়া ফেলিবার জন্য সচেষ্ট হইলে আলেকজান্ড্রিয়া নগরে যে সকল স্নানাগার ছিল সেই সকল প্রত্যেক স্নানাগার উষ্ণ করিবার উদ্দেশে আমরুর আদেশে উক্ত অমূল্য পুস্তকরাশি বিতরণ করা হইয়াছিল। কথিত আছে যে, এই উপায়ের দ্বারা ছয় মাসের মধ্যে সমস্ত পুস্তকরাশি ধ্বংস করা হয়। এইরূপে আলেকজেন্ড্রিয়া নগরের সুবিখ্যাত পুস্তকালয় বিনষ্ট হয়।

প্রসিদ্ধ বক্তা।

গ্রীসের প্রসিদ্ধ বক্তা ডিমস্থিনিস একজন উৎকৃষ্ট বক্তা বলিয়া বিখ্যাত ছিলেন। তিনি অল্পবয়সে তোত্‌লা ছিলেন। যখন তিনি যৌবন প্রাপ্ত হয়েন তখন তাঁহার হৃদয়ে, একজন উৎকৃষ্ট বক্তা বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিবার বাসনা উদিত হয়। কেমন করিয়া তিনি উৎকৃষ্ট বক্তা বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিবেন অহরহ ইহাই তাঁহার একমাত্র চিন্তার বিষয় হইয়াছিল। ক্রমে অধ্যবসায় ও চেষ্টার বলে তিনি তাহার জিহ্বার জড়তা দূর করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। তিনি প্রতিদিন সমুদ্রতীরে গমনপূর্ব্বক একখণ্ড নুড়ি জিহ্বাদেশে স্থাপন করিয়া উচ্চৈঃস্বরে বাক্য বলিতে অভ্যাস করিতেন। এইরূপ অধ্যবসায়ের দ্বারা তিনি ক্রমে ক্রমে জগতের মধ্যে একজন প্রসিদ্ধ বক্তা বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিতে সিদ্ধকাম হইয়াছিলেন।

শ্রীলজ্জাবতী বসু

পতি।

পতি রমণীগণের দেবতাস্বরূপ ইহা সকলেই জানেন। সেই—দ্বাদশবর্ষ বয়সে (আধুনিক সময়ে) পিতা মাতা ইহ জীবনের মত যাহার হস্তে সমর্পণ করিয়া

দিলেন, সেই চিরজীবনের সঙ্গী। সেই সুখ দুঃখের মূল। সেই—যাহার—সঙ্গে প্রাণের অবিচ্ছিন্ন সম্বন্ধ—ললনাগণের দেবতা স্বরূপ। সেই ভক্তির আধার, চিরসহচর, দেহ মনের অধিকারী, আদরের সামগ্রী। পতি রমণীগণের পক্ষে যে বস্তু তাহা মহিলাকুল মাত্রেই অবগত আছেন। যখন পিতা মাতা, অন্যদেশীয় অপরিচিত এক ব্যক্তির নিকট একাদশ কিম্বা দ্বাদশ বর্ষীয়া বালিকাকে জন্মের মত সঁপিয়া দেন, তখনই তাঁহারা বুঝিতে পারেন আজ তাঁহাদের জীবনের একটী গুরুতর কার্য্য সমাধা হইয়া গেল, আজ হইতে তাঁহাদের জীবন সর্ব্বতোভাবে অন্যের দ্বারা পরিচালিত হইতে চলিল, আজ হইতে তাহারা সম্পূর্ণ পরাধীন। জীবনের নূতনভাব নূতন কাজ আরম্ভ হইল। তারপর যখন চতুর্দ্দশ কিম্বা পঞ্চদশ বৎসর বয়ক্রম হইল, তখন আর বুঝিতে বাকি রহিল না যে, সেই জীবনের সুখ দুঃখের মূল স্বামী। তাহা হইতেই সুখ, তাহা হইতেই দুঃখ, স্বামী সুন্দর হউন বা কুৎসিত হউন, বিদ্বান হউন বা মূর্খ হউন, গুণবান হউন বা নির্গুণ হউন, তিনি ভিন্ন আর গতি নাই, তিনিই আজীবনের আশা ভরসা সুখ দুঃখের মূলাধার। সুখী করিলেও তিনি দুঃখী করিলেও তিনি। এই সম্বন্ধ আর ছিন্ন করিবার উপায় নাই; এইভাব মনে দৃঢ়তর হইতে আরম্ভ হইয়া ক্রমে ক্রমে সেই অপরিচিত ব্যক্তির উপর মমতা ও অনুরাগ জন্মে তৎপর তাঁহার স্নেহ ও যত্ন পাইলে সেইভাব বর্দ্ধিত হইয়া পতি পত্নীর ভালবাসা সংস্থাপিত হয়।

পতির আদর রমণীগণের পক্ষে যেরূপ মধুময় ও সুখকর তাহা অধিকাংশ রমণীই অবগত আছেন। সহস্র ধন রত্ন পাইলে যে আনন্দ না হয়, পতির একটী অনুরাগের কথায় তাহা হইয়া থাকে। পতির ভালবাসা স্ত্রীজাতির এক মহামূল্য পদার্থ; সেই চিত্তমুগ্ধকর পতির আদর নারীহৃদয়কে প্লাবিত করিয়া সংসারে সুখ শান্তির পথ পরিষ্কার করে। পতির অনাদর নারীজীবনের এক ভয়ানক অশান্তির কারণ। রমণীগণ অনেক সহিতে পারেন, কিন্তু পতির অনাদর সহিতে পারেন না। রমণীজীবনে পতির পবিত্র প্রেমের অভাব হইলে, সেইখানেই তাহার সংসারের সুখের আশায় জলাঞ্জলি দিতে হইল, সেইখানেই সব বিলুপ্ত, সেইখানেই জীবনের ইতিবৃত্ত শেষ।

কত সাধ্বী রমণী পতির নির্দ্দয় ব্যবহারে অকালে প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াছেন। ঘোর দারিদ্র্যপীড়ন, অনাহার, শাশুড়ী ননদদিগের লাঞ্ছনা গঞ্জনা, রমণীগণ এসব সহিতে পারেন কিন্তু পতির অনাদর সহিতে পারেন না। পৃথিবীর মধ্যে সকলের ভাগ্য সমান নহে। পতি আদরে আদরিণী পতির ধর্ম্মসঙ্গিনীরূপে সংসারে সুখী, এমন সৌভাগ্য সকলের নহে। কত দুরাত্মা নিষ্ঠুর পতি পতিব্রতা সহধর্ম্মিণীকে নানাপ্রকারে কষ্ট দিয়া কত শান্তিময় গৃহে অশান্তি অনল জ্বালাইয়া দেন। কেহ কেহ গৃহে গুণবতী রূপবতী ভার্য্যা ফেলিয়া, দিবানিশি অসৎ সঙ্গে অসৎ কার্য্যে মত্ত থাকেন, একবারও পত্নীর প্রতি ফিরিয়া চাহেন না। অবজ্ঞা ও তাচ্ছল্যের ভাবে সন্তপ্তা হইয়া ভগ্নমনে, ম্লানমুখে, নিরাশপ্রাণে, সেই কুসুমকোরক সদৃশা পত্নী তাঁহার মনোদুঃখে শুষ্ক হইতে থাকে। তিনি তাহা ফিরিয়াও দেখেন না, একি কম দুঃখের কথা? এহেন পতির নিন্দাও স্ত্রীরপক্ষে অসহ্য।

পতি, সাধ্বী পতিপ্রাণা রমণীকে নির্দ্দয়-রূপে তিরস্কার বা প্রহার পর্য্যন্ত করিলেন, কোনও কোনও পাষণ্ডপতি নানারূপ অশ্লীল ভাষায় গালাগালি দিলেন, পাড়া-প্রতিবেশীগণ সেই সব লইয়া আলোচনা বা নিন্দা করিতে লাগিল. কি আশ্চর্য্য ইহাও সাধ্বী পত্নীর পক্ষে অসহ্য। স্বামীর নিন্দার কথা শুনিয়া তিনি নির্ম্মল হৃদয়ে কতই বেদনা পাইলেন। লজ্জায় দুঃখে মরমে মরিয়া গেলেন। তিনি স্বামী কর্ত্তৃক প্রহৃতা বা তিরস্কৃতা হইয়াছেন, তাহা বিদূরিত হইল, লোকে সকল জানিতে পারিল এবং পতিকে সকলে নিন্দা করিল ইহাই বেশী দুঃখের কারণ হইল। স্বামী হাজার মন্দ হইলেও অন্যে তাঁর কথা লইয়া নিন্দা বা আলোচনা করিলে, সতী স্ত্রী আন্তরিক ব্যথিতা হন। পতি তিরস্কার করুন প্রহার করুন কিন্তু লোকের সমক্ষে নয়, সকলের অগোচরে যাহা ইচ্ছা করুন, কেহতো জানিবে না, লোকেতো নিন্দা করিবে না? পত্নীর ভয়পাছে পতিকে কেহ নিন্দা করে, পতির দোষের কথা লইয়া নাড়াচাড়া করিতে পত্নীর মনে যত আঘাত লাগে, এত বুঝি আর কাহারও নয়।

তাই বলি, পতি যেন অবশ্য নিজ পত্নীকে পশুবৎ ঘৃণা না করিয়া, তাহাকে সৎপরামর্শ ও সদুপদেশ দানে সুশীলা ধর্ম্মনিষ্ঠা এবং নিজের মতানুযায়ী প্রস্তুত করিতে যত্নবান হন, যাহাতে সহধর্ম্মিণী নামের গৌরব রক্ষা সকল রমণীগণই করিতে পারেন।

সকল রমণীগণেরই স্বামীকে মহাগুরু জানিয়া দেবতাজ্ঞানে পূজা করা উচিত। শাস্ত্রে বলিয়াছেন, স্বামী পূজা করিলে দেবতা পূজার ফল হয়।

শ্রীহেমন্ত কুমারী গুপ্তা।

নলিনী।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

কয়েকখানি পত্র।

প্রিয় পাঠিকা! অনেক দিন আমাদের সুরজার সহিত সাক্ষাৎ নাই, আপনাদের কি সেই কঠোর ব্রতাবলম্বিনী বালবিধবার পবিত্র পুণ্যময় চিত্র একবার প্রাণ ভরিয়া দর্শন করিবার ইচ্ছা হইতেছে না? চলুন একবার তাহার কাছে যাই।

সুরজা প্রতিজ্ঞা করিল সে বিবাহ করিবে না, ক্রমে ক্রমে তাহার প্রতিজ্ঞার কথা মাতা ও মাতুলের কর্ণগোচর হইল। নরেশ বাবু মনে মনে কিছু ক্ষুণ্ণ হইলেন বটে, কিন্তু সুরজার ধর্ম্ম নিষ্ঠা ও কর্ত্তব্যপরায়ণতা দেখিয়া তাহার প্রতি সন্তুষ্ট ব্যতীত অসন্তুষ্ট হইতে পারিলেন না।

ভবেশ কাশী চলিয়া গেলে সুরজা আর কলিকাতা থাকিতে চাহিল না, সুরজা এখন সপ্তদশ বর্ষীয়া যুবতী, তাহাকে লইয়া অভি-ভাবকশূন্য অবস্থায় স্বর্ণপুর বাস করা তাহার মাতার ও মাতুলের যদিও সম্পূর্ণ অনিচ্ছা, কিন্তু তাহার রীতি নীতি, ও ধর্ম্মজ্ঞান দেখিয়া সকলকেই তাহার মতে মত দিতে হইল। তাঁহারা বুঝিলেন, সংসারের শত শত প্রলো-ভনেও সুরজাকে প্রলুব্ধ করিতে পারিবে না পাপ পিচ্ছিল দুর্গম পথেও সুরজার পদস্খলন হইবে না, সে তাহার ধর্ম্মের পথ, নীতির পথ, আপনিই খুঁজিয়া লইতে পারিবে।

সুরজা যাত্রাকালে মাতুল ও মাতুলানীকে প্রণাম করিলে উভয়ে একবাক্যে আশীর্ব্বাদ করিলেন, "ঈশ্বর তোমার মনস্কামনা পূর্ণ করুন।"

সুবর্ণপুর আসিয়া সুরজা মাতুলানীকে নিম্নলিখিত পত্র লিখিল।

শ্রীচরণেষু।

আপনাদের স্নেহবন্ধন ছিন্ন করিয়া আসিলাম। আপনারা বোধ হয় আমার ব্যবহারে আন্তরিক অসুখী হইয়াছেন? কি করিব? সংসারে বুঝি কাহাকেও সুখী করিবার জন্য জন্মি নাই, এ হতভাগিনীর জন্য আপনাদিগকে চিরদিনই ক্লেশ পাইতে হইবে।

আপনি মামাবাবুকে বলিবেন আমি এখানে একটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপিত করিতে ইচ্ছা করিয়াছি, তজ্জন্য তিনি যদি মাসিক ১০৲।১৫৲ টাকার সাহায্য করিতে পারেন, তবেই আমার ইচ্ছা কার্য্যে পরিণত হয়, নতুবা আর হয় না। আমি এসম্বন্ধে মাতাঠাকুরাণীর মত পাইয়াছি, আশা করি আপনাদেরও অমত হইবে না। আপনারা আমার প্রণাম গ্রহণ করিবেন ইতি।

আপনার স্নেহের

সুরজা।

উত্তরে গিরিজা লিখিলেন।

প্রাণাধিকা সুর!

তোমার পত্র পড়িয়া বড় দুঃখিত হইলাম। তুমি এমন কি অপরাধ করিয়াছ যে তদ্দ্বারা আমাদের স্নেহের বন্ধন ছিন্ন হইবে? তোমার প্রতি আমাদের যে স্নেহ, তাহা চিরদিনই অক্ষুণ্ণ থাকিবে। তোমার ব্যবহার আমাদের নিকটে কোন দিনও বিরক্তিজনক নহে বা আমরা সে জন্য দুঃখিতও নহি। তবে সকলে যেমন সংসারে সুখী হয়, তুমি তাহা হইলে না ইহাই আমাদের মর্ম্মান্তিক যাতনা। ঈশ্বরের ইচ্ছার উপরে কাহারও হাত নাই, তিনি যাহা করিবেন তাহাই আমাদের মঙ্গল বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে; তিনি তোমাকে সংসারী হইতে দিলেন না, হয় তো তোমা দ্বারা তাঁহার অন্য কোনও শুভ উদ্দেশ্য সংসাধিত হইবে। তুমি যে সংকল্প করিয়াছ তাহা তোমার মাতুলকে জানাইয়াছি, তিনি শুনিয়া অতিশয় সুখী হইলেন, এবং শীঘ্রই বর্ত্তমান মাসের স্কুল খরচ পাঠাইয়া দিবেন বলিলেন। আমরা কুশলে আছি তুমি আমাদের স্নেহাশীর্ব্বাদ লইও।

তোমার স্নেহের মামী

গিরিজা।

সুরজা মাতুলানীর পত্র পাইয়া খুব সুখী হইল, এবং সেইদিন হইতে মাতার অনুমতি লইয়া পাড়ায় মেয়েদের অভিভাবকের নিকটে তাঁহাদের কন্যাদিগকে বিদ্যাশিক্ষা করাইবার নিমিত্ত অনুরোধ করিতে আরম্ভ করিল। কেহ কেহ তাহার প্রস্তাবে সম্মত হইল কেহ বা স্ত্রীশিক্ষার ফল শুভ নহে বলিয়া সম্মত হইল না। ইহাতে সুরজার কোনও ক্ষতি হইল না, সে ১৫।১৬টি মেয়ে লইয়া বিদ্যালয়ের কার্য্য আরম্ভ করিল। যে সকল দরিদ্র বালিকার পুস্তকাদি ক্রয় করিবার সামর্থ্য নাই তাহাদের পুস্তক, শ্লেট, কাগজ কলম ইত্যাদি নিজে ক্রয় করিয়া দিল। সেলাই শিখাইবার জন্য কাপড় পশম, সূঁচ সূতা ইত্যাদি ক্রয় করা হইল। বালিকারা নিয়মিত সময়ে বিদ্যালয়ে উপস্থিত হইত। প্রথম ২ঘণ্টা লেখা পড়া, পরে ২ ঘণ্টা সেলাইএর কার্য্য শেষে অর্দ্ধঘণ্টা নীতি ও ধর্ম্মোপদেশের এবং ঈশ্বরের স্তোত্র পাঠের পর স্কুলের ছুটি হইত। ক্রমে

ক্রমে বালিকারা সুরজার খুব বাধ্য হইয়া উঠিল। সুরজা কোনও কোন দিন বালিকাদের বাড়ী যাইয়া তাহাদের জননীর নিকটে কন্যারা পিতা মাতার সহিত কি প্রকার আচরণ করে, এবং সাংসারিক কাজকর্ম্মে মনোযোগ করে কিনা, ইত্যাদি বিষয় গুলি জানিয়া আসিত, এবং বিদ্যালয়ে সেই কথা উল্লেখ করিয়া মধুর ভাষায় তাহাদিগকে উপদেশ প্রদান করিত। কিছুদিন পরেই সুরজা বুঝিতে পারিল তাহার উপদেশে বালিকাদের যথেষ্ট উপকার হইতেছে। যে সকল মেয়েরা পূর্ব্বে নিতান্ত উচ্ছৃঙ্খল চরিত্র ও পিতামাতার অবাধ্য ছিল,তাহারা সুরজার উপদেশে পিতা মাতার প্রতি ভক্তিমতী ও সাংসারিক-কর্ম্মে মনোনিবেশ করিতে লাগিল! সুরজা ভাবিল এ সময় বালিকাদিগকে গুণানুসারে পুরস্কৃত করা কর্ত্তব্য। সুরজা কতক গুলি খেলানা পুস্তক প্রভৃতি ক্রয় করিয়া নির্দ্দিষ্ট দিনে বালিকাদিগকে পারিতোষিক প্রদান করিল। বালিকাগণ দ্বিগুণ উৎসাহের সহিত বিদ্যাশিক্ষা করিতে ও সুরজার উপদেশ পালন করিতে আরম্ভ করিল। সুরজার বালিকা বিদ্যালয়ের সুফল প্রত্যক্ষ করিয়া, যাঁহারা স্ত্রীশিক্ষার প্রতি বিদ্বেষ হেতু পূর্ব্বে কন্যাদিগকে স্কুলে যাইতে দেন নাই, তাঁহারাও স্ব স্ব অধীনস্থ বালিকাদিগকে স্কুলে পাঠাইতে আরম্ভ করিলেন। স্কুলে বালিকার সংখ্যা প্রায় ৪০টী হইল। এতগুলি বালিকার বিদ্যা শিক্ষা শিল্পকাজ প্রভৃতি শিক্ষা দেওয়া সুরজার পক্ষে অসম্ভব হইল, তখন সে অন্য একজন সহযোগিনীর জন্য মাতুলকে লিখিল এবং গ্রামস্থ অবস্থাপন্ন লোকের কন্যাদের নিকট হইতে কিছু কিছু বেতন লইতে আরম্ভ করিল। সুরজার বিদ্যালয় দেখিয়া গ্রামের সকলেই সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। জমীদার মহাশয় একদিন বিদ্যালয় পরিদর্শনে আসিয়া যথেষ্ট আহ্লাদ প্রকাশ পূর্ব্বক মাসিক ১৫৲টাকা সাহায্য করিবেন বলিলেন। অর্থাভাব বলিয়া সুরজার যে চিন্তাছিল ইহাতে তাহা দূর হইল। অবিলম্বে কলিকাতা হইতে জনৈক শিক্ষয়িত্রী আসিয়া সুরজার সাহায্য আরম্ভ করিলেন।

এইরূপে দুই বৎসর অবিশ্রান্ত বালিকা বিদ্যালয়ও অন্যান্য সৎকার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়া সুরজা প্রাণে অনেক শান্তি পাইল বটে, কিন্তু তাহার চিত্তের বিষন্নতা সম্পূর্ণরূপে বিদূরিত হইল না। সমস্ত দিন পরিশ্রমের পর রাত্রে যখনই শয়ন করিতে যাইত, অমনই তাহার মনে হইত, "কি করিলাম! ঈশ্বর কি আমাকে ক্ষমা করিবেন? পার্থিব সুখের আশা ত চূর্ণ করিয়া ফেলিলাম, হৃদয়কেও একরূপ আয়ত্ত করিলাম, কিন্তু ইহাতে কি পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইবে? ভালবাসায় পাপ হয় তাহা আগে জানিতে পারি নাই, আমি একজনের স্ত্রী অন্যকে ভাল বাসিবার অধিকার আমার নাই, তাহাও অগ্রে জানিতাম না। যেদিন তাহা বুঝিয়াছি সেইদিন হইতেই হৃদয়কে বশে আনিতে চেষ্টা করিয়াছি, হৃৎপিণ্ড ভাঙ্গিয়া চূর্ণ করিয়াছি, জগদীশ্বর যতটুকু ক্ষমতা দিয়াছেন, সাধ্যানুসারে সে পথ হইতে ফিরিতে চেষ্টা করিতেছি। যিনি আমারই ন্যায় না বুঝিয়া পবিত্র ভাবে ভাল বাসিয়াছিলেন, তাঁহাকে কতকষ্ট দিয়াছি, তাঁহার কান্না, তাঁহার কষ্ট দেখিয়াও দেখি নাই, তাহাতেও কি আমি, জগতের আদি পুরুষ! পতিতপাবন! তোমার চরণে স্থান পাইব না? আর স্বামি? তুমি কি তোমার চির দুঃখিনী পাপীয়সী স্ত্রীকে ক্ষমা

করিবে? যখন পরকালে তোমার সহিত মিলিতে যাইব, তখন কি আমাকে পাপিনী বলিয়া ঘৃণা করিয়া দূর করিয়া দিবে? অথবা অনুতপ্ত হৃদয়া হতভাগিনীর প্রতি দয়া করিয়া চরণ তলে স্থান দিবে?" ভাবিতে ভাবিতে সুরজা কাঁদিয়া ফেলিত, অনেক রাত্রি তাহার কাঁদিয়াই অতিবাহিত হইত।

আজ রবিবার বিদ্যালয় বন্ধ আছে। সুরজা মাতার নিকটে বসিয়া মহাভারতের নলদময়ন্তী উপাখ্যান পাঠ করিতেছিল, তাহার কাছে দুইটি বালিকা বসিয়া একমনে সতীর উপাখ্যান শ্রবণ করিতেছিল। বালিকা দুইটির সম্প্রতি বিবাহ হইয়াছে শীঘ্রই তাহারা শ্বশুরালয়ে যাইবে; তাই স্নেহশীলা সুরজার নিকটে বিদায় লইতে, তাঁহার উপদেশ গ্রহণ করিতে, তাহাদের জননীরা পাঠাইয়া দিয়াছেন। সুরজা দময়ন্তীর অসাধারণ সতীত্ব অপার্থিব পতিপ্রেম প্রভৃতি বালিকাদিগকে বুঝাইয়া দিয়া, সাবিত্রীর উপাখ্যান পড়িতে আরম্ভ করিলেন। সাবিত্রী যখন স্বামীর আশু বিপদ জানিতে পারিয়া স্বামীর সহিত বনে গমন করিতেছিলেন, সেই স্থান সুরজা পড়িতেছিল। সেই সময়ে ডাকওয়ালা আসিয়া একখানা চিঠি তথায় দিয়া প্রস্থান করিল। সুরজার মাতা হাতে লইয়া দেখিলেন, কন্যার নামাঙ্কিত চিঠি, সুরজার নিকটে রাখিয়া বলিলেন, দেখ্ তো তোর মামী কি লিখিয়াছে। সুরজা পত্র হাতে লইয়া দেখিল, অমনি তাহার মুখ খানি কেমন মলিন হইয়া গেল; পত্র খানা পুস্তকের মধ্যে রাখিয়া বলিল, থাক পরে পড়িব। সাবিত্রীর উপাখ্যান শেষ হইলে সুরজা বালিকাদ্বয়কে শ্বশুর খাশুড়ী প্রভৃতির সহিত কি প্রকারে ব্যবহার করা কর্ত্তব্য ইত্যাদি বিষয়ে প্রয়োজনীয় কতকগুলি বিষয় উত্তম রূপে বুঝাইয়া দিলেন, পরে তাহাদের মুখ চুম্বনান্তর দুইখানি "ললনা সুহৃদ" দুইটী বালিকার হস্তে পুরস্কার স্বরূপ প্রদান করিয়া তাহাদেরে বিদায় করিলেন।

ক্রমে সন্ধ্যা হইল, সুরজা সন্ধ্যা উপাসনা শেষ করিয়া গৃহে প্রবেশ করিল, প্রদীপের নিকটে বসিয়া চিঠি খানা পড়িতে আরম্ভ করিল,

স্নেহের সুরজা!

আজ অনেক দিন পরে, ঠিক দুই বৎসর পরে তোমার কাছে পত্র লিখিতে বসিয়াছি, দুই বৎসরের পরেই বা বলি কেন? জীবনে এই তোমাকে প্রথম পত্র লিখিতেছি, তুমি আমার পত্রের উত্তর দিবে কি না জানি না, ইহা পড়িয়া তুমি কি মনে করিবে তাহা ভাবিবার সময়ও আমার নাই, আমি বুঝি জ্ঞান হারাইয়াছি!

স্নেহের সুর! তোমাকে কেমন করিয়া লিখিলে হৃদয় তৃপ্ত হয়, তাহা ভাবিয়া পাইতেছি না, কি লিখিলে হৃদয়ের যথার্থ ভাব তোমাকে জানাইতে পারি তাহাও খুঁজিয়া পাইতেছি না।

আমি দুই বৎসর কলিকাতা ছিলাম না, কতবার তোমাকে পত্র লিখিব মনে করিয়াছি, কেবল তুমি কি ভাবিবে মনে করিয়াই লিখি নাই। আজ আর থাকিতে পারিলাম না, আমার পত্রের উত্তর দিয়া কি আমাকে সুখী করিবে? দুই বৎসর পূর্ব্বে যে দিন কলিকাতা ত্যাগ করিয়া যাই, মনে পরে কি সুর? তাহার পূর্ব্ব রাত্রিতে এই ঘরেই তুমি দয়া করিয়া আমাকে একবার দেখা দিয়াছিলে, সে দিন যদি দেখা না দিতে তবে বোধ হয় আজ আর এ পত্র লিখিতে হইত না। সেই দিন কি সুর! হৃদয়ের দ্বার খুলিয়া প্রাণের

নিভৃত-তম প্রদেশ তোমাকে দেখাই নাই? সে দিনও কি প্রাণের যন্ত্রণা তুমি কথঞ্চিৎ বুঝিতে পার নাই? তখন তুমি বলিয়াছিলে আর এক দিন তোমার মনের কথা আমাকে জানাইবে। সেই আশায় আশ্বস্ত হইয়া এতদিন বুক বাঁধিয়াছিলাম কিন্তু কৈ? তুমি তো একদিনও এ হতভাগ্যকে স্মরণ করিলে না? একদিনও তো মনের কথা বলিলে না? এখনো কি তোমার সে কথা বলিবার সময় উপস্থিত হয় নাই?

যদি ইচ্ছা হয়, আমি এক সপ্তাহ এখানে থাকিব ইহার পুর্ব্বেই উত্তর দিও বিলম্ব করিও না। তোমার পত্র পাইলেই আমি সুবর্ণপুর যাইব। ইতি

তোমার অভাগা
ভবেশ।

সুরজা পত্রখানা পড়িয়া দুঃখিত এবং বিস্ময়াবিষ্ট হইল, কিন্তু তাহার সে আশৈশব ধৈর্য্যশীল হৃদয় কিছুমাত্র বিচলিত হইল না অর্দ্ধোচ্চারিত স্বরে বলিল, "আবার এসব কেন? সংসারে কি আর আমার জন্য শান্তি নাই। কি শত্রুতাই ছিল?" সুরজার নেত্রপ্রান্তে দুইবিন্দু অশ্রু দেখাদিল, যোড়করে উর্দ্ধদিকে চাহিয়া বলিল, "ভগবান হৃদয়ে শক্তিদাও! তুমি ভিন্ন সংসারে আর আমার কেহই নাই! যে জীবন তোমার চরণে উৎসর্গ করিয়াছি, তাহা যেন তোমার আদেশ পালন করিতেই শেষ হয়। সংসারের পাপ প্রলোভন যেন কখনও সে হৃদয়কে মুগ্ধ করিতে না পারে? পরমেশ্বর! পার্থিব সুখের আশাতো রাখিনা, তোমার দয়ায় তোমার আদেশে পাপ পথে প্রধাবিত হৃদয়কে একরূপ আয়ত্ত করিয়াছি। আমাকে আরও বল দাও যেন তোমার প্রদর্শিত পথ ব্যতীত অন্য পথে আমার চিত্ত ধাবিত না হয়!" সুরজা পত্রখানা দীপ শিখায় ধরিল পত্র জলিয়া উঠিল, সুরজা মনে মনে বলিল, "পত্র! তুই যেমন ভস্ম হইলি; যিনি তোকে প্রেরণ করেছেন, তাঁহার হৃদয়ের দুরাশা গুলিও এইরূপে ভস্ম হইয়া যাউক। আজ যেমন তাঁহাকে বিস্মৃত হইয়া তোকে পোড়াইয়া ছাই করিলাম, ঈশ্বর সমীপে প্রার্থনা আমার প্রতি তাঁহার যত স্নেহ ভালবাসা সকলি এইরূপ ভস্মীভূত হউক! চিরদিনের জন্য তিনি আমাকে বিস্মৃত হউন আমার পথ কণ্টকশূন্য হউক! সুরজা কাগজ কলম লইয়া পত্রের উত্তর লিখিতে বসিল,—

সুবর্ণ পুর।

পরম পূজনীয়!

শ্রীযুক্ত ভবেশচন্দ্র মিত্র
মহাশয় শ্রীচরণেষু

ভবেশ বাবু!

আপনার পত্র পাইলাম অনেক দিন পরে যে আপনি আমাকে মনে করিয়াছেন সে অতীব সুখের বিষয় তাহাতে সন্দেহ নাই কিন্তু আপনার পত্র পড়িয়া আমি সুখী হইতে পারি নাই, প্রত্যুত আন্তরিক যাতনাই অনুভব করিতেছি, এতদিন পরে আপনার নিকট হইতে এইরূপ পত্র পাইব তাহা কখনও মনে করি নাই।

আপনি আমাকে বাল্যাবধি স্নেহের চক্ষে দেখেন, তাহা জানি। আপনি বুদ্ধিমান এবং বিদ্বান, বোধ হয় বুঝিতে পারেন মনুষ্যের ইচ্ছাতে কোনও কার্য্য হয় না। আপনার হৃদয়ের যাতনা বুঝিতে পারিয়াছি, আমিই এ যন্ত্রণার মূল তাহা বুঝিতেও আমার বাকী নাই। একদিন আপনাকে আমার মনের

কথা বলিব বলিয়াছিলাম, আপনি কি এত-দিনেও তাহা বুঝিতে পারেন নাই ?

জীবনে যাহা কিছু শিক্ষা আপনার চরণ-তলে বসিয়াই লাভ করিয়াছি, কিন্তু নিতান্ত বাধ্য হইয়াই আজ আপনাকে উপদেশ দিতে হইতেছে, এ অপরাধ আপনি গ্রহণ করিবেন না—করিলেও আমি উপায় হীনা। সত্যই কেবল আমার অমতের জন্যই মাতুল মহা-শয়ের কথা ঠিক হয় নাই, তাঁহাদের কোনও দোষ নাই। ভবেশ বাবু! আপনার নিকট যে জ্ঞান যে শিক্ষা লাভ করিয়াছি সেই জ্ঞান সেই শিক্ষাই আমাকে বর্ত্তমান অবস্থায় আনিয়াছে।

সংসারে অধীর হইলে কোনও কার্য্যই সিদ্ধ হয় না। আপনি শিক্ষিত লোক সংসার আপনার নিকট অনেক প্রত্যাশা করে। আপনি যদি সামান্য কারণে এত অধীরতা প্রকাশ করেন সে বড়ই আক্ষেপের কথা। আপনি সুবর্ণপুর আসিতে চাহিয়াছেন, আসিলে আমিও সুখী হইতাম, কিন্তু আমি আপনাকে আসিতে নিষেধ করিতেছি। এখন আপনার আমার সহিত দেখা করি-বার সময় হয় নাই।

বোধ হয় শুনিয়া সুখী হইবেন, আপনার প্রদত্ত শিক্ষায় আজ এই গ্রামের অনেক গুলি বালিকা শিক্ষালাভ করিতেছে, এজন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিবেন। অধিক আর কি লিখিব? দুরাশায় মগ্ন থাকিয়া আজীবন যন্ত্রণা ভোগ না করিয়া, যাহাতে নিজে সুখী হইতে এবং আপনার স্বজনকে সুখী করিতে পারেন তাহাই করিবেন। ভগবানের চরণে আপ-নার জন্য প্রার্থনা করি।

আপনার স্নেহের

সুরজা।

ক্রমশঃ

একখানি পত্র

অন্তঃপুরবাসিনী প্রিয় পাঠিকা ভগিনীগণ! মানুষ মাত্রেই মনের মত লোকের সঙ্গে আলাপ করিতে ভালবাসে। মনের কথাটী যে বেশ বুঝিতে পারে তাহার সঙ্গে সমস্ত দিন বসিয়া আলাপ করিতে ইচ্ছা হয়। অন্তঃপুর বাসিনী মহিলারা সর্ব্বদাই এইরূপ সঙ্গীর অভাব বোধ করিয়া থাকেন। সমস্ত দিন সংসারের কাজ কর্ম্ম করিয়া অবসর সময় একটু গল্পসল্প করিতে সকলেরই সাধ হয়। কিন্তু এই গল্প করিবার উপযুক্ত লোক খুব অল্পই ঘটিয়া থাকে। চিরপরাধীনা বঙ্গমহিলা কখনও মনের কষ্ট খুলিয়া বলিবার লোক পান না। তবে আজকাল অধিকাংশ মহিলারাই অল্পাধিক পরিমাণে শিক্ষিতা হওয়ায় অনেক সময় তাঁহারা চিঠি পত্রে মনের ভাব প্রকাশ করিয়া থাকেন। আর বর্ত্তমান সময়ে "অন্তঃপুর" আমাদিগকে অনেকের মনের কথা জানিতে দেয়। "অন্তঃপুর" পড়িতে পড়িতে অনেকেরই মনে হয় যে অন্তঃপুরবাসিনী ভগিনীদের সঙ্গে একবার দেখা হইলে বুঝি কতক মনো-কষ্টের লাঘব হইত। প্রত্যেকের মনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আশা-লতাগুলি প্রত্যেককে জানাইয়া ঐগুলি বর্দ্ধিত করিবার চেষ্টা করা যাইত। কিন্তু

আমাদের এই সুযোগ কোথায়? "অন্তঃপুরের" লেখিকারা একে অন্যের নিকট সম্পূর্ণ রূপে অপরিচিতা হইলেও আমরা জানি যে পরস্পরের প্রতি পরস্পরের যথেষ্ট সহানুভূতি আছে। আমরা "অন্তঃপুরকে" প্রাণের সহিত ভালবাসি। আমাদের এই প্রিয় বন্ধুটীকে মধ্যবর্ত্তী করিয়া আমরা পরস্পরকে মনের কথা জানাইতে চেষ্টা করিব।

গত মাঘ মাসের অন্তঃপুর পত্রিকায় কোনও সহৃদয়া "হিন্দু বিধবার" লিখিত "বৈধব্য জীবনের চিত্র" শীর্ষক প্রবন্ধটী পাঠ করিয়া আমরা অতিশয় আহ্লাদিত হইয়াছি। প্রত্যেক মহিলারাই যদি অল্পাধিক পরিমাণে এই বিষয়টী চিন্তা করিতেন, তবে আজ ভারতের এ দুর্দ্দশা থাকিত না। কিন্তু হায়! সকলেই যেন উদাসীন ভাবে দিন কাটাইতেছি। জীবনের দিনগুলি কোনওরূপে কাটিয়া গেলেই যেন হইল। এত নিরুৎসাহের ভাব আর কোনও জাতির মধ্যে আছে বলিয়া বোধ হয় না। ইউরোপ, আমেরিকা প্রভৃতি দেশের মহিলারা বঙ্গরমণীদের মত এত শক্তিহীনা নহেন। ঐ সকল স্থানে কেবল মহিলাদের চেষ্টায় কত সৎকার্য্য হইতেছে। তাঁহারা নিজে উদ্যোগী হইয়া কত সভা সমিতি করিতেছেন। বঙ্গমহিলাদের মত নিশ্চেষ্ট ভাবে থাকিতে তাঁহারা ভালবাসে না। এ দোষ শুধু মহিলাদের নহে। বঙ্গদেশের পুরুষ জাতিরই যদি এই দশা তবে মহিলাদের দোষ কি? তাহারা উৎসাহ দাতার অভাবে অনেক সময় সৎসংকল্পগুলি মন হইতে দূর করিতে বাধ্য হন। কেহ কোনও একটী সৎ কার্য্যের কথা বলিলে অমনি চারিদিক হইতে তাহার প্রতি নানারূপ বিদ্রূপ বাক্য বর্ষণ হইতে থাকে। সুতরাং এই ভয়েও কেহ কিছু বলিতে সাহস পান না।

প্রিয় ভগিনীগণ! ভগবানের কৃপায় আমরা এই সামান্য রকম লেখাপড়া শিখিয়াই বুঝিতেছি যে, আমাদের কর্ত্তব্য শুধু এই ক্ষুদ্র পরিবার মধ্যেই আবদ্ধ নহে। জগতে আমাদেরও করিবার কিছু কাজ আছে। যদি আহার নিদ্রা, ও সন্তান পালনই আমাদের জীবনের লক্ষ্য হইত, তবে আমরা পশু পক্ষী হইতে পৃথক হইলাম কি করিয়া? তবে আর আমরা মানুষ নামের যোগ্যা নহি! পশু পক্ষীগণও আহার করে, নিদ্রা যায়। স্বীয় বাসস্থান প্রস্তুত করে, সন্তান পালন করে, আমরাও যখন তাহাই করিতেছি তবে আর আমরা তাহাদের হইতে শ্রেষ্ঠ কিরূপে?

একটু চিন্তা করিলেই আমরা দেখিতে পাই যে, দয়াময় ঈশ্বর আমাদিগকে স্বাধীন ইচ্ছা দিয়া পশু হইতে পৃথক করিয়াছেন। ইহা দ্বারাই আমরা মনুষ্যত্ব লাভ করিতে পারি। এই শক্তিটী যদি আমরা ব্যবহার না করিয়া পশুর মতই জীবন যাপন করি তবে বিধাতার এই বিশেষ দানের অপমান করা হয়। তাই বলি ভগিনীগণ! আমরা আর কতকাল মোহনিদ্রায় নিদ্রিত থাকিব। একবার জাগিয়া দেখ, জগতে আমাদের অনেক করিবার আছে। চক্ষের সম্মুখে দেখিতে পাইতেছ, বঙ্গীয় বালবিধবাদের জীবন দুঃখ কষ্টে কাটিতেছে। পুরুষ জাতি এ বিষয় চিন্তা করেন না, বলিয়া কি তোমরাও ইহাদের কথা ভাবিবে না? তোমরা ত রমণী তোমাদের প্রাণ ত পাষাণে গড়া নয়?

একবার এই হতভাগিনীদের কথা ভাবিয়া দেখ, ইহারা কি শুধু কাঁদিতেই জগতে আসিয়াছে? এক একটী বিধবার কষ্ট দেখিলে প্রাণ ফাটিয়া যাইতে চায়। এজগতে যেন তাহারা কতই অপরাধী। সর্ব্বদা অপরাধীর ন্যায় ভীত চিত্তে দিন কাটাইতেছে আত্মীয় স্বজনের মনস্তুষ্টির জন্য তাহারা জীবন দিতে প্রস্তুত। কিসে পরিবারের লোক সুখী হন সর্ব্বদা এই চেষ্টা। কিন্তু হায়। ইহার পরিণাম কি? যাহার সেবায়, যাহার মনতুষ্টির জন্য খাটিয়া খাটিয়া শরীরটা মাটী করিতেছেন, তাহারাই— হায় রে ভাবিতে ও প্রাণ ফাটিয়া যাইতে চায়—ঐ দুঃখিণী মহিলারা পীড়িতা হইলে চক্ষে দেখিতে পারেন না! একটু সেবা শুশ্রূষা করিতে হয় বলিয়া কত বিরক্তি প্রকাশ করেন, কত আপদ জঞ্জাল মনে করেন।

ভগিনীগণ? একবার চাহিয়া দেখ প্রতিদিন ঘরে ঘরে এইরূপ কত ঘটনা ঘটিতেছে। আজ যিনি পিতৃগৃহে স্নেহের পুত্তলী, পিতা মাতার আদরের কন্যা, পতি-হীনা হইলে কালই তাহাকে অন্য আত্মীয় স্বজন তো দূরের কথা অনেক সময় পিতামাতা পর্য্যন্ত বিষদৃষ্টিতে দেখিয়া থাকেন। হায় রে! এই অনাথিনীরা তবে কোথায় দাঁড়াইবে ইহাদের কি কোনও উপায় নাই?

সত্য বটে এ জগতে বিধবাদের সুখ নাই। স্বামীর সঙ্গে সঙ্গে জীবনের সুখ সাধ সবই শেষ হইয়া গিয়াছে। তাহাদের অভাব পৃথিবীতে পূর্ণ হইবার নয়। তাহাদের প্রাণের শোকাগ্নি নির্ব্বাপিত হইবার নয়। কিন্তু সংকাজে যে শান্তি তাহাত আছে। ভগবৎ প্রেমে মন ডুবাইলে পার্থিব সুখের অভাবে মন কখনও কাতর হয় না। কিন্তু জ্ঞান হীনা বালিকাদিগকে সেই পথ কে দেখাইবে?

বিধবাদের মধ্যে যাঁহারা সন্তানবতী, তাঁহাদের জীবনের একটা লক্ষ্য আছে এবং নিজ জীবনটারও মূল্য আছে বলিয়া মনে করিতে পারেন। অধিকাংশ সময়ই তাঁহারা সন্তানের চিন্তায় ও কার্য্যে কাটাইয়া থাকেন, এবং সন্তানের ভবিষ্যৎ জীবনের সুখ শান্তির আশায় তাহারা শোক দুঃখ অনেকটা ভুলিয়া থাকিতে পারেন।

কিন্তু যাহারা বালিকা বয়সে পতিহীনা হইয়াছেন, তাহারা ভাবেন পৃথিবীতে তাহা-দের কাজ কিছুই নাই। তাহাদের জীব-নের কোনও মূল্য নাই। প্রতি মুহূর্ত্তে তাহারা মৃত্যু কামনা করিয়া থাকেন। তাহাদের প্রাণের এই উদাস উদাস ভাব-গুলি দূর করিবার কি কোনও উপায় নাই?

প্রকৃত কাজ করিতে পারিলে মনে বেশ শান্তি পাওয়া যায়। মনের উদাস ভাবগুলও থাকে না। আমি যদি বুঝিতে পারি যে, আমার দ্বারা জগতের কোনও কাজ হইতেছে, তবে অবশ্যই আমার জীবনটার উপর একটা মমতা জন্মিবেই। এত বড় একটা অবসর জীবন বৃথা যাইতেছে, ইহা কতটুকু কষ্টের বিষয়। এই দুর্ব্বলা ভারত মহিলার দ্বারা জগতের কোনও মহৎ কাজ হইতে পারে, ভগিনীগণ! তাহা কি তোমরা বিশ্বাস করিতে পার না?

গত চৈত্র মাসের অন্তঃপুর পত্রিকায় স্বর্গীয় দীননাথ দত্ত মহাশয়ের জীবনীতে আমরা দেখিয়াছি যে, তিনি একটী বিধবা-শ্রম স্থাপন করিতে মনস্থ করিয়াছিলেন।

বিধাতা তাঁহার এই বাসনা পূর্ণ করিতে সময় দিলেন না। এখন আমাদের জিজ্ঞাস্য এই যে একটী বিধবাশ্রম কি স্থাপিত হইতে পারে না? আমাদের অদৃষ্ট দোষে কেহ উৎসাহ দাতা নাই। পুরুষগণ সুখ নিদ্রায় মগ্ন। আমরা চেষ্টা করিলে কি এইরূপ একটী কাজ করিতে পারি না? হায়! বাঙ্গালী জাতির এমনই স্বভাব যে, কেহ একটী সঙ্কল্প করিলে তাহার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে সঙ্কল্পটীও চলিয়া যায়। তাহার ভবিষ্যৎ বংশধরগণ তাহা পূর্ণ করিতে চেষ্টা করেন না। ইহাতেই আমাদের সমাজের এই অবস্থা। এক ব্যক্তির জীবনে আর কত সময় পাইতে পারে? এসব কাজ ১।২ দিনের চেষ্টায়ও হবার নয়।

প্রিয় ভগিনীগণ! আমরা পৃথিবীতে সেবিকা হইয়া আসিয়াছি। জগতের সেবা করাই আমাদের কাজ। জীবসেবাই নারী জীবনের—বিশেষতঃ বিধবা জীবনের—মুখ্য উদ্দেশ্য। যদি সেবাই আমাদের জীবনের লক্ষ্য হইল তবে তাহা শুধু পরিবার মধ্যে আবদ্ধ রাখিলে স্বার্থপরতা হয় না কি? নিস্বার্থ ভাবে জগতের সেবা করাই ধর্ম্ম। আজ তোমাদের নিকট তোমাদের দুঃখিনী ভগিনীদের দুঃখ মোচনের একটি আশ্বাস বাণী শুনিবার জন্য আসিয়াছি। আমাকে কি বিফল মনোরথ হইয়া ফিরিতে হইবে? যে সময়টা তোমরা বৃথা আমোদ প্রমোদে কাটাইয়া থাক তাহা হইতে একটু সময় লইয়া এই বিষয়টী একটী বার চিন্তা করিয়া কি তোমরা ইহার একটা উপায় করিবে না? আমাদের জন্য এই সামান্য পরিশ্রমটী স্বীকার করিতেও কি তোমরা কাতর হবে? সকলে এই বিষয় মনোযোগী হইয়া এই অনাথিনীদের একটা উপায় করিয়া সমাজের দুঃখ কষ্ট দূর কর, তোমাদের নিকট ইহাই ভিক্ষা। আর আমাদের সমদুঃখিনী ভগিনীগণ, আমরা লোক লজ্জা ভয়ে প্রাণের উচ্চ আশা গুলি প্রকাশ করিতে সাহস পাইনা, কিন্তু এই লোকনিন্দা আর কয়দিন থাকিবে? লোকনিন্দা ভয়ে চির জীবন দুঃখে কাটাইব কিন্তু লোকের প্রশংসায় ত প্রাণের শোকাগ্নি নির্ব্বাপিত হয় না? এস ভগিনীগণ! আমরা প্রাণপনে একবার চেষ্টা করিয়া দেখি এই দুঃখ নিশি প্রভাত হয় কিনা। বর্ত্তমানে বাল বিধবার সংখ্যা নিতান্ত কম নহে, এবং অনেকে বেশ শিক্ষিতা। তাই বলি ভগিনী! আমাদের ক্ষুদ্র শক্তিতে যতটুকু পারি একবার চেষ্টা করিয়া দেখিব। অন্যে আমাদের কষ্ট না বুঝিতে পারেন, কিন্তু আমরাও যদি একে অন্যের মনোবেদনা না বুঝি আমাদের জ্ঞানহীনা বালিকা ভগিনীদের জন্য যদি আমাদের প্রাণ না কাঁদে তবে কাহার প্রাণ কাঁদিবে? যাহারা আজিও বালিকা, সংসারের কিছুই জানে না তাহাদেরে কে পথ দেখাইবে? তাহাদের অশ্রু মুছাইবার আর কে আছে? যদিও আমরা দুর্ব্বলা, কিন্তু "সাধু যাঁহার ইচ্ছা, ঈশ্বর তাঁহার সহায়।" এই মহাবাক্যই আমাদের ভরসা। পরিশেষে পাঠিকা ভগিনীদের প্রতি বিনীত প্রার্থনা, এই বিষয়টী চিন্তা করিয়া আপন আপন মনের ভাব প্রকাশ করিতে ক্রুটী না করেন। বিষয়টী শুধু কাগজে লিখা থাকা আমাদের উদ্দেশ্য নহে। আজ না হউক সময়ে যাহাতে এইটী কার্য্যে পরিণত হইতে পারে ইহাই আমাদের একান্ত ইচ্ছা। পাঠিকা ভগিনীগণ, পত্রিকাখানি পাঠ করিয়া

পরিচিতা বাল বিধবাকে পড়িতে দিলে চির বাধিত হইব।

তোমাদেরই একটী
ভগিনী।

(লেখিকার সদুৎসাহ দেখিয়া আমরা যারপর নাই সুখী হইয়াছি। বর্ত্তমান সময়ে বড় শুভচিহ্ন দেখা যাইতেছে, তাহা এই যে অন্তঃপুরের আবরণ ভেদ করিয়া আমাদের পাঠিকাগণ স্বদেশীয় চিরদুঃখিনী বালবিধবাগণের অবস্থার উন্নতির জন্য সমবেত হইতে চাহিতেছেন। আমরা আশা করি আমাদের সহৃদয়া পাঠিকাগণ এসম্বন্ধে স্বীয় মতামত প্রকাশ করিয়া লেখিকার উৎসাহ বৃদ্ধি করিবেন। আমরা ভারতের বিভিন্ন প্রদেশস্থ বিধবাশ্রমগুলির বিবরণ সংগ্রহ করিয়া প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিব। এসম্বন্ধে কেহ কোন প্রবন্ধ লিখিলে সাদরে গৃহীত হইবে। অঃ সঃ)।

বলিদান।

আবার সম্বৎসর পরে বঙ্গবাসীর আনন্দের দিন আসিতেছে। ভক্তের গৃহে ভগবতীর আগমন হইবে, তাঁহার সন্তান সন্ততিগণ ইতি মধ্যেই যাহাতে ষোড়শোপচারে মায়ের পূজা হয় তাহার আয়োজন করিতে আরম্ভ করিয়াছে। মায়ের মনস্তুষ্টির জন্য মহিষ, ছাগশিশু যাহার যাহা মানস আছে, বলি দিবার জন্য ক্রয়ের ফন্দ হইতেছে।

কিন্তু ভগিনি. একবার জিজ্ঞাসা করি আমাদের সম্মুখে আমাদের সন্তানের তীক্ষ্ণধার খড়্গে বলি এবং বাছাদের রক্ত অন্য পাঁচ জনে মাখিয়া নাচিতেছে বা আনন্দ করিতেছে, মা হইয়া আমরা কি ইহা সহ্য করিতে পারি? না সুখ লাভ করিতে পারি?

যদি ইহা না পারিলাম, তবে বোন কেন আমরা মায়ের সম্মুখে মায়ের সন্তান বলি দিয়া মনে করি মাকে তুষ্ট করিলাম।

না বোন, মা তাহাতে তুষ্ট না হইয়া বরং রুষ্ট হন। তাই আমাদের দিন দিন এমন অধোগতি হইতেছে। মায়ের আশীর্ব্বাদের পরিবর্ত্তে অভিসম্পাৎ সঞ্চয় করিতেছি।

আমাদের জগত জননী বড় কোমল হৃদয়া, যদি আজ পুত্তলিকার পরিবর্ত্তে রক্ত মাংস দেহী মা মণ্ডপে দাঁড়াইতেন তবে দেখিতে পাইতে তিনি লোলজিহ্বা বাহির করিয়া নিজের সন্তানের রক্ত নিজে পান করিতেছেন না। কিন্তু তাহার পরিবর্ত্তে ঐ বাক্‌শক্তি হীন সন্তানগুলিকে রক্ষার জন্য তাঁহার কোমল বক্ষ পাতিয়া দিতেছেন।

বোন, আমরা এমন করিয়া আর ভগবতী মায়ের কোমল হৃদয়ে আঘাত দিব না। সাধ্যমত আমাদিগের পিতা, ভ্রাতা, পতি ও পুত্রদিগকে জগদীশ্বরীর অভিশাপ হইতে রক্ষা করিতে চেষ্টা পাইব।

এই সকল জীব বলির পরিবর্ত্তে এস বোন আমরা বেশী না পারি অন্ততঃ একটা রিপুকে এ বৎসর বলি দিতে চেষ্টা করি।

মাও তাই চান মা চান আমরা তাঁহার সুসন্তান হই, তাই মায়ের শাস্ত্রে বলি দানের প্রথা আছে। দুর্দ্দমনীয় রিপুগুলিকে দমন করিতে না পারিলে, মায়ের সুসন্তান হওয়া যায় না, দুইটা মহিষ বা চারিটা ছাগশিশু বলি দেওয়া সহজ, ইহাদিগকে আয়ত্তে আনিতে যত না বল, যত না পরিশ্রমের আবশুক, এক একটা রিপুকে দমন করা তাহা অপেক্ষা শত গুণে পরিশ্রমজনক

কারণ মহিষটা মরিয়া গেলে আর উঠে না রিপুগুলি মরিয়াও মরে না। কয়েক দিনের পরিশ্রমে পশুগুলি আয়ত্তাধীন হয়, কিন্তু একটা রিপু দমন করিতে অনেক দিন অনেক মাস এমন কি অনেক বৎসরও লাগিয়া, যায়। রিপু দমন করিতে এত কষ্ট হয় বলিয়াই বুঝি আমরা জীব বলির ব্যবস্থা করিয়াছি। তাই বুঝি আমরা সহজ সাধ্য কাজ ভাবিয়া পতি পুত্রকে বাক্‌শক্তি হীন জীবগুলিকে মায়ের তুষ্টির জন্য তাঁহার চরণে বলি দিতে অনুরোধ করি।

তা হইবে না। এখনও সময় আছে, এবার আমরা আর জীব বলি দিয়া মায়ের অভিশম্পাৎ কুড়াইতে পতি পুত্রকে অনুরোধ করিব না। তাহার পরিবর্ত্তে অন্তরে যে রিপুটা বড়ই দুর্দ্দমনীয় হইয়াছে, তাহাকেই বলিদান করিতে বলিব, এবং নিজেরাও যত্নবতী হইব। স্বয়ং জগন্মাতা একার্য্যে আমাদের সহায় হইবেন।

শ্রীপুষ্পমালা দেবী।

রন্ধন।

সহজ উপায়ে মাংস পাক।

প্রথম মাংস বেশী ধুইবে না বেশী ধুইলে মাংসের অনেক সার জিনিস নষ্ট হইয়া যায়। একটী বড় পাত্রে জল রাখিয়া তন্মধ্যে মাংস ছাড়িয়া দিয়া উঠাইলেই ধোয়া হইল। এইক্ষণ মাংসগুলি একটা পাত্রে রাখিয়া মাংসের আন্দাজে লবণ, হলুদ, জিরা, গোলমরিচ, বাঁটা ধনে, লঙ্কা বাঁটা, তেজপত্র, আদার রস, পেঁয়াজের টুক্‌রা, খানিকটা দধি এই সকল দিয়া বেশ করিয়া মাখিবে তারপর একটা ডেকে মাংসের আন্দাজে (বা গৃহস্থের জিনিসের বরাদ্দে) খানিকটা ঘি, বা তৈল ঢালিয়া দিয়া খানকয়েক তেজপত্র গোটা কয়েক জিরা অথবা লবঙ্গ ফোড়ণ দিয়া মাংসগুলি ডেকের ভিতর দিয়া খুব নাড়িতে হইবে, অল্প-নাড়িয়াই মাংস ডোবা (অর্থাৎ আন্দাজে বুঝিতে হইবে যত খানি জলে সিদ্ধ হয়) জল দিবে। খানিক জ্বাল দিয়া মাংস তুলিয়া দেখিবে মাংস হাড় হইতে ছাড়িয়াছে কিনা হাড় ছাড়িলেই মাংস বেশ সুসিদ্ধ হইয়াছে বুঝিতে হইবে। এদিকে ঝোল অবশ্য ঘন হইয়াছে বুঝিলে (ছোট এলাচি লবঙ্গ দারুচিনি বাঁটা) গরম মসলা দিয়া নামাইবে। নামানের পূর্ব্বে ঘি দেওয়া আবশ্যক।

শ্রীহেমন্ত কুমারী সেন গুপ্তা।

কবিতা

নেপোলিয়ন চরিতের একপৃষ্ঠা।

ক্ষুদ্র দ্বীপ সংবেষ্টিত চৌদিক সাগরে।
যত দূর চলে দৃষ্টি অনন্ত পয়োধি,
অনিবার উচ্ছ্বসিত তরঙ্গ-লহরী ;
শুভ্রফেন চূড়া শিরে গর্জ্জিয়া ছুটিছে
মহাব্ধি বিক্ষুব্ধ করি আকাশ-বেলায়।
দ্বীপপ্রান্তে সুসম্বদ্ধ শৃঙ্খলিত যেন,

পর্ব্বতের শ্রেণী প্রসারিত, দৃঢ়তর
কারা প্রাকার যেমতি অভাগ্য বন্দীর।
অনুর্ব্বরা বসুন্ধরা, বিমুখ প্রকৃতি
ক্রোধন-মূরতি যেন প্রকাশেন হেথা ;
মহাগ্রীষ্ম বারমাস, অল্লাবু-নিবাসী।
এ হেন বিরূপ স্থলে নির্ব্বাসিত এবে,
ফ্রান্সের গৌরব-রত্ন উন্নতি সোপান,
জগতে অতুলবীর, নেপোলিয়ান খ্যাত।
বিপ্লববিভ্রান্ত ফ্রান্স উত্থিত যখন,
বিসর্জ্জিয়া একেবারে দয়া-ধর্ম্ম-নীতি
পরস্পর রক্তপাতে উন্মত্ত হইয়া,
বিপদে বিপদান্তরে করি আলিঙ্গন।
বিস্মৃত সুরাজনীতি, নরপতি তবে
ব্যস্ত নিজ প্রাণভয়ে, ক্ষিপ্ত প্রজাকুল
সম্মিলিত, রাজরক্তে মিটাইতে তৃষা,
প্রচণ্ড প্রবাহ ক্ষীণ শৃঙ্গভঙ্গে যথা।
অর্থহীন অসহায় তরুণ যুবক,
সম্মুখে বিনষ্ট প্রায় নিরখি স্বদেশ,
অগ্রসর হৈলা তবে, একাকী নির্ভয়ে,
সে বিপ্লব প্রতিরোধে, ঘুচাতে বিদ্রোহ ;
দেশের কল্যাণে দৃঢ় নিবিষ্ট অন্তর।
সংক্ষুব্ধ সাগরে যেন দক্ষ কর্ণধার
অনুকূল স্রোতভরে চালিলা ক্ষেপণী।
শোণিত উচ্ছ্বাস তদা, হইল বিরাম,
স্থিরচিত্তে অতিক্রমি, বিঘ্ন সমুদায়,
স্থাপিলা উদ্ধারি তায়, উন্নতি সোপানে
সুশাসনে, শান্তির কল্যাণচ্ছায়া-তলে।
বিপ্লবান্তে সুপ্রসন্ন দিক্ সমুদয়,
গৃহে গৃহে বন্দনায় সুরব গাহিয়া,
মন্দিরে সুগন্ধ দীপ জ্বালায়ে আবার
করিল তাহারি যেন বিজয় ঘোষণা।
তার পর উজ্জ্বলিত দিবালোক সম ;
কৃতজ্ঞ ফরাসী জাতি, প্রকৃতি যেমনি
স্বীয় শুভ বিধিবশে, দিলা সেই শিরে
সম্রাটের স্বর্ণময় উজ্জ্বল মুকুট—
গৌরবের অভিজ্ঞান, পরায়ে আদরে।
ঘটিল ফ্রান্সের ভাগ্যে, কত রূপান্তর,
সানন্দ প্রকৃতিপুঞ্জ, তুষ্টমনা সদা,
অনুকূল নৃপতির, সুনীতি-শাসনে,
একতায় পরিপুষ্ট বর্দ্ধিত জীবন।
কত দেশ, কত রাজ্য কিরণে তাহার
জাগিল অমরোৎসাহে, নবীন জীবনে।
কিন্তু দূরদৃষ্ট ফ্রান্স, দুর্ম্মতি তাহার,
সহিল না এ সৌভাগ্য বহুদিন হায়,
সঞ্চারিল কেন্দ্রে তার তামস ভীষণ।)
বিদ্রোহি চক্রান্তে মরি অজ্ঞাতে হেলায়
সে অমূল্য রত্ন তায় দিল বিসর্জ্জন।
বুঝিল না জানিল না, কি যে সে হারা'ল,
অনুপম আশীর্ব্বাদ-প্রসাদ ধাতার।
মনস্বী সে বীরচিত্ত অম্লানবদনে,
আলিঙ্গন দিলা নিজ দুরূহ বিপদে ;
প্রবেশিলা এ বিষম সিন্ধুকারাগেহে।
স্বদেশের অতিদূরে, মহাসিন্ধু গর্ভে,
ক্ষুদ্র দ্বীপে, নির্ব্বাসিত বীরবর এবে।
হৃদয়ের অতিপ্রিয়, শান্তি জীবনের,
সকলি বিচ্ছিন্ন তাঁর, আত্মীয় বান্ধব,
কেহ বন্দী আততায়ী শত্রুর কবলে
তাদের সন্দেশ লয়ে প্রবেশিতে হেথা,
পবনও প্রতিরুদ্ধ, শঙ্কিত অন্তর।
একাকী সম্রাট হেথা, রুদ্ধ দ্বীপালয়ে,
স্বদেশ স্বজনচ্যুত, পরাধীন ভাবে ;
তীব্রজ্বালা সর্ব্বসহা বক্ষে রোধি যথা,
অপূর্ব্ব আদর্শে দিয়া আত্মবিসর্জ্জন।
প্রাণহীন সুকঠোর শৈলদ্বীপ সেই,
স্বকক্ষে জগতরত্ন করিয়া ধারণ,
বুঝে নাই জানেনিক হৃদয়ে তাহার
কি গৌরব সমুদিত প্রদীপ্ত ভাস্কর,
আপনার অন্ধকক্ষে, সমাহিত থাকি।

নীচাশয় শাসকের, তেমতি তাহার,
নীচ ব্যবহারে ম্লান বীরেন্দ্রকেশরী,
নিয়ত বিমর্ষ চিত্ত, ভগ্ন স্বাস্থ্য এবে।
একদা প্রদোষে বসি সহচর সনে,
ব্যথিত ব্যাকুলচিত্ত, নৃপতি কহিলা ;—
"কোথা সে কর্সিকা যথে, মাতৃক্রোড় সম
শৈশবে যে বক্ষপুটে করিল পালন,
শুনাইয়া স্বচ্ছতোয়া গিরি-তটিনীর
কল্লোল এ কর্ণ মূলে, গৌরব সঙ্গীত—
ঊর্দ্ধ পিতৃপুরুষের, মায়াচ্ছন্দে গাঁথি।
পিয়া'য় সে মিষ্ট করি মাতৃদুগ্ধ সম
কোথা সে সমীরস্নিগ্ধ আমোদ-চঞ্চল ?
করিত কিশোর প্রাণ আনন্দে পূরিত ?
কোথা তার শ্যামক্ষেত্র, ঊর্দ্ধে সুবিশাল
অনন্ত আনন্দোজ্জ্বল নীলাভ্র সুন্দর ;
হ'ত আকর্ষিত যাহে সদা আঁখি দুটি
প্রশান্ত প্রীতির ছবি প্রকটিত হেরি ?
গম্ভীর অচল-শ্রেণী উন্নত মস্তকে
গৌরব প্রতিষ্ঠা প্রাণে করিত যাহার।
জনক জননী মম যাহার কুটিরে
শুনাতেন নিত্য নব বীরত্ব কাহিনী,
সুমধুর কথা ভঙ্গে সাদরে আহ্লাদে
তরুণ হৃদয়ে মম বিচিত্র সংযোগে
শিরায় শিরায় রক্তকম্পন ছুটিত।
শুনিতাম মুগ্ধপ্রাণে আগ্রহে বিস্ময়ে,
সানন্দে জড়ায়ে কণ্ঠ স্নেহ-অঙ্কে থাকি
পরিপূর্ণ হত চিত্ত অব্যক্ত আবেগে,
কি মহিমা দেখিতাম জননীর মুখে।
কোথা সেই সে জীবন প্রভাতের মম,
আলোকে পুলকে দীপ্ত পুণ্য প্রিয়ভূমি।
নির্ব্বাসীর ক্ষুদ্রতর মলিন কুটীরে
ভাসিল সহসা এক উদার উজ্জ্বল,
সুন্দর প্রসূভূমি মমচিত্রে হায়।
কাঁপিল বীরের বক্ষ, প্রিয় লাফনাস্

চাহিলা মলিনচক্ষে ক্ষুব্ধ পতিপানে,
নিরখিলা সে বদন বিষাদে আঁধার।
সাশ্রুনেত্র কহিলা আবার, কোথা ফ্রান্স
আমার সে সাধনার ভূমি, বিশ্বরত্ন।
বার বার পতনের মহাঘাত হতে,
হইলা উত্থিত নিজ বিপুল গৌরবে,
কোথায় সে বীরপ্রসূ স্বর্ণভূমি ফ্রান্স।
যাহারে সাজাতে সাধ, সদা ছিল মনে,
আলোক ভাস্বর সম জগতের ভালে,
উন্নত আদর্শ দৃঢ় সত্য গরিমায়।
অনুগত শিষ্য সত্য বিপুল জগত
পাইত উন্নত তত্ত্ব, শিখিত যাহাতে
উদার কল্যাণনীতি এ উন্নতি যুগে।
কেন্দ্র যে হইত হায় মহাজগতের,
মহা মিলনের পুণ্য অধিষ্ঠান ভূমি।
সসাগরা বসুন্ধরা গাইত যাহার
ধন্য রব কণ্ঠে কণ্ঠে ; জ্ঞান প্রেমপুণ্য
হত বিরাজিত যথা, একই আসনে
যেমতি স্বর্লোক মাঝে, এমরত ভবে।
সে আজি মলিন, বিদ্রোহীর বক্ষরক্তে,
পথের কর্দ্দম সম বৈরী পদতলে,
হা অদৃষ্ট ! এ যন্ত্রণা নহে সহিবার।
(শোকে কণ্ঠ নীরব হইল ক্ষণতরে)
"কিন্তু ভবিষ্যত্ নাহি অবিশ্বাস তোমা,
আমিও অচির কালে উদ্ধারিতে তায়
যেদিন ফরাসি ভূমি নবীন জীবনে
জাগ্রত হইবে পুন এ তামসী শেষে।
তুমিও হে পিতঃ ! অই ঊর্দ্ধলোক হতে
দাও তার শিরে কল্যাণ আশীষধারা।
উদ্ধারি চরণাশ্রয়ে কর গো স্থাপন ;
দেখো যেন অভাগার তরে, সহে না সে
দুঃখভার, এই বিড়ম্বনে দাও শান্তি।
ফ্রান্স ! প্রিয়ভূমি ফ্রান্স ! দুর্গতি তোমার,
দূর হক এ মুহূর্ত্তে হওগো উত্থিত,

প্রচার জগতে নব গৌরব আভাতি,
ঘুমুক জাগ্রত ফ্রান্স, আপন গৌরবে।
অভাগা পরাণ মনে করে আকিঞ্চন ;
হায় শক্তি নাহি মাত্র এ বিপুল দেহে।"
দুটি অশ্রু দুটি, প্রষ্ঠ দীপ্ত তারা সম
বীরের কঠিন বক্ষে পড়িল লুটায়ে।
বাহিরিল যেন হায় ভাঙি সে হৃদয়
প্রলয়ের তাপদগ্ধ সুদীর্ঘ নিশ্বাস।
অচিরে সোণার রবি গেল অস্তচলে
পড়িল ধুসর ছায়া অঙ্কে ধরণীর।

শ্রীসুপ্রীতিবালা ঘোষ।

"এত ভালবাসি।"

(বালিকার রচনা)

বল্ ফুল কেন তোরে এত বালবাসি ?
হেরি তোর গুণ রাশি,
তাই কিরে ভালবাসি,
নবনীত ওঠে তোর—কি অমিয় হাসি।
বল্ ফুল কেন তোরে এত ভালবাসি!
কভুবা গলায় রাখি,
হাতে লয়ে কভু দেখি,
কভুবা মলয় বহে লয়ে গন্ধ রাশি।
বল্ ফুল কেন তোরে এত ভালবাসি,
কচি কচি পাতা মাঝে,
মুখ তুলে সেজে গুজে,
চাহি থাক তুমি তব ঢালি রূপরাশি।
বল্ ফুল কেন তোরে এত ভালবাসি,
কভুবা গলায় রাখি—
হাতে লয়ে কভু দেখি;
কভুবা মলয় বহে লয়ে গন্ধ রাশি।
বল্ ফুল কেন তোরে এত ভালবাসি,
কচি কচি পাতা মাঝে,
মুখ তুলে সেজে গুজে,
চাহি থাক তুমি, ঢালি তব রূপ রাশি।
বল্ ফুল কেন তোরে এত ভাল বাসি,
সুগন্ধি চন্দন সহ
ভক্ত বৃন্দ হস্তে কহ,
শিশুদের করে কভু হেরি রাশি রাশি।
বল ফুল তোরে কেন এত ভাল বাসি,
যিনি হরি পবিত্রাত্মা
তাঁহার সে পবিত্রতা
হেরিয়ে তোমার মাঝে তাই ভাল বাসি ?
বল্ ফুল কেন তোরে এত ভাল বাসি,
দেবতা চরণে রহ
নরগণে সদা রহ
এদেহ নশ্বর তব হে পৃথিবী বাসি।
বল্ ফুল কেন তোরে এত ভাল বাসি,
আরো বল যতনে,
দয়াময় আরাধনে
সুখ পাবে সদা হৃদে' হে ধরণী বাসি।
বল্ ফুল কেন তোরে এত ভাল বাসি,
তোমার মতন সবে,
হইলে মানুষ ভবে,
স্বরগ হইত ক্ষিতি সুখ নীরে ভাসি।

কুমারী আশালতা দাস গুপ্তা

অভিমান।

কাহার উপরে করি এত অভিমান ?
রোষের অধীন হয়ে,
সতত ব্যাকুল আমি, রাখিবারে মান,
এ ক্ষুদ্র জীবন লয়ে।
সংসারে হতাশ আমি হইগো যখন
জ্বলে মরি দুঃখ ভারে।
নিমিত্তের ভাগী করি হায়রে তখন,
মানবের কর্ম্ম ডোরে ;
পদে পদে হতমান হয়ে ভবমাঝে,
চেতনা হয়না মোর।

তথাপি মানের আশে সদাব্যস্ত থাকি,
জানিনা কি মায়া ঘোর
একবার গিয়া হায় শ্রীফলের তলে
মুণ্ডিত মস্তক জন,
যায় কি আবার কভু ভুলে সেইদিকে ?
কে আছে অজ্ঞ এমন ?
আমি অতি লজ্জাহীন তাই বার বার,
ভুলি লোক আচরণ।
পে'তে চাই দুদিনের অতি তুচ্ছমান,
করে দৃঢ় প্রাণ পণ
মুদিব নয়ন যবে লীলা সাঙ্গকরি,
এ নিখিল বিশ্ব হতে,
পড়ে র'বে তুচ্ছমান ধূলির মতন
কিছু না পারিব নিতে।

শ্রীরাজলক্ষ্মী ঘোষ

বিবিধ প্রসঙ্গ

বঙ্গদেশে স্ত্রীশিক্ষার ব্যয় ও অন্যান্য বিবরণ—গবর্ণমেন্টের সাহায্য প্রাপ্ত শিক্ষয়িত্রী প্রস্তুতের জন্য ট্রেনিং স্কুলের সংখ্যা ৯, এবং ঐ সকল স্কুলে ছাত্রী সংখ্যা ৮৮।

শিক্ষয়িত্রীর জন্য ট্রেনিং স্কুল সমূহের ব্যয় হইয়াছে ৪৫ হাজার ১৪৯ টাকা।

বেথুন কলেজ বোর্ডিঙ্গে ছাত্রীসংখ্যা ৩১ জন উহাদের জন্য বৎসরের ব্যয়ের পরিমাণ ৪৯২৭ টাকা।

সরকারী বা সরকার হইতে সাহায্য প্রাপ্ত স্কুল সমূহে বৎসর মধ্যে ছাত্রীসংখ্যা ১৮৮ ৩২২। ইহার পূর্ব্ব বৎসরে ছিল ৯৬ হাজার ৮৫৭। বেসরকারী স্কুল সমূহে কত ছাত্রী পড়িয়াছে তাহার হিসাব দেওয়া হয় নাই। তাহার কারণ ঐ সকল স্কুলে যে সকল ছাত্রী পড়ে, তাহাদের অধিকাংশই মুসলমান। উহারা এক আবটু কোরাণ আবৃত্তি ভিন্ন আর কিছু বড় একটা শিখেনা। ছাত্রী ট্রেনিং স্কুলে ১৮জন পরীক্ষোত্তীর্ণা হইয়া সার্টিফিকেট পায়। ৪ জন সিনিয়র টিচারশিপ এবং ১৪ জন জুনিয়র টিচারশিপ সার্টিফিকেট। বালিকা স্কুল সমূহের মহিলা ইনস্পেক্‌ট্রেস্ কর্ত্তৃক এই উভয় পরীক্ষা গৃহীত হইয়াছিল।

আর্টস কলেজ সমূহে ছাত্রী সংখ্যা ৫৫, ডাক্তারী প্রভৃতি শিক্ষার জন্য কলেজ সমূহে ২২, ট্রেনিং স্কুল সমূহে ৫১৬, মেডিকেল স্কুল সমূহে ৪৩, অন্যান্য বিশেষ স্কুলে ৭৮। ১৯০১।২ সালে ছাত্রীদের জন্য তিনটি আর্টস কলেজ ছিল।—বেথুন কলেজ, লরেট্টো হাউস্ এবং লামার্টিনিয়র, এই তিনটি কলেজই কলিকাতায় অবস্থিত। ইহাদের মধ্যে বেথুন কলেজটিরই ছাত্রী সংখ্যা অধিক। উক্ত বৎসর কলেজে ৩৬ জন ছাত্রী অধ্যয়ন করিয়াছে। বালিকাদিগের জন্য উচ্চ শ্রেণীর স্কুল সংখ্যা ১৩, ঐ সকলে ছাত্রীসংখ্যা ১ হাজার ৬২৮, ১৩টি স্কুলের মধ্যে ৬টি এদেশীয় বালিকাদিগের জন্য; ঐ ৬টির ছাত্রী সংখ্যা ৫৪৮। বেথুন কলিজিয়েট স্কুলই তন্মধ্যে প্রধান—ছাত্রীসংখ্যা ১৩৭; উহার মধ্যে হিন্দু ১২৮জন, অবশিষ্ট দেশীয় খৃষ্টিয়ান। বৎসরকাল মধ্যে বালিকাদিগের জন্য প্রাথমিক মধ্য ও উচ্চ শ্রেণীর স্কুল সমূহে ব্যয় হইয়াছে ৭লক্ষ ৪৪হাজার ৭৬৯ টাকা, ইহার মধ্যে ১লক্ষ ৬৫ হাজার ৬৭৯ টাকা প্রাদেশিক রাজস্ব হইতে প্রাপ্ত। প্রাথমিক স্কুল সমূহে প্রত্যেক ছাত্রীর জন্য গড়ে ব্যয় পড়িয়াছে ৪৷৴০।

আদর্শ পত্নী।—ফরাসি রাজ্যের দেশপতি মসু লুবের পত্নী স্বামীর সর্ব্বকর্ম্মের সহচরী; তিনি কেবল গৃহে গৃহকর্ত্রী নহেন, কেবল স্বামী সেবায় রতা নহেন; তিনি তাঁহার স্বামীর প্রতি কার্য্যের সহচরী। দেশপতি তাঁহার পত্নীকে একাধারে পত্নী, বন্ধু ও মন্ত্রী বলিয়া সন্মান করেন।

মহিলা অধ্যাপক।—ফ্রান্সের গ্রেনোবল ইউনিভার্সিটিতে মিস্‌জেনিংস্‌ ইংরাজী ভাষায় অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়াছেন। ফ্রান্সের বিশ্ববিদ্যালয়ে ইনি প্রথম মহিলা অধ্যাপক নিযুক্ত হইলেন।

স্বর্গীয়া জোয়ালা দেবী।—মীরাটের ডাক্তার রামচন্দ্রের স্ত্রী শ্রীমতী জোয়ালা দেবী মীরাটের হিন্দু রমণীদের শিক্ষার্থ এক পাঠশালা, তাহাদের জ্ঞানোন্নতির জন্য এক সভা এবং অনাথ বালক বালিকাদের জন্য এক আশ্রম স্থাপন করিয়াছিলেন। এ সকল কার্য্যের গুরুতর পরিশ্রমে সম্প্রতি তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। তাঁহার অকাল মৃত্যুতে মীরাটের হিন্দু রমণীগণ বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছেন। তাঁহার স্থান পূরণের উপযুক্ত আর কেহ কি নাই? যে যায়, তাহার মত যে আর দ্বিতীয় কেহ মিলে না, ইহাই এদেশের দুর্ভাগ্যের বিষয়।

শিক্ষিতা রাজকুমারী।—সপ্তম এডওয়ার্ডের কনিষ্ঠা কন্যা নানাগুণে বিভূষিতা। তিনি ৫টী বিদেশী ভাষায় কথা বলিতে পারেন, ছবি তুলিতে পারেন, নৌকার দাঁড় টানিতে এবং হাল চালাইতে পারেন। তিনি সীবন কার্য্যে সুদক্ষ এবং বই বাঁধাইর কার্য্যও বেশ জানেন।

সাহসী নারীদল।—অষ্ট্রেলিয়ার অন্তর্গত আর্মিডেল নগরে এক অগ্নি নির্ব্বাপকের দল আছে। এই দলের ভিতর সকলেই স্ত্রীলোক। অনেক বিপজ্জনক ঘটনায় তাঁহারা অতি সাহসের পরিচয় দিয়াছেন এবং নানাস্থানে অতি দক্ষতা ও ক্ষিপ্রতার সহিত অগ্নি নির্ব্বাণ করিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। এই দলে ১২জন স্ত্রীলোক আছেন, প্রয়োজন হইলে তাঁহারা পুরুষের দলের কার্য্যে সহায়তা করিয়া থাকেন।

রমণীর বীরত্ব।—একদিন চুলামো ভুটিয়ারাণীর স্বামী মদ খাইয়া দারজিলিঙ্গের বাজারে গোলমাল করিতেছিল। পুলিস তাহাকে ধরিতে গিয়াছিল। চুলামো তখন ৯ মাসের গর্ভবতী। স্বামীর বিপদ দেখিয়া চুলামো তাহাকে উদ্ধার করিতে বহির্গত হইল। ৩জন কনষ্টেবল এবং আরও অনেক লোক তাহার স্বামীকে ধরিয়াছিল, চুলামো একাকী কনষ্টেবল ও তাহাদের সাহায্যকারীদিগকে ভাগাইয়া স্বামীকে উদ্ধার করিয়াছিল। চুলামোর নামে নালীস হইয়াছিল। দারজিলিঙ্গের, একজন ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট চুলামোকে ৩ মাসের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড করিয়াছিলেন। বিচারকালে ইহা প্রকাশ পাইয়াছিল যে, কনষ্টেবলেরা চুলামোকে নিদারুণ প্রহার করিয়াছিল, তাহার বস্ত্র ছিন্ন করিয়াছিল। তাহাকে এমন প্রহার করা হইয়াছিল যে, ২৬ দিন তাহাকে চিকিৎসার্থ হাস্পাতালে থাকিতে হইয়াছিল। ধরপাকড়ের সময় চুলামো এক কামড়ে, একজন কনষ্টেবলের আঙ্গুল দ্বিখণ্ড করিয়াছিল। হাস্পাতালে চুলামো এক সন্তান প্রসব করে। কারাগারে সন্তানকে মাতার নিকট হইতে পৃথক রাখা হইয়াছে। চুলামো হাইকোর্টে আপীল করিয়াছে। হাইকোর্ট তাহাকে জামীনে মুক্তি দিয়াছেন এবং দণ্ড হ্রাস হইবে না কেন, তাহার কারণ দর্শাইতে হুকুম দিয়াছেন।

৯ মাসের গর্ভবতী রমণী ৩জন কনেষ্টবলকে হটাইয়া স্বামীকে উদ্ধার করিয়াছে, ইহা ভুটিয়া রমণীর পক্ষেই সম্ভব। কনেষ্টবলেরা যে তাহাকে নিদারুণ প্রহার করিয়াছে, সে জন্য তাহাদিগকে দণ্ড না দিয়া কেবল এই স্বামী-উদ্ধারিণীকে দণ্ড দেওয়া ম্যাজিষ্ট্রেটের কর্ত্তব্য হইয়াছে কি না; হাইকোর্টে অবশ্যই তাহার আলোচনা হইবে।

রাণী ভবসুন্দরী।—বিগত ১৭ই জুলাই দীঘাপাতিয়ার রাজা প্রমদানাথ রায়ের পিতামহী, প্রমথনাথ রায়ের মাতা ও রাজা প্রসন্ননাথ রায়ের পত্নী রাণী ভবসুন্দরীর আদ্যশ্রাদ্ধ তাঁহার পৌত্রগণ মহা সমারোহে দীঘাপাতীয়া মোকামে সম্পন্ন করিয়াছেন। উত্তর বঙ্গের ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ব্যতীত নবদ্বীপ, পূর্ব্বস্থলী, ভাটপাড়া, চুচুঁড়া, কলিকাতা, খাগরা, নড়াল, ফরিদপুর, বিক্রমপুর প্রভৃতি স্থানের কতিপয় প্রসিদ্ধ গণ্যমান্য পণ্ডিত শ্রাদ্ধবাসরে উপস্থিত থাকিয়া দানাদি গ্রহণ করিয়াছেন। রাজবাটীর সম্মুখে এক প্রশস্ত মণ্ডপ হইয়াছিল,—তাহার একদিকে মূল্যবান্ দানসামগ্রী সমূহ সজ্জিত হইয়াছিল,—তিনদিকে ব্রাহ্মণ পণ্ডিত মণ্ডলী, অভ্যাগত রাজা, জমিদার এবং মধ্যবিত্ত শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ আসন পরিগ্রহ করিয়াছিলেন। শ্রাদ্ধবাসরে অপূর্ব্ব শোভা হইয়াছিল। রাজা প্রমদানাথ এবং তাঁহার কনিষ্ঠ সহোদরত্রয়ের ঐকান্তিক সৌজন্য, বিনয় ও সম্বর্দ্ধনায় আপামর সাধারণ সকলেই আপ্যায়িত হইয়াছেন। রাণী ভবসুন্দরী দয়াবতী, দানব্রতপরায়ণা রমণী ছিলেন,—কোর্ট অব্ ওয়ার্ডের আমলে তিনি যে অর্থ পাইতেন, তাঁহার দানশীলতার জন্য তাহাতে তাঁহার কুলাইত না। এজন্য রাজা প্রমদানাথের নাবালক কালে যে কয় বৎসর জমিদারী কোর্ট অব্ ওয়ার্ডের অধীন ছিল, সেই কয় বৎসরে রাণী ভবসুন্দরীর লক্ষাধিক টাকা ঋণ হইয়াছিল। রাজা প্রমদানাথ জমিদারীর ভারপ্রাপ্ত হইয়া পিতামহীর সেই ঋণ পরিশোধ করেন। রাজসাহী জেলার লোক তাঁহার দানশীলতার জন্য তাঁহার নাম কৃতজ্ঞতার সহিত স্মরণ করিবে। দক্ষিণ হস্তে তিনি দান করিতেন, বাম হস্ত তাহা জানিতে পারিত না; এজন্য তাঁহার নাম সংবাদপত্রের দুন্দুভিনাদে ঘোষিত হয় নাই। ৭০ বৎসর বয়সে তিনি পরলোক গমন করিয়াছেন,—এই সুদীর্ঘ জীবনের অধিকাংশকাল তিনি পতিপুত্রের অর্থের সদ্ব্যবহার করিয়াছেন। তাঁহার পৌত্রগণ ৫০ সহস্র মুদ্রা ব্যয় করিয়া তাঁহার শ্রাদ্ধক্রিয়া সম্পন্ন করিয়াছেন,—প্রায় ১ সহস্র ব্রাহ্মণকে উপাদেয় ভোজ্য এবং প্রচুর দক্ষিণা দ্বারা পরিতুষ্ট করিয়াছেন, এবং ৭ সহস্র গরীব দুঃখীকে নানাবিধ মিষ্টান্ন দ্বারা ভূরিভোজন করাইয়া ও প্রত্যেককে ॥০ আট আনা হইতে ১৲ এক টাকা পর্য্যন্ত দান করিয়াছেন। পরিতাপের বিষয়, প্রাতঃস্মরণীয়া রাণী ভবানীর দেশে রাণী ভবসুন্দরীর ন্যায় দানশীলা রমণীর সংখ্যা দিন দিনই লোপ পাইতেছে। আমরা দীঘাপাতিয়ার সম্পন্ন রাজপরিবারে রাণী ভবসুন্দরীর ন্যায় দানব্রতপরায়ণা রমণী আরও দেখিতে ইচ্ছা করি। তাঁহার সাধু দৃষ্টান্ত দীঘাপাতিয়ার রাজপরিবারের মহিলাদের মধ্যে বদ্ধমূল হউক। মহারাণী স্বর্ণময়ী গিয়াছেন,—রাণী ভবসুন্দরী গেলেন; তাঁহাদের বিষয়বিভব যা ছিল, তাই আছে,—বরং দিন দিন বাড়িতেছে; আমরা আশা করি, তাঁহাদের দানশীলতা তাঁহাদের উত্তরাধিকারীদের মধ্যে কখনও লুপ্ত হইবে না।

বিলাতে বিদুষী রমণী।—বিলাতে বিদুষী রমণীর সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। প্রায় তিন লক্ষ শিক্ষিতা রমণী শিক্ষয়িত্রী, তিন শত বায়ান্ন জন ডাক্তার ও দন্তচিকিৎসক, চৌষট্টি হাজার রোগীর পরিচারিকা, পাঁচ হাজার ধর্ম্মোপদেশিকা, ছয় হাজার ক্যাথলিক সন্ন্যাসিনী, ছাব্বিশ হাজার সরকারী কর্ম্মচারিণী, প্রায় দুই হাজার জন সাহিত্য ও বিজ্ঞান চর্চ্চাকারিণী—প্রভৃতির কার্য্য করিতেছেন। তিন হাজার আটশত একান্ন জন কলা-বিদ্যা-চর্চ্চায়,এতদ্ব্যতীত বহু সহস্র রমণী বাণিজ্যে কল কারখানায় শ্রমজীবীর কার্য্য করিতেছে। ডাক বিভাগে ও বহুরমণী কার্য্য করিয়া জীবিকা উপার্জ্জন করিতেছে। পাশ্চাত্যদেশের স্বাবলম্বন ভাব আমাদের দেশের অকর্ম্মণ্য পুরুষদিগের অনুকরণীয়। পরমুখাপেক্ষী হইয়া জীবন যাপন করা অপেক্ষা বিদ্যাশিক্ষা করিয়া স্বাবলম্বন শ্রেয়ঃ (এতদ্দেশে কত শত রমণী এক মুষ্টি অন্নের জন্য পরমুখাপেক্ষিণী হইয়া কত নিগ্রহ নীরবে সহ্য করিতেছে। তাহার সংখ্যা কে করে?

সৎকার্য্য।—মান্দ্রাজ প্রদেশে পালানকোটা নামক স্থানে ইংরাজ রমণীগণ কালা বোবাদের জন্য ৩ বৎসর হইল এক বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছেন। তাহাতে সিংহল, জব্বলপুর, কাণপুর, মহোবা, ভিজাগাপট্টম, কানারা, ও সিন্ধুদেশের অন্তর্গত সক্কর হইতে আগত কালা ও বোবা বালক বালিকা আশ্রয় পাইয়াছে। বর্ত্তমানে ৮০টী বালকবালিকা এই বিদ্যালয়ে ইংরেজী ভাষা ও নানাপ্রকার কার্য্যকরী শিল্প শিক্ষা করিতেছে।

আশার কথা।—কুমারী হেলেন কেলার জন্মান্ধ ও জন্মবধির। যখন তাহার বয়স ৭ বৎসর,তখন এক মহিলার উপর তাহার শিক্ষার ভার ন্যস্ত হয়। তখন কেলার স্নেহ ভালবাসা কি, তাহা বুঝিতে পারিত না। তাহার কোনও মানসিক শক্তির কিছুমাত্র বিকাশ হয় নাই। শিক্ষয়িত্রী ক্রমে ক্রমে বালিকার প্রাণে স্নেহ, ভালবাসা প্রভৃতি বিকাশ করিতে লাগিলেন,—ক্রমে তাঁহার মুখ দিয়া বাক্য নিঃসরণ হইল। অবশেষে সে লিখিতে পড়িতে লাগিল। এই বালিকা এখন বড় হইয়াছে, যৌবনে পদার্পণ করিয়াছে। অন্ধকার, নিস্তদ্ধতার মধ্যে যে নিমজ্জিত ছিল, সে এখন জ্ঞানের রাজ্যে প্রবেশ করিয়াছে। তিনি "আমার আত্ম-জীবন কাহিনী" নামে এক পুস্তক মুদ্রিত করিয়াছেন। তাহা যে পাঠ করিতেছে, সেই মুগ্ধ হইতেছে। এই গ্রন্থে তাঁহার আত্ম কাহিনীর সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার শিক্ষয়িত্রীর অতুল স্নেহ, যত্নের বিবরণ লিপিবদ্ধ হইয়াছে। গ্রন্থের ভাব ও ভাষা উভয়ই মনোহারী। এই রমণীর কাহিনী অন্ধ, বধিরদের প্রাণে নূতন আশার সঞ্চার করিবে।

পুণ্যশীলা নারী।—কুমারী সার্প অমৃতসর নগরে অন্ধদের জন্য এক বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছিলেন। এই বিদ্যালয়ের অন্ধদিগকে লেখা পড়া ও শিল্প কার্য্য শিক্ষা দেওয়া হইত ছাত্র সংখ্যা বৃদ্ধি হওয়াতে কুমারী সার্প বিদ্যালয়টী দেরাদূনের নিকটবর্ত্তী রাজপুরে উঠাইয়া লইয়া গিয়াছিলেন। অল্প দিন হইল ওলাউঠা রোগে এই জনহিতৈষিণী মহিলার মৃত্যু হইয়াছে।

সূর্য্যের জন্মতিথি। বিলাতের বড় জ্যোতিষী সার রবার্টবল্, গ্রহনক্ষত্র তারা সূর্য্য চন্দ্র আদি লইয়াই ব্যস্ত আছেন। সকলের জন্মপত্রিকা বা কোষ্ঠী তাঁহার নিকট আছে। সার রবার্ট বলই বলিতেছেন "এ বৎসর সূর্য্যের বয়স ঠিক শতকোটী বর্ষ অতিক্রম করিবে; তাঁহার বয়স এখন ১০০০০০০০০ বৎসর।
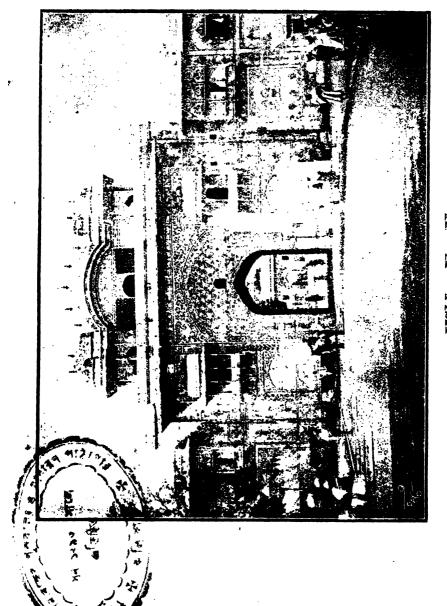
ANTAHPUR

AN ILLUSTRATED MONTHLY JOURNAL IN BENGALI

Edited and contributed to by the ladies only.

কেবল মহিলাগণ কর্ত্তৃক লিখিত ও সম্পাদিত।

তটিনী ব্যাকুলা সদা, বিলাতে জীবন তার,
জুড়াতে তাপিতে দিতে তৃষিতেরে জলধার;
হাসাতে ধরারে, দিয়ে ফুলফল শস্যচয়,
রমণী জীবন যেন এমনি মধুর হয়।

৬ষ্ঠ বর্ষ।	কার্ত্তিক, ১৩১০ বঙ্গাব্দ।	VOL. VI.
৭ম সংখ্যা।	NOVEMBER, 1903.	NO. VII.

কলম্বসের আমেরিকা আবিষ্কার।

বাল্যকালে আমরা ভূগোলে নূতন ভূখণ্ড আমেরিকার বিষয় সকলেই পাঠ করিয়াছি। কিন্তু কেমন করিয়া কোন্ মহাপুরুষের দ্বারা এই ভূখণ্ড আবিষ্কৃত হইয়াছে, আমরা তাহাই এখানে বিবৃত করিব। পূর্ব্বকালে ইউরোপের সহিত ভারতের ব্যবসায় বাণিজ্য চলিত। লোহিত সমুদ্র ও সুয়েজ যোজক অতিক্রম করিয়া বণিকগণ ভারতের পণ্যদ্রব্য ইউরোপের বিপণিসমূহে বিক্রয় করিয়া বিপুল অর্থ উপার্জ্জন করিত। এক সময়ে ভারতের উজ্জ্বল মণিমুক্তা ও সুশোভন ঢাকাই মসলিন অর্দ্ধ জগতের রাজধানী রোম নগরীর বিলাসিনী রমণীবর্গের আকাঙ্ক্ষার বস্তু ছিল। তৎকালে ইউরোপে এই জনশ্রুতি প্রচলিত ছিল যে, পৃথিবীতে ভারতের ন্যায় ঐশ্বর্য্যশালী দেশ আর নাই। তথায় পথে ঘাটে মণিমুক্তা ছড়াছড়ি যাইতেছে, বৃক্ষসমূহে পদ্মরাগ মণির পত্র ও হীরকের ফুল উৎপন্ন হইয়া থাকে; সেখানকার অধিবাসীগণ এক একজন সম্রাটের ন্যায় ধনাঢ্য। বলা বাহুল্য যে ভারতের অতুলনীয় ও মহার্ঘ্য পণ্যদ্রব্যই এই জনশ্রুতির মূল। এইরূপে চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে ভারতের সহিত ইউরোপের ব্যবসায় বাণিজ্য খুব বিস্তৃতি লাভ করিলে ভারতের সহিত ইউরোপ কিম্বা আফ্রিকার যে জাতি ব্যবসায় বাণিজ্যে লিপ্ত হইতে

লাগিল, সেই জাতিকেই বিপুল ধন উপার্জ্জন করিতে দেখিয়া, স্পেনের স্পানিয়ার্ড বণিক-গণ ভারতের সহিত ব্যবসায় বাণিজ্য করিবার জন্য অত্যন্ত লালায়িত হইয়া উঠিল। কিন্তু লোহিত সমুদ্র ও সুয়েজ যোজকের মধ্যদিয়া ভারতের সহিত ইউরোপের যে ব্যবসায় বাণিজ্য চলিত তাহাতে পথের বন্ধুরতা ও দস্যুর উৎপীড়ন ইত্যাদি কারণের জন্য সময়ে সময়ে অত্যন্ত অনিষ্ট সংসাধিত হইত। এই সকল কারণে লোহিত সমুদ্র ও সুয়েজ যোজকের পথ ব্যতীত অন্য একটি সহজ পথের সন্ধান পাইলে ভারতের সহিত ব্যবসায় বাণিজ্যের সুবিধা হইতে পারে ভাবিয়া সে পথ কোন্ স্থান দিয়া আবিষ্কৃত হইতে পারে,তৎকালে স্পানিয়ার্ড বণিকগণের তাহাই প্রধান চিন্তার বিষয় হইয়াছিল। অনেক গবেষণার পর তাহারা আফ্রিকার দক্ষিণদিক বেড়িয়া গেলে ভারতে যাইবার সুগম পথ আবিষ্কৃত হইতে পারে, এই স্থির করিল। কিন্তু রাজসাহায্য ব্যতীত তাহাদের সঙ্কল্প সিদ্ধ হইতে পারে না দেখিয়া,তাহারা স্পেনের তৎকালীন রাজা ফার্ডিনাণ্ডের নিকট তাহাদের সঙ্কল্পিত পথ আবিষ্কার কার্য্যে সাহায্য প্রার্থনা করিল। রাজা ফার্ডিনাণ্ড সেই সময়ে স্বরাজ্যের ধন বৃদ্ধির মানসে ভারতের সহিত ব্যবসায় বাণিজ্য করিবার জন্য সচেষ্ট হইয়াছিলেন। সুতরাং স্পানিয়ার্ড বণিক-গণ যখন ভারতে যাইবার সুগম পথ আবিষ্কার করিবার জন্যে তাঁহার সাহায্য প্রার্থনা করিল, তখন রাজা আনন্দের সহিত তাহাদের প্রস্তাব অনুমোদন করিলেন। এই অনুসারে ছয়খানি জাহাজ আটলাণ্টিক মহাসমুদ্র অতিবাহন পূর্ব্বক ভারতের পথ আবিষ্কারার্থ প্রেরিত হইল। কিন্তু ক্রমে যখন তাহারা আফ্রিকার দক্ষিণ উপকূল ভাগে উপস্থিত হইল, তখন ভীষণ বাত্যাতাড়িত হইয়া আর অগ্রসর হইতে পারিল না। চারিখানি জাহাজ অবিলম্বে সমুদ্রে ডুবিয়া বহুকষ্টে দুইখানি মাত্র কোন মতে পরিত্রাণ পাইয়া স্বদেশে ফিরিয়া আসিল। জাহাজের নাবিকগণ আফ্রিকার দক্ষিণ উপকূল ভাগের অন্তরীপের অতি অল্প অংশ মাত্র দর্শন করিয়াছিল। তাহারা ফিরিয়া গিয়া রাজার নিকট তাহাদের সমুদ্র যাত্রার বিষয় বর্ণনা করিলে, নৃপতি এতদিনে ভারত আবিষ্কৃত হইবার সু-আশা হইল এই বিশ্বাসে যে অন্তরীপ ভাগ নাবিক-গণ দর্শন করিয়াছিল, তাহার নাম উত্তমাশা অন্তরীপ রাখিলেন। এইরূপে ভারতের সুগম পথ আবিষ্কার লইয়া তৎকালে স্পেনে বিপুল আন্দোলন চলিতে লাগিল। এই সময়ে কলম্বস স্পেনে আগমন করিলেন। তিনি সে সময়কার একজন সুদক্ষ নাবিকের মধ্যে গণ্য ছিলেন। অনেকবার সমুদ্র গমন করিয়া ভৌগোলিক বিদ্যায় সবিশেষ দক্ষতা লাভ করিয়াছিলেন। ভারতের সুগম পথ আবিষ্কারের সম্বন্ধে অনেক গবেষণার পর, তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন যে, যদি ইউরোপের উত্তরদিক বেড়িয়া কিছুদিন আটলাণ্টিক মহাসমুদ্র অতিবাহন করা যায়, তবে নিশ্চয়ই একটি নূতন ভূখণ্ডে উপস্থিত হইতে পারা যাইবে। তাঁহার মতে সেই ভূখণ্ডই ভারতবর্ষ। তৎকালে ইউরোপিয়ানদের মধ্যে এই বিশ্বাস প্রচলিত ছিল যে, পৃথিবী তিন খণ্ডে বিভক্ত, আটলাণ্টিক মহাসমুদ্রের পরে আর কোনদেশ নাই। খৃষ্টান ধর্ম্মশাস্ত্র বাইবেলেও পৃথিবী তিনভাগে বিভক্ত, এইমত লিখিত রহিয়াছে। কলম্বস যখন আটলাণ্টিক সমুদ্রের পারে দেশ আছে

এই অভিমত প্রচার করিলেন, তখন ইউরোপে হুলস্থূল পড়িয়া গেল। তাঁহাকে পাগল, ধর্ম্মবিদ্বেষী মূর্খ বলিয়া সকলে বিদ্রূপ ও গালি প্রদান করিতে লাগিল। ধর্ম্মযাজকগণ বলিতে লাগিলেন যে, যদি আটলাণ্টিক সমুদ্রের পারে কোন দেশ থাকে, তবেত পৃথিবী চারিখণ্ডে বিভক্ত এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হয়। আমাদের ধর্ম্মশাস্ত্র বাইবেলে পৃথিবী তিন খণ্ডে বিভক্ত এইমত ব্যক্ত রহিয়াছে। যে ভণ্ড পৃথিবী চারিখণ্ডে বিভক্ত এই মত প্রচার করে, সে ধর্ম্মশাস্ত্র বিদ্বেষী বিধর্ম্মী। দেশের পণ্ডিতগণ বলিতে লাগিলেন যে আমরা চিরকাল ধরিয়া জানিয়া আসিতেছি পৃথিবী তিনখণ্ডে বিভক্ত, আজ একটা মূর্খের কথায় বিশ্বাস করিতে হইবে যে, পৃথিবী চারিখণ্ডে বিভক্ত। আটলাণ্টিকের পার আবার দেশ আছে। ভৌগোলিকগণ পৃথিবী যে তিনখণ্ডে বিভক্ত পৃথিবীর মানচিত্র খুলিয়া তাহাই প্রমাণ করিতে বসিলেন। এইরূপে কলম্বসের অভিমতকে সকলেই পাগলের পাগলামি মূর্খের প্রলাপ বলিয়া উড়াইয়া দিতে লাগিল। কিন্তু কলম্বস সহস্র প্রতিবাদ ও বিদ্রূপ সত্বেও নিজের মত প্রত্যাহার করিলেন না। তিনি বলিতে লাগিলেন যে, যদি তিনি কয়েক খানা পোত ও কয়েকজন সাহসী নাবিক পান, তাহা হইলে তিনি আটলাণ্টিকের পর পারে নূতন ভূখণ্ডের অস্তিত্ব জগতকে দেখাইতে পারেন। কিন্তু তিনি ইউরোপের যে যে ধনাঢ্য ব্যক্তি কিম্বা রাজার নিকট নূতন ভূখণ্ডের আবিষ্কারের জন্য সাহায্য প্রার্থনা করিলেন, তাঁহারাই তাঁহাকে উন্মাদ ভাবিয়া তাড়াইয়া দিতে লাগিলেন। সর্ব্বস্থানে নিরাশ হইয়া অবশেষে কলম্বস স্পেনে আগমন করিয়া, স্পেনের রাজার যদি সাহায্য পান তাহার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। এই সময়েই স্পেনে ভারতের নূতন পথ আবিষ্কার লইয়া তুমুল আন্দোলন চলিতেছিল। কিন্তু রাজা ফার্ডিনাণ্ড ও তাঁহার পারিষদ্‌বর্গ প্রথমে কলম্বসের প্রস্তাবকে মূর্খের প্রলাপ ভাবিয়া তাঁহাকে তাড়াইয়া দিলেন। তখন অন্য উপায়ান্তর না দেখিয়া কলম্বস তাহার সঙ্কল্পিত কার্য্যে স্পেনের রাজ্ঞী ইসাবেলার সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। রাণী ইসাবেলা বড় বুদ্ধিমতী ও রাজনীতি কুশলা রমণীছিলেন। কলম্বস রাণীকে তাঁহার অভিমত উত্তমরূপে বুঝাইয়া দিলে,তিনি কলম্বসকে উন্মাদ বলিয়া অগ্রাহ্য করিতে পারিলেন না। বরং আনন্দের সহিত রাজাকে সম্মত করাইয়া কলম্বসকে দীর্ঘকালীন সমুদ্র যাত্রোপযোগী সকল সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। তদনুসারে রাজাজ্ঞায় ছয় মাসের সমুদ্র যাত্রোপযোগী সকল দ্রব্য সহ কয়েকখানি পোত ও কয়েকজন সাহসী নাবিক সংগৃহীত হইলে কলম্বস পোতাধ্যক্ষের পদ গ্রহণ করিয়া নূতন ভূখণ্ডের আবিষ্কার উদ্দেশে সমুদ্র যাত্রা করিলেন। এতদিনে কলম্বসের বাসনাসিদ্ধ হইল। নাবিকগণ মহোল্লাসে ইউরোপের উত্তরদিক বেড়িয়া জাহাজ সকল চালনা করিতে লাগিল। চারিদিকে আটলাণ্টিক মহাসমুদ্রের অকূল জলরাশি। পরে জাহাজ সকল অবিরত পশ্চিমাভিমুখে ধাবিত হইতে লাগিল; এইরূপে দিন মাস সপ্তাহ চলিয়া যাইতে লাগিল; তথাপি নাবিকগণ অক্লান্ত পরিশ্রম ও ধৈর্য্য সহকারে তাহাদের কার্য্য করিতে লাগিল। জলরাশির পর জলরাশি, দূরে পশ্চাতে দিগন্তে কেবলি জলরাজ্য। উপরে অনন্ত নীলাকাশ নিম্নে তীরহীন বন্দর হীন অখণ্ড জলপ্রবাহ। এইরূপে সেই পঙ্কা-

হীন ভয়াবহ জলরাজ্যে তিন চারিমাস ব্যয়িত হইলে, কলম্বসের সমভিব্যাহারী নাবিকগণ এই অনির্দ্দিষ্ট দীর্ঘ সমুদ্র যাত্রার পরিশ্রমে ক্লান্ত হইয়া পড়িতে লাগিল। ক্রমে যখন ছয়মাস সমুদ্র যাত্রার পরও কলম্বসের সমভিব্যাহারী নাবিকগণ ভূমির কোন চিহ্ন দর্শন করিতে পাইল না, তখন তাহারা অত্যন্ত অস্থির হইয়া পড়িল এবং কলম্বসকে তাঁহার এই অনির্দ্দিষ্ট সমুদ্র যাত্রা পরিত্যাগ করিয়া, স্বদেশে ফিরিয়া যাইতে অনুরোধ করিতে লাগিল। কিন্তু কলম্বস তাহাদের অনুরোধে কোন কর্ণপাত করিলেন না। আরো কয়েকদিন অতিবাহিত হইলে যখন তাহারা দেখিল যে কলম্বস সত্য সত্যই তাহাদের জাহাজের গতি ফিরাইতে কোন আজ্ঞা দিতেছেন না,তখন তাহারা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল এবং কলম্বসকে হত্যা করিয়া স্বদেশে ফিরিয়া যাইবার জন্য মন্ত্রণা করিতে লাগিল। কলম্বস তাহাদের সঙ্কল্প বুঝিতে পারিয়া,তাহাদিগকে অনেক বুঝাইতে লাগিলেন, কিন্তু যখন তাহারা আর বেশী দূরে অগ্রসর হইতে একেবারে অসম্মত হইল তখন তিনি তাহাদেরে আর এক সপ্তাহ মাত্র অপেক্ষা করিতে বলিলেন। আর এক সপ্তাহের মধ্যে যদি ভূমির কোন উদ্দেশ না পাওয়া যায়, তবে তাহাদিগকে স্পেনে ফিরিয়া যাইতে অনুমতি দিবেন। এই প্রতিশ্রুত হইলেন। এইরূপে পুনরায় কলম্বসের অঙ্গীকৃত সপ্তাহের ষষ্ঠ দিবস চলিয়া যাইতে লাগিল, তথাপি ভূমির কোন চিহ্ন দৃষ্ট হইল না। সপ্তাহের ষষ্ঠ দিবসের নিশীথ কালে কলম্বস ও তাঁহার সহকারী একজন নাবিক, জাহাজের ডেকের উপর চিন্তিত মনে দণ্ডায়মান ছিলেন। কলম্বসের ললাটে নিরাশার মেঘ ঘনীভূত হইতেছিল! হায়! তাঁহার অনুমান কি শেষকালে মিথ্যায় পরিণত হইল। আজ সপ্তাহের ষষ্ঠ দিবস কই স্থলেরত কোনও চিহ্ন দেখা যাইতেছে না। তবে কি সবই বৃথা হইল। কলম্বস সম্মুখে দৃষ্টিপাত করিয়া গভীর চিন্তা করিতেছিলেন। সহসা দূরে সেই নিশীথ অন্ধকার ভেদ করিয়া সমুদ্রের উপর প্রদীপালোকের ন্যায় কি দৃষ্টিগোচর হইল। ওকি মনুষ্যহস্তস্থিত প্রদীপালোক? না অন্য কিছু? ঐ যে একবার জ্বলিয়া উঠিতেছে একবার নির্ব্বাপিত হইতেছে। কলম্বস চমকিত হইয়া বিস্ময় গদগদ স্বরে তাঁহার সহকারী নাবিককে সেই আলোকের দিকে দৃষ্টিপাত করিতে বলিলেন। একজন স্পানিয়ার্ড কবি কলম্বসের নূতন ভূখণ্ডের এই প্রথম চিহ্নদর্শন সম্বন্ধে একটি সুন্দর কবিতা লিখিয়াছেন এখানে তাহার কয়েক লাইনের অনুবাদ প্রদত্ত হইল।—

"দেখ বন্ধু, ওকি সত্য প্রদীপের আলো,
নহে শুধু কল্পনার ছলনার খেলা?
ওই দেখ ধীরে ধীরে যাইছে নিবিয়া
ওই দেখ কি উজ্জ্বল জ্বলিতেছে পুনঃ!"

কলম্বস ও তাঁহার সহকারী নাবিক সে রাত্রে যে আলোক দর্শন করিলেন, তাহা স্থলভাগের মানবহস্ত প্রজ্বলিত আলোক বলিয়া শেষকালে স্থিরীকৃত হইলে, কলম্বস সমস্ত নাবিকগণকে ডাকিয়া তাহা দেখাইলেন। এতদিনের পরিশ্রমের পর স্থলভাগের চিহ্নের দর্শন পাইয়া তাহারা মহা আশান্বিত হইল। সেইদিনের কয়েকদিন পূর্ব্ব হইতে স্থলনিবাসী পক্ষীগণকে জাহাজের উপর দিয়া উড়িয়া যাইতে ও মনুষ্যহস্তনিক্ষিপ্ত কাষ্ঠসমূহ সমুদ্রে ভাসমান হইতে দৃষ্ট হইতেছিল।

তাহার পর এই আলোক দর্শনে নিকটেই যে স্থলভাগ আছে, তাহাই নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হইল। তৎপর দিন প্রভাতকালে আমেরিকার ভূমিভাগ কলম্বস ও তাঁহার সমভিব্যাহারী নাবিকগণের দৃষ্টিগোচর হইল। এইরূপে ১৪৯২ খৃঃ ১২ই অক্টোবর প্রভাতকালে কলম্বস আমেরিকায় প্রথম পদার্পণ করিলেন। তিনি ও তাঁহার অনুচর নাবিকগণ স্থলে অবতরণ করিয়া ভূমি চুম্বন পূর্ব্বক অশ্রুপূর্ণ নয়নে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ প্রদান করিলেন। তাঁহারা যে দ্বীপের যে ভাগে অবতরণ করিয়াছিলেন, তাহা কয়েক ক্রোশ প্রশস্ত বহুবৃক্ষসমাকুল একটি মনোরম উদ্যানের ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছিল। কলম্বস ও তাঁহার অনুবর্ত্তী নাবিকগন সেই দ্বীপের উপকূল ভাগের সৌন্দর্য্য দর্শন ও নির্ম্মল বায়ু সেবন করিয়া অত্যন্ত প্রীতি লাভ করিলেন। যদিও সেই দ্বীপের চারিদিকের ভূমি অকর্ষিত অবস্থায় পতিত ছিল, তথাপি সেখানে দ্বীপবাসী মনুষ্য সমাগমের কোন অভাব ছিল না। অরণ্য হইতে দলে দলে উলঙ্গকায় আদিম অধিবাসীগ। সমুদ্রতীরে আগমন পূর্ব্বক বিস্মিত নেত্রে কলম্বসের সমভিব্যাহারী জলে ভাসমান পোতসমূহ দর্শন করিতে লাগিল। এবং হঠাৎ সমুদ্রজলে এই অদৃষ্টপূর্ব্ব পদার্থের সমাগম দেখিয়া তাহারা সেই সকল পোতসমূহকে সমুদ্র নিবাসী পক্ষযুক্ত বিশালকায় দানব মনে করিতে লাগিল। যখন বায়ু প্রভাবে বৃহৎ পক্ষের ন্যায় পালসমূহের সঞ্চালন প্রসারণ এবং জলোপরে তাহাদের অনায়াসসাধ্য গমনাগমন তাহারা প্রত্যক্ষ করিল, তখন তাহারা যে সমুদ্র নিবাসী কোন অদৃষ্টপূর্ব্ব প্রাণী, তাহাই তাহাদের হৃদয়ে দৃঢ়রূপে অঙ্কিত হইল। কিন্তু যখন সেই সকল অদৃষ্টপূর্ব্ব প্রাণী তীরে আগমন করিল এবং তাহাদের মধ্য হইতে উজ্জ্বল অস্ত্র শস্ত্রে সজ্জিত, একদল শ্বেতকায় অদ্ভুত মূর্ত্তি জীবকে ভূমিতে অবতরণ করিতে দর্শন করিল, তখন তাহাদের হৃদয়ে ভীষণ ভয়ের সঞ্চার হইল এবং উক্ত প্রাণীগণ তাহাদের প্রাণ সংহার করিতে আসিয়াছে, এই আশঙ্কায় দলে দলে তাহাদের সম্মুখ হইতে অরণ্যে পলায়ন করিতে লাগিল। এইরূপে বহুক্ষণ অতীত হইলে, পুনরায় যখন তাহারা দেখিল যে, নবাগত জীবগণ তাহাদের প্রতি কোনরূপ অত্যাচার করিবার প্রয়াস পাইতেছে না, তখন তাহারা কিঞ্চিৎ নির্ভয় হইল, এবং পুনরায় কৌতূহলাক্রান্ত চিত্তে, স্পানিয়ার্ডগণকে কোন স্বর্গীয় দেবতা ভাবিয়া দূর হইতে কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহাদিগকে প্রণাম করিতে করিতে নিকটে আগমন করিতে লাগিল। স্পানিয়ার্ডগণের উজ্জ্বল অস্ত্র শস্ত্র, সুন্দর পরিচ্ছদ ও গাত্রের মনোহারী শুভ্রবর্ণ তাহাদের বিপুল বিস্ময় উৎপাদন করিয়াছিল। নিকটে আসিয়া সেই আশ্চর্য্য জীবগণকে প্রশংসা ও বিস্ময়াকুল নেত্রে তাহারা দর্শন করিতে লাগিল। কেহ কেহ স্পানিয়ার্ডগণের দাড়ী ও হস্ত পদ স্পর্শ করিয়া পরীক্ষা করিতে ও তাহাদের গাত্রের শুভ্রবর্ণের প্রশংসা করিতে লাগিল। কলম্বস তাহাদের এইরূপ নম্রতা ও সরল ব্যবহারে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন। অসভ্যগণ কলম্বসের পোতসমূহকে আকাশ কিম্বা সমুদ্র বিহারী বিমান ও অস্ত্র শস্ত্রে সজ্জিত স্পানিয়ার্ডগণকে স্বর্গীয় দেবতা মনে করিতে লাগিল। আমেরিকার আদিম অধিবাসীগণ স্পানিয়ার্ডগণকে দেখিয়া যেমন বিস্মিত হইয়াছিল, স্পানিয়ার্ডগণও তেমনি সম্পূর্ণ নগ্নকায় অসভ্য আমেরিকানগণকে দেখিয়া অবাক্ হইয়াছিল।

তাহাদের ধরণ ধারণ ও হাবভাবে তাহারা যে ঘোর অসভ্য তাহাই প্রতীয়মান হইয়াছিল। তাহাদের সমস্ত শরীর একপ্রকার রঙ্গের দ্বারা রঞ্জিত ছিল। সমস্ত শরীর রঙ্গের দ্বারা রঞ্জিত থাকাতে তাহাদিগকে একপ্রকার অদ্ভুত বন্যজীবের ন্যায় দেখাইতেছিল। কিন্তু যদিও তাহাদের ধরণ ধারণ ও সাজ সজ্জা ঘোর অসভ্যজনোচিত ছিল, তথাপি তাহাদের মধ্যমাকৃতি দেহ, সুগঠিত মুখশ্রী সুন্দর চক্ষু ও তাম্রবর্ণে তাহাদিগকে সুসভ্যজাতিগণের ন্যায় সুশ্রী বলিয়া উপলব্ধি হইতেছিল। এবং সুসভ্য জাতিগণের ন্যায় তাহাদের প্রকৃতিও যে শান্ত ও মিত্র ভাবাপন্ন তাহা তাহাদের ব্যবহারে ব্যক্ত হইতেছিল। তাহারা মৎস্যের অস্থিদণ্ড কিম্বা চকমকি প্রস্তর নির্ম্মিত এক প্রকার বর্শা, হস্তে ধারণ করিয়াছিল। লৌহ কি পদার্থ তাহা তাহারা সে সময়ে অবগত ছিল না। স্পানিয়ার্ডগণ তাহাদের হস্তে লৌহের তরবারি প্রদান করিলে তাহারা তরবারির সম্মুখদেশ ধরিয়া তাহা দেখিতে লাগিল। সম্মুখ দিক ধরিলে যে কোন বিপদ ঘটিতে পারে,লৌহের বিষয় অবগত না থাকাতে তাহা তাহাদের অজ্ঞাত ছিল। কলম্বস তাহাদের মধ্যে বিচিত্রবর্ণের টুপি,কাচের মালা ও অন্যান্য সামান্য মূল্যের দ্রব্য সকল বিতরণ করিতে লাগিলেন। অসভ্যগণ আগ্রহের সহিত কলম্বসের প্রদত্ত সেই সকল দ্রব্য গ্রহণ করিতে লাগিল। এইরূপে স্পানিয়ার্ডগণ দীর্ঘ সমুদ্র যাত্রার পর দ্বীপের সুন্দর নিকুঞ্জের মধ্যে সমস্ত দিন অসভ্যদিগকে লইয়া যাপন করিয়া সন্ধ্যাকালে পুনরায় জাহাজে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। তৎপর দিন প্রভাতকালে দ্বীপের সমস্ত অসভ্যগণ স্বর্গের নূতন দেবতাগণের দর্শন লালসায় দলে দলে সাগরতীরে আগমন করিতে লাগিল। কেহ কেহ সাঁতার দিয়া কেহ কেহ বা ক্যানোস্ নামক এক প্রকার হাল্কা নৌকায় আরোহণ করিয়া জাহাজের নিকট আগমন করিতে লাগিল। তাহারা এই ক্যানোস্ নামক নৌকাগুলি একটা বৃক্ষের সমুদয় অংশদ্বারা নির্ম্মাণ করিত। চল্লিশ পঞ্চাশ জন লোক এই নৌকায় গমনাগমন করিতে পারিত। এক প্রকার ক্ষুদ্র দাঁড়ের দ্বারা এই নৌকাগুলি তাহারা খুব ক্ষিপ্রতা সহকারে চালাইতে লাগিল। অসভ্যগণ স্পানিয়ার্ডগণকে স্বর্গের মহান্ দেবতা ভাবিয়া তাহাদের নিকট কাচের মালা ও অন্যান্য সামান্য দ্রব্য অমূল্য স্বর্গীয় দান স্বরূপ প্রাপ্ত হইবার জন্য ব্যগ্র হইল। কলম্বসও অকাতরে তাহাদিগকে দান করিতে লাগিলেন। কেহ কেহ ক্ষুদ্রাকার কাচ খণ্ড সকলও স্বর্গীয় দেবতার অমূল্য দ্রব্য জ্ঞানে উঠাইয়া লইতে লাগিল। স্পানিয়ার্ডগণের সেই সকল দ্রব্যের পরিবর্ত্তে তাহারা তাহাদিগকে শুকপক্ষী তুলার বাণ্ডিল ও 'উকা' নামক এক প্রকার বৃক্ষের মূল দ্বারা প্রস্তুত পিষ্টক প্রদান করিল। অসভ্যগণের মধ্যে কাহারও কাহারও নাসিকায় সুবর্ণের অলঙ্কার দোদুল্যমান দেখিয়া দ্বীপে যে প্রচুর সুবর্ণ খনি বিদ্যমান আছে স্পানিয়ার্ডগণ তাহা বুঝিতে পারিল। অসভ্যগণ সামান্য কাচের মালার পরিবর্ত্তে সুবর্ণের অলঙ্কার স্পানিয়ার্ডগণের সহিত বিনিময় করিল। কলম্বস তাঁহার সমভিব্যাহারী স্পানিয়ার্ডগণকে অসভ্যগণের সহিত এইরূপ বিনিময়ে ব্যবসায় করিতে ব্যগ্র দেখিয়া, রাজাজ্ঞা ব্যতীত আর অধিকতর বিনিময় ব্যবসায় করিতে নিষেধ করিলেন। ইহার পর কলম্বস

সন্নিহিত আরো অনেক দ্বীপ ও স্থান আবিষ্কার করিবার জন্য কয়েকজন নাবিক সমভিব্যাহারে বোটে করিয়া উপকূল বেষ্টন করিয়া গমন করিতে লাগিলেন। যতই তাহাদের বোট অগ্রসর হইতে লাগিল, ততই তাঁহারা প্রত্যেক তীরভূমি অসভ্য পুরুষ ও রমণীগণে সমাচ্ছন্ন দেখিতে পাইলেন। কোথাও সমবেত অসভ্যপুরুষ ও রমণীগণ নতদেহে ও উর্দ্ধহস্তে তাহাদের নূতন দেবতাগণের অর্চ্চনা করিতে লাগিল। কোথাও কেহ কেহ তাহাদিগকে ফল ও জল পাত্র গ্রহণ করিবার জন্য আহ্বান করিল। কিন্তু কলম্বসের বোটকে অবিরত গমনশীল দেখিয়া তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ সাঁতার দিয়া কেহ কেহ বা ক্যানোস্ নামক নৌকায় আরোহণ পূর্ব্বক কলম্বসের বোটের নিকট গমন করিল। কলম্বস তাহাদেরে সাদরে গ্রহণ করিয়া কাচের মালা ও অন্য দ্রব্য উপহার প্রদান করিলেন। অসভ্যগণ সেই সকল সামান্য উপহার শ্বেতকায় স্বর্গীয় দেবগণের উপহার ভাবিয়া অতি ভক্তি ও আনন্দের সহিত গ্রহণ করিতে লাগিল। ইহার পর কলম্বস দ্বীপ বেষ্টন করিয়া একটি উপদ্বীপে উপস্থিত হইলেন। এই উপদ্বীপ দর্শন করিবার পর তিনি জাহাজে পুনরায় ফিরিয়া আসিলেন, এবং সেইদিন সন্ধ্যাকালে প্রচুর কাষ্ঠ ও জল সংগ্রহপূর্ব্বক আমেরিকার দক্ষিণদিকে অন্য সমৃদ্ধিসম্পন্ন দেশ আবিষ্কার উদ্দেশে যাত্রা করিলেন। ভারতের শেষসীমাস্থ একটী দ্বীপে উপস্থিত হইয়ছেন, এই বিশ্বাসে কলম্বস আমেরিকার অধিবাসী অসভ্যগণকে 'ইণ্ডিয়ান' এইনাম প্রদান করিয়াছিলেন। সেই অবধি আমেরিকার সমস্ত আদিম অধিবাসিগণ ইণ্ডিয়ান নামে অভিহিত হইয়া আসিতেছে। কলম্বসের পর আমেরিগো ভেস্পুচিনামে একজন পর্ত্তুগিজ, আমেরিকার অন্য অংশ সকল আবিষ্কার করেন। তাঁহার নামানুসারেই নূতন ভূখণ্ড 'আমেরিকা' নাম প্রাপ্ত হয়।

শ্রীলজ্জাবতী বসু।

মুঙ্গের।

বাল্যকাল হইতে মুঙ্গেরের নাম শুনিয়া আসিতেছি। নানাপ্রকারে মুঙ্গেরের সহিত চির পরিচিত। প্রথমে যখন বাঙ্গালার ইতিহাস পড়িলাম তখন মুঙ্গেরের নাম শুনিয়া ভাবিলাম না জানি উহা কিরূপ দেশ। বন্ধু বান্ধব আত্মীয় স্বজনকে প্রায়ই স্বাস্থ্য পরিবর্ত্তনের জন্য মুঙ্গের যাইতে দেখিয়াছি, এতদিনে তাহা স্বচক্ষে দেখিয়া কৌতুহল চরিতার্থ করিলাম।

ভাগলপুর হইতে ৪।৫ ষ্টেসন দূরে (Up) মুঙ্গের সহর। মুঙ্গের বাঙ্গালার শেষ মুসলমান রাজধানী। বাঙ্গালার শেষ নবাব মীরকাশেমের ইহা রাজধানী ও কেল্লা ছিল। প্রাতঃকালে ভাগলপুর ছাড়িয়া বেলা আন্দাজ দশটার সময় প্রসিদ্ধ জামালপুর সুড়ঙ্গ (Tunnel) পার হইলাম। টানেল কথাটা বোধ হয় অনেকেই জ্ঞাত নহেন। বড় বড় পাহাড় গোলা বারুদ দিয়া ফুটা করিয়া রেল যাতায়াতের রাস্তা করা হয়। এই সুড়ঙ্গকে টানেল বলে। জামালপুর টানেল বেশ বড়। এই সুড়ঙ্গের ভিতর দিয়া যখন গাড়ী

যাইতেছিল তখন অন্ধকারে পার্শ্বের দ্রব্যও দেখিতে পাই নাই। জামালপুরের চতুর্দ্দিকেই পাহাড়। এই জামালপুরে ই, আই, আর, রেলওয়ে কোম্পানীর এক প্রকাণ্ড কারখানা আছে। জামালপুর পৌঁছার পূর্ব্বেই মুঙ্গেরের প্রসিদ্ধ পীর পাহাড়ের প্রাসাদ দেখিতে পাইলাম। অতীতের ঘটনাবলী স্মৃতিপথে উদিত হইল। এই পীর পাহাড়ের প্রাসাদে কত সুখের কত দুঃখের ঘটনা হইয়া গিয়াছে। এখান হইতে কত ব্যক্তি পরকালে চলিয়া গিয়াছেন, কিন্তু পীর পাহাড় অতীত ও ভবিষ্যতের সাক্ষী হইয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছে। কত যুগযুগান্তর হইল দণ্ডায়মান রহিয়াছে, কতকাল পর্য্যন্ত থাকিবে কে বলিতে পারে? আজ প্রায় চল্লিশ বৎসরপূর্ব্বের কথা বলিতেছি এই পীর পাহাড়ের প্রাসাদে আমার মাতামহ ঠাকুর অকালে কালগ্রাসে পতিত হইয়াছেন। আমি মাতামহকে দেখি নাই, কিন্তু কি জানি কেন পীর পাহাড়কে দেখিয়া কত আপনার জন মনে হইতে লাগিল।

জামালপুরে গাড়ী পরিবর্ত্তন করিয়া মুঙ্গেরের গাড়ীতে উঠিলাম। মুঙ্গের জামালপুর হইতে ৪ মাইল দূরে। আন্দাজ ১৫ মিনিটে গাড়ী মুঙ্গের ষ্টেসনে আসিয়া লাগিল। ষ্টেসনটী একেবারে গঙ্গার ধারে; গাড়ী হইতে গঙ্গা ও গঙ্গাবক্ষে জাহাজ ও নৌকা দেখিতে লাগিলাম। অত্যন্ত আনন্দ হইতে লাগিল, গাড়ী হইতে নামিয়া মুঙ্গের সার্কিট হাউসে উপস্থিত হইলাম। সার্কিট হাউস্ কেল্লার মধ্যে। যখন প্রথম কেল্লার মধ্যে প্রবেশ করিলাম মনে অভূতপূর্ব্ব ভাবের উদয় হইল। আমি এক ক্ষুদ্র-প্রাণী দুইশত বৎসর পর ইহাকে দেখিতে আসিয়াছি। পূর্ব্বে এই কেল্লার না জানি কত সমৃদ্ধি কত সৌন্দর্য্য ছিল এখন তাহার কিছুই নাই বটে কিন্তু সেই পরিখা সেই রেমপার্টস্ সেই প্রহরীর উচ্চ মণ্ডপ সমস্তই রহিয়াছে। যে স্থানে একদা বীরপুরুষের হুঙ্কার, অস্ত্র শস্ত্রের ঝঞ্ঝনা, তোপের গর্জ্জন, সমরবাদ্য শুনা যাইত, সে স্থান আজ নির্জ্জন নিস্তব্ধ। কালের কি বিচিত্র গতি, ভাগ্য চক্রের কি অদ্ভুত ক্রিয়া। আজ যে বাদ্‌সা কাল সে ফকির আজ যে বীর্য্যশালী কাল সে রোগগ্রস্ত। আজ যেপুরীতে আনন্দ কোলাহল উত্থিত হইতেছে কাল সেখানে ক্রন্দনের রোল উঠিবে। আজ যেখানে সমৃদ্ধিশালী নগর কাল সে নগণ্য গ্রাম বিশেষ! বেলা প্রায় ১১টার সময় সার্কিট হাউসে আসিয়া পৌঁছিলাম, কেল্লার ভিতর সমুদায় সরকারী আফিস, কাছারী ও সাহেব এবং ধনী বাঙ্গালী বাবুদের বাড়ী। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বাড়ী তাহার চতুর্দ্দিকে সুন্দর বাগান বড় বড় মাঠ সবুজ রং এবং পরিষ্কার তৃণ দ্বারা আবৃত, তাহার মধ্যে পরিষ্কার রাস্তাগুলি দেখিতে বড়ই সুন্দর। গঙ্গাতীরটী অতি চমৎকার! আমাদের কলিকাতার গঙ্গাতীর দেখিয়া ইহার সৌন্দর্য্য অনুভব করা যায় না। কলিকাতার গঙ্গাতীরে কেহ সাধ করিয়া বেড়াইতে চায় না, কিন্তু এ গঙ্গাতীর ঠিক তার বিপরীত। একটী জাহাজ কিম্বা নৌকা এখানে নাই জাহাজ ও নৌকার জন্য ভিন্ন দিক রহিয়াছে তাহা কেল্লার বাহিরে। এমন চমৎকার দৃশ্য আর কখনও দেখি নাই। আমি তীরে দণ্ডায়মান, আমার পদদ্বয়ের ৫।৬ হাত নীচে ভীষণ গঙ্গা, পাথর বান্ধান তীরে আসিয়া আছড়াইয়া পড়িতেছে সে দৃশ্য না দেখিলে হৃদয়ঙ্গম হয় না। ঠিক্ গঙ্গার ধার দিয়াই রাস্তা। সাহেব মেমেরা

বড় বড় গাড়ী করিয়া ক্রমাগত ঘুরিয়া ঘুরিয়া হাওয়া খাইতেছেন। রাস্তাটী অতি পরিষ্কার। আমরা তীরে আসিয়া গাড়ী হইতে নামিয়া বেড়াইতে লাগিলাম। আমাদের সম্মুখে সূর্য্যাস্ত হইল। আস্তে আস্তে সুবর্ণ গোলক নদীগর্ভে বিলীন হইল। নিকটেই কষ্টহারিণীর ঘাট। ঘাটের দুইধারে যমরূপী পাণ্ডাদের বাসস্থান। কেন যে এই ঘাটটীর নাম কষ্টহারিণী হইল কিছুতেই জানিতে পারিলাম না। এই গঙ্গাতীরেই বাঙ্গালার শেষ নবাব মীরকাশেম এবং তাঁহার পুত্র ও কন্যাদ্বয়ের সমাধি রহিয়াছে। এই ভ্রাতা ও ভগ্নীর মৃত্যু সম্বন্ধীয় একটী আশ্চর্য্য প্রবাদ আছে। ভগিনীগণ বোধ হয় অনেকেই জ্ঞাত নহেন ভাবিয়া, গল্পটী লিখিলাম। অনেকেই ইহাকে গল্প না বলিয়া সত্য ঘটনা বলেন। সত্য হইলেও হইতে পারে কারণ ইহাতে এমন কিছু অলৌকিক ঘটনা নাই যাহাতে মিথ্যা বলিয়া ধারণা হইতে পারে। নবাবের মৃত্যু হইলে ক্লাইব তাঁহার মৃতদেহ গঙ্গাতীরে সমাধিস্থ করিলেন। মীর কাশেমের পুত্র ' বাহার ' ও কন্যা 'গুল' যমজ ছিলেন। বেগম যমজ সন্তান দুটীকে লইয়া পলাতক হইলেন। গীত বাদ্যে নবাবের অত্যন্ত অনুরাগ ছিল। তিনি পুত্রও কন্যাকে গীত বাদ্যে পারদর্শী করিয়াছিলেন। তাঁহারা দুইজনেই খুব ভাল সেতার বাজাইতে পারিতেন; পিতা রাজকার্য্য হইতে ফিরিলে ইহাঁরা সুমধুর সেতার ধ্বনিতে নবাবকে পুলকিত করিতেন। ইহা তাঁহাদের দৈনিক কর্ম্মের মধ্যে ছিল। নবাব মীরকাশেমের মৃত্যু হইলে, মুঙ্গের যখন ইংরাজের হইল তখন ইহাঁরা পলাতক, মুঙ্গের দুর্গ মুসলমান সাস্ত্রীর পরিবর্ত্তে ইংরাজ সাস্ত্রীদ্বারা রক্ষিত হইতে লাগিল। হঠাৎ একদিন রাত্রি দ্বিপ্রহরের সময় ইংরাজ সাস্ত্রী শুনিতে পাইল মীরকাশেমের সমাধি হইতে সুমধুর বাদ্যধ্বনি শুনা যাইতেছে। তাহারা অবাক্ হইল। ক্রমান্বয়ে তিন রাত্রিতে এইরূপ সুমধুর ধ্বনি শুনিয়া চতুর্থ দিন তাহারা ক্লাইবকে ইহা জ্ঞাপন করিল। ক্লাইব নিজে এই বাদ্যধ্বনি শুনিয়া বন্দুক হস্তে অসম সাহসে সমাধির দিকে অগ্রসর হইয়া দেখিলেন একটী ব্যাঘ্র সমাধির নিকটবর্ত্তী হইতেছে। তিনি দেখিবামাত্র ব্যাঘ্রকে লক্ষ্য করিয়া গুলি করিলেন; গুলি লাগিবামাত্র ব্যাঘ্র পড়িয়া গেল ও পঞ্চত্ব পাইল। ক্লাইব নিকটে গিয়া দেখিলেন একটী পরম রূপবান যুবা পুরুষ সেতার হস্তে ব্যাঘ্রচর্ম্মাবৃত হইয়া পতিত রহিয়াছে। ইনিই মীর কাশেমের পুত্র 'বাহার' ছদ্মবেশে রাত্রিতে পিতার সমাধির নিকট উপবিষ্ট হইয়া পিতাকে সেতার শুনাইতেন। মীরকাশেমের সমাধির পার্শ্বে ইহাঁকে সমাধিস্থ করা হইল। পরদিন রাত্রিতে ইংরাজ প্রহরীরা নিশ্চিন্ত মনে পাহারায় নিযুক্ত আছে। কি আশ্চর্য্য আবার সেই সুমধুর বাদ্যধ্বনি শ্রুত হইতে লাগিল। তাহারা অবাক হইয়া ক্লাইবকে সংবাদ দিল। ক্লাইব বাদ্যধ্বনি শুনিয়া অত্যন্ত কৌতুহলী হইলেন এবং সমাধির নিকটবর্ত্তী হইয়া দেখিলেন একটী পরম রূপবতী যুবতী সেতার হস্তে বাহারের সমাধির উপর মৃত্যুমুখে পতিত হইয়া রহিয়াছেন। ক্লাইব অতিশয় আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। অনুসন্ধানে ইহাঁকে নবাব মীরকাশেমের প্রিয়তমা কন্যা 'গুল' জানিতে পারিয়া ইহাঁকেও তাঁহা দের পার্শ্বে সমাধিস্থ করিলেন।

সন্ধ্যার পর অপূর্ব্ব ভাব লইয়া গঙ্গাতীর হইতে বাসায় ফিরিলাম। পৃথিবীর কত

স্থানেই যে সেই মহান্ পুরুষ কত ভাবে তাঁহাকে দেখা দিয়াছেন, তাহা ভাবিলে প্রাণ বিমোহিত হয়। পরদিন সীতাকুণ্ড ও পীরপাহাড় দেখিতে গেলাম। সীতাকুণ্ড-মুঙ্গের হইতে প্রায় ৫ মাইল দূরে হইবে। সীতাকুণ্ডের নিকটেই পীরপাহাড়। সীতাকুণ্ড একটী উষ্ণ প্রস্রবণ। প্রায় ১২।১৩ হাত সমচতুষ্কোণ একটা চৌবাচ্চা জলে পূর্ণ। জল এত গরম যে ধূম উঠিতেছে। নিকটে গেলে যেন একটী গরম হাওয়া মুখে লাগিল। চার জল যেরূপ গরম হয় ইহার জলও সেই প্রকার গরম। শুনিলাম ইহার জল লইয়া অনেকে সেইস্থানে চা প্রস্তুত করিয়া পান করিয়াছেন। সীতাকুণ্ডের চতুর্দ্দিকেই পাহাড়। ইহাতে বেশ বুঝিতে পারা যায় কালে এই পাহাড় আগ্নেয়গিরি রূপে পরিণত হইতে পারে। সীতাকুণ্ড হিন্দুদের এক মহা তীর্থ-স্থান। পৃথিবী ভেদ করিয়া গরম জল উঠিতেছে ইহা এক আশ্চর্য্য ব্যাপার। কেন, কিরূপে হইতেছে, তাহার তত্ত্বানুসন্ধান না করিয়া ইহার অদ্ভুত শক্তির মধ্যে ভগবানকে না দেখিয়া, ইহাকেই ভগবান্ বলিয়া পূজা করিতেছে। দেশ এখনও কি কুসংস্কারাপন্ন! আজ কয়েক বৎসর হইল সীতাকুণ্ডের অনতি-দূরেই ঠিক্ আর একটী উষ্ণপ্রস্রবণ বাহির হইয়াছে। ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট ইহাকে অনেক যত্ন করিয়া রক্ষা করিতেছেন। আর একটী আশ্চর্য্য এই দেখিলাম যে, কুণ্ডের পার্শ্বেই আরো দুই তিনটী কুণ্ড রহিয়াছে কিন্তু তাহার জল সাধারণ পুষ্করিণীর মত ঠাণ্ডা। সহরে ফিরিবার কালে পীরপাহাড় পড়ে। পাহাড়ের উপরে প্রসন্নকুমার ঠাকুরের একটী প্রকাণ্ড বাড়ী আছে। আমরা পাহাড় উঠিয়া বাড়ীতে প্রবেশ করিলাম। প্রাসাদের বারান্দা হইতে নীচের মাঠ, গঙ্গা ও সহরের যে কি সুন্দর ছবি দেখিলাম, তাহা প্রাণে অঙ্কিত হইয়া রহিয়াছে। মনে হইল কোন্ নিপুণ চিত্রকর তুলি দিয়া এমন মনোহর চিত্র আঁকিয়াছেন। সহরে ফিরিতে আমাদের সন্ধ্যা হইল। মুঙ্গেরে যে কয়দিন ছিলাম স্ফূর্ত্তি, ক্ষুধা, দুইই বৃদ্ধি পাইয়াছিল। যেদিন মুঙ্গের পশ্চাৎ করিলাম ভাবিলাম আবার কি তোমায় দেখিব?

শ্রীকুলদা দেবী

ভাগলপুর।

নলিনী।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

আবার পরীক্ষা।

আরও এক বৎসর অনন্তকালপ্রবাহে ভাসিয়া গিয়াছে। সুরজার জীবনের দিন সমভাবেই কর্ত্তিত হইতেছে। সুরজা এখন আরও গাম্ভীর্য্যময়ী হইয়া দাঁড়াইয়াছে। শরীরের উপর আরও কঠোর আচরণ করিতে আরম্ভ করিয়াছে, মস্তকের কেশগুলি কাটিয়া ফেলিয়াছে, গৈরিক বস্ত্র পরিধান করিয়াছে, দেখিলে তাহাকে আর চেনা যায় না।

একদিন সুরজা বালিকাদলপরিবেষ্টিতা হইয়া বিদ্যালয়ে বসিয়া আছে, ইতিমধ্যে সুবর্ণপুরের জমিদার (যিনি বিদ্যালয়ে মাসিক ১৫৲ টাকা সাহায্য করেন) মহাশয় তথায় উপস্থিত

হইলেন, তাঁহাকে দেখিয়া সুরজা ও বালিকাগণ সসম্ভ্রমে উঠিয়া দাঁড়াইল। এবং সুরজা ভক্তিভরে তাঁহার চরণে প্রণত হইলে বালিকাগণও তাঁহাকে প্রণাম করিল। জমিদার মহাশয়ের বয়স ৭০ বৎসর হইবে, তথাপি উৎসাহ, উদ্যমে তাঁহার অন্তঃকরণ পরিপূর্ণ, এবং তাঁহার বালকের ন্যায় সরল ব্যবহারে স্বগ্রামবাসী সকলেই তাঁহার প্রতি অনুরক্ত। জমিদার মহাশয় বালিকাদিগকে বসিতে অনুমতি করিলেন, তাহারা স্ব স্ব স্থানে উপবেশন করিলে, তিনি সুরজাকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিলেন, মা! তোমার সঙ্গে একটা বিশেষ কথা আছে স্থানান্তরে যাইতে হইবে। সুরজা বালিকাদিগকে পড়িতে বলিয়া বারাণ্ডায় আসিল, জমিদার মহাশয় একখানি চেয়ারে উপবেশন করিলেন, সুরজা তাহার কিছু দূরে মাটিতে বসিল। জমিদার মহাশয় একখানি কাগজ লইয়া পড়িলেন।

"আমি স্বজ্ঞানে এবং স্ব-ইচ্ছায় এই দান পত্র প্রস্তুত করিতেছি। আমার নগদ ১৫ হাজার টাকা ও প্রায় দশ হাজার টাকার অলঙ্কারাদি, আমার ভগিনীর বিধবা পুত্রবধূ শ্রীমতী সুরজা দাসীকে প্রদান করিলাম। আমার সন্তানাদি বা অন্য উত্তরাধিকারী না থাকাতে আমার স্বীয় সম্পত্তিতে তাহাকেই উত্তরাধিকারিণী মনোনীতা করিলাম,—তাহার সাধু চরিত্রে আমি মুগ্ধ হইয়াছি, আশা করি তাহার হস্তে এ অর্থের অপব্যবহার হইবে না। ইতি সন ১৩০৪ সাল ২৫শে কার্ত্তিক।"

স্বাক্ষর শ্রীমতী ভবতারিণী দাসী।

সাক্ষী।

শ্রীঅনাদিনাথ রায়, জমিদার।

শ্রীমধুসূদন তর্কালঙ্কার, পণ্ডিত।

শ্রীশ্যামকৃষ্ণ দে, উকীল।

জমিদার মহাশয় কাগজখানি পাঠ করিয়া বলিলেন, এখানা কি তাহা বুঝিয়াছ? সুরজা নতমুখে বলিল, বুঝিয়াছি একখানা উইল; যিনি আমাকে এত অর্থ দিলেন ইনি কে? ইনি কে তাহা বলিতেছি, বলিয়া জমিদার মহাশয় অর্থদাত্রীর ইতিহাস তাহার নিকট বলিলেন।

সুরজার মৃত স্বামীর একজন মাতৃস্বসা ছিলেন, তাঁহার স্বামী ব্রহ্মদেশে চাকুরী করিতেন বলিয়া তাঁহারা সেই দেশেই বাস করিতেন, তজ্জন্যই প্রকাশ ও তাহার পিতা মাতার মৃত্যু সংবাদ অনেক দিন পর্য্যন্ত তাঁহাদের অজ্ঞাত ছিল। স্বামীর মৃত্যু হইলে প্রকাশের মাতৃস্বসা যখন স্বদেশে প্রত্যাগমন করিলেন, তখন জানিতে পারিলেন তাঁহার একমাত্র ভগ্নী, স্বামী ও পুত্র সহিত পৃথিবী হইতে প্রস্থান করিয়াছেন। শোকে দুঃখে তাঁহার হৃদয় ভাঙ্গিয়া গেল, স্বাস্থ্যও শীঘ্র শীঘ্র নষ্ট হইল, বৎসরাধিককাল স্বদেশবাসের পরে তিনিও মানবলীলা সম্বরণ করিলেন। স্থাবর সম্পত্তি যাহা ছিল তাহা উত্তরাধিকার সূত্রে তাঁহার স্বামীর জ্ঞাতিরা অধিকার করিল। তাঁহার নিজের অলঙ্কার ও নগদ টাকা যাহা ছিল তাহা তাঁহার ভগিনী পুত্রকে দিবেন মনে করিয়াছিলেন, ভগ্নীপুত্রের অবর্ত্তমানে তাহার ধর্ম্মপরায়ণা সাধ্বী স্ত্রীকে প্রদান করিয়াছেন। সম্প্রতি তাঁহার পরলোক হইয়াছে। এই উইলখানি প্রথমে জেলায় প্রেরিত হইয়াছিল, তথা হইতে ম্যাজিষ্ট্রেটের আজ্ঞানুসারে সুবর্ণপুর আসিয়াছে। জমিদার মহাশয় সুবর্ণপুরের একজন বর্দ্ধিষ্ণু ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি এবং সুরজাও অন্য অভিভাবক হীনা, তজ্জন্য তাঁহার নিকটেই উইলখানা পৌঁছিয়াছে। সুরজা নীরবে কথাগুলি শ্রবণ করিয়া একটি দীর্ঘ নিশ্বাস

পরিত্যাগ করিয়া তাহার স্বভাবসিদ্ধ মৃদুস্বরে বলিল, যিনি আমাকে এত অর্থদান করিলেন, তাঁহাকে একবার দেখিতে পাইলাম না।

জমিদার। তিনি ইচ্ছা করিলেই তোমার সহিত দেখা করিতে পারিতেন, বোধ হয় কষ্ট হইবে বলিয়া দেখা করেন নাই, সেজন্য দুঃখ করিয়া আর লাভ কি মা?

সুরজা। না দুঃখ নহে, আমি ভাবিতেছি এত টাকা অলঙ্কার লইয়া আমি কি করিব?

বৃদ্ধ জমিদার মহাশয় ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন টাকা লইয়া লোকে কি করে? সুরজা পূর্ব্বের ন্যায়ই ধীরস্বরে বলিল, টাকাতে তো আমার বিশেষ কোনও প্রয়োজন নাই, আপনারা পাঁচ জনে অনুগ্রহপূর্ব্বক যাহা দান করিয়াছেন, তাহাতেই আমার ক্ষুদ্র ইচ্ছা বেশ পূর্ণ হইয়াছে, আর টাকা অলঙ্কারে কাজ কি? জমিদার বলিলেন, সে পরে দেখা যাবে, তোমার প্রয়োজন না থাকে আমিই এ টাকা লইব। কিন্তু এখন তোমাকে এই অর্থ গ্রহণ করিতে একবার নদীয়ায় যাইতে হইবে।

বলা বাহুল্য সুরজা তাঁহার এ প্রস্তাবে সম্মত হইল না। অবশেষে জমিদার মহাশয়কেই জেলায় যাইয়া উল্লিখিত টাকা ও অলঙ্কার আনিতে হইল। সুরজা এই সকল অর্থ লইয়া কি করিল তাহা পরে বিবৃত হইবে। এক্ষণে আমরা কিছু দিনের জন্য সুরজার নিকট বিদায় গ্রহণ করিলাম।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

গিরিজার দুঃখ।

যথা সময়ে সুরজার পত্র ভবেশের হস্তগত হইল। ভবেশের আর কিছু বুঝিতে বাকী থাকিল না। সমস্ত সংসারটা যেন তাঁহার নিকট ভাঙ্গা ভাঙ্গা উদ্দেশ্যহীন বলিয়া মনে হইতে লাগিল। কলিকাতা বাস আর তাঁহার নিকট ভাল লাগিল না, কাশীতে যাইবার জন্য গিরিজার নিকট বিদায় প্রার্থনা করিলেন। গিরিজা মুখখানি মলিন করিয়া বলিলেন, কেন? তুমি বলে ছিলে, সাত দিনের ছুটি, ইচ্ছা হইলে আরও দুই একদিন থাকিতে পার, তবে আজকেই যাইতে চাহিতেছ কেন? আমাদের কাছে থাকিতে বুঝি ভাল লাগিতেছে না? ভবেশের চিত্ত তখনও স্থির হয় নাই, হৃদয় তখনও উদ্বেগে পরিপূর্ণ, তিনি গম্ভীর স্বরে বলিলেন, না না সেকথা বলিবেন না, পৃথিবীতে আমার যদি কেহ যথার্থ আত্মীয় থাকেন তবে আপনারা, যদি আমার একটুও শান্তির স্থান থাকে তবে সে আপনাদের নিকটে!

গিরিজা। মুখে যাহা বল তাহাই কাজে কর, আরও দুই চারিদিন থাকিয়া যাও।

ভবেশ। ক্ষমা করিবেন, পরশ্ব আমাকে রওনা হইতেই হইবে, ছেলেটির পরীক্ষা নিকটে। যদি অনুমতি করেন গ্রীষ্মের ছুটিতে এদেশে আসিব।

গিরিজা। আমি বলিব তবে আসিবে, তা না হ'লে আসিবে না? তোমার পিতা কাশীবাসী হইয়াছেন বলিয়া তুমিও কি দেশের মায়া ত্যাগ করিয়া যাইবে?

ভবেশ। (গম্ভীরস্বরে) না, ত্যাগ আর কি?

গিরিজা। আচ্ছা ভবেশ বাবু! একটা কথা বলি রাখিবে তো?

ভবেশ। (ঈষৎ হাসিয়া) আপনি কথা

বলিবেন, তাহা রাখিব না কেন?

গিরিজা। এখন পড়া ছেড়ে চাকুরী করিতেছ, একটি বিয়ে ক'রে সংসারী হও।

ভবেশের মুখ গম্ভীর হইল, কিয়ৎক্ষণ নীরবে থাকিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন, না বিয়ে আর কর্‌বো না, বিয়ে করে কি হবে?

হাস্যময়ী গিরিজা হাসিয়া বলিলেন, বিয়ে করে আর কি হবে? আর সকলের যা হয় তোমারও তাই হবে! তোমার স্ত্রীতে যদি প্রয়োজন না থাকে, তোমার বৃদ্ধ পিতার সেবা শুশ্রূষা করিতে পারিবে তো?

ভবেশ। আমি কি তাঁহার সেবা করিতে পারিব না?

গিরিজা। তুমি তাঁহার সেবা করিবে বটে, তোমার সেবা কে করিবে?

"আমার!" ভগ্নস্বরে এই কথা বলিয়া ভবেশ উঠিয়া দাঁড়াইলেন, ইচ্ছা তথা হইতে প্রস্থান করেন। গিরিজা বলিলেন, উঠিলে কেন? আমার কথার উত্তর দিয়া যাও। ভবেশ বলিলেন ও বিষয় আমাকে ক্ষমা করুন। ভবেশের হৃদয় মধ্যে তখন তুমুল ঝটিকা বহিতেছিল। গিরিজা বলিলেন, ক্ষমা করিলে চলিবে না, পূর্ব্বেই তো বলিলাম কথা রাখিবে কি না? এখন তুমি বল, আমি একটি ভাল মেয়ে ঠিক্ করিয়া রাখিব, তুমি গরমের বন্ধে আসিয়া বিবাহ করিবে।

ভবেশ নীরব, গিরিজা আবার বলিলেন, বল চুপকরে রহিলে কেন? আমি সমস্ত এক প্রকার ঠিক্ করিয়াছি শুধু তোমার মত হইলেই হয়, তুমি, আচ্ছা বল। ভবেশ বিষম সমস্যায় পড়িলেন, কি উত্তর দিবেন কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না, মাঘের অপরাহ্ণেও তাঁহার শরীর দিয়া ঘর্ম্ম নির্গত হইতে লাগিল, তিনি মাটিতে বসিয়া পড়িলেন, বোধ হয় তখন তাঁহার কথা বলিবার সামর্থ্য ছিল না। গিরিজা বুঝিলেন, ভবেশ এখনও সুরজাকে ভুলেন নাই বা ভুলিবার চেষ্টাও করেন নাই, সুতরাং তাঁহার নিকটে বিবাহের প্রস্তাব করা নাকরা উভয়ই তুল্য। ভবেশের যাতনা-পীড়িত মুখের দিকে চাহিয়া গিরিজার বড় দুঃখ হইল, তাঁহাকে অন্যমনস্ক করিবার নিমিত্ত গিরিজা কোল হইতে খোকাকে নামাইয়া দিলেন, খোকা ছুটিয়া ভবেশের নিকটে যাইয়া 'দাদা!' বলিয়া তাঁহার গলদেশ বেষ্টন করিয়া ধরিয়া তাঁহাকে আদর করিতে আরম্ভ করিল। ভবেশ কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন, শেষে খোকাকে ক্রোড়ে লইয়া নীচে চলিয়া গেলেন।

ভবেশ প্রস্থান করিলে প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টা পরে নরেশবাবু কলেজ হইতে আসিলেন। জলযোগ শেষ হইলে নরেশবাবু একখানা চেয়ারে বসিলেন, গিরিজাও সম্মুখে টেবিলের উপর পানের ডিবাটি রাখিয়া তাহার নিকটে অপর চেয়ারে উপবেশন করিলেন। নরেশ বাবু বলিলেন ভবেশ সকাল বেলা বল্‌ছিল যে কাল্‌কেই সে যাবে, সে সম্বন্ধে তোমাকে কিছু বলে নাই?

গিরিজা। ভবেশ আজকেই যাবে বলে আমার কাছে বিদায় নিতে এসেছিলেন, আমি অনেক অনুরোধ করিয়াছিলাম, তাই পরশ্ব যাইতে স্বীকৃত হ'য়েছেন।

নরেশবাবু বলিলেন, বেশ! আমি দেখি আমাপেক্ষা তোমারি ক্ষমতা বেশী, আমি বলিলাম, তাহাতে সে বলিল তাহাকে কাল্‌-কেই যেতে হবে, আর তোমার কথাতেই দুদিন থাকিতে সম্মত হইল, তোমাকে দেখিয়া কি সকলেই মুগ্ধ হ'য়ে যায়? নরেশবাবু

উচ্চরবে হাসিয়া উঠিলেন। গিরিজা মৃদু হাস্যের সহিত বলিলেন, আমাকে দেখিয়া সকলে মুগ্ধ হউক বা না হউক কিন্তু আমার কথার মূল্য অবশ্যই বেশী, যদি তাহা না হইত তবে আমি বলিতেই বা যাব কেন? যাউক সে সব কথা, এখন ভবেশের মতিগতি ফিরাবার একটা উপায় কর্ত্তে হয় যে!

নরেশ। আমি আর কি করিব? ভবেশ তো মূর্খ বা নির্ব্বোধ নহে যে, আমি তাহাকে বুঝাইব! যৌবনের মোহ যতদিন থাকিবে, ততদিন তাহার মত ফিরানো সহজ নহে, আর বিশেষতঃ আমি ওবিষয়ে কোনও অনুরোধ করা প্রয়োজন মনে করি না, যখন সে বিবাহের আবশ্যকতা উপলব্ধি করিবে, তখন আর তোমার বা আমার অনুরোধ উপরোধের প্রয়োজন থাকিবে না। গিরিজার মুখ গম্ভীর হইল, বলিলেন, তুমি যা বলিলে, তাহার উপর আর আমি কি বলিব? তুমিই বা আমার কথা শুনিবে কেন? কেবল আমারি।—পরদুঃখকাতরা সরলপ্রাণা গিরিজার নেত্রকোণে দুই বিন্দু অশ্রু দেখা দিল, তিনি আর বলিতে পারিলেন না। নরেশ বাবু বলিলেন, তুমি দেখিতেছি নিতান্ত বালিকার ন্যায় আরম্ভ করিলে! আচ্ছা বল দেখি, ভবেশ বিবাহ করিতে চায় না তাহাকে বলপূর্ব্বক বিবাহ দিবার আমার ক্ষমতা কি? সেজন্য আমার প্রতি রাগইবা কর কেন?

গিরিজা দুই হস্তে চক্ষু মার্জ্জনান্তর ধীরে ধীরে বলিলেন,—

রাগের কথা নহে, কি জানি বুঝিতে পারি না, আমার যেন মনে হয়, ভবেশ যদি এরূপ উদাসীনের ন্যায় জীবন অতিবাহিত করেন, তাহা হইলে আমরাই ঈশ্বরের নিকটে অপরাধী হইব। তাহার হতাশাব্যথা যাতনাপূর্ণ মুখ দেখিলে মনে হয়, আমরাই তাহার কারণ! সেই জন্যই তোমাকে বার বার বলি, যাহাতে তাহাকে সংসারী করিতে পারা যায় এরূপ চেষ্টা করা তোমার নিতান্তই উচিত।

নরেশবাবু স্নেহ ও ভক্তি বিমিশ্রিত নয়নে কিয়ৎক্ষণ একদৃষ্টে স্ত্রীর মুখপানে চাহিয়া রহিলেন, পরে গম্ভীর স্বরে বলিলেন, গিরি! আমি যাহা করিয়াছিলাম, পরিণামে ভাল হইবে ভাবিয়াই করিয়াছিলাম, কিন্তু আমার ইচ্ছা পূর্ণ হইল না। তাহাতে ক্ষতি কি? মানুষের ইচ্ছা কবে পূর্ণ হয়? পরমেশ্বরের যাহা ইচ্ছা তাহাই পূর্ণ হইয়াছে। সুরজাকে সংসারী করিতে চাহিয়াছিলাম সে দেবী হইয়াছে, যে পরীক্ষাকে জীব মাত্রেই ভয়ানক বলিয়া জ্ঞান করে, সুরজা সে পরীক্ষায় অনায়াসে উত্তীর্ণা হইয়াছে ইহাপেক্ষা আহ্লাদের বিষয় আর কি? বর্ত্তমানে ভবেশ কিছু মানসিক যাতনা ভোগ করিতেছে বটে, কিন্তু তুমি দেখিও, ওকষ্ট চিরস্থায়ী নহে, ঈশ্বরের কৃপায় উহার মোহবিকার ঘুচিয়া গেলে উহাকেও সুখী দেখিবে। তুমি যে বার বার আমাকে ভবেশকে বিবাহ দিবার নিমিত্ত বলিতেছ, তুমি কি বুঝিতে পার না, ওরূপ অনুরোধ করা অন্যায়? অনুরোধ রক্ষা না হইলে আমার পক্ষে সেটা একটু অপমানের কারণ হয়।

গিরিজা আর কোনও কথা বলিলেন না। একটি দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

অনুশোচনা।

দিন তো আর যায় না। ভাবিয়াছিলাম এখানে আসিলে সুখী হইব, প্রাণে শান্তি

পাইব, কৈ কিছুইতো না, কেবলি যন্ত্রণা— অনন্ত অপরিসীম যন্ত্রণা, কি করিব ? পৃথিবীতে কি আমার জন্য বিন্দুমাত্রও শান্তি নাই ? জানি না জন্ম-জন্মান্তরে কত পাপ করিয়াছিলাম। পিত্রালয়ের একটি বাতায়ন পথে মুখ রাখিয়া নলিনী এই সকল চিন্তায় মগ্ন ছিলেন। স্বামীগৃহ হইতে আসিবার পর প্রায় বৎসরাধিককাল গত হইয়া গিয়াছে, এ পর্য্যন্ত জগদীশবাবু নলিনীকে লইবার প্রস্তাব করেন নাই। প্রতি মাসে নলিনীর খরচ বাবদ ২০০৲ টাকা পাঠাইয়া দেন, এতদ্ব্যতীত স্ত্রীর সহিত আর তাঁহার কোনও সম্বন্ধ নাই। জামাতার এই প্রকার ব্যবহারে নলিনীর পিতামাতা বিশেষ চিন্তাকুল হইলেন, এরূপ হইবার কারণ কি তাঁহারা তাহা বুঝিতে পারিলেন না। প্রথমে তাঁহারা জামাতার চরিত্রে সন্দিহান হইয়া, তাঁহার প্রতি ভয়ানক বিরক্ত হইলেন, এবং এরূপ পাত্রে কন্যার বিবাহ দিবার অপরাধে নলিনীর জননী সর্ব্বদাই স্বামীকে গঞ্জনা দিতে আরম্ভ করিলেন। নলিনীর পিতা কিছু দিন নীরবে স্ত্রীর কটু বাক্যাবলী সহ্য করিতে লাগিলেন, শেষে তাঁহার মনে হইল, যদি বাস্তবিকই জগদীশচন্দ্রের স্বভাব মন্দ হয়, তবে তিনি স্ত্রীকে সুখে রাখিবার জন্য এত চেষ্টিত হইবেন কেন ? তিনি ধনী লোক, তাঁহার কার্য্য ভাল বা মন্দ হউক কেহই প্রতিবাদ করিতে সাহস করিবে না, তবে তিনি স্ত্রীর পিত্রালয়ে দাসদাসী মাসহারা ইত্যাদির বন্দোবস্ত করিবেন কেন ? অনেক চিন্তার পর তিনি স্থির করিলেন, নলিনীই স্বামীর নিকট অপরাধিনী, তাই তিনি তাহাকে এরূপভাবে পরিত্যাগ করিয়াছেন। তখন হিন্দু পিতার কন্যার প্রতি বিরক্তি জন্মিল, স্ত্রীকেও এইরূপ বুঝাইলেন, নলিনীর মাতাও কন্যার প্রতি কিছু অসন্তুষ্ট হইলেন, কন্যার প্রতি পিতামাতার যত্নেরও কিছু অভাব হইতে লাগিল।

এদিকে নলিনী এক বৎসর পিত্রালয়ে বাস করিয়া, বিশেষতঃ পিতামাতার স্নেহের হ্রাস উপলব্ধি করিয়া, তাহার মনে বড় অনুতাপ হইতে লাগিল। পিত্রালয়ে বাস আর তাহার নিকট শান্তিপ্রদ মনে হয় না, প্রাণে যেন খালি খালি একটা ভাব সর্ব্বদাই রহিয়া যায়। নলিনী ক্ষিপ্তের ন্যায় হইয়া উঠিল, সমবয়স্কাদিগের হাসি আমোদও তাহার নিকট বিষতুল্য মনে হইতে লাগিল। নলিনী যখন এইরূপ অশান্তির সমুদ্রে হাবুডুবু খাইতেছিল, সেই সময় তাহার জননী একদিন তাহাকে বুঝাইয়া দিলেন, তাঁহাদের মনে বিশ্বাস জন্মিয়াছে যে, নলিনী স্বামীর নিকট বিশেষ দোষে দোষী। যে কন্যা স্বীয় অপরাধের জন্য স্বামীর অপ্রিয়া; নলিনীর পিতা সেরূপ কন্যার মুখ দেখিতে ইচ্ছুক নহেন; তবে যদি নলিনী স্বামীর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া স্বামীর প্রিয় হইতে পারে, তবে আবার পিতার প্রিয় হইবে। জননীর বাক্য শ্রবণ করিয়া নলিনী স্তম্ভিত হইয়া বসিয়া রহিল, মাতার কথায় কোনও উত্তর প্রদান করিতে তাহার শক্তি রহিল না। স্নেহময়ী মাতা স্বামীর আদেশে কন্যার প্রতি ঐরূপ নিষ্ঠুর বাক্য প্রয়োগ করিয়া বস্ত্রাঞ্চলে নয়ন মার্জ্জনা করিতে করিতে তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। নলিনীর চক্ষে প্রবল বেগে জলধারা বহিতে, লাগিল, কাঁদিয়া কাঁদিয়া দুই চক্ষু রক্তবর্ণ হইল। এইবার নলিনীর স্বামীর কথা মনে পড়িল, স্বামীর চরণ দর্শন করিবার জন্য অন্তর ব্যাকুল হইয়া উঠিল। নলিনী কাঁদিতে

কাঁদিতে নিম্নোক্ত পত্রখানি স্বামীকে লিখিল।

পরমপূজনীয়—

শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়

শ্রীচরণেষু

দেব!

আমি আপনার চরণে অনেক অপরাধে অপরাধিনী; আপনি আমার সমস্ত অপরাধ ক্ষমা করিয়া শ্রীচরণে স্থান না দিলে আমার আর পৃথিবীতে আশ্রয় নাই, যেমন আপনার স্নেহ দয়া উপেক্ষা করিয়া চলিয়া আসিয়াছিলাম, তাহাপেক্ষা শতগুণে কাতর হইয়া আজ আপনার কৃপা ভিক্ষা করিতেছি, যদি আমার অপরাধ ক্ষমার যোগ্য মনে হয়, শীঘ্রই আমাকে কাশীতে লইয়া যাইবার বন্দোবস্ত করিবেন। ইতি

সেবিকা

নলিনী।

পত্রখানি লিখিয়া দুই একবার পড়িল. জানি না কেমন অজ্ঞাতসারে নলিনীর বক্ষঃস্থল কেন স্পন্দিত হইয়া উঠিল, দেহ কণ্টকিত হইল, অর্দ্ধোচ্চারিত স্বরে নলিনী বলিল, আবার? আবার যাইতে হইবে! কিছুকাল চুপ করিয়া বসিয়া রহিল, শেষে অনেক চেষ্টার পর চিত্তকে দৃঢ় করিয়া লইল, ভাবিল যাব ক্ষতি কি? স্বামীর পদতল ভিন্ন নারীজাতির আর স্থান নাই, তাহা এত দিনে বুঝিলাম। যদি তাঁহার প্রিয় হইতে পারি, তবে পিতারও প্রিয় হইব। স্বামীগৃহে স্থান না পাইলে পিতৃগৃহেও আমার স্থান হইবে না! তাহা হইলে এই বুঝিতে হইবে তিনি বই আর কেহই নাই; মহাভারত রামায়ণ প্রভৃতি ধর্ম্মগ্রন্থেও বলে পতি বই স্ত্রীর গতি নাই, স্বামী যাহাই হউন, স্ত্রীকে প্রাণমন দিয়া তাঁহাকে ভালবাসিতে হইবে, আমি কি তাহা পারিব না? অবশ্যই পারিব। নলিনী ভৃত্যদ্বারা চিঠিখানি ডাকে পাঠাইয়া দিল, পুনরায় যথাস্থানে সেই নির্জ্জন গৃহমধ্যে যাইয়া বসিল. আবার সেই চিন্তা এই চিঠি কালকে পাইবেন, যদি লোক আসে পরশ্বই আসিবে, যদি ভবেশবাবু আসেন তাহা হইলে বেশ হয়! কত দিন তাঁহাকে দেখি না.—বাস্তবিক তেমন সুন্দর রূপ তেমন সুমিষ্ট স্বর আমার জীবনে আর কখনও শুনি নাই, জানি না পরমেশ্বর তাঁহাকে কি দিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন।

নলিনী ধীরে ধীরে বিছানায় যাইয়া শুইয়া পড়িল। দারুণ দুশ্চিন্তায় তাহার হৃদয় আকুল হইয়া উঠিল।

উপরোক্ত ঘটনার ৩।৪ দিন পরে ভবেশ ও বিনয় নলিনীকে লইয়া যাইবার জন্য বর্দ্ধমানে আসিলেন; ভবেশ আসিয়াছেন নলিনী শুনিতে পাইল, ভবেশের নাম তাহার কর্ণে প্রবেশ করিবামাত্র তাহার দেহ শিহরিয়া উঠিল, কর্ণ যেন কি গভীর শব্দ শুনিয়া বধির হইয়া গেল, কেন এমন হইল নলিনী নিজেই তাহা বুঝিতে পারিল না, মাথা ঝাঁ ঝাঁ করিতে লাগিল, ধীরে ধীরে মাথাটি হেলিয়া পড়িল, সকলে দেখিল নলিনী সংজ্ঞাহীনা। নলিনীর মাতা কাঁদিয়া আকুল হইলেন। অনেক সেবা যত্নের পর নলিনীর চৈতন্যোদয় হইল, নলিনী চক্ষু উন্মিলিত করিয়া কাতর-নয়নে জননীর দিকে চাহিল, মাতাও অশ্রুপূর্ণ নেত্রে কন্যার ললাটে হস্তার্পণ করিয়া বলিলেন, মা ননি! অমন করছিলে কেন? এখন কেমন আছ? নলিনী ক্ষীণ স্বরে বলিল, ভালই আছি, বিনয় এসেছে নাকি? বিনয় নিকটেই ছিল, বলিল, হাঁ খুড়ি মা, আমি এসেছি, তুমি
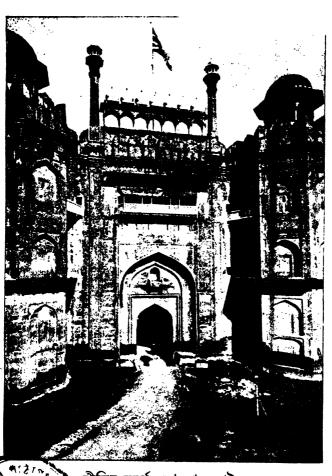
দীল্লির দুর্গের লাহোর গেট।

সচিত্র মাসিক পত্রিকা।

ANTAHPUR

AN ILLUSTRATED MONTHLY JOURNAL IN BENGALI

Edited and contributed to by the ladies only.

কেবল মহিলাগণ কর্তৃক লিখিত ও সম্পাদিত।

হৃদয়ে অসীম বল রয়েছে গোপনে,
দুর্ব্বলা বঙ্গের বালা বলে সর্ব্বজনে।
কর্ত্তব্য সাধনে সাধু কাজের সময়,
প্রাণের সে শক্তি যেন লুকানো না রয়।

৬ষ্ঠ বর্ষ।	অগ্রহায়ণ, ১৩১০ বঙ্গাব্দ।	VOL. VI.
৮ম সংখ্যা।	DECEMBER, 1903.	NO. VIII.

রঙ্গিন সাড়ী।

বড়দিনের ছুটীর সময় বাড়ী আসিয়া দেখি স্ত্রী অত্যন্ত অসুস্থা। ইহার দুইমাস পূর্ব্বে তাহার একটি সন্তান প্রসূত হয়। সন্তানটি সূতিকা গৃহেই গতায়ু হয়। সেই শোকে ও কষ্টে আমার স্ত্রী পীড়িতা হন। উত্তম উত্তম চিকিৎসক দ্বারা চিকিৎসা চলিতেছে, কিন্তু নির্দ্দোষরূপে ব্যারাম ভাল হইতেছে না। গৃহে আসিয়া দেখি, তাহার মুখ পাণ্ডুবর্ণ, শীর্ণ, শরীর নিতান্ত কাহিল। উজ্জ্বল গৌরবর্ণ কালিমায় আচ্ছন্ন। তাহার বিষাদ-কালিমা চেহারা দেখিয়া প্রাণে অত্যন্ত ব্যথা পাইলাম। আমি তিনমাস পূর্ব্বে তাহাকে যে অবস্থায় দেখিয়াছিলাম, তাহার তুলনায় এখনকার অবস্থা অনেক প্রভেদ। অকস্মাৎ ব্যারাম ও মন পীড়াতে এতখানি হইয়াছে ভাবিয়া সাদরে তাহার হাত দুখানি নিজ হাতে লইয়া বলিলাম, হেম তোমার শরীর কি হইয়াছে? তোমাকে যে আর চেনা যায় না? হেমের বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না, আমার স্কন্ধে মস্তক রাখিয়া নীরবে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। তাহার উষ্ণ অশ্রু আমার কঠিন বক্ষঃ ও বাহু ভেদ করিয়া চলিল। কিছুক্ষণ নীরবে থাকিয়া আর সহ্য করিতে পারিলাম না, তাহাকে বুকে টানিয়া লইয়া বলিলাম, হেম বুঝিয়াছি কি জন্য তোমার শরীর শোধরাইতেছে না। সে

শিশু আমাদের ছিল না, যাঁহার সন্তান তিনি লইয়াছেন, একটি ক্ষুদ্র শিশুর জন্য তোমার অমূল্য জীবন নষ্ট করিবে? জগতে প্রেমের তুল্য কিছুই নাই, সেই প্রেম, সেই অবিনশ্বর পবিত্র প্রেম আমি তোমায় দান করিয়াছি, তুমি কি আমার জন্য এ দুঃখ ভুলিতে পারিবে না? ছি, কাঁদিও না। আগ্রায় যাইবে? আজই তিন মাসের ছুটীর জন্য দরখাস্ত করিব, তোমায় লইয়া সেখানে যাইব, সেখানে গেলেই তোমার অসুখ নিশ্চয়ই ভাল হইবে। বায়ু পরিবর্ত্তনের কথা শুনিয়া হেম কিছু প্রফুল্ল হইলেন। মস্তক তুলিয়া বলিলেন, ডাক্তার যাইতে পরামর্শ দিবেন কি? আমি বলিলাম, এখনই যাইয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া আসিব, তিনি যাহা বলেন তাহাই করিব। এই বলিয়া আমি চাদর লইয়া জগৎবাবুর বাড়ী চলিলাম। যাইবার সময় দেখি, স্নেহময়ী জননী আমার জন্য মিষ্টান্ন লইয়া উপরে আসিতেছেন। আমাকে দেখিয়া বলিলেন, কোথা যাও বাবা? খাবার খেয়ে যাও।

আমি এখনি আসিতেছি বলিয়া জগৎ বাবুর বাড়ী চলিলাম। তাঁহার বাড়ী যাইয়া দেখি তিনি বাড়ী নাই, তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র পন্টু একখানি কলের গাড়ী লইয়া খেলা করিতেছে। সম্মুখে ভৃত্য বসিয়া রহিয়াছে। পন্টুকে জিজ্ঞাসা করিলাম, তোমার বাবা কোথায় পন্টু? পন্টু কিছুক্ষণ ঢোক গিলিয়া গিলিয়া বলিল, বাবা, বাবা, বাবা ওই গল্ গল্ গেশ্বে, অর্থাৎ গাড়ীতে করিয়া গিয়াছেন। শিশুর নানা ভঙ্গি সহকারে আধ আধ কথা শুনিয়া আমি হাসিয়া ফেলিলাম। বাবু এখনি আসিবেন বলিয়া ভৃত্য আমাকে বসিবার জন্য একখানি চেয়ার দিল। আমি চেয়ার টানিয়া বসিলাম। শিশুর মধুর আধ আধ স্নেহস্বর তখন আমার কর্ণে সুধাবর্ষণ করিতেছিল। শিশুর সুধাজড়িত বাক্য, শিশুর মনমুগ্ধকর অঙ্গভঙ্গী আমার হৃদয় তন্ত্রীতে কি এক মোহন ঝঙ্কার দিতেছিল। এই শিশু, এই স্বর্গীয় উদ্যানের কোমল কুসুমকোরক, ইহারই নিকট মানব হৃদয় পরাজিত, সহস্র বন্ধনে দৃঢ় বিজড়িত! ইহারাই পিতা মাতার সর্ব্বস্ব হরণ করিয়া এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডকে মুগ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। হঠাৎ হেমের শিশুর কথা মনে জাগ্রত হইল, চক্ষে শিশুকে দেখি নাই, তবু মনটা কেমন উদাস হইয়া গেল। বুঝিলাম, হেমের অবস্থা কেন এমন হইয়াছে, ক্ষুদ্র শিশুর প্রতি এত টান কেন! হায়! অপার মাতৃস্নেহ। এক নিমেষের মধ্যে পৃথিবীর কোন্ মায়ারাজ্যে যেন পরিভ্রমণ করিতে লাগিলাম। সে কি স্নিগ্ধ, মধুর-শান্ত-শীতল-ছায়াময় রাজ্য! অকস্মাৎ কাহার পদশব্দে আমার মোহ ভঙ্গ হইল। চাহিয়া দেখি ডাক্তার বাবু উপস্থিত। আমাকে দেখিয়া জগৎবাবু করমর্দ্দন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, কি হে নলিন কবে এলে?

আমি বলিলাম। 'এই সকালকার গাড়ীতে।

তা, ভালত?

হাঁ একরকম ভাল, তবে স্ত্রীর অসুখের জন্য মন কিছু খারাপ আছে।'

জগৎবাবু। তোমার স্ত্রীর শরীর বড় কাহিল হইয়াছে বটে আজকাল যে ঔষধ দেওয়া যাইতেছে, তাহাতে বোধ হয় কিছু উপকার দেখা যায়, কেমন?

আমি। হাঁ, কিছু উপকার হইয়া থাকিবে। আমি আপনার নিকট একটী বিষয়ের পরামর্শ লইতে আসিয়াছি। আমি মনে করি-

তেছি, আমার স্ত্রী এখন বায়ু পরিবর্ত্তন করিলে বোধ হয় শীঘ্র সারিয়া উঠিবেন। আপনি ইহাতে কি বলেন?

জগৎবাবু কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া বলিলেন, সে পরামর্শ টা মন্দ নয়। তোমার স্ত্রীর যে সন্তানটী হইয়াছিল, তাহা প্রায় দুইমাস হ'ল না?

হাঁ প্রায় দুইমাস হইয়াছে বৈ কি?

এক অজীর্ণ এবং শারীরিক দৌর্ব্বল্য ভিন্ন অন্য কোন উপদ্রব অবশ্য নাই?

না তাহা বোধ হয় নাই।

তবে স্বচ্ছন্দে লইয়া যাইতে পার, তবে সেকেণ্ড ক্লাস গাড়ী রিজার্ভ করিয়া লইতে হইবে নতুবা পশ্চিমের গাড়ীর ভিড় দুর্ব্বল শরীরে সহ্য করিতে পারিবেন না। কোথায় যাইতে মনস্থ করিয়াছ?

আগ্রায়।

তবে রিজার্ভে অনেক খরচ পড়িবে।

খরচের জন্য চিন্তা নাই, আমার স্ত্রী যাহাতে সুস্থ থাকেন তাহা আমাকে করিতেই হইবে।

তবে তাই ভাল, তা'হলে তোমাকে ত ছুটী লইতে হইবে।

তিন মাসের ছুটীর জন্য আজই দরখাস্ত করিব বলিয়া তাহার নিকট হইতে বিদায় হইলাম। আসিবার সময় তাঁহার ক্ষুদ্র শিশুর গোলাপি গণ্ডে চুম্বন করিতে ভুলিলাম না। শিশুর পবিত্র স্পর্শে আমার সর্ব্বশরীর রোমাঞ্চিত হইল

বাড়ী আসিলাম। দেখি তখনও জননী খাদ্যদ্রব্য লইয়া উপবিষ্টা! মাতার প্রদত্ত খাবার খাইয়া দরখাস্ত লিখিতে বসিলাম। দরখাস্ত লিখিয়া ডাকযোগে প্রেরণ করিলাম। উপযুক্ত সময়ে ছুটী মঞ্জুর হইয়া আসার প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম। আমার আসার পর এই কয়দিনে স্ত্রীর মানসিক ও শারীরিক কিছু পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিলাম। মুখে বিষাদের পরিবর্ত্তে হাসি প্রস্ফুটিত হইল আয়ত চক্ষুর কোণে যে কালিমা রেখা ছিল, তাহা দিন দিন দূরীভূত হইতে লাগিল। একটু প্রফুল্ল হইয়া উঠিলেন। নির্জীব দেহ একটু সজীব হইল। তবে পূর্ব্বেকার মত চলাফেরা করিতে পারিতেন না। দুজনে দ্বিতলের একটী সঙ্কীর্ণ বারাণ্ডায় দুখানি আরাম চৌকিতে বসিয়া জীবনের নানা ঘটনার কথা লইয়া আলোচনা করিতেছি। আমার স্ত্রী কিছু সাহিত্য প্রিয় ছিলেন। তিনি মাঝে মাঝে কোন কোন মাসিক পত্রিকায় দু একটী প্রবন্ধ দিতেন সেই সব কথা লইয়া ও আলোচনা হইতেছে। সন্ধ্যার শীতল বায়ু আমাদের ললাট স্পর্শ করিতে লাগিল, শৈত্য অনুভব হওয়ায় ঘরে আসিয়া বসিলাম। ঘরে আসিয়া দেখি চাকর একখানি ডাকের চিঠি হস্তে অপেক্ষা করিতেছে, চিঠিখানি আমার এক বন্ধু লিখিয়াছিলেন। তিনি বেঙ্গল গবর্ণমেণ্টের আফিসে চাকুরী করেন ছুটী শীঘ্র যাহাতে মঞ্জুর হয়, তজ্জন্য তাঁহাকে অনুরোধ করিয়াছিলাম, তদনুসারে তিনি আমার ছুটী প্রাপ্তির সংবাদ শীঘ্র জ্ঞাপন করিলেন। স্ত্রী ছুটীর কথা শুনিয়া অত্যন্ত পুলকিত হইলেন। মাতাকে সবিশেষ বলিলাম, তিনি শুনিয়া হর্ষ প্রকাশ করিলেন। আমি মাকে বলিলাম, মা তোমারও যাইতে হইবে। মথুরা ও বৃন্দাবন দর্শন করিয়া আসিবে। মাতা একটি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন, "বাছা আমার অদৃষ্টে কি তাহাই হইবে? এ সংসার ছাড়িয়া যে এক পা নড়ি, এমন সাধ্য আমার নাই,

তোমরা যে বেড়ীপায়ে পরাইয়াছ, এ বড় কঠিন বেড়ী। ইহা ফেলিয়া কোথায় যাইব? আশীর্ব্বাদ করি মা আমার ভাল হইয়া আসুন, তাঁহার শরীর সুস্থ ও মন প্রফুল্ল দেখিলেই আমার সুখ। বাছার আমার এই বয়সেই ঘুণ ধরিল, ইহা ভাবিতে আমার বুক ফাটিয়া যায়, মা কালী করুন, মায়ের আমার পুত্রকোলে দেখিয়া যেন মরিতে পারি। এই বলিয়া তিনি চক্ষু মুছিলেন এবং আমার স্ত্রীকে বুকে টানিয়া লইলেন। জন. নীর অকৃত্রিম স্নেহে হেম বশীভূত, শ্বশ্রূ ও বধূতে মাতৃকন্যা ভাব।

আবশ্যকীয় জিনিস পত্র গুছাইয়া লই-লাম মাতার পদধূলি গ্রহণ করিয়া পঞ্জাব মেলে যাত্রা করিলাম। আমরা ভিন্ন গাড়ীতে একটি চাকর ও পাচক ব্রাহ্মণ সঙ্গে লইয়াছিলাম। তাহারা আমাদের গাড়ীর সংলগ্ন একটী ক্ষুদ্র কামরাতে রহিল। শুক্লপক্ষ রজনী, জ্যোৎস্নালোকে জগৎ প্লাবিত, দূরে দূরে বৃক্ষরাজী, বিস্তৃত মাঠ কোথায় ক্ষুদ্র পল্লী, পল্লীর বাড়ী ঘর জ্যোৎস্না তরঙ্গে স্নাত হইয়া অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য বিকীর্ণ করিতেছিল। আমার স্ত্রী জানালা খুলিয়া বসিলেন। প্রকৃতির চারুশোভা দেখিতে দেখিতে এক নব আনন্দ দিতেছিল। মেলগাড়ী দ্রুতগতিতে চলিতেছে, হু হু করিয়া বাতাস গাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিতেছে। হেমকে জানালা বন্ধ করিয়া দিতে বলিলাম, শীতল বাতাস লাগিয়া অসুখ বৃদ্ধি হইতে পারে। তিনি জানালা বন্ধ করিয়া আমার নিকট আসিয়া বসিলেন, তোমার শীত বোধ হইতেছে? তবে এই কম্বলটা গায়ে দিয়া বস. এই বলিয়া তিনি উঠিলেন। চূর্ণকুন্তল তাঁহার মুখের উপর আসিয়া পড়িয়াছে গ্যাসালোকে উজ্জ্বল গৌরবর্ণ আরও উজ্জ্বল দেখাইতেছে। মুখকান্তি যেন মলিন মৃণালের ন্যায় বোধ হইতেছে। তাঁহার পরিধানে রঙ্গিন সাড়ী। আজকাল এই পেঁয়াজি এবং জাম ইত্যাদি রংয়ের সাড়ীর খুব প্রচলন। আমার স্ত্রীর পরিধানেও এই পেঁয়াজি রংয়ের একখানি সাড়ী। তিনি রঙ্গিন সাড়ীর অত্যন্ত প্রিয় ছিলেন। রঙ্গিন সাড়ী আমার নিকট তেমন প্রিয় নয়, তবে স্ত্রীর আগ্রহাতিশয্যে তাহাকে নিরস্ত করা আমার দুঃসাধ্য হইল। তাই রঙ্গিন সাড়ীতে এবং সেই রঙ্গের জ্যাকেটে তাহার মুখশ্রীতে অপূর্ব্ব শোভা ফুটিয়া উঠিয়াছিল। আমি অনিমেষ নয়নে তাহার মুখপ্রতি চাহিয়া রহিলাম, এবং রঙ্গিন সাড়ীর বিরোধী আমি তাহার রূপে মুগ্ধ হইয়া রঙ্গিন সাড়ীর প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। ইহার মধ্যে তিনি আমার গায়ে কম্বলটা টানিয়া দিলেন। আমরা মহাসুখে সে রাত্রি যাপন করিলাম।

উপযুক্ত সময়ে আগ্রায় পৌঁছিলাম। একটি দ্বিতল বাড়ী ভাড়া লইলাম। সুতরাং আমাদের সুখসেব্য যাহা কিছু সকলই মিলিল। স্ত্রী আমার নিকট তাজের সবিশেষ বিবরণ শুনিয়াছিলেন। দুচার দিনের বিশ্রামের পর আমারা তাজ দেখিতে গেলাম! তাজের সেই অমল ধবল অপরূপ রূপ দর্শনে আমার স্ত্রী মোহিত হইলেন। প্রত্যহ সেখানে যাইতে স্থির করিলেন, সুতরাং প্রত্যহ সেখানে যাইতাম। সেই সৌধচূড়াবলম্বিত তাজ অটল অচলভাবে দণ্ডায়মান। হেম অনিমেষ লোচনে সেই মর্ম্মরশোভিত তাজের কারুকার্য্য সকল নিরীক্ষণ করিতেন। জ্যোৎস্নালোকে তাজের অপূর্ব্ব শ্রীদর্শনে মনে কত আনন্দ অনুভব করিতাম। কোন

স্বর্গরাজ্যে আসিয়া উপনীত হইয়াছি বলিয়া বোধ হইত। প্রাণে হর্ষ বিষাদের ছায়া অনুভূতিতে সঙ্গীত ধ্বনি প্রাণের মাঝে আপনা হইতে ঝঙ্কার দিয়া উঠিত। সুখ দুঃখের অবসাদে মানবের প্রাণে সঙ্গীতধ্বনি বড় স্বাভাবিক। দুঃখের সময়ে প্রাণ খুলিয়া দুঃখ গাঁথার কয়েক চরণ গাহিয়া যেমন দুঃখ ভার লাঘব করা যায়, সঙ্গীতই যেন সুখ দুঃখের একমাত্র সঙ্গী, সুখের সময়ও তেমন প্রাণ খুলিয়া সঙ্গীতে আপনার প্রাণের গভীর আনন্দ গভীরতর রূপে অনুভব করা যায়। অজয় বাসনা অনন্ত কামনা লইয়া মানবের মন উৎকণ্ঠিত। আজ তাজের নিকট আসিয়া সুখ দুঃখের মিশ্রণে প্রাণে এক নবভাবের সঞ্চার হইল। এবং প্রাণ হইতে আপনার হর্ষ বিষাদ সেই বিশ্বপিতার চরণে উপহার দিবার জন্য সঙ্গীতধ্বনি উত্থিত হইল। এই প্রকার সেই বিস্তীর্ণ মর্ম্মরচত্বরে বসিয়া প্রত্যহ ব্রহ্মসঙ্গীত করিতাম। সঙ্গীতের সুর তাজে প্রতিধ্বনিত হইয়া দিগ্‌দিগন্তে মিশিয়া যাইত। আমি সেতারে সিদ্ধহস্ত ছিলাম। স্ত্রীর অনুরোধে প্রত্যহ সেতার সঙ্গে লইতাম। তিনি সেতার শুনিতে বড় ভাল বাসিতেন। এই কয়দিনে তাঁহার শরীর একটু সবল হইয়া আসিল। নূতন উৎসাহে, নূতন জীবনে প্রাণে এক নবউদ্যম আসিয়া ঘিরিল। সেই উৎসাহের বলে তিনি স্বীয় দুর্ব্বলতাকে তুচ্ছ করিয়া অতিশয় প্রফুল্লতার সহিত আগ্রায় বেড়াইতে লাগিলেন। আমাদের বাসার সন্নিকটে একটি উকিল সপরিবারে বাস করিতেন। তাঁহার স্ত্রীর সহিত আমার স্ত্রীর খুব ঘনিষ্ঠতা হইল। উভয়ে একসঙ্গে কোন কোন দিন আগ্রার কেল্লা প্রভৃতি স্থান দেখিতে যাইতেন। আমাদের দিনগুলি বেশ স্ফূর্ত্তির সহিত অতিবাহিত হইতে লাগিল কোন কোন দিন সন্ধ্যার সময় যমুনার কূর্ম্মকুলের নির্ভীক ভাব দেখিবার জন্য কিছু ছোলাভাজা লইয়া যমুনার সোপানোপরি যাইয়া বসিতাম। মানুষের সাড়া পাইয়া কূর্ম্মকুল আপনার বিস্তীর্ণ কঠিন দেহ ভাসাইয়া আমাদের সম্মুখীন হইত। আমরা সেই সময় তাহাদেরে খাদ্যদ্রব্য দিতাম। তাহারা নিঃসঙ্কোচে আমাদের নিকট আসিত। এইরূপ নানা আমোদে আমার ছুটির দীর্ঘ দুইটী মাস অতীত হইল। এতদিনে আমার স্ত্রীর শরীর প্রায় পূর্ব্ববৎ হইয়া আসিল। মুখে অপূর্ব্ব শ্রী ফুটিয়া উঠিল সেই সুকুমার দুর্ব্বল দেহে পুনরায় লাবণ্য বিকশিত হইল। শীর্ণ কপোল যুগল সুগোল হইয়া আসিল। তাহার সৌন্দর্য্য যাহা ছিল তাহা হইতে আরও যেন দ্বিগুণ সৌন্দর্য্য বাড়িল। তাঁহার স্বাস্থ্যের সহসা এত পরিবর্ত্তনে আমার প্রাণে গভীর আনন্দ বোধ হইতে বাগিল। তাঁহার পূর্ব্বের স্ফূর্ত্তি ফিরিয়া আসিল। সময়ে সময়ে উভয়ে হাস্য পরিহাস করিয়া অনেক আমোদ করিতাম। কখন কখন আমার স্ত্রী একটু বিমনা হইয়া পড়িতেন। বুঝিতাম কিসের জন্য, কিছু বলিতে সাহস করিতাম না। একদিন সন্ধ্যার পূর্ব্বে কোন বন্ধুর সহিত বেড়াইতে গেলাম, সেদিন হেমের শরীর অসুস্থ ছিল। তিনি বাহির হইলেন না। আমার গৃহে ফিরিতে সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গেল। আসিয়া দেখি তিনি উপাধানে মুখ লুকাইয়া নীরবে শয়ন করিয়া আছেন। অসুখ করিয়াছে মনে করিয়া তাঁহার সন্নিকট হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, অসুখ বাড়িয়াছে হেম্? কোন উত্তর পাইলাম না। আমার কাঁপিয়া উঠিল

মুখ নত করিয়া দেখিলাম, অশ্রুজলে উপাধান সিক্ত হইয়াছে। আমি অত্যন্ত অস্থির হইয়া পড়িলাম,তাঁহার সদ্য-শিশির-স্নাত প্রস্ফুট গোলাপের ন্যায় মুখখানির নিকট প্রদীপের আলোক ধরিয়া বলিলাম, ছি কি করিতেছ হেম? এস বসিবার ঘরে যাই, তাই বলিয়া উভয়ে সেই ঘরে গেলাম। নানা গল্পে তাঁহাকে অন্যমনস্ক করিলাম। নানাবিধ সাহিত্যালোচনা করাতে তাঁহার মন কিছু সুস্থির হইল, শোক কিছু প্রশমিত হইল। মনে করিলাম আজিও হেম সেই শিশুর কথা ভুলিতে পারেন নাই। শিশু বুঝি মাতার জীবনে এইরূপ জ্বলন্ত স্মৃতি রাখিয়া দিয়া যায়। যে সন্তান জীবিত থাকে, সে মাতার সমস্ত স্নেহটুকু শুষিয়া লইয়া মাতার হৃদয়ে বিস্তীর্ণ রাজ্য পাতিয়া বসে। যে চলিয়া যায়,সে তাহার মাতার হৃদয়ে কঠিন দাগ বসাইয়া যায়। যে জ্বলন্ত অগ্নি নিক্ষেপ করিয়া যায়, তাহা সেই সন্তান-স্নেহ-কাতর স্নেহময়ী জননী ভিন্ন কে বুঝিতে সক্ষম? সে ক্ষুদ্র শিশু, দুদিনের পৃথিবীর আলোক পাইয়াছিল, দুদিনেই তাহার জীবলীলা অবসান হইল। সে যে কেন আসিল বা চলিয়া গেল,তাহার সে কি বুঝিল? তবে তাহার জন্য জননীর এত উষ্ণ নিশ্বাস এত মর্ম্মব্যথা কেন? হায়! কঠিন হৃদয়, আত্মসুখ প্রয়াসী ক্ষুদ্র নর, আমি কি বুঝিব? সেই শিশুর ক্ষুদ্র মুখখানিতে কি অপরিমিত স্বর্গীয় সুধা সঞ্চিত ছিল? সে শিশুর পবিত্র দেহলতা বুকে লইয়া মাতার প্রতি লোমকূপে, মাতার প্রতি শিরায় শিরায় কি বৈদ্যুতিক তরঙ্গ বহিয়া যাইত, তাহার কি বুঝিব?

আগ্রায় থাকিয়া দিনগুলি বড় সুখে যাইতে লাগিল। ছুটী প্রায় ফুরাইয়া আসিল। আগ্রা ত্যাগ করিতে ইচ্ছা হইতেছিল না। প্রত্যহ অপরাহ্ণে তাজের পার্শ্বে ভ্রমণ করিয়া তাজের বিচিত্র শোভা সন্দর্শন করিয়া উভয়ে যে অতুল আনন্দ উপভোগ করিতাম, সে সুখ আজীবন ভোগ করিবার বাসনা প্রবল হইতেছিল। কোন দিন সেকেন্দ্রা, কোন দিন দুর্গ, কোন দিন বা ফতেপুর সিক্‌রি ইত্যাদি স্থান দেখিয়া বেড়াইতাম। দিন রাত দুটী স্বাধীন বিহঙ্গের ন্যায় মুক্ত বাতাসে প্রাণ খুলিয়া দুটী প্রাণী মনের সুখে ঘুরিয়া বেড়াইতাম। জীবন আশা শূন্য ছিল না। কত আশা লইয়া, কত কল্পনার ছবি মনে অঙ্কিত করিয়া সুখে দিন অতিবাহিত করিতেছি।

এক দিন বৈকালে সেতার লইয়া বসিয়াছি। তন্ময় হইয়া সেতার বাজাইতেছি। হেম পার্শ্বে বসিয়াছিলেন, কতক্ষণ সেতার বাজাইতেছি কাহার ও হুঁস নাই। হঠাৎ হেম উঠিয়া বলিলেন 'বেশ' কতক্ষণ বাজাইবে? পরশ্ব দিন আগ্রাত্যাগ করিতে হইবে, চল একটু বেড়াইয়া আসি। অন্ধকার রাত্রি সন্ধ্যা হইয়া আসিল, শীঘ্র উঠ। আমি তখন ইমন ভুপালির রাগিণীতে বিভোর তাহার কথা শুনিয়াও শুনিলাম না। তিনি উঠিয়া গেলেন বেশ পরিবর্ত্তন করিয়া আসিয়া বলিলেন এখনও বাজাইতেছ? কখন যাইবে? এই বলিয়া আমার হাত হইতে সেতার উঠাইয়া লইলেন। ইমন ভুপালি আমার কাণে বড় মধুর লাগিতেছিল, নিতান্ত অনিচ্ছা স্বত্বে তাহার অনুগমন করিলাম।

পরশ্ব দিন আগ্রাত্যাগ করিব ঠিক করিয়াছি। হেম শ্বেতপ্রস্তরের জিনিস যথেষ্ট কিনিয়াছেন, তবু তাঁহার সাধ মিটে নাই। তাজে যাইবার পথে গাড়ী দাঁড় করাইয়া আর ও কতকগুলি কিনিলেন। রঙ্গিন পাথর বসান ঝিণুকের কাজ করা নানাবিধ থালা

রেকাবিতে গাড়ীর একটী বেঞ্চ পূর্ণ হইয়া গেল। কেনাকাটীতে আরও কিছুক্ষণ সময় গেল। আমার সেতার বন্ধ করার প্রতি. শোধ লইবার জন্য কৃত্রিম ক্রোধ সহকারে বলিলাম, সন্ধ্যা হইয়া আসিল, তবু তুমি এখানে দেরী করিতেছ, অন্ধকারে যাইয়া কি হইবে? তিনি বুঝিলেন, এটি তাঁহার কথার প্রতিশোধ। এই প্রকার কথার প্রতি-শোধ অনেক হইয়া থাকে। তিনি হাসিয়া বলিলেন, আমার কেনা হইয়াছে; গাড়ী যাইতে বল। আমরা তাজে আসিলাম। দেখি-লাম তোরণ দ্বারে আর একখানি গাড়ী দণ্ডায়মান। আমরা ভিতরে প্রবেশ করিলাম চতুর্দ্দিকের নয়নরঞ্জন দৃশ্যগুলি প্রাণ ভরিয়া দেখিয়া লইলাম। এধার ওধার ঘুরিয়া যমুনার পার্শ্বস্থিত বিস্তৃত মর্ম্মর চত্বরে যাইয়া বসিলাম। প্রাণ খুলিয়া তাজের নিকট বিদায় সঙ্গীত গাহিতে লাগিলাম। হেম কিছুক্ষণ পর বলিলেন, যাঁহারা আগ্রায় চিরকাল বাস করেন, তাঁহাদের প্রাণকত শান্তিপূর্ণ। আমরা এই দুদিন আসিয়াছি তাই বোধ হইতেছে যেন তাজ আমাদের কত পরিচিত কত স্নেহের জিনিস। তাপদগ্ধ হৃদয় এখানে আসিয়া কত শান্তিলাভ করে। আমি তাঁহার কথায় বাধা দিয়া ইসারা করিয়া দূরে একজন ভদ্রলোক সস্ত্রীক ভ্রমণ করিতেছেন দেখাইলাম। তাঁহারা চতুষ্পার্শ্বে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। ক্রমে তাঁহারা আমাদের সম্মুখ দিয়া চলিয়া গেলেন। আমরা কিছুক্ষণ পরে একটী মিনারে উঠিয়া আগ্রা সহরের বৈচিত্র্যময় সৌন্দর্য্য শেষ নিরীক্ষণ করিয়া লইলাম। আমরা তখন কত উর্দ্ধে পুণ্যতোয়া যমুনা নিম্নে, একটী সূত্রের মত লক্ষ্য হইতেছে। দূরে দূরে বনানী শ্রেণীর সূক্ষ্ম রেখা, যমুনা তটস্থিত ক্ষুদ্র বৃহৎ শস্য-ক্ষেত্র গুলি যেন এক একখানি চিত্র, আমাদের সম্মুখে কে ধরিয়া রাখিয়াছে। এই অপরূপ দৃশ্য দেখিয়াই মুগ্ধ চিত্তে কবি গাহিয়াছেন,—

'নির্ম্মল সলিলে বহিছ সদা
তট শালিনি সুন্দর যমুনে ও'

চতুর্দ্দিকের এই দৃশ্যাবলী দর্শনে অতীতের কত লুপ্ত স্মৃতি মনে জাগরুক হইল। তিনশত বৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে, মুসলমান রাজত্বের সেই গৌরব অচিরে বিলুপ্ত হইয়া গেলেও ভারতবাসীর তাহা অস্থি মজ্জাগত। ক্রমে সন্ধ্যা আসিয়া আপনার তিমিরবসন দ্বারা পৃথিবীর বিশাল দেহ আবৃত করিলেন। ক্রমে উজ্জ্বল সান্ধ্য তারা আকাশের গায় দেখা দিল দেখিতে দেখিতে কে যেন আকাশে কতকগুলি হীরক খণ্ড ছড়াইয়া দিয়া গেল। সান্ধ্য সমীর ধীরে ধীরে আসিয়া ললাট চুম্বন করিতেছে, তাহার স্পর্শানুভূ-তিতে, প্রাণ দিব্য আরাম পাইল। চারিদিক নিস্তব্ধ, মনটা কেমন উদাস বোধ হইতে লাগিল। সান্ধ্য পবনও যেন উদাসভাবে আমাদিগকে স্পর্শ করিতেছিল। বোধ হইতে লাগিল তাজের চতুস্পার্শ্বে কাহার যেন মর্ম্ম-ভেদী উষ্ণ নিশ্বাস সান্ধ্য সমীরে মিশিয়া যাইতেছিল। কত কথা স্মৃতিদ্বারে আসিয়া আঘাত করিতে লাগিল। ধীর পাদ বিক্ষেপে তোরণদ্বারের নিকট অগ্রসর হইলাম। হেম মালিকে কিছু পয়সা দিয়া কতকগুলি ফুল লইলেন। চাহিয়া দেখিলাম, অন্য যে ভদ্রলোকটী তাজে আসিয়াছিলেন, তিনিও তাঁহার স্ত্রীর সহিত তোরণদ্বারে আসিয়া দাঁড়া-ইলেন। তাঁহার স্ত্রী পূর্ব্বেই গাড়ীতে যাইয়া বসিলেন, কিছু পরে আমার স্ত্রীও গেলেন। আমি তোরণদ্বারে দাঁড়াইয়া, ইত্যবসরে ভদ্র-

লোকটির সহিত দুচারিটি কথাবার্ত্তা কহিয়া উভয়ে উভয়ের নিকট পরিচিত হইলাম। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন এম্ এ উপাধি-ধারী। সম্প্রতি বিএল পাশ করিয়া মজঃফরপুরে ওকালতি করিতেছেন। আগ্রা আগমন তাঁহাদের এই প্রথম। মাতার নিকট সন্তান দুইটী রাখিয়া আসিয়াছেন, ইত্যাদি ইত্যাদি অনেক কথা হইল। ভদ্রলোকটিকে কথাবার্ত্তায় অতি সরল ও অমায়িক বোধ হইল। কিছুক্ষণ কথাবার্ত্তার পর উভয়ে উভয়কে অভিবাদন পূর্ব্বক গাড়ীতে যাইয়া বসিলাম। স্ত্রী নিস্তব্ধে বসিয়া আছেন, উভয়ে নীরবেই চলিলাম। মনে অতীতের কত স্মৃতি আসিয়া অধিকার করিল। তাজ, আগ্রা, মমতাজ বিবি, সাহাজান বাদশা ইত্যাদি কত কথাই মনে ওলটপালট করিতে লাগিল। মন সেই চিন্তায়ই ভরপুর আছে। কখন দুইশত বৎসরের পশ্চাতে আমার মনের গতি ফিরিয়া গিয়াছে। যেন অতীতের সেই রাজ্যে আমি পরিভ্রমণ করিতেছি। সেই মায়ারাজ্যে পড়িয়া আমি আত্মহারা শ্লথমনা হইয়া পড়িয়াছি। হঠাৎ গাড়ীর পশ্চাতে চীৎকার শুনিয়া আমার মোহ ভাঙ্গিয়া গেল। পশ্চাতে 'গাড়ী রোখো' 'গাড়ী রোখো' শুনিতে পাইলাম। হঠাৎ চমকিয়া মুখ বাহির করিয়া দেখিলাম, ভদ্রলোকটি দ্রুত আসিতেছেন, আমার গাড়ী থামিল। ভদ্রলোকটি নিকটবর্ত্তী হইয়া বলিলেন, মহাশয় বড় ভুল হইয়াছে, আপনি ঐ গাড়ীতে যান। আমি কিছু রহস্য বুঝিতে পারিলাম না, অবাক হইয়া বলিলাম কেন? তিনি বলিলেন, আপনার স্ত্রী ঐ গাড়ীতে আছেন, আমরা উভয়েই ভুল করিয়া গাড়ীতে উঠিয়াছি। আমি তখন চাহিয়া দেখি পার্শ্বস্থ মহিলাটি ঘোমটা টানিয়া জড়সড়ভাবে বসিয়া আছেন। আমি পূর্ব্বে ইহা কিছুমাত্র লক্ষ্য করি নাই, কতটুকু সময়ের মধ্যে এই ঘটনা ঘটিল বুঝিতে পারিলাম না। দশ বিশ মিনিট গাড়ীতে বসিয়াছিলাম, ইহা পরে উপলব্ধি করিতে পারিলাম।

আমি গাড়ী হইতে লাফাইয়া বাহিরে আসিলাম, বলিলাম কি করিয়া এমন হইল? আমার বুদ্ধি শুদ্ধি তখন গোল হইয়াছে। কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া কিয়ৎকাল ভদ্রলোকের মুখপানে চাহিয়া রহিলাম। আমার হৃদ্‌পিণ্ড তখন এত সজোরে স্পন্দিত হইতেছিল যে, সে স্থান নিস্তব্ধ থাকিলে আমার বুকের শব্দ সকলে শুনিতে পাইত সন্দেহ নাই। ভদ্রলোকটী লজ্জায় মরিয়া গেলেন। আমার অবস্থাও বলিবার নয়। আমার হাত ধরিয়া কাতর ভাবে তিনি বলিলেন, মহাশয়, ক্ষমা করিবেন, বড় ভুল হইয়াছে, ভুলত আমারও হইয়াছে। আমিও ক্ষমা প্রার্থনীয়। কিন্তু এরূপ ভুল কেন হইল বুঝিতে পারিতেছি না। দেখুন, আমার বোধ হয় রঙ্গিন সাড়ীটাই যত নষ্টের গোড়া, এজন্য যে কতদূর লজ্জিত হইতেছি তাহা বলিবার নয়। আমি বলিলাম, দোষ একেলা আপনার নয়, তবে কিছু মনে করিবেন না। তাই বলিয়া উভয়ে উভয়ের নিকট বিদায় লইলাম। আমি গাড়ীতে আসিয়া দেখি স্ত্রী কাঁদিতেছেন। আমার তাই মহাভুলের জন্য তাঁহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিলাম। তিনি মৃদু মৃদু বলিলেন, ছি আমার মৃত্যু হইলে ভাল ছিল। একটি অপরিচিত ব্যক্তির সহিত একাসনে বসিয়াছিলাম। আমি তাঁহাকে সান্ত্বনা করিয়া বলিলাম, তাই ভুলের জন্য আমি লজ্জায় মরিয়া যাইতেছি। তোমাদের উভয়ের কি পরিধানে এক রঙ্গের সাড়ী? তিনি বলিলেন, কেন

সেভয় পেগোডা।
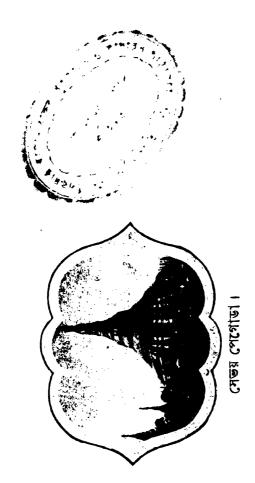
তুমি কি তাহা লক্ষ্য কর নাই? আমি বলিলাম, অত বুঝিলে কি এত বিভ্রাট বাধিত। রঙ্গিন সাড়িই যত অনর্থের মূল। রঙ্গিন সাড়ীপরা তুমি উঠিয়াছ মনে করিয়া আমি ঐ গাড়ীতে উঠিয়াছিলাম। ঐ ভদ্রলোকটীর স্ত্রীর পরিধানেও যে রঙ্গিন সাড়ী তাহা আমি লক্ষ্য করি নাই। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি কি করিয়া লাভ করিলেন, ধীর কণ্ঠে স্ত্রী এই কথাটি বলিলেন। পরে ঘৃণাব্যঞ্জক স্বরে বলিলেন, আর কখনও রঙ্গিন সাড়ী পরিব না। তাই রঙ্গিন সাড়ীর জন্য এই বিষম বিভ্রাট উপস্থিত হইল, আজ বাড়ী যাইয়া রঙ্গিন সাড়ী গুলিকে আগুনে দগ্ধ করিব। আমি অপ্রস্তুত হইয়া গিয়াছিলাম, অধিক বাক্যব্যয় করিতে পারিলাম না। তাঁহাকে অত্যন্ত গম্ভীর দেখিয়া আমি তাঁহার মুখের অতি নিকটে মুখ নত করিয়া বলিলাম, 'হেম, সেই অসময়ে সেতার কাড়িয়া লওয়ার ফল নয় ত?' তিনি মৃদু হাসিলেন মাত্র। আমিও তাই রহস্যের জন্য না হাসিয়া থাকিতে পারিলাম না। তদবধি আমার সহধর্ম্মিণীর রঙ্গিন সাড়ীতে ঘোর বিতৃষ্ণা।

শ্রীগিরিবালা দেবী।

বর্ম্মা বর্ম্মী।

এদেশের পুরুষ লোকদিগকে বর্ম্মা এবং স্ত্রীলোকদিগকে বর্ম্মী (বা বর্ম্মিনী) বলে। ইহারা মঙ্গোলীয় জাতিসম্ভূত। ভারতবাসীর অপেক্ষা চীন ও জাপানবাসীর সহিত ইহাদের অধিকতর সাদৃশ লক্ষিত হয়। ইহাদের গায়ের রং সাধারণত ফর্সা, চক্ষু ছোট, নাক খাঁদা। অপেক্ষাকৃত সেকেলে ধরণের পুরুষেরা শরীরে উল্কি পরে, এবং মস্তকে দীর্ঘ কেশ রাখে। ইংরাজের অধিকারে আসিয়া ইহারাও ক্রমে ক্রমে পাশ্চত্য সভ্যতার অনুকরণ করিতেছে। নিম্ন ব্রহ্মের (Lower Burma) লোক অধিকাংশই সভ্য হইয়াছে; কিন্তু উচ্চব্রহ্মে (Upper Burma) আজিও পাশ্চাত্য সভ্যতার আলোক সম্পূর্ণরূপে প্রবেশ করিতে পারে নাই। বাঙ্গালীর সহিত মধ্য-ভারতবাসীর যেরূপ পার্থক্য, নিম্ন ব্রহ্মবাসীর সহিত উচ্চ ব্রহ্মবাসীর তদ্রূপ পার্থক্য। চীন হিল্ (Chin Hill) ও শান ষ্টেটও (Shan State) ব্রহ্ম গবর্ণমেণ্টের অন্তর্ভুক্ত, কিন্তু এই দুই স্থান, বিশেষতঃ চিনহিল্ আজও নিতান্ত বর্ব্বর অবস্থায় রহিয়াছে।

ইহাদের পরিধেয় কাপড়কে লুঙ্গি (Loungyi) বলে। পূর্ণ বয়স্কদিগের লুঙ্গি দীর্ঘ ৮ হাত, দুই ধার সেলাই করা; দেখিতে অনেকটা খুব বড় বালিসের খোলের ন্যায় দেখায়। ইহারা কাছা বা কোঁচা কিছুই দেয় না; লুঙ্গি সেরূপ ভাবে প্রস্তুতও নয়। স্ত্রী পুরুষ সকলেই গায় জামা পরে, এবং পায় জুতা বা চটি ব্যবহার করে। সাধারণ হিন্দু রমণীদিগের পোসাকের চেয়ে এই বর্ম্মিনীদিগের পোষাক অধিকতর উন্নত বলিয়া বোধ হয়। লুঙ্গি সাধারণত ইউরোপ হইতে আমদানী হয়। দাম বার আনা হইতে পঞ্চাশ, ষাট টাকা পর্য্যন্ত; অধিক দামের

লুঙ্গিগুলি রেশম নির্ম্মিত। স্ত্রী পুরুষ সকলেই রুমাল ব্যবহার করে, পুরুষেরা মাথায় জড়ায় এবং স্ত্রীলোকেরা গলায় ঝুলাইয়া রাখে। স্ত্রী পুরুষেরা সকলই একরূপ পোষাক ব্যবহার করে বলিয়া নূতন দর্শকের পক্ষে স্ত্রী পুরুষ চিনিয়া উঠা ভার। এদেশে ভাল চুরুট প্রস্তত হয়, এবং স্ত্রী পুরুষ সকলেই এই সুদীর্ঘ চুরুটভক্ত। স্ত্রীলোকের মুখে এতবড় চুরুট বড়ই অস্বাভাবিক বলিয়া বোধ হয়।

বাঙ্গালীর মত ইহারাও দুবেলা ভাত খায়। তাজা মাছ মাংসের চেয়ে শুকনা এবং পচা মাছ মাংস খেতে অধিকতর ভালবাসে। ইহারা মাছ পচাইয়া এক প্রকার খাদ্য প্রস্তত করে এবং তাহা লবণের ন্যায় সকল তর-কারীতে ব্যবহৃত হয়। এই খাদ্যের নাম "নাপ্পি"। বর্ম্মাজাতির নিকট এই নাপ্পির ন্যায় উপাদেয় খাদ্য আর দ্বিতীয় নাই। কিন্তু আমরা এই নাপ্পির দুর্গন্ধ কিছুতেই সহ্য করিতে পারি না। অপর দিকে এই নাপ্পি-ভক্ত বর্ম্মাজাতি ঘৃতের গন্ধ অস্বাকারজনক মনে করে। ইহারা দুগ্ধ তত পছন্দ করে না। আমাদের এক বন্ধু বলিয়াছিলেন, তিনি সর-কারী কার্য্য উপলক্ষে একবার এক জঙ্গলে যান। সেখানে গুলি করিয়া একটী সর্প বধ করেন। গ্রাম্য বর্ম্মারা এমনি সর্পমাংস লোলুপ, যে তাহারা মৃত সাপটী লইয়া বন্ধুবরকে ১০টা সুমিষ্ট ডাব নারিকেল উহার পরিবর্ত্তে দান করিল।

এদেশে এরূপ নানা জাতীয় ফল পাওয়া যায়, যাহা কলিকাতা সহরে কখনই দেখা যায় না। ট্যাভয়, মারগুই, মৌলমিন ও থাটোন অঞ্চলে পাহাড়ের উপর এক অতি উপাদেয় ফল জন্মে তাহা দেখিতে অনেকটা ছোট কাঁঠালের মত। কিন্তু গায়ের কাঁটা বড় বড়। উহার ভিতরে কাঁঠালের ন্যায় কোষ আছে। বর্ম্মাজাতির নিকট এই ফল সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রিয়। ইহার নাম ডুরিয়ান (Durian) শুনা যায়, এই ডুরিয়ান ফল সংগ্রহ করিবার জন্য বর্ম্মার রাজাদের বিশেষ দূত (Special Messenger) দিক্ বিদিক্ ছুটিত। ডুরিয়ান পাকিলে প্রায় আধ মাইল দূর হইতে তাহার গন্ধ পাওয়া যায়। যে সমস্ত বাঙ্গালী এই ফল আস্বাদন করিয়াছেন, তাঁহারা বলেন যে ইহা খাইবার সময় প্রথম কয়েক দিন একটা বিজাতীয় গন্ধ অনুভব হয় বটে, কিন্তু পরে এই ফল অতি উপাদেয় ও রসনার তৃপ্তিদায়ক বলিয়া বোধ হয়। এদেশে একরূপ আশ্চর্য্য ফল দেখিতে পাওয়া যায় যাহার বিচি ফলের বাহিরে।

এদেশের স্ত্রীলোকগণ স্বাধীনতার অবতার স্বরূপ। ইহারা অনেক সময় পাশ্চাত্য স্ত্রী লোকদিগের চেয়েও অধিক স্বাধীনতা সম্ভোগ করে। বাজারে এদেশী লোকের যত দোকান আছে, সকলই স্ত্রীলোক দ্বারা চালিত। বিবাহের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত প্রায় সকল মেয়েই, এবং পরেও কেহ কেহ কোন না কোন ব্যবসায় করে।

স্ত্রীলোকেরা কিছু অধিক মাত্রায় বিলাসী। ইহারা সব সময় ফিট্‌ফাট্ বাবু সাজিয়া থাকিতে অতিশয় ভাল বাসে। যে কোনও বর্ম্মা রমণীর চিত্র দেখিলেই ইহা সহজেই বুঝিতে পারা যাইবে। সাধারণ ভাবে বলা যাইতে পারে, এদেশের পুরুষেরা Drone এবং স্ত্রীলোকেরা Bee। ইহারা কোনরূপ জাতিভেদ মানে না।

এখানে বিবাহের কোন নির্দ্দিষ্ট নিয়ম নাই, এবং ইহারা অশিক্ষিত; এই সকল

কারণে এদেশে নানারূপ ব্যভিচার দৃষ্ট হয়। সাঁওতালদের ঈশ্বর জ্ঞান যেরূপ, এদেশী লোকদিগের সতীত্ব জ্ঞান প্রায় তদ্রূপ। যে কেহ অপেক্ষাকৃত ভাল খেতে পরতে দিতে পারে, বর্ম্মিনী তারই আশ্রয় গ্রহণ করে। তাই দশ বৎসর পূর্ব্বে বর্ম্মায় এমন বিদেশী লোক প্রায় ছিল না, যার বর্ম্মা স্ত্রী না থাকিত।

সাহেব, ফিরিঙ্গী, মান্দ্রাজী প্রায় সকলেই এই বিষম প্রলোভনে পড়িয়াছে। পূর্ব্বে এদেশের ডেপুটি কমিশনার, কমিশনার ও চিফ কমিশনারের পর্য্যন্ত বর্ম্মা স্ত্রী থাকিত, আইন বলে উক্ত ইউরোপীয় কর্ম্মচারীদিগের বর্ম্মা স্ত্রী গ্রহণ নিষিদ্ধ হইয়াছে। এই ব্যভিচারের ফলে, বিশেষতঃ নিম্নব্রহ্মে নানা শঙ্কর জাতির উৎপত্তি হইয়াছে। এবং এই পাপের স্রোত আরও কিছুকাল প্রবাহিত থাকিলে নিম্ন ব্রহ্মে বিশুদ্ধ বর্ম্মা পাওয়া দুষ্কর হইয়া উঠিবে।

এদেশে বাল্য বিবাহ নাই। যুবক যুবতী নিজেদের ইচ্ছানুসারে বিবাহ করে, এবং ইচ্ছানুসারে ছাড়িয়া যায়। বিবাহের পূর্ব্বে কোর্টসিপ হয়, হঠাৎ যুবতী কন্যা ঘর হইতে অদৃশ্য হয়। কয়েক দিন জঙ্গলে বাস করার পরে পুরুষ ও স্ত্রী গ্রামে ফিরিয়া আইসে, তখন খাব্য হইল যে অমুক অমুককে নিয়েছে; মানে—তারা বিবাহিত হয়েছে। এদেশের বিবাহের সাধারণ আদর্শ এইরূপ বিশেষে উন্নত তর আদর্শও দৃষ্ট হয়। থাটোন সহরে মং টুন ইন (Moung Tun yin) এর বিবাহ উপলক্ষে অনেক সাহেব মেমেরও সমাগম হইয়াছিল।

আমার মনে হয়, বৌদ্ধ ধর্ম্ম এই বর্ম্মা জাতির অধঃপতনের মূল কারণ। এই ধর্ম্ম নিরীশ্বর বাদী, ইহারা পরলোকে বিশ্বাস করে না; তাই ইহারা এই জীবনকে সার মনে করিয়া "খাও, দাও, মজা কর" মতানুসারে ইহাদের জীবনের অমূল্য সময় কাটাইয়া দেয়। যাহাদের পরলোক বিশ্বাস নাই, তাহারা ইহলোকে যথেচ্ছ ব্যবহার করিতে পারে, এবং এই যথেচ্ছ ব্যবহারের ফলস্বরূপ এই বৌদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বী জাতির অধঃপতন আরম্ভ হইয়াছে। এই পাপের জন্য ভ্রান্ত বৌদ্ধধর্ম্ম সভ্য জগতের নিকট দায়ী। খৃষ্টান মিশনারিরা এদেশে আসিয়া তাঁহাদের ধর্ম্ম (নরপূজা) প্রচার করিতেছেন, যদি ব্রাহ্ম সমাজ এদেশে কয়েক জন প্রচারক পাঠান তাহা হইলে এই সরল বিশ্বাসী জাতি অত্যল্প কালের মধ্যে অন্যান্য উপধর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক নিশ্চয়ই ব্রাহ্ম ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া আরও উন্নত হইতে পারে।

ক্রমশঃ
শ্রীমৃণালিনী রায়।

বর্মায় আটদিন

(গত প্রকাশিতের পর)

পরদিন প্রাতে ৮টার সময় আমরা আজমীরে পৌছিলাম সেখানে আমাদের একজন কুটুম্ব থাকেন তিনি আমাদের লইতে আসিয়াছিলেন। আমরা তাঁহার বাটিতে গিয়া বস্ত্রাদি পরিবর্ত্তন করিয়া তখনই পুষ্কর তীর্থের উদ্দেশে যাত্রা করিলাম। আজমীর হইতে পুষ্কর ৭ মাইল

দূর। মধ্যে একটি পাহাড় পার হইতে হয়, তাহার অপর পৃষ্ঠে পুষ্কর। পাহাড়ের উপর কার রাস্তা বড় সরল নহে, তবে নিতান্ত খারাপ নহে। কিন্তু পথের দৃশ্য অতি মনোহর। পাহাড়ের উপর হইতে চারিদিকে চাহিলে চক্ষু ফিরাইতে ইচ্ছা করে না। নীচে শ্যামল ক্ষেত্রের ভিতর কোথাও ময়ূরেরা দলবদ্ধ হইয়া পেখম ধরিয়া নাচিতেছে, কোথাও গাছের উপর দলবদ্ধ ময়ূরগুলি সমস্বরে ডাকিতেছে। সম্মুখে আরাবল্লী পর্ব্বতশ্রেণী, দূরে আনাসাগর প্রভাত সূর্য্যের কিরণে ঝকমক করিতেছে। পথিমধ্যে একটা ছোট গ্রাম এই সকল দৃশ্য দেখিতে দেখিতে আমরা বেলা ৯॥ টার সময়ে পুষ্করে পৌছিলাম। পুষ্কর একটি মাঝারি রকম হ্রদ। কথিত আছে ইহার তীরে ব্রহ্মা যজ্ঞ করিয়াছিলেন। আমরা পুষ্করে স্নানাদি করিলাম, কিন্তু বড় ভয়ে ভয়ে, কারণ হ্রদের ভিতর বড় কুমীর। আমরাত ৭।৮টা দেখিয়াছিলাম আরও আছে কি না বলিতে পারিনা। দুই একটা সাপও দেখিলাম, সুতরাং সেখানে যে কিরূপ ভয়ে ভয়ে স্নানকরা গেল তাহা পাঠিকাগণ অনুমান করিতে পারেন। তবে শুনিলাম সেগুলি মেছকুমীর এবং সে ঘাটে সর্ব্বদা অনেক লোক থাকে বলিয়া কাছে আসিতে ভয়পায়। পুষ্করের কাজকর্ম্ম শেষ হইতে বেলা ১২টা বাজিয়া গেল। তারপর সেখান হইতে আমরা প্রথমে সাবিত্রী দেবীর মন্দির দেখিতে গেলাম। একটি উচ্চ পাহাড়ের উপর মন্দির। পথ বড় দুর্গম। প্রথমে ১ মাইল বালির উপর দিয়া যাইতে হয়। যদিও সে সময় বর্ষাকাল কিন্তু আজমীরে বৃষ্টির নামও ছিল না। ভয়ানক গরম। সেই দ্বিপ্রহর রৌদ্রে বালি যেন অগ্নির ন্যায় তপ্ত হইয়াছিল, যদিও আমাদের ডুলিছিল, তথাপি সেই তপ্ত বালির তাত অসহ্য হইয়া উঠিয়াছিল। বেহারারা আমাদের লইয়া ছুটিতেছিল কারণ সেই উত্তপ্ত বালির উপর অধিকক্ষণ পা রাখা মানুষের সাধ্য নহে। সুতরাং বালি পার হইতে আমাদের অধিকক্ষণ লাগে নাই। অল্পক্ষণের মধ্যেই পাহাড়ের নিম্নদেশে আসিয়া পৌছিলাম। সেখানে ১০।১৫ মিনিট বিশ্রাম করিয়া পাহাড় চড়িতে আরম্ভ করিলাম। শুনিয়াছিলাম সাবিত্রীর পাহাড়ে একশত ষাট সোপান আছে, কিন্তু সেই সোপানাবলি যে এরূপ তাহা জানিতাম না। ৮।১০ হাত অন্তর কতকগুলা পাথর সিড়ির মত করিয়া বসান। ধাপগুলা এত উচ্চ যে এক একটার সোজা হইয়া চড়াবার না নামিবার সময় বসিয়া নামিতে হয়। বেলা ১টার সময় আমরা পাহাড়ের উপর পৌছিলাম। মন্দিরের দ্বারে বসিয়া কিছুক্ষণ বিশ্রাম করাগেল সেই সময় আমাদের পাণ্ডা পুষ্করে ব্রহ্মার যজ্ঞ এবং ব্রহ্মার উপর রাগ করিয়া সাবিত্রীর পর্ব্বতের উপর বাস এই বিষয়ের এক পৌরাণিক গল্প। বলিল, বাহুল্য ভয়ে লিখিলাম না। তারপর আমরা সাবিত্রী দেবী দেখিতে গেলাম। শ্বেত প্রস্তরের মূর্ত্তি। এখানে পূজাদি কিছু করিতে হয় না। সাবিত্রীকে সিন্দুর লোহা ইত্যাদি আপনারাই পরাইতে হয় পাণ্ডা কিছু করে না। সেখান হইতে শীঘ্রই ফিরিলাম। তারপর ব্রহ্মার মন্দির দেখিতে গেলাম সাবিত্রীর মন্দির অপেক্ষা ব্রহ্মার মন্দির বড় এবং দেখিতেও সুন্দর, মূর্ত্তিও সুন্দর। পৌরাণিক ত্রিমূর্ত্তির মধ্যে ব্রহ্মার পূজা আজকাল উঠিয়া গিয়াছে। ভারতবর্ষের মধ্যে এই একমাত্র ব্রহ্মার মন্দির আছে। সেখান

হইতে যখন গৃহে ফিরিলাম, তখন শরীর একেবারে অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছে। পাঠিকাগণের মধ্যে যদি কেহ তীর্থ ভ্রমন করিতে পুষ্করে যান তবে যেন শীতকালে যান নতুবা বড় কষ্ট পাইবেন। সন্ধ্যার সময় আমরা আজমীরে পৌঁছিলাম। পরদিন সকালে আজমীর নগর দেখিতে গেলাম আজমীর অতি পুরাতন সহর। চোহান বংশীয় রাজা অজয় পাল এই সুন্দর সহর প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। তাঁহার পর উক্ত বংশীয় অনেক বিখ্যাত নরপতি এখানে রাজত্ব করিয়াছেন। এই বংশের শেষ নরপতি পৃথ্বিরাজ মাতামহের উত্তরাধিকারী হইয়া দিল্লীর সিংহাসনে বসিয়াছিলেন। তাঁহার পতনের সহিত এই রাজবংশেরও পতন হইয়াছে এবং আজমীরের প্রকৃত হিন্দু রাজত্বও শেষ হইয়াছে। এক্ষণে ইহা বৃটিশ রাজত্বের অন্তর্গত। এখানে গভর্ণর জেনারলের একজন এজেণ্ট থাকেন, আজমীর সহর সমুদ্র তীর হইতে ৩০০০ ফিট উচ্চ, তারাগড় নামক একটি পাহাড়ের পাদমূলে অবস্থিত। এখানকার বাড়ীগুলি দেখিতে সুন্দর এবং অধিকাংশ প্রস্তর নির্মিত। আমরা প্রথমে মেওকলেজ দেখিতে গেলাম। কলেজ শ্বেত মর্ম্মর প্রস্তর নির্ম্মিত দেখিতে অতি সুন্দর। মধ্যে একটি উচ্চ টাওয়ার আছে, ও চারিদিকে চারিটা সেই ধরণের ছোট চূড়া আছে। কলেজের চারিদিকে বহুদূর পর্য্যন্ত রাজপুত্রদিগের বাসের নিমিত্ত সুন্দর সুন্দর গৃহ আছে। সে সকলের ভিতর দেখিবার উপায় নাই। কলেজের ভিতর অনেক বৈজ্ঞানিক যন্ত্রাদি আছে, এবং যে সকল রাজকুমারেরা সেখানে বিদ্যাশিক্ষা করেন, তাঁহাদের ফটোগ্রাফ আছে। হলের দুই পার্শ্বের প্রাচীরে চন্দ্র ও সূর্য্যের পৌরাণিক প্রতিমূর্ত্তি অঙ্কিত আছে। কলেজ হইতে পাবলিক গার্ডন দেখিতে গেলাম। বাগানে কিছুই নাই, দেখিতেও তেমন ভাল নহে। চারিদিকে অপরিস্কার ও আগাছা জন্মিয়াছে। এখানে একটি মরুভূমির "পান্থপাদপ" বৃক্ষ দেখিলাম, দেখিতে কতকটা কলাগাছের মত। পাবলিক গার্ডেন দেখিয়া আনাসাগর দেখিতে গেলাম। ইহা একটি কৃত্রিম হ্রদ। রাজা আনা ইহা তৈয়ার করাইয়াছিলেন, তাঁহারই নামানুসারে ইহার নাম আনাসাগর। একটি নির্ঝরিনীর জল বাঁধিয়া এই হ্রদ করা হইয়াছে। এই হ্রদ হইতে লুনী নামে একটি নদী বাহির হইয়া সিন্ধুতে মিশিয়াছে। আজমীরে আমি যাহা কিছু দেখিলাম আনাসাগর আমার সর্ব্বাপেক্ষা ভাল লাগিয়াছিল। আমারা যখন সেখানে পৌঁছিলাম, তখন একটু জোরে বাতাস বহিতেছিল, তাহাতে আনাসাগরে বড় বড় তরঙ্গমালা ক্রীড়া করিতেছিল। চারিধারে উচ্চ বাঁধের উপর গাছ পালার মর্ম্মর শব্দ ময়ূরের কেকাধ্বনির সহিত মিশিয়া চক্ষু কর্ণ জুড়াইতেছিল। সে সৌন্দর্য্য বর্ণনাতীত। আমার সাধ্য নাই যে সে সময়কার হৃদয়ের ভাব ভাষায় বর্ণনা করি। প্রকৃতির সে সৌন্দর্য্য দেখিয়া প্রকৃতির নিয়ন্তার অনন্ত সৌন্দর্য্যে হৃদয় পূর্ণ হইয়া উঠে। আনাসাগরের তীরে সম্রাট সাহাজান শ্বেত প্রস্তরের অতি সুন্দর কারকার্য্যময় বসিবার স্থান তৈয়ার করাইয়া দিয়াছিলেন। ইংরাজেরা তৎসমুদয় ভাঙ্গিয়া বাঙ্গালা তৈয়ার করাইয়া আফিস করিয়াছিলেন, এক্ষণে লর্ড কার্জ্জনের আদেশে আফিশ উঠাইয়া বাঙ্গালা ভাঙ্গিয়া পূর্ব্বে যেরূপ ছিল সেইরূপ পুনরায় তৈয়ারি করান হইতেছে। কতক হইয়াছে, এখনও অনেক বাকী আছে। আনাসাগরের তীরে

রেসিডেন্সি। আজমীরে পদ্মসাগর নামে আর একটি কৃত্তিম হ্রদ আছে, লোকে সচরাচর তাহার জল ব্যবহার করে। আনাসাগর হইতে আমরা খাজা মৈনুদ্দিন চিস্তির দর্গা দেখিতে গেলাম, কিন্তু শুনিলাম সেদিন মুসলমানদের কোন পর্ব্বোপলক্ষে অত্যন্ত ভিড়, সুতরাং আমাদের আর দেখা হইল না, সঙ্গী পুরুষেরা দেখিয়া আসিলেন। শুনিলাম দর্গা অতি সুন্দর। দেখিবার মত জিনিষ। আমরা একটু ক্ষুণ্ণ হইলাম। যাহা হউক সেখান হইতে একজন মাড়োয়ারী একটি প্রদর্শনী তৈয়ার করাইতেছে। তাহাই দেখিতে গেলাম। বাড়ীটি বেশ বড়, প্রথম ঢুকিতেই দেখিলাম উঠানে ও তাহার পার্শ্বের ঘরে অনেক কারীকর কাজ করিতেছে; তারপর দ্বিতলে উঠিলাম, সেখান হইতে প্রদর্শনী দেখিতে হয়। চারিদিকে বাড়াণ্ডা মধ্যে একটি বড় ঘর। সেই ঘর ও তাহার ভিতরকার দ্রব্যাদিই দেখিবার জিনিষ। ঘরে ঢুকিতে দেয় না। দেয়ালে দ্বারপ্রমাণ বড় বড় কাচ লাগান আছে, তাহার মধ্যদিয়া ভিতরকার দৃশ্য দেখিতে হয়। ভিতরটি অতি সুন্দর। দেয়ালে ও ছাদে শিশমহলের ন্যায় নানাবর্ণের ছোট ছোট কাচ বসান ও স্বর্ণ রৌপ্যের নানারূপ কারুকার্য্য। মধ্যে মধ্যে বড় বড় এক একখানা আর্সি দেয়ালের সহিত বসান, তাহাতে আবার পার্শ্বের দেয়ালের ও ছাদের প্রতিবিম্ব পড়িয়া আরও শোভাবৃদ্ধি করিয়াছে। ছাদের উপর হইতে ছোট ছোট ময়ূরপঙ্খি ঝুলান আছে। তাহাতে স্বর্গ হইতে দেবতারা দেখিতে আসিয়াছেন। নীচে অযোধ্যানগরে রামচন্দ্রের জন্ম হইয়াছে। নগরে উৎসব হইতেছে। সুতিকাগারে কৌশল্যার কোলে রাম শুইয়া আছেন, রাজা দশরথ দেখিতে আসিয়াছেন। আর এক স্থানে এলাহাবাদের অক্ষয় বটের পূজা হইতেছে। একজন রাজা পূজা দিতে আসিয়াছেন, সেখানে বড় উৎসব; লোকজন ছুটাছুটি করিতেছে। অন্য স্থানে সপ্তসমুদ্র ও সপ্তদ্বীপা পৃথিবী ইহা এখনও অসম্পূর্ণ আছে। এইরূপ আরও কত চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে তাহা কত লিখিব। সেই সকল দেখিতে অতি সুন্দর, পুতুলগুলা কিসের বলিতে পারি না। তবে বোধ হয় স্বর্ণ বা স্বর্ণের জল দেওয়া পিতলের হইবে। বাড়ী ঘর কতক কাষ্ঠের ও কতক স্বর্ণের। কিন্তু যাহারই হউক সে সকলের কারুকার্য্য অতি সুন্দর। শুনিলাম বার বৎসর হইতে ইহা তৈয়ারী হইতেছে, এখনও শেষ হয় নাই। ১৪ লক্ষ টাকা খরচ পড়িয়াছে। এখান হইতে বাটী ফিরিলাম ও আহারাদি করিয়া বেলা ২ টার ট্রেণে দিল্লী যাত্রা করিলাম।

ক্রমশঃ

শ্রীমনোরমা দেবী।

সুজাতার পণ।

ক্ষুদ্র কুটীরের নির্জ্জন প্রকোষ্ঠে বৃদ্ধ গঙ্গারাম চিন্তামগ্ন হইয়া বসিয়া রহিয়াছেন। তাহার মনের ভাবরাশি যেন বদনমণ্ডলে প্রকাশ পাইতে চেষ্টা করিতেছে। তিনি অতি কষ্টে তাহার মনের ভাব গোপন করিতে, চেষ্টা করিতেছেন কিন্তু নিরাশা আসিয়া

তাহাকে এক একবারে অবসন্ন করিয়াফেলিতেছে। যে সময় গঙ্গারাম এইরূপ মানসিক যাতনায় অধীর, ঠিক সেই সময় কুটীর প্রাঙ্গনে একটি বালিকা রন্ধনাদি গৃহ কার্য্য সমাপন করিয়া এক ঘটী জল, গামছা ও একখানা চৌকী যথাস্থানে রাখিয়া, সন্ধ্যা প্রদীপ জ্বালিয়া সেই প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিল, যেখানে গঙ্গারাম চিন্তা নিমগ্ন হইয়া বসিয়া রহিয়াছেন, বালিকা সেখানে আসিয়া, বাবা, বাবা, এসেছ বাবা, এমন করে কেন বসে রয়েছ বাবা, তোমাকে আজ এমন দেখ্‌ছি কেন? ইত্যাদি প্রশ্ন আগ্রহের সহিত করিতে লাগিল। পিতা বালিকাকে স্নেহভরে বুকে টানিয়া সস্নেহে বলিলেন, মা লক্ষ্মী কিছু না, তুমি ব্যস্ত হয়ো না।

বালিকা। তুমি তো কোনও দিন গৃহে আসিয়া অমন করে বস না, চল হাত পা ধুয়ে একটু জল খাবে আমি আজ তোমার জন্যে নূতন খাবার তৈয়ের করেছি।

বালিকা শৈশবেই মাতৃহীনা। পিতাই তাহার সংসারে একমাত্র আশ্রয়। তাঁহারই স্নেহের ক্রোড়ে পালিত হইয়া সে মার অভাব ভুলিয়াছে। এবং তাহার ক্ষুদ্র শক্তিতে যত টুকু সম্ভব পিতার সেবা ও গৃহকার্য্য করিয়া দিন কাটাইতেছে। গৃহ প্রাঙ্গনে কয়েকটা বেল, যুঁই, গোলাপ, রজনীগন্ধা ফুল দিয়া ছোট একটা বাগান সাজিয়েছে। এই পরিবার ভুক্ত আরও কয়েকটি প্রাণী আছে। একটি গাভী ও তাহার বাছুর একটি কুকুর, একটা ময়না পাখী, একটা সাদা ধপধপে বিড়াল ছানা। বালিকা সারাদিন এইগুলি নিয়া ব্যস্ত থাকে, যখনই অবসর পায় তখনই তাহাদের সঙ্গে খেলা করে। মাঝে মাঝে প্রতিবাসী ছোট ছোট বালক বালিকাগুলি আসিয়া তাহার খেলার সঙ্গী হয়। বালিকা গৃহে পিতার নিকটে বেশ সুন্দর লিখিতে পড়িতে শিখিয়াছে। রামায়ণ মহাভারত তাহার বড় প্রিয় গ্রন্থ। আজ পিতাকে চিন্তাপূর্ণ দেখিয়া তাহার ক্ষুদ্র হৃদয়খানি আন্দোলিত হইয়াছে। পিতার কি হইয়াছে, তাঁর চিরপ্রসন্ন বদনমণ্ডল আজ কেন গম্ভীর ও বিষণ্ণ? বালিকা নানাকথা ভাবিতেছে, কিছু ঠিক করিতে পারিতেছে না। বিষম সমস্যাতে পড়িয়াছে।

গঙ্গারামের ইচ্ছা নয় যে তাঁহার চিরপ্রফুল্লময়ী স্নেহের পুত্তলি বালিকাকে তাঁহার সাংসারিক ভাবনা চিন্তার বিন্দু বিসর্গ জানিতে দেন। তাই উত্তর করিলেন, না না আজ আমি কিছু খাব না, ভাল বোধ কচ্ছি না, তুমি খেয়ে এস।

বালিকার নাম সুজাতা, তাহার মাতা সাধ করিয়া এই নাম রাখিয়াছিলেন। সুজাতা যৌবনে সবে পা দিয়াছে। গ্রামের একটি যুবকের সহিত তাহার বিবাহ সম্বন্ধ স্থির হইয়াছে। যুবকের নাম প্রশান্তকুমার। সুজাতার পিতার একটা ছোট খাট দোকান আছে। সম্প্রতি তিনি তুলার কারবার আরম্ভ করিয়াছিলেন; কিন্তু ধূর্ত্ত লোকদের প্রবঞ্চনায় তাঁহাকে কয়েক সহস্র মুদ্রার ঋণভার মস্তকে গ্রহণ করিতে হইয়াছে। এতদিন তিনি সরল বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া তাঁহার সহব্যবসায়ীদিগের পরামর্শ অনুযায়ী চলিতেছিলেন; কিন্তু হঠাৎ তাহাদের প্রবঞ্চনা বুঝিতে পারিয়া এবং আপনার মাথায় এত ঋণের বোঝা দেখিয়া একেবারে স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। কি করিয়া এরূপ হইল ভাবিয়া ঠিক করিতে পারিলেন না। এখন ঋণের দায়ে তাঁহার যথাসর্ব্বস্ব শেষ হইতে চলিল।

তাঁহার একমাত্র কন্যার কি উপায় হইবে ভাবিয়া তিনি অধিকতর আকুল হইয়াছেন। নানা চিন্তায় তিনি সেই দিনই শয্যাগত হইলেন। সুজাতা বহুকষ্টে পিতার মানসিক ক্লেশের কারণ জানিতে পারিয়া পিতাকে সান্ত্বনা দিতে লাগিল ও প্রাণপণে পিতার সেবায় নিযুক্ত হইল। কিন্তু যে মহাশত্রু গঙ্গারামকে আক্রমণ করিয়াছে, তাহার হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার সম্ভাবনা বড়ই অল্প। মাসাধিককাল শয্যাগত থাকিয়া গঙ্গারামের একমাত্র কন্যাকে দুঃখ সাগরে ভাসাইয়া মৃত্যুর শান্তিপ্রদ ক্রোড়ে চিরবিশ্রাম লাভের সময় হইল। পিতার জীবনপ্রদীপ নির্ব্বাণের, পিতার অকাল মৃত্যুর, কারণ বুঝিতে পিতৃপরায়ণা কন্যার আর বাকী রহিল না। সেইদিন বালিকা প্রতিজ্ঞা করিল, হে সর্ব্ব-সাক্ষীদেবতা, যতকাল পিতার ঋণ পরিশোধ করিতে না পারিব ততকাল সাংসারিক কোন সুখ মস্তক পাতিয়া গ্রহণ করিব না। বালিকা তুমি জাননা যে এই সংসার বড়ই কঠোর স্থান। যদি জানিতে তবে এই প্রতিজ্ঞা করিতে সাহসী হইতে কি না জানি না। প্রাণপ্রিয় কন্যার মুখ হইতে এই কঠোর প্রতিজ্ঞা শ্রবণ করিয়া মুমূর্ষু পিতার চক্ষু হইতে জলধারা প্রবাহিত হইতে লাগিল। তখন কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হইয়া আসিতেছে। জীবনের শেষ আশীর্ব্বাদবারি কন্যার মস্তকোপরি সিঞ্চন করিয়া তিনি চক্ষু মুদ্রিত করিলেন। দরিদ্র গঙ্গারাম স্বীয় সাধুতা ও অমায়িকতার গুণে পল্লীবাসী সকলেরই শ্রদ্ধাভাজন হইয়াছিলেন। বালিকা সুজাতার সরলতায় মুগ্ধ হইয়া পল্লীবাসী বালক বালিকা তাহাকে জ্যেষ্ঠা সহোদরার ন্যায় ভালবাসিত। বয়স্কা প্রচীনা রমণীগণ তাহাকে কন্যার ন্যায় স্নেহ করিতেন। আজ অসহায়া পিতৃহীনা বালিকার দুঃখে সকলেই দুঃখিত এবং সকলেই তাহার সহিত সঙ্গে সঙ্গে বিষাদিত বালিকা সুজাতা আজ পিতৃ-শোকে আত্মহারা হইয়া কেবলই বিলাপ করিতেছে, আর বলিতেছে; বাবাগো তুমি যেও না, তোমার ঋণশোধ করিব, গঙ্গারামের নশ্বর দেহ অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া সম্পন্ন করিবার জন্য প্রতিবেশীরা সাহায্য করিল। যথাসময়ে তাহার দেহ ভস্মীভূত হইল। ভস্মাবশেষ অস্থিরাশি সংগ্রহ করিয়া তাহাদের বাসস্থানের নিকটে একটি ক্ষুদ্র সমাধি নির্ম্মিত হইল। বালিকা প্রতিদিন পুষ্পমালা গাঁথিয়া পিতার সমাধির উপরে অশ্রুপূর্ণ নয়নে ভক্তির সহিত অর্পণ করিত।

গ্রামের সেই প্রশান্তকুমারও সেখানে উপস্থিত ছিল। সুজাতার প্রতিজ্ঞা শ্রবণ করিয়া, সে ভাবিয়াছিল শোকাবেগ হ্রাস হইলেই বিবাহের প্রস্তাব করিবে। প্রতিবাসীগণও নিরাশ্রয়া বালিকাকে বিবাহ করিতে খুব আগ্রহের সহিত পরামর্শ দিল। গঙ্গারামের মৃত্যুর পর তাহার একজন বাল্য-বন্ধু গ্রামের জমিদার বিপিন বাবু এই বালিকাকে তাঁহার বাড়ীতে লইয়া গেলেন। এবং অপত্য নির্ব্বিশেষে তাহাকে প্রতিপালন করিতে লাগিলেন। বিপিনবাবু বর্ত্তমান সময়ের উন্নত ও আদর্শ জমিদার। জ্ঞান চর্চ্চায় তাহার বিশেষ অনুরাগ। মনটি সরল। চরিত্র পবিত্র। তিনি সুজাতার বিবাহে প্রথম মনোযোগী হইলেন না। মনে করিলেন পিতৃশোক বিস্মৃত হইলে তাহাকে বিবাহ দিবেন। ক্রমে ছয় মাস অতীত হইল। তিনি একদিন বিকালে তাহার শয়ন ঘরে বসিয়া সুজাতাকে ডাকিয়া

পাঠাইলেন। সুজাতা পিতৃবন্ধু বিপিন বাবুকে বাবা বলিয়া ডাকিত। নিকটে আসিয়া বলিল কি বাবা কেন ডাকিয়াছ? এস মা বলিয়া বিপিন বাবু তাহাকে কাছে বসাইয়া, মাথায় ও গায়ে হাত বুলাইতে লাগিলেন।

বিপিন বাবু বিশেষ সতর্কতার সহিত তাহার বিবাহের কথা তুলিলেন। বালিকা পিতার কথা স্মরণ করিয়া অশ্রু সংবরণ করিতে পারিল না। বিপিন বাবু তাহাকে অন্য কথায় আশ্বস্ত করিয়া আবার সেই বিবাহের কথা পাড়িলেন, সুজাতা সলজ্জভাবে তাহার পিতৃ ঋণের প্রতিজ্ঞার কথা জানাইয়া বিবাহে অসম্মতি প্রকাশ করিল। বিপিন বাবু তাহার প্রতিজ্ঞার কথা শুনিয়া বিশেষ আহ্লাদিত হইলেন। এবং অচিরে তাহার ঋণ মুক্তির উপায় করিতে মনস্থ করিলেন।

গ্রামে একটী ভাল বালিকা বিদ্যালয় ছিল না। তিনি গবর্ণমেণ্টের হস্তে যথেষ্ট টাকা গচ্ছিত রাখিয়া তাহার সুদে যাহাতে একটি ভাল বালিকা বিদ্যালয় চলিতে পারে তাহার উপায় করিলেন। এবং সুজাতাকে তাহার প্রধান শিক্ষয়িত্রীর কাজে নিযুক্ত করিলেন। সুজাতা তাহার প্রাপ্য বেতনের টাকা জমাইতে লাগিল। এবং বিপিন বাবু সেই টাকা অন্যত্র ধার দিয়া বৃদ্ধির চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

যেমন কন্যা বিধাতা তাহার জন্য তেমন বরও রাখিয়াছেন। প্রশান্ত কুমার বিপিন বাবুর মুখে সুজাতার প্রতিজ্ঞার কথা শুনিয়া বিশেষ সুখী হইলেন। এবং বিপিন বাবুকে বলিলেন, যত দিনই অপেক্ষা করিতে হউক আমি সুজাতাকে ভিন্ন আর কাহাকেও প্রণয়িনী করিব না। বিপিন বাবু প্রশান্ত কুমারের মুখে এই সকল কথা শুনিয়া কতক আশ্বস্ত হইলেন।

আজ সুজাতার বিবাহ। সুজাতার পিতৃঋণ পরিশোধ হইয়াছে। বিপিন বাবু বিবাহের দিন রাত্রে বর এবং কন্যাকে আশীর্বাদ করিতে আসিয়া বলিলেন, তোমরা উভয়ে তোমাদের চরিত্রের দ্বারা যে উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত দিলে, আশা করি দিন দিন এই দৃষ্টান্ত আরও দেখিতে পাইব এবং স্বদেশ ও স্বজাতির মুখোজ্জ্বল হইবে।

কবিতা

আমার দেবতা।

আমার দেবতা তুমি এমর জগতে
আমার সাধনা সিদ্ধি তব চরণেতে!
আমার তৃপ্তি সুখ তোমারে দেখিয়া
আমার জীবন শুধু তোমারে লইয়া
দীন আমি মূর্খ আমি ছিনু এক ধারে
তুমি ডেকে নিলে মোরে কত প্রীতি ভরে।
শিখালে কতই কথা—দেখাইলে পথ
কত সুখ কত শান্তি দিলে অবিরত!
জাগিল এ মর হৃদে স্বরগ বারতা!
তাই ভাবি মনে মনে তুমি কি দেবতা?
আশীর্ব্বাদ যাচে দাসী, দেবতা আমার!
মিশে যাক ওচরণে এহৃদয় ছার!

শ্রীসরোজিনী বসু!

" শিশুর হাসি।"

ভুলিতে কি পারে মাতা এ হাসি কখন !
আপনা ভুলিতে পারে, সংসারেরে দিতে পারে
অতল বিস্মৃতি জলে চির বিসর্জ্জন ;
পারে না এ হাসি মাতা ভুলিতে কখন।
একিবা অতুল রূপ
অবনীতে অপরূপ
ধরাধামে কভু তো গো দেখিনি এমন
এযে গো অমূল্য মণি মার প্রাণধন !
ভুলিতে কি পারে মাতা এ হাসি কখন ?
এযে গো ননীতে গড়া চাঁদ হাসি মুখ ভরা
চাঁদের হাসিটী যেন ?—চাঁদেরই মতন
চাঁদের জোছনা হতে উজ্জ্বল বরণ।
ধাতা সব বেছে নিয়ে
স্বরগ মাধুরী দিয়ে
গড়ায়েছে তাই হেন প্রীতি দরশন
তাই মার চিত্ত বাছা করেছ হরণ।
কোথা পেলি তুই বাছা হাসিটী এমন ?
চাঁদ হাসি কোথা লাগে যখন গোলাপী রাগে
রঞ্জিত অধরে হাসি নেহারি বাছন
তুইরে, তুইরে, বাছা অমূল্য রতন॥
তুইরে মায়ের সুখ
তুইরে মায়ের দুখ
তোমারি মুখেতে মার আনন্দ বর্দ্ধন
তুইত মায়ের তোর হৃদয় রতন।
কোথা হতে নিয়ে এলি হাসিটা বাছন ?
মার স্নেহ কিনে নিলে মাতারে বাঁধিয়া দিলে
এযে রে ভীষণ, ওরে ভীষণ বাঁধন !
এ বাঁধা ছিঁড়িতে কেউ পারেনা কখন
তোমারি সুখের তরে
জননী ভাবিয়া মরে
তোমারি বিপদ হলে সজল নয়ন
বেঁচে থাক বেঁচে থাক মার প্রাণধন
ভুলিতে কি পারে মাতা এ হাসি কখন !
আপনা ভুলিতে পারে সংসারেরে দিতে পারে
অতল বিস্মৃতি জলে চির বিসর্জ্জন
পারেনা এ হাসি মাতা ভুলিতে কখন॥

শ্রী সরযূবালা দেবী।

সুন্দর-তম।

সুন্দর তম কাহারে বা কব
সুন্দর তব ভুবনে !
দিবানিশি শত সুন্দর ছবি
উদ্ভাসিত মম নয়নে !
বিরাট সৌন্দর্য্যে মগ্ন বসুন্ধরা,
নীলিম কণ্ঠে লগ্ন শশীতারা,
মুগ্ধনেত্রে চাহি—নির্ব্বাক রহি
সুন্দর তব ভুবনে !
দিবানিশি শত সুন্দর ছবি
উদ্ভাসিত মম নয়নে !
স্নিগ্ধ শান্তি তব কাহার অঙ্গে
মাথাইয়ে দিয়েছ ধরায়
দিবানিশি শত স্নেহের পরশ
লভিছে মা শ্রান্ত হেথায়।
জাহ্নবী স্নাত মুক্ত পবন
বিশ্বপ্লাবী কনক কিরণ
দিবা অবসানে স্নেহ পরশন
লভিছে মা শ্রান্ত হেথায়।
স্নিগ্ধ শান্তি তব কাহার অঙ্গে
মাথাইয়ে দিয়েছ ধরায় ?
সুমধুরতম কারে মা করেছে
তব অধরের অমৃত ?
চঞ্চল হৃদয় কে মুগ্ধ করেছে
কে তৃপ্ত করেছে তৃষিত ?
পাষাণের বুকে মধুর অমিয়া
সে যে উচ্ছ্বাসে এসেছে নামিয়া

শ্যাম.বাতায়নে সুধাভরা হাসি
কে তৃপ্ত করেগো তৃষিত ?
সুমধুরতম কারে মা করেছে
তব অধরের অমৃত ?
উজ্জ্বলতম কে আছে.হেথায়
তোমার পুণ্য কিরণে ?
কে পারে হেথায় দেখাইতে পথ
নিবিড়:তিমির গহনে ?
নীলিম আকাশে.রবিশশী তারা:
তারাও ত নিভে হয় দিশাহারা
চির উজ্জ্বল কার আঁখি তারা
তোমার পুণ্য কিরণে ?
কে পারে হেথায় দেখাইতে পথ
নিবিড় তিমির গহনে ?
এই—সারা বিশ্বধামে একটি কুটীর
তোমারি সোহাগে রচিত
সুন্দরতম সুন্দর ভুবনে
তোমারি মাধুরী মথিত।
তোমারি শান্তি সাগর বেলায়,
দীপ্ত তোমারি পুণ্য প্রভায়,
বিজড়িত তব প্রেম লতিকায়
তব চুম্বন খচিত।
স্নিগ্ধ উজ্জ্বল সুন্দর তম
তোমারি সোহাগে রচিত
হেথা—শ্রান্তের তরে আছে মা শান্তি
তৃষিতের তরে অমিয়া।
হেথা—অপূর্ব্ব শকতি দূর হতে সবে
নিজ বুকে লয় টানিয়া।
এযে " প্রেম পরিবার " বিশাল ভুবনে
নমিত তোমার সুন্দর চরণে
এযে জীবনের সাধ মানব প্রাণের
রেখেছ মা তুমি আঁকিয়া !
সুপ্ত বাসনা জাগে মা ছবিতে
মুগ্ধ নয়ন রাখিয়া।

শ্রীশান্তি ময়ী

[খোকা]

কোথা হতে এলি তুই এ মরধরায়
ঢালিতে অমিয়ধারা তাপিত হিয়ায় !
নিরাশার গুরু ভারে ক্লান্তছিল হিয়া
তোরে পেয়ে আশা-পুন উঠেছে জাগিয়া !
জীবনের সুখ , আশা , তুই ই আমার ,
ক্ষণতরে না দেখিলে সব অন্ধকার !
দেখি যবে তোর ওই চাঁদ মুখে হাসি ,
সব দুঃখ যায় দূরে সুখনীরে ভাসি ?
তোরে বুকেনিয়ে ভুলি সংসার যাতনা
কি যেন সুধার স্রোতে হইরে মগনা !
ওই হাসিমাখা মুখে যবে চুমো খাই ,
কি জানি কি সুখ স্রোতে আমি ভেসে যাই
যেইদিন এলি তুই নিশীথ সময়
নব অতিথির মত , নীরব ভাষায়
জানাইলি আপনার স্নেহ অধিকার ,
জীবনেতে সেইদিন বুঝিনু , আমার
দুঃখের রজনীগতে সুখ উষা আসে ,.
হৃদয় উঠিল নেচে আনন্দ উল্লাসে !
কেতুই স্বর্গের শিশু এলিরে ধরায়
জ্বালিতে আশার বাতি হাসা'তে আমায় !
এলে যদি বাছা ! বাঁধা থেক মাতৃস্নেহে ,
দেব আশীর্ব্বাদ লভি থেক সুস্থদেহে !

শ্রী লাবণ্য-প্রভা গুহ

সে কেন দাঁড়ায়।

চলি' চলি' চলে না চরণ
দুরু দুরু কাঁপে ক্লান্ত হিয়া ;
চুপি চুপি আঁখি দুটি ওই,
পিছু পানে রয়েছে চাহিয়া।
সম্মুখে যে উদার প্রান্তর
ডাকে কাল বলি আয় আয় !
অত দূরে যেতে হবে যার,
মাঝ পথে সে কেন দাঁড়ায় ?

কেমনে মুছিব স্মৃতি !

কেমনে মুছিব স্মৃতি
সেকি মোছা যায় ?
হৃদয়ের স্তরে স্তরে
এঁকেছি যে মূরতীরে
প্রণয় কুসুমে পূজি
ধেয় দেবতায় !
কেমনে মুছিব স্মৃতি
সেকি মোছা যায় ?
নাহি স্বার্থ নাহি আশা
প্রাণঢালা ভালবাসা
ভালবেসে সুখী শুধু
কিছু নাহি চায়—
তারে কি ভুলিতে পারি
কভু ভোলা যায় ?
অতীত মধুর স্মৃতি
হৃদে জাগে নিরবধি—
স্মৃতি লয়ে বেঁচে আছি
দূরে ছেড়ে তায়,
কেমনে মুছিব স্মৃতি
সেকি মোছা যায় ?

“ চাহিবর ”

ফুটিয়াছে যূই, জাতি যত পুষ্প ভার
কোকিল কুজনে বনে,
বসন্ত এসেছে শুনে,-
বনস্থল পরিয়াছে ফুল দিয়ে হার।
ফুলের সুবাস পেয়ে ভ্রমরের দল,
গুণ্ গুণ্ গুণ্ স্বরে,
তোষামোদ করে তারে,
লইতে ফুলের গন্ধ সবে পালে পাল।
আসিলেন বাণীদেবী বীণা লয়ে করে,
জাগায়ে ভারতে সবে,
বাজালেন মধু রবে,
সকলে করিল স্তোত্র প্রাণ মন ভরে।
কি কব তোমারে মাগো অধম অজ্ঞান,
এই আমি চাহিবর,
প্রসারিয়ে তব কর,
উঠাও পতিত এই ভারত সন্তান।

কুমারী আশালতা দাস গুপ্তা

বিবিধ-প্রসঙ্গ

আদর্শ মুসলমানরমণী। “গত ২২শে অক্টোবর তারিখে হাওড়ার ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট বাবু নিবারণচন্দ্র ঘটক মহোদয়ের সমক্ষে একটি পুলিশ চালানী মোকদ্দমা উপস্থিত হয়। মোকদ্দমা দেখিবার জন্য আদালত গৃহ লোকে লোকারণ্য হইয়াছিল। ঘটনার মর্ম্ম এইরূপ;—ফরিয়াদি ‘আকুল’ বিবির বয়স ১৫।১৬ বৎসর, দেখিতে পরমা সুন্দরী। তাহার স্বামীর নাম ‘জীবন মণ্ডল’। বালিকা যথাসাধ্য স্বামীর শুশ্রূষা ও গৃহ কর্ম্মাদি করিয়া থাকে। কিন্তু তাহার শাশুড়ী (জীবনের মাতা) উহাকে আদৌ দেখিতে পারে না। যাহারা বিনা কারণে বধূকে যন্ত্রণা দিতে ত্রুটি করেন না এইরূপ দুই একটি শাশুড়ী আমাদের দেশে নিতান্ত দুর্ল্লভ নহে। একদিন ‘আকুল’ পরিশ্রান্ত

স্বামীর সেবা করিতেছিল, এমন সময়ে উগ্রচণ্ডা শাশুড়ী আসিয়া 'জীবনকে' বলিলেন 'আজ তোর বৌয়ের দোষে মুরগীতে ধান গুলো সব খেয়ে ফেলেছে; আমি ধান রৌদ্রে দিয়া গিয়াছিলাম, বৌ সে গুলো একবার চোখ দিয়ে দেখ্‌লে না। এমন বৌ নিয়ে আমি ঘর করিতে পারিব না। আমাকে বিদায় দিয়ে তুই বৌ নিয়ে ঘর কর' ইত্যাদি। উপযুক্ত পুত্র 'জীবন' প্রায়ই এইরূপ অভিযোগ শুনিত। আজ মার ক্রোধ সম্বরণ করিতে না পারিয়া মাতাকে, 'মা আর তোমার এ জঞ্জাল রাখিব না' বলিয়া এক খানি ছুরি বালিকার গলায় বসাইয়া দিল। বালিকা কাতর কণ্ঠে চীৎকার করিতেছিল; 'জীবন' বড় সুবিধা হইল না বুঝিয়া, স্ত্রীকে বলিল 'আয় তোকে তোর বাপের বাড়ী রেখে আসি'। সরলা বালিকাও স্বামীর সঙ্গে চলিল। শেষে একটা খালের ধারে নির্জ্জন স্থানে লইয়া গিয়া বালিকার পায়ে কতকগুলি ইট বাঁধিয়া খালের জলে ফেলিয়া দিয়া পাষণ্ড দৌড়িয়া বাড়ী পলায়ন করিল। ভাগ্যক্রমে 'আকুলের' পায়ের বন্ধন দৃঢ় হয় নাই, সহজেই খুলিয়া গেল, 'আকুল' রক্ষা পাইল। রমণী নিকটস্থ এক আত্মীয়ের বাটীতে আশ্রয় লইল। পরদিন পুলিশ সংবাদ পাইয়া 'আকুলকে' হাসপাতালে পাঠাইয়া দেয়। চিকিৎসায় 'আকুল' সুস্থ হইল, পুলিশ 'আকুলকে' অস্ত্রাঘাত করার জন্ম তাহার স্বামীকে ৩২৪ ধারার অপরাধে চালান দিলেন।

এদিকে এক মুসলমান যুবক, বালিকার রূপে মুগ্ধ হইয়া, হাফুসেখ নামক 'আকুলের' দূর সম্পর্কীয় এক চাচাকে মুরুব্বি ধরিল। হাফু টাকার দাবী করিলেন। টাকা পাইলে 'আকুলের' সহিত তাহার সহজেই নিকা দিয়া দিতে পারেন প্রকাশ করিলেন; রূপমুগ্ধ যুবক টাকা সংগ্রহ করিল। মোকদ্দমার দিন উক্ত যুবকের সহিত হাফু আদালতে আসিয়া আসামী পক্ষের মুরুব্বিগণের সহিত রফার প্রস্তাব করিল। ৪০টি টাকা নগদ দিয়া 'জীবন' 'আকুলকে' তালাক দিতে (পরিত্যাগ করিতে) সম্মত হইলে রফা হইতে পারিবে শুনিয়া, 'জীবন' ও তাহার মুরুব্বি সম্মত হইল। ৩২৪ ধারার মোকদ্দমা কেবল বাদিনীর ইচ্ছায় মিটিতে পারে না, এজন্য উকীল মোক্তারগণ সকলে একত্র হাকিমের সম্মতি লইলেন। ভিতরের এত ব্যাপার 'আকুল' এপর্য্যন্ত কিছুই জানিতে পারে নাই। ৫০টী টাকা আসামী পক্ষ হইতে 'আকুলকে' দেওয়া হইলে সেই টাকা 'আকুল' হাফুর হস্তে দিল। হাফু পরম পরিতুষ্ট হইয়া 'আকুলকে' আনন্দ সাগরে নিমগ্ন করিবার অভিলাষে যখন প্রস্তাবিত 'তালাক ও নূতন নিকার' কথা তাহাকে জানাইল তখন সে স্তম্ভিত হইয়া বলিল, 'তবে আমি আমার স্বামীকে আর দেখিতে পাইব না? পর পুরুষের সঙ্গে আমায় যাইতে হইবে?' এই কথা বলিয়া সে এককালে স্বামী 'জীবনের' পদযুগল ধরিয়া কাঁদিয়া পড়িল; বলিল, 'দোহাই তোমার আমাকে তুমি পরিত্যাগ করিও না, আমাকে কোথায় ভাসাইয়া দিবে? আমার আর কে আছে?' দর্শকবৃন্দ এই ব্যাপার দেখিয়া বিস্মিত হইলেন, 'জীবন' তাহার হাত ধরিয়া তুলিল। বালিকার সম্পূর্ণ বিশ্বাস হইল না; সে স্বামীর পশ্চাৎ দিক হইতে কোমর জড়াইয়া ধরিল। কিছুতেই ছাড়িবে না; হাফু, 'আকুলকে' অনেক উপদেশ দিল, কত ভয় দেখাইল, বলিল 'অমন স্বামীর মুখ দেখিতে নাই। এবার গেলে মেরে ফেলিবে' খুন করিবে, আর

খবরদার তুই এর সঙ্গে যাবি ?' বালিকা এ সকল কথায় ভুলিল না। উত্তরে বলিল, 'হায়াৎ মোৎ (জীবন মরণ) খোদার হাত। যদি খোদার মর্জ্জি হয়, তবে ইহার হাতেই মরিব। মরণ ত লোকের দুইবার হয় না ?' আবার স্বামীকে বলিল 'এবার যদি খাশুড়ী তোমাকে কিছু বলে তুমি আমাকে একবারে জবাই (কাটিয়া ফেলা) করো আধমারা করো না; এতে আমার বড় কষ্ট হয়েছিল। আমি এই আপন মুখে আদালতে বলে যাচ্ছি, আমার প্রাণের জন্য তোমার উপর কোন দাবী চলিবে না। এবারেও ত আমি তোমার নামে নালিশ করি নাই, পুলিশ আমাকে ধরে বেঁধে পাঠিয়ে দিয়েছে।' সরল হৃদয়া বালিকার মধুমাখা বাক্যে সকলেই বিমোহিত হইলেন। কিন্তু হাফু চাচা দেখিলেন তাহার উপদেশাদিতে কোন ফল হইল না, তখন সে তাহাকে প্রলোভনে বশ করিবার চেষ্টা করিল। বলিল 'আকুল! তোর আক্কেল হয় নাই, তাই প্রাণের মায়া রাখছিস্ না, এই স্বাধ শুধু তালাক্ নয় আবার কত টাকা পাইতেছিস্ এ সমস্ত তুই পাইবি অথচ নূতন ঘরকন্না সব মিলিবে।'

বালিকা বলিল, কৈ টাকা ? হাফু হাফ ছাড়িয়া টাকাগুলি 'আকুলের' হাতে দিল, ভাবিল বুঝি ফল ফলিল। 'আকুলসুন্দরী' ঐ টাকা গুলি লইয়া স্বামীর চরণপ্রান্তে রাখিয়া বলিল 'এই তোমার টাকা তুমি লও আমার টাকায় দরকার নাই।' হাফু চাচাকে বলিল 'একজন নূতন লোক আমার হাত ধরে নিয়ে যাবে, তা আমার সহ্য হবে না। তার চেয়ে আমার মরণ ভাল।' তখনও কিন্তু বালিকা স্বামীর কোমর ছাড়ে নাই। দর্শকেরা সকলে মিলিয়া 'জীবনকে' অত্যন্ত ভর্ৎসনা করিতে লাগিল। অবশেষে জীবন বলিল 'আর আমি তোমায় ছাড়িব না; এবার যদি মা বকে, তবে আমি তোকে নিয়ে বিদেশে চলে যাব।—হাওড়া হিতৈষী।

বঙ্গদেশের মৃত্যুসংখ্যা—১৮৯৪ সাল হইতে ১৮৯৬ সাল পর্য্যন্ত প্রতি বৎসর যত লোকের মৃত্যু হইয়াছে, ১৯০০ সাল হইতে ১৯০২ সাল পর্য্যন্ত প্রতি বৎসর গড়ে ৮৭,৭৩৪ জনের বেশী মৃত্যু হইয়াছে। এই ৮৭,৭৩৪ এর মধ্যে ৭৮,৮৭৫ জনই এক বৎসরের কম বয়স্ক বালক বালিকা। ১৮৯৯ সাল হইতে শিশুদের মৃত্যুর সংখ্যা অত্যন্ত বেশী দেখা যাইতেছে। মৃত্যুর তালিকা দৃষ্টে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যাইতেছে যে বঙ্গদেশের জল বায়ু কিরূপ দূষিত হইয়াছে। পূর্ব্বাপেক্ষা মৃত্যু সংখ্যাও দিন দিন বাড়িতেছে। বিশেষতঃ এক বৎসরের কম বয়স্ক বালক বালিকাদের মৃত্যুর তালিকা দেখিয়া প্রাণ শিহরিয়া উঠে। আহা, কত রমণী গৃহে গৃহে প্রাণপ্রিয় সন্তানের শোকে হাহাকার করিতেছে। বঙ্গের ছোটলাট শিশুদের মৃত্যুর কারণ নির্ণয় করিবার জন্য বিশেষ অনুরোধ করিয়াছেন। বাল্য-বিবাহ, মাতার ও ধাত্রীর অজ্ঞতা ও অস্বাস্থ্যকর সূতিকা গৃহই শিশুর মৃত্যুর প্রধান কারণ। বালিকাদিগকে উত্তমরূপে পারিবারিক স্বাস্থ্যরক্ষা প্রণালী শিখাইবার আয়োজন প্রত্যেক বালিকা বিদ্যালয়ে হওয়া উচিত। যাহাতে অন্তঃপুরবাসিনী রমণীরা সন্তান পালন ও স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়ম শিখিতে পারেন তজ্জন্য ও চেষ্টা করা প্রয়োজন। আমাদের অজ্ঞতায় কত প্রাণপ্রিয় আত্মীয় স্বজন অকালে কালগ্রাসে পতিত হইতেছে। যতদিন এই সকল বিষয় সংস্কার করা না হইবে ততদিন মৃত্যু সংখ্যা হ্রাস হইবে না।

রুক্মিণী সভা।—ইণ্ডিয়ান লেডিজ

ম্যাগাজিন পত্রিকার জনৈক ইংরাজ লেখিকা এক অতি সুন্দর ও সময়োপযোগী প্রস্তাব করিয়াছেন, তাহা এই—যে ভারতীয় মহিলাদের স্বাস্থ্যরক্ষিণী সভা স্থাপন করিয়া স্থানে স্থানে মহিলাদের মধ্যে স্বাস্থ্যের নিয়ম সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান ও স্বাস্থ্যরক্ষা, সন্তান পালন সম্বন্ধে উপকারী পুস্তক ও পুস্তিকা প্রকাশ ও প্রচার করা। আমরাও এই প্রস্তাবে আন্তরিক সহানুভূতি জ্ঞাপন করিতেছি। বঙ্গদেশের অনেক রমণী চিকিৎসা বিদ্যা শিখিয়া জীবিকা উপার্জ্জন করিতেছেন। তাঁহারা ও অপর শিক্ষিতা মহিলাগণ সম্মিলিতা হইয়া যদি এই প্রস্তাবানুযায়ী কার্য্য এতদঞ্চলে করেন; তাহা হইলে দেশের মহদুপকার সাধিত হইতে পারে। আশা করি ভারত গবর্ণমেণ্টও এ বিষয়ে সাহায্য করিবেন। যে সকল রোগে সচরাচর এদেশে মৃত্যুসংখ্যা অধিক তাহার প্রতিবিধানার্থও দেশের জল বায়ু সংশোধন করা গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্য।

বিড়ালের বুদ্ধি—ইংলণ্ডের কোন নগরের একটী গৃহে রাত্রিতে অগ্নি লাগে সে সময় গৃহ স্বামী নিদ্রিত ছিল। তাহার পোসা একটী বিড়াল বিপদ উপস্থিত দেখিয়া গৃহস্বামীর গাত্রে বারবার তাহার পায়ের দ্বারা আঘাত করিতে লাগিল তাহাতে ঐ ব্যক্তির নিদ্রা ভঙ্গ হইল। জাগিয়া দেখিল ঘরের চালে আগুন, অমনি সে তাহার একটী ভগিনী সহ গৃহ হইতে বহির্গত হইল। তাহারা বহির্গত হওয়া মাত্র গৃহের ছাদ ভাঙ্গিয়া পড়িল। বিড়ালের বুদ্ধিতে দুইটী মানবের প্রাণ রক্ষা হইল।

বৃদ্ধার উৎসাহ—ইংলণ্ডে ৯৬ বৎসরের একটী বৃদ্ধা বাল্যকাল হইতে অদ্যাপি নিয়মিত রূপে ধর্ম্মালয়ের উপাসনা ও উপদেশাদি শ্রবণে যোগ দান করিতেছে। প্রত্যহ নিয়মিত সময় শিল্প কার্য্য ও পাঠাদি কার্য্য করিয়া থাকেন। তাঁহার দৃষ্টি শক্তি অদ্যাপি এমন সুন্দর রহিয়াছে যে তাঁহাকে চসমার সাহায্য গ্রহণ করিতে হয় না।

শিক্ষয়িত্রীগণের সমিতি—সম্প্রতি লক্ষ্ণৌর ইসাবেলা থোবর্ণ কলেজ গৃহে উত্তর পশ্চিম অঞ্চলের বালিকা বিদ্যালয় সমূহের শিক্ষয়িত্রীগণের সমিতির ষষ্ঠ বার্ষিক অধিবেশন হইয়াছে। নানাস্থানের শিক্ষয়িত্রীগণ বিদ্যালয়ে শিক্ষাদান সম্বন্ধে জ্ঞানগর্ভ প্রবন্ধ পাঠ ও শিক্ষাদান প্রণালী বিষয় আলোচনাদি করিয়াছিলেন। প্রবন্ধ লেখিকাগণের সকলেই প্রায় পাশ্চাত্য দেশীয়া। বঙ্গদেশে নানা স্থানে বালিকা বিদ্যালয় সমূহে বঙ্গবাসিনী রমণীগণ শিক্ষয়িত্রীর কার্য্য করিতেছেন; তাঁহারাও যদি গ্রীষ্ম কিম্বা পূজার অবকাশে এই রূপ সম্মিলিতা হইয়া, শিক্ষাদান প্রণালী সম্বন্ধে আলোচনাদি করেন, তাহা হইলে তাহাদের ও ছাত্রীদিগের মঙ্গল সাধিত হইতে পারে। সৎ যাহা তাহা সকলেরই অনুকরণীয়।

বিধবা বিবাহ।—গত ৩০এ সেপ্টেম্বর মান্দ্রাজের অন্তর্গত গণ্টুর নগরে তথাকার উকীল শ্রীযুক্ত ডি, লক্ষ্মীনারায়ণের বাটীতে এক বিধবা বিবাহ হইয়া গিয়াছে। কন্যা শ্রীমতী বঙ্কুবাইর বয়স ১৭ বৎসর। বরের নাম মিঃ পি, কৃষ্ণমূর্ত্তি, বয়স ২৩ বৎসর। ইনি বহরমপুরে শিক্ষকতা কার্য্য করেন।

হিন্দু বালিকা কলেজ।—মিসেস্ এনি বেশান্ত হিন্দুবালকদের নিমিত্ত কাশীতে যেরূপ এক কলেজ স্থাপন করিয়াছেন, হিন্দুবালিকাদের জন্যও তদ্রূপ এক কলেজ স্থাপনের সংকল্প

করিয়াছেন। এই কার্য্যে কলেজের জমি ও গৃহ ব্যতীত ৬লক্ষ টাকা মূলধন সংগ্রহার্থ তিনি ইচ্ছা করিয়াছেন,—তাহার আয় হইতে এই কলেজের ব্যয় নির্ব্বাহ হইবে। স্থায়ী মূলধন ব্যতীত কোন বিদ্যালয় সুপরিচালিত হইতে পারে না। তিনি ইতিমধ্যেই তিন লক্ষ টাকার যোগাড় করিয়াছেন, তিনি যে কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন, তাহা যে সংসিদ্ধ করিয়া তুলিবেন, তাহাতে আশঙ্কা হয় না। প্রথমে ছাত্রী সংখ্যা আশানুরূপ না হইতে পারে, তাহাতে ভগ্নোদ্যম হইবার কোনই কারণ নাই; কালে শিক্ষার্থিনীর অভাব হইবে না। কলিকাতার বেথুন কলেজই তাহার দৃষ্টান্ত স্থল।

প্রাচীন চিত্র।—খৃষ্টজন্মের ২৫০০ বৎসর পূর্ব্বে একখানি পুরাতন চিত্র পাওয়া গিয়াছে। এত পুরাতন চিত্র আর কোথাও পাওয়া যায় না।

বালকের শিক্ষার ব্যয়।—সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার চ্যানিং বলিয়াছেন, "বালকের শিক্ষা ও চরিত্রের উন্নতির জন্য ব্যয় করিতে কুণ্ঠিত হইও না। অন্য বিষয় কৃপণতা করিয়াও বালক বালিকার শিক্ষার জন্য মুক্তহস্ত হইবে।

বিলাত যাত্রা।—কুমারী কৃষ্ণস্তোমা এম, এ, মান্দ্রাজবাসিনী মহিলা ইংলণ্ডে শিক্ষালাভের জন্য যাত্রা করিয়াছেন।

স্ত্রীশিক্ষা।—সম্প্রতি আয়র্লণ্ডের বেলিন বিশ্ববিদ্যালয় পরীক্ষার্থিনী মহিলাদের উপাধি লাভের অধিকার প্রদান করিয়াছেন।

অষ্ট্রেলিয়াতে কুমারী গ্রেটা নাম্নী এক মহিলা উকালতি পরীক্ষায় উত্তীর্ণা হইয়া ব্যবসায় করিবার অধিকার পাইয়াছেন, ইংলণ্ডে রমণীদিগকে উকালতি ব্যবসায় করিতে দেওয়া সম্বন্ধে আন্দোলন হইতেছে।

গবর্ণমেণ্টের সদাশয়তা।—মালদহের লেডি ডাক্তারের নাম বোধ হয় অনেকেই জানেন, লেডি ডাক্তারের প্রতি অত্যাচার করিবার জন্য মালদহের জমিদারের কারাদণ্ড হইয়াছে। এবং উক্ত মহিলা চিকিৎসককে গবর্ণমেণ্ট ৫০০৲ শত টাকা তাহার ব্যবসার ক্ষতিপূরণ স্বরূপ দান করিয়াছেন।

মহিলা চিকিৎসক।—সম্প্রতি জনৈক মহিলা চিকিৎসক জাহাজে ডাক্তার হইয়াছেন। ইতিপূর্ব্বে কোনও মহিলাকে উক্ত কার্য্যে নিযুক্ত করা হয় নাই।

সৎসাহস।—সম্প্রতি কলিকাতার গঙ্গাগর্ভে নিমগ্না একটী বৃদ্ধাকে জনৈক বাঙ্গালী যুবক উদ্ধার করিয়াছেন; আমাদের জনৈক ইংরাজ কর্ম্মচারী ও নদী গর্ভ হইতে একটী নারীকে রক্ষা করিয়াছিলেন। ইহাকেই বলে প্রকৃত সাহস।

ঠিকানা পরিবর্ত্তন।—অন্তঃপুর আফিস ৫২ নং সুকিয়া ষ্ট্রীটে উঠিয়া আসিয়াছে। অতঃপর চিঠি পত্রাদি এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

আমরা বর্ত্তমান অগ্রহায়ণ মাস হইতে এক পয়সা মাশুলে পত্রিকা পাঠাইবার সুবিধা পাইয়াছি। কিন্তু পূর্ব্বে এক পয়সায় ৪ তোলা ওজন যাইত। ১৯০৪ সালের জানুয়ারী হইতে ৬ তোলা যাইবে, সুতরাং আমাদের পত্রিকা ৪ তোলার অধিক বলিয়া বাধ্য হইয়া ১লা জানুয়ারী পত্রিকা পাঠাইতে হইল।

ম্যানেজার অন্তঃপুর পত্রিকা।
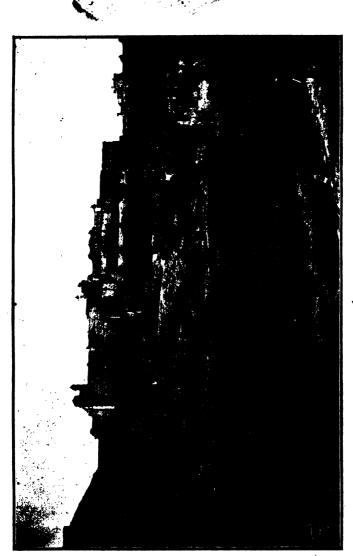
অম্বর দুর্গ—জয়পুর।

অন্তঃপুর

সচিত্র মাসিক পত্রিকা।

ANTAHPUR

AN ILLUSTRATED MONTHLY JOURNAL IN BENGALI

Edited and contributed to by the ladies only.

কেবল মহিলাগণ কর্ত্তৃক লিখিত ও সম্পাদিত।

পরিবার হয় যদি নন্দনের প্রায়,
পুণ্য প্রেম পারিজাত ফুটে যদি তায় ;
মানব দেবতা হবে তাতে ভুল নাই,
এ কাজ তোমারি নারি, মনে রেখো তাই !

৬ষ্ঠ বর্ষ।	পৌস ১৩১০ বঙ্গাব্দ	VOL. VI
৯ম সংখ্যা	JANUARY, 1904.	No IX.

একান্নভুক্ত পরিবারের অশান্তি নিবারণের উপায় কি ?

দয়াময় পরমেশ্বর আমাদিগকে এই বিশ্বরাজ্যে প্রেরণ করিয়াছেন, আমাদের সুখ বিধানের নিমিত্ত, পিতা, মাতা, ভ্রাতা, ভগিনী প্রভৃতি আত্মীয় স্বজনে পরিবেষ্টিত করিয়া প্রাণ রক্ষার উপায় করিয়া দিয়াছেন। ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র মাতার অকৃত্রিম স্নেহ যদি সদ্যোজাত ক্ষুদ্র শিশুর প্রতি অর্পিত না হইত, তবে কি মুহূর্ত্তকালও আমরা জীবন ধারণ করিতে সক্ষম হইতাম ? এইরূপ ঈশ্বরের বিধানে, আমরা যথা নিয়মে যাহার নিকট হইতে আমাদের যাহা প্রাপ্য তাহা অযাচিত ভাবে পাইয়া আসিতেছি। তাহার জন্ত আমাদিগকে ব্যস্ত হইতে হয় না। আকাঙ্খাও করিতে হয় না। নদীর স্রোত যেমন নিম্নদিকে স্বতঃই ধাবিত হয়, কোন চেষ্টা করিবার আবশ্যক হয় না ; সেইরূপ আমাদের যাহার সঙ্গে যে সম্বন্ধ, যাঁহার নিকট যে প্রাপ্য, তাহা অনায়াসে লাভ করিতেছি। পিতা মাতার অতুল স্নেহ, ভ্রাতা ভগিনীর ভালবাসা, স্বামীর অকৃত্রিম প্রেম, সন্তানের ভক্তি আমাদের মনকে সতত স্নিগ্ধ রাখিতেছে। কিন্তু আমরা কি ক্ষণেকের তরেও, সেই অনন্ত কীর্ত্তিশালী, পরম কৃপাবান, বিশ্বনিয়ন্তা, বিধাতা আমাদের প্রতি কি গুরুতর কর্ত্তব্য ভার ন্যস্ত করিয়া এই বিশ্বসংসারে প্রেরণ করিয়াছেন, তাহা চিন্তা করিয়া থাকি? হায়, আমরা

যে জ্ঞানান্ধ, তাই আমরা আমাদের কর্ত্তব্য-পথ চিনিয়া লইতে অক্ষম, আমাদের সেই চির-প্রণম্য মহানপুরুষের আদেশ অগ্রাহ্য করিয়া কেবলই পাপ পথে পরিচালিত হইতেছি। তিনি স্নেহ, প্রেম, করুণা, ভক্তি, ক্ষমা, ধৈর্য্য প্রভৃতি যে সমস্ত সদ্‌গুণ দান করিয়াছেন, তাহাতে ভূষিত হইয়া কোথায় জীবন ধন্য করিব, তাহা না করিয়া, কেবলই তাহার অপব্যবহার করিতেছি। দ্বেষ, হিংসা পরশ্রীকাতরতা ইত্যাদির বশবর্ত্তী হইয়া, লোক সমাজে ঘৃণাস্পদ হইয়া, অতি হেয় ভাবে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া ইহ সংসার হইতে বিদায় গ্রহণ করিতেছি। ইহাতে আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য সফল হওয়া ত দূরের কথা, আরও পাপ ভারে পৃথিবীকে প্রপীড়িত করিতেছি। এবং সেই কুদৃষ্টান্তের অনুসরণ করিয়া কত লোকে ক্ষতিগ্রস্থ হইয়া দুঃখের মাত্রা বৃদ্ধি করিতেছি। একতা সংসারের শ্রীবৃদ্ধি সাধনের সহায়তা করে; কিন্তু আজকাল আমাদের শিক্ষার দোষে অন্তরের ভাব অতিশয় সঙ্কীর্ণ হইয়া পড়িতেছে। নিতান্ত আত্মীয়, এমন কি জীবনাধিক সহোদর ভ্রাতাও পরের ন্যায় গণ্য হন এবং তাঁহার সঙ্গেও দূর সম্পর্কীয়ের ন্যায় ব্যবহার দৃষ্ট হইয়া থাকে, ইহা বড়ই পরিতাপের বিষয়। আজকাল পুরুষ ও স্ত্রীজাতি উভয়ের মধ্যেই যেরূপ শিক্ষার বিস্তৃতি হইয়াছে, তাহাতে তাঁহাদের অন্তরে উদার ভাবের বৃদ্ধি করিয়া সমাজের শ্রীবৃদ্ধি সাধনের জন্য চেষ্টা করা উচিত। একালের শিক্ষা প্রাপ্ত পুরুষ ও রমণী অপেক্ষা সে কালের অল্প বিদ্যা সম্পন্ন পুরুষ ও নিরক্ষরা রমণীর মন অনেকাংশে প্রশস্ত ছিল। তাঁহারা দূর সম্পর্কীয় লোকের সঙ্গেও অতি নিকট আত্মীয়ের ন্যায় ব্যবহার করিতেন, এবং বহু গোষ্ঠী একত্র প্রতিপালিত হইয়া নির্ব্বিকার চিত্তে জীবন যাপন করিতে সক্ষম ছিলেন। আজকাল ইংরাজী সভ্যতার অনুকরণে আমাদের দেশের অধিকাংশ লোকই স্বাধীনভাবে বাস করিতে ভালবাসেন অর্থাৎ অভিভাবকের অধীনতা তাঁহাদের নিকট অসহ্য কষ্ট বলিয়া জ্ঞান হয়। কেবল নিজ নিজ স্ত্রী পুত্র কন্যা লইয়া এক একটী পরিবার গঠন করিয়া মহা সুখে কালযাপন করিতেই সতত উৎসুক। অন্যান্য আত্মীয় স্বজনের বিপদে অথবা সম্পদে কেহ কাহারও অংশী নহেন। ইহাতে লাভের মধ্যে এই হয় যে, স্বইচ্ছায় মানসিক সৎ প্রবৃত্তি বিকাশের পথ রুদ্ধ করিয়া, কেবল মাত্র স্বার্থপরতার ক্রোড়ে আত্ম বিসর্জ্জন দিয়া, মনুষ্যত্ব বিসর্জ্জিত হইয়া সংসারে অতি হেয় ভাবে জীবন কাটাইতে হয়। এইরূপ মনুষ্যত্ব বিহীন হইয়া সংসারে বাস করা কোন প্রকারেই বাঞ্ছনীয় নহে। সত্য বটে বহু পরিবার একত্র বাস করিতে হইলে, অনেক প্রকার অসুবিধা হইবার সম্ভাবনা, কিন্তু আমরা যদি এ বিষয়ে সাবধান হই, তবে তাহা হইতে অনেকটা নিস্তার পাইতে পারি। বহু পরিবার একত্র থাকিতে হইলে তাহাতে এমন একজন সুদক্ষ নেতার প্রয়োজন, যিনি শত ঝঞ্ঝাট অম্লানবদনে সহ্য করিয়া সংসারের সুব্যবস্থা করিতে পারেন, এইরূপ একজন পুরুষ অথবা রমণীর প্রতি সংসারের ভার ন্যস্ত হইলে পরিবারবর্গের মধ্যে কেহ কখনও কোনরূপ অসাচ্ছন্দ্য অনুভব করিতে পারিবে না। যিনি সংসারের কর্তৃত্ব ভার গ্রহণ করিবেন, তাঁহাকে বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করিয়া চলিতে হইবে। তাঁহার

হৃদয়ে স্বার্থপরতা দ্বেষ হিংসা প্রভৃতি কখনও যেন স্থান না পায়; তাঁহাকে নিষ্কাম ভাবে সংসার পরিচালিত করিতে হইবে। যিনি শিক্ষাগুরু, যাঁহার আদেশে সংসার চালিত হইবে, তাঁহারই যদি কর্ত্তব্য সাধনে ত্রুটী হইল, তিনিই যদি স্বার্থ দ্বারা আকৃষ্ট হইলেন, তবে আর সংসারে সুশৃঙ্খলার আশা কোথায়? তাঁহার হীন দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিয়া সংসারে অচিরেই অশান্তির আগুণ প্রজ্জলিত হইয়া তাহা ছারখার করিবে। কাজেই এ বিষয়ে বিশেষ সাবধানতার আবশ্যক। পরমেশ্বর তাঁহার সৃষ্ট প্রত্যেক পদার্থের মধ্যে আমাদিগের জন্য কেমন সুন্দর উপদেশ নিহিত করিয়া দিয়াছেন, একটু অনুসন্ধান করিলেই আমরা তাহা বুঝিতে পারি। আমরা দেখিতে পাই পরম পিতার আদেশে সূর্য্য কেমন অবিচলিত ভাবে উত্তাপ ও আলোক প্রদান করিয়া এই জীব জগতের প্রাণ রক্ষা করিতেছেন! তাঁহার অন্য কোন লক্ষ্য নাই, কেবলই স্বীয় প্রভুর আদেশ অবিরত অশ্রান্ত ভাবে পালন করিয়া সৃষ্টি মাহাত্ম্য প্রচার করিতেছেন। সেইরূপ গৃহকর্ত্তারও সেই দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া পিতার আদেশ মাত্র স্মরণে রাখিয়া নিজ সুখ দুঃখ ভুলিয়া তাঁহাদের প্রতি যে গুরুতর কর্ত্তব্যভার অর্পিত হইয়াছে, তাহা বুঝিয়া চলা কর্ত্তব্য। আলস্য পরায়ন অথবা অসহিষ্ণু ব্যক্তি কখনও সংসারধর্ম্ম পালন করিবার উপযুক্ত নহেন; কারণ সংসারের প্রতি খুঁটিনাটি বিষয়ের আলোচনা করিতে হইবে, কোন্‌টী সঙ্গত কোন্‌টী অসঙ্গত প্রত্যেক বিষয় অতি ধীরভাবে বিচার করিয়া নির্দ্দেশ করিতে হইবে। অসহিষ্ণু হইলে ন্যায়ান্যায় বিচার থাকে না, কাজেই বিচারের দোষে একজনের ত্রুটী অপরের প্রতি স্থাপিত হইলে সংসারে মনোমালিন্য সঞ্চারের সম্ভাবনা। নিরপেক্ষভাবে দোষ গুণ বিচার না করিলে বহু সংখ্যক লোক একত্র বাস করা সম্ভবপর হইতে পারে না। সংসারের মধ্যে স্বেচ্ছাচারিতা বর্ত্তমান থাকিলে তাহাতে কেবলই বিষময় ফল উদগীরণ করে এই জন্যই এক জন গণ্য মান্য সুশিক্ষিত ব্যক্তির হস্তে কর্ত্তৃত্ব ভার অর্পন করা আবশ্যক সংসার একটী ক্ষুদ্র বিষয় বলিয়া আমাদের মনে হইতে পারে, কেননা আমরা দেখিতে পাই যেভাবে সেভাবে কোন প্রকার গ্রাসাচ্ছাদনের যোগাড় করিয়া দিন কাটাইয়া দিতে পারিলেই জীবনের শেষ সীমায় উপনীত হওয়া যায়। তাহার পর মৃত্যুতে গ্রাস করিবে। মৃত্যুর পর কি আছে কে জানে? জীবনে কি কার্য্য করিলাম তাহা ত আর এ সংসারে কাহারও নিকট কৈফিয়ৎ দিতে হইবে না? বা সেজন্য বিশেষ কোন দণ্ডও পাইতে হইবে না, তবে কেন এত আয়োজন? আমাদের মনে যদি এইরূপ নাস্তিক ভাবের উদয় হয়, তাহা হইলে সংসারে থাকিয়া এমন কোন্ পাপ কার্য্য আছে যাহা, আমাদের দ্বারা সংসাধিত হইতে না পারে? কিন্তু তাহা হইলে মানবে পশুতে প্রভেদ রহিল কোথায়? কোন জীবই ত অভুক্ত থাকেনা, যে রূপেই হউক আহার এবং বাসস্থান যুটাইয়া লয়। একটা প্রবাদ আছে "মানব জন্ম বড়ই দুর্ল্লভ," কিসের জন্য? ইহার মর্ম্ম কি?—মানবাত্মা শুধু গ্রাসাচ্ছাদনে সন্তুষ্ট নহে তাহারা এমনি আরও কিছু চায় যাহাতে মন পবিত্র হয়, জীবন ধন্য হয়, পাপই বা কি? পুণ্যই বা কি? ধর্ম্ম কি? অধর্ম্ম কি? সুখ কিসে হয়, অসুখই বা

কিসে জন্মে? সমস্তই তাহারা বিবেক বুদ্ধি অনুসারে স্থির করিয়া লইতে পারে এই জন্য মানব জন্ম জগতে আরাধনীয় এবং দুর্লভ বলিয়া বিদ্বান ভক্তমণ্ডলীগণ প্রচার করিয়া গিয়াছেন। বিশ্বস্রষ্টার অতি ক্ষুদ্র বালু কণা সমূহ লইয়া আমাদের সংসার গঠিত। তিনি আমাদিগকে বুদ্ধিবৃত্তি দান করিয়াছেন আমাদের সুখ দুঃখ কতকটা আমাদের আয়ত্তাধীন। কিসে আমাদের সুখ স্বচ্ছন্দতা বৃদ্ধি হইতে পারে, সে বিষয়ে আমাদের দৃষ্টি অল্প, কিন্তু আমরা আমাদের বুদ্ধির দোষে নিজেই নিজেদের দুঃখ বৃদ্ধির হেতু হইয়া অদৃষ্টের নিন্দা করিয়া থাকি, এমন কি আমাদের অনন্ত সুখদাতা পরমেশ্বরের প্রতিও দোষারোপ করিতে কিছু মাত্র দ্বিধা বোধ করি না, অথচ কিসের জন্য এই দুঃখ ঘটিল তাহার কারণানুসন্ধানে আমাদের কিছু মাত্র যত্ন নাই। জীবন সুখময় করিতে হইলে তাহার জন্য অনেক চেষ্টার, অনেক আয়োজনের আবশ্যক। অবহেলা করিলে কোন কার্য্যই সুচারুরূপে নিষ্পন্ন হইতে পারে না। শিক্ষা জীবনোন্নতির পক্ষে প্রধান সহায়. শিক্ষার প্রভাবে আমাদের হৃদয়স্থিত কুসংস্কাররূপ অন্ধকার বিদূরিত হইয়া জ্ঞানের আলোকে উদ্ভাসিত হয়, এবং তখন আমরা অনায়াসে আমাদের কর্ত্তব্য পথ চিনিয়া লইয়া আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য পালন করিতে সক্ষম হই। এই পৃথিবীতে শিখিবার এত বিষয় আছে যে মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হওয়া অবধি জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত শিখিলেও আমরা তাহার অন্ত পাই না। পরিতাপের বিষয় এই, আমরা আলস্য পরবশ হইয়াই সৎশিক্ষারূপ এমন অমূল্য বিষয়ের প্রতি অনাস্থা প্রদর্শন করিয়া নিজ নিজ জীবন কেবল দুঃখের আধার রূপে পরিণত করিয়া তুলি। বুদ্ধিবৃত্তি সম্পূর্ণ বিকাশপ্রাপ্ত না হইলে সংসারে কাহার প্রতি কি কর্ত্তব্য তাহা আমরা হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হই না; এই কারণে আমাদের প্রত্যেকেরই বিদ্যালোচনা করিয়া যাহাতে সৎশিক্ষার দ্বারা আমাদের হৃদয় উন্নত হয়, সে বিষয়ে মনোযোগী হওয়া কর্ত্তব্য। শৈশবকাল হইতে আমরা সৎশিক্ষা প্রাপ্ত হইলে তাহার সহায়তায় আমাদের চিত্ত সেই দিকেই আকৃষ্ট হইয়া উদারতার ন্যায় মহৎ গুণ আমাদের জীবন অলঙ্কৃত করিয়া পুণ্যপথে পরিচালিত করিতে পারে। হিংসা দ্বেষ প্রভৃতি কুপ্রবৃত্তির প্রশ্রয় লইয়া প্রতিনিয়ত আমরা এই সংসারধামে কতই না পাপকার্য্য সংসাধিত করিতেছি। এমন কি নিজেদের প্রাণ হইতে প্রিয় আত্মীয় স্বগণের সহিত অকারণে মনোমালিন্যের সঞ্চার করিয়া, সেই চির অভিলষিত সংসারাগার নিতান্তই শান্তি বিহীন করিয়া তুলি। আমাদের অবিবেচনার ফলে সংসারে যখন আত্মকলহরূপ ভীষণ অগ্নি প্রজ্জলিত হইয়া উঠে, তখন আমাদের এমন সাধ্য থাকে না যে, তাহার গতি রোধ করি। সংসারে স্বেচ্ছাচারিতা বর্ত্তমান থাকিলে তাহাতে কোনও একটা বন্ধন থাকে না, কাণ্ডারীবিহীন তরণী যেমন বিপথে পরিচালিত হয় এবং ক্রমে ক্রমে তাহার অসাধ্যতাহেতু অতলে নিমজ্জিত হয়, সেইরূপ আমাদের সংসারাশ্রমে যদি একজন উপযুক্ত ব্যক্তি তাহার নেতৃত্ব গ্রহণ না করেন, তাহা নিতান্তই অবলম্বনহীন তরীর ন্যায় উচ্ছৃঙ্খলতা প্রাপ্ত হয়; এবং তাহাতে নানাবিধ অসচ্ছন্দতা দৃষ্ট হয়।

প্রত্যেক মনুষ্যের জীবনের মধ্যেই দোষ গুণের সমাবেশ দেখিতে পাওয়া যায়, যদি আমরা সকলেই স্ব স্ব প্রবৃত্তির স্রোতে গা ভাসাইয়া চলি এবং তাহার গতি রোধ করিবার ক্ষমতা কাহারও প্রতি অর্পণ না করি, তবে নানারূপ অনর্থপাতের আশঙ্কা প্রচুর পরিমাণে ঘটিবার সম্ভব। কেন না অধিকাংশ লোকই নিজের ত্রুটী স্বীকার করিতে ভালবাসেন না এবং আপনার মধ্যে দোষ অপেক্ষা গুণের ভাগই অধিক বলিয়া মনে করেন; কাজেই শাসনাভাবে আমাদের মধ্যে যথেচ্ছাচারিতা বৃদ্ধি পাইয়া থাকে ও তাহাতে নানাবিধ অনিষ্টও ঘটিতে দেখা যায়। তবে প্রত্যেক সংসারেই যে এমনটী ঘটিবে তাহার কোনও নিশ্চয়তা নাই। বিদ্বান বুদ্ধিমান ব্যক্তিগণ আপন আপন স্ত্রীপুত্র কন্যা দাস দাসী পরিবেষ্টিত হইয়া ধর্ম্মপথে থাকিয়া কত সুখে কাল কাটাইতেছেন, সে দৃষ্টান্তের যদিও অভাব নাই, তথাপি যদি আমরা আপনার আত্মীয় স্বজন প্রত্যেকে পৃথক পৃথক ভাবে নিরুপদ্রবে বাস করিতে স্পৃহনীয় না হইয়া যাহাতে সমগ্র পরিবার একত্র হইয়া নির্ব্বিবাদে বাস করিতে পারি তাহাই আমাদিগের অধিক বাঞ্ছনীয় হওয়া উচিত। কারণ আপনার জনকে যত্ন করিতে সকলেরই আগ্রহ জন্মিয়া থাকে, এমন কি নিজের প্রাণ বিসর্জ্জন করিয়াও যদি তাহাদের সুখবিধান আবশ্যক হয়, তাহাতেও কেহ পশ্চাৎপদ নহেন, এরূপ দৃষ্টান্ত বিরল নহে, এবং ইহাতে আশ্চর্য্যের বিষয়ও কিছু নাই। কিন্তু তাহা হইলে ঈশ্বরপ্রদত্ত সেই অমূল্য নিধিচয়ের (স্নেহ প্রেম ক্ষমা ধৈর্য্য) সদ্ব্যবহার কিরূপে হইল? তাহা নিতান্তই গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ করিয়া কেবল স্বার্থ প্রণোদিত হইয়াই জীবন কাটাইতে হইল।

ঈশ্বর সৃজিত স্ত্রী এবং পুরুষ উভয় জাতির মধ্যে যেমন আকৃতিগত বৈষম্য লক্ষিত হয়, সেইরূপ আন্তরিক ভাবেরও সমধিক পরিবর্ত্তন দেখিতে পাওয়া যায়। সৃষ্টিকর্ত্তার বিধান অনুসারেই হউক অথবা মনুষ্যের বিধান বশতঃই হউক, পুরুষ অপেক্ষা আমাদের রমণী জাতির সংসারাশ্রমে দায়িত্ব অধিক। পুরুষ আপনার আত্মীয় স্বজনের সহিত চিরজীবন কাটাইয়া দেন, কিন্তু স্ত্রীজাতির পক্ষে তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত, নিতান্ত অপরিচিত, এমন কি যাহাদিগের সঙ্গে কোন কালে রক্তের সম্পর্ক ছিল না অথবা চাক্ষুষ দৃষ্টিও হয় নাই, এইরূপ ব্যক্তিদিগের সঙ্গে নিতান্ত আপনাভাবে বসবাস করিতে হয়। শৈশবের সেই স্নেহময় সংসর্গ হইতে চিরদিনের জন্য (প্রায়) বিচ্ছিন্ন হইয়া একেবারে অপরিচিতের মধ্যে আসিয়া যাহার প্রতি যে কর্ত্তব্য অনন্য চিত্তে তাহা সম্পন্ন করা কম কথা নহে। সেই জন্যই বলিতেছি পুরুষ হইতে স্ত্রীজাতির চিত্তকেই অধিক সংযমী করিতে হয়; সংসারে যিনি গৃহিনী বলিয়া গণ্যা হইবেন, তাঁহার প্রতি কতদূর দায়িত্ব অর্পণ করা হইয়াছে তাহা তাঁহাকে বিশেষ ভাবে বিবেচনা করিয়া চলিতে হইবে। যদি তিনি তাঁহাকে সেই কার্য্যের অনুপযুক্ত মনে করেন, তবে যাহাতে সে বিষয়ে সুশিক্ষা লাভ করিয়া কার্য্যক্ষম হইতে পারেন, তাহাই চেষ্টা করিবেন। শ্বশুর, শাশুড়ী, দেবর, যা, পুত্র কন্যা, দাস, দাসী যাহার প্রতি যে কর্ত্তব্য তাহা অতি ধীর ভাবে সম্পাদন করিবেন, সামান্য অথবা অসামান্য কারণে তাঁহার হৃদয় কখনও বিচলিত হইবে না, তিনি যে গুরুতর কার্য্য

ভার মস্তকে লইয়াছেন তাহা সর্ব্বদা তাঁহার মনে সমভাবে জাগরূক থাকিবে। পীড়িতের শুশ্রূষা, শোকার্ত্তকে সান্ত্বনা, নিরুৎসাহীকে উৎসাহ প্রদান ইত্যাদি যেখানে যাহা আবশ্যক কায়মনোবাক্যে তাহা সম্পন্ন করিবেন। অর্থাৎ জননীর সুবিমল স্নেহ যেমন প্রত্যেক সন্তানের প্রতিই সমভাবে অর্পিত, কিন্তু মাতার ব্যবহারে প্রত্যেক সন্তানেরই মনে এইরূপ ধারণা জন্মে যে, আমার প্রতিই মায়ের অধিক স্নেহ মা আমাকেই সর্ব্বাপেক্ষা ভাল বাসেন। অথচ মাতার হৃদয়নিঃসৃত সেই অতুলনীয় স্নেহ শতধারায় প্রবাহিত হইয়া প্রত্যেক সন্তানের জীবনী শক্তি বর্দ্ধিত করিয়া সযতনে যাহার যে অভাব তাহা মোচন করিয়া দিতেছে। পরিবার বর্গের মধ্যে গৃহিণীর কার্য্য কলাপ যদি সকলের মনেই এরূপ ধারণা জন্মাইতে সমর্থ হয়, তবে সেই সংসার অতি সুখময় হয়। বুদ্ধির অল্পতা হেতু যদি কেহ কখনও অন্যায় কার্য্য করে তাহাকে তিরস্কার না করিয়া বরং মিষ্ট বাক্যে তাহার ত্রুটী তাহাকে বুঝাইয়া দিলে সেই আত্মকৃত অপরাধ বুঝিয়া লইতে পারে, যাহাতে পুনরায় সে ঐরূপ কার্য্যে প্রবৃত্ত না হইয়া, নিজের ভ্রম বুঝিতে পারে এবং তাহা সংশোধন করিতে যত্ন লয়, এইরূপ সুমধুর উপদেশ প্রদান করিবেন। বীর কেশরী নেপোলিয়ন আপন শাসন বলে ভিন্ন ভিন্ন দেশীয় ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর অগণ্য লোকসমূহকে কেমন সুন্দর বশীভূত রাখিয়া ছিলেন। সেই সীমাহীন সমুদ্রের ন্যায় অসংখ্য সৈন্যসমূহ প্রভুর ইঙ্গিত মাত্র কত কঠিন কার্য্য সমাধা করিয়াছে, তাঁহার আজ্ঞানুযুদ্ধস্থলে অকাতরে প্রাণ বিসর্জ্জন করিতেও কুণ্ঠিত হয় নাই। সেই মৃত্যুতেও কত আনন্দ! কেবল প্রভুর আজ্ঞা পালন করিলাম, প্রভুর কল্যাণের নিমিত্ত প্রাণ বিসর্জ্জন করিতে পারিলাম, ইহাই তাহাদের আনন্দের বিষয়। ইহাই কি কেবল প্রজাবর্গের হৃদয়জাত অতি-প্রভুভক্তির পরিচয়? তাহা নহে, প্রভুর স্নেহ বাৎসল্য ও সুনিয়মের গুণে বশীভূত হইয়াছিল বলিয়াই তাহারা তাহাদের জীবনের মহত্ব দেখাইয়া যাইতে সমর্থ হইয়াছে। নতুবা এমন কত ঘটনার কথাও শুনা যায় যে, রাজার অবিবেচনা ও অপরিণামদর্শিতার ফলে কত রাজ্য ছারখার হইয়া গিয়াছে এবং অবশেষে সন্তান তুল্য প্রজাবর্গের হাতে অকালে শোচনীয় ভাবে প্রাণ পরিত্যাগ করিয়া চিরদিনের জন্য শ্রোতামণ্ডলীর দয়ার পাত্র হইয়া রহিয়াছেন। উভয়ের নামই ইতিহাসে জলন্ত অক্ষরে দীপ্তমান রহিয়াছে, কিন্তু উভয়ের মধ্যে কত ব্যবধান। একজন ভক্তির পাত্র, তাঁহার চরণতলে মস্তক আপনাআপনি নমিত হয়, তাঁহার শিক্ষার দৃষ্টান্ত জীবনে অনুসরণীয়। অপর তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত, তাঁহার শিক্ষা সযতনে পরিহার্য্য, সে দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিলে জীবনে কদাচ সুখ সম্ভাবনার আশা থাকে না। তাই বলিতেছি—সংসারে স্থান কাল ভেদে নানাবিধ শক্তি প্রয়োগের আবশ্যক হইয়া থাকে। আমরা আমাদের ক্ষুদ্র সংসারটীর মধ্যে নিতান্ত আত্মীয় স্বজনে পরিবেষ্টিত হইয়া কাল কাটাই, কিন্তু ক্ষোভের বিষয় এই যে, আমাদের ব্যবহারের মধ্যে নানা রূপ ত্রুটী আনয়ন করিয়া এমন যে প্রাণ হইতে প্রিয় আত্মীয় স্বজন, তাহার মধ্যেও আত্মপর ভেদ জন্মাইয়া দেয়। আমাদের দেশে একান্নভুক্ত পরিবার এখনও অনেক বর্ত্তমান আছে। কিন্তু তাহার সুশৃঙ্খলার নিতান্ত

অভাব প্রায়শঃই প্রচুর পরিমাণে দৃষ্ট হয়। সংসারে সকলেরই সমান উপার্জ্জনক্ষম হওয়া সম্ভব নহে, যিনি অধিক উপার্জ্জন করেন, তাঁহার হয় ত ব্যয় অল্প এবং যাহার উপার্জ্জন অল্প, তাঁহার ব্যয়ের কারণ অধিক এরূপ ঘটনা বিরল নহে। এবং এরূপ অবস্থায় পতিত হই লেই সেই সংসারে মনোমালিন্য ঘটিবার আশঙ্কা উপস্থিত হয়। অবশ্য উপার্জ্জনশীল এমন সহৃদয় ব্যক্তিও সংসারে আছেন যিনি অকুণ্ঠিত চিত্তে আপনার জীবন দান করিয়াও পরহিতব্রত সাধনে যত্নবান, কিন্তু ইহার সংখ্যা নিতান্ত অল্প, উপরোক্ত শ্রেণীর লোকই সংসারে অধিক দেখিতে পাওয়া যায়। অশিক্ষিত বুদ্ধিহীন লোকের নিকট হইতে এরূপ ব্যবহার পাওয়া বিচিত্র নহে এবং তাহাতে দুঃখের বিষয়ও কিছু নাই, কিন্তু যদি বিদ্বান বুদ্ধিমান ব্যক্তিও অর্থ লোলুপ হইয়া ঐ প্রকার কুভাব অন্তরে পোষণ করেন তাহা বড়ই ক্ষোভের কারণ হয়। হিংসা-বৃত্তি বড়ই জঘণ্য, অতি ঘৃণার সহিত ইহাকে পরিহার করিতে হইবে। যিনি ক্ষমতাবান, তিনি যদি অক্ষমকে পালন না করেন, তবে আর কে করিবে? এই ক্ষমতা ঈশ্বর তাঁহাকে দান করিয়াছেন, এই মনে করিয়া তাহার সদ্ব্যবহার করা উচিত। অবশ্য অক্ষম বলিয়া নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া থাকা কখনও সঙ্গত নহে এবং সে বিষয়ে প্রশ্রয় দেওয়াও মহাপাপ বলিয়া মনে করা উচিত। একের চেষ্টায় কোন কার্য্য সম্পূর্ণ সফল হওয়া কষ্টদায়ক। সকলের লক্ষ্যই যদি এক হয় তবে আয়াস সাধ্য কার্য্যও অতি সহজ বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। যাহা হউক স্বইচ্ছায় গৃহবিচ্ছেদ ঘটাইয়া হীনবল হওয়া কখনই সঙ্গত নহে। সামান্য সামান্য পশু পক্ষীরাও একতার গুণে কত কঠিন কার্য্য সম্পন্ন করে। মানবজাতি সকলের শ্রেষ্ট জাতি হইয়াও যে এমন ক্ষুদ্র নীচ ভাব মনে স্থান দিয়া এমন ভ্রম পোষন করিয়া স্বইচ্ছায় দুঃখ আহ্বান করিয়া আনেন ইহা বড়ই অন্যায় কথা।

আমরা যে দিন দেখিতে পাইব আমাদের বঙ্গের প্রতিগৃহ, গৃহিণীর লীলা ক্ষেত্র, সুব্যবস্থার গুণে দ্বেষ হিংসারূপ কুটীল তমসা লুপ্ত করিয়া উদারতার পুণ্যালোকে আলোকিত করিতে সক্ষম হইয়াছে, সেই দিন বুঝিব আমাদের ভাগ্য পরিবর্ত্তনের কাল সমুপস্থিত, সেই দিন বুঝিব আমাদের দুঃখ দুর্দ্দশা অপনীত, এবং সৌভাগ্যের কাল নিকটবর্ত্তী হইয়াছে। যে স্থানে হিংসা দ্বেষ চির প্রতিষ্ঠিত হইয়া আমাদের সংসারে দুঃখ দারিদ্রতার বৃদ্ধি করিতেছে সেই স্থানে স্নেহ প্রেম, প্রীতি প্রতিষ্ঠা লাভ করিলে তাহা শান্তি ও পবিত্রতার লীলা ভূমিরূপে বিরাজিত হইয়া অনন্ত সুখ প্রদান করিতে সক্ষম হইবে, এবং ইহাই বাঞ্ছনীয়।

শ্রী নিরুপমা দেবী।

নলিনী।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ।

নলিনীর মূর্চ্ছা।

এবার স্বামী গৃহে আসিয়া নলিনী সাধ্যানুসারে স্বামীর সেবা ও যত্ন করিতে প্রয়াস পাইতে লাগিল কিন্তু স্বামীর সহিত প্রাণ খুলিয়া কথোপকথন বা আমোদ প্রমোদ প্রভৃতি যৌবন সুলভ সুখসম্ভোগ নলিনীর অদৃষ্টে ঘটিল না। হিন্দুকন্যা হিন্দু স্ত্রী বুঝিয়াছিল স্বামীকে সুখী করাই তাহার জীবনের প্রধান কর্ত্তব্য! স্বামীর মনস্তুষ্টির জন্য জীবনোৎসর্গ ব্যতীত নারীর আর ধর্ম্ম নাই তাই নলিনী স্বামী সেবায় রত হইয়াছে। জগদীশ বাবুও এখন স্ত্রীর ব্যবহারে অনেকটা সুখী হইয়াছেন, কিন্তু তিনি বুঝিতে পারিয়াছেন নলিনীর হৃদয়ের অগাধ অনন্ত প্রণয় পাইবার যোগ্য তিনি নহেন, বিবাহই যে একমাত্র সুখের মূল নহে, তাহাও অনেকটা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছেন।

গত বৎসর বিনয় পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারে নাই। এবার বৃত্তির সহিত পরীক্ষোত্তীর্ণ হইয়াছে। বিনয় এতদুপলক্ষে তাহার বন্ধুবর্গকে নিমন্ত্রণ করিবে, এই তাহার ইচ্ছা। বড় লোকের ছেলের এ ইচ্ছা কার্য্যে পরিণত হইতে অধিক বিলম্ব হইল না। অদ্য নিমন্ত্রণের দিন বিনয়ের বন্ধু বান্ধবেরা অনেকেই আসিয়াছেন। বিনয় কোনও কার্য্যোপলক্ষে অন্তঃপুরে আসিয়াছে সঙ্গে শিক্ষক ভবেশচন্দ্র; বলা বাহুল্য ভবেশ বিনয়ের উন্নতির অন্যতম কারণ বলিয়া তাহার সহিত ক্রমেই জগদীশ বাবুর পারিবারিক ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি হইতেছে। যখন বিনয় অন্দরে আসিল, তখন বিনয়ের মাতা ভাণ্ডার গৃহের তত্ত্বাবধানে নিযুক্ত ছিলেন নলিনীও প্রমদার সহিত বসিয়া পান সাজিতে ছিল। বিনয়ের মাতা বর্ষিয়সী, তিনি পুত্রের শিক্ষককে দেখিয়া পলায়ন করা আবশ্যক মনে করিলেন না। নলিনী দেখিল বিনয়ের পার্শ্বে "মাষ্টার মহাশয়!" কর্ত্তব্যের অনুরোধে তথা হইতে প্রস্থান করা তাহার উচিত। কারণ কখনও সে মাষ্টার মহাশয়ের সম্মুখে বাহির হয় নাই বা কাহারও নিকট তদ্রূপ আদেশও প্রাপ্ত হয় নাই। নলিনী উঠিতে চেষ্টা করিতেছিল, হঠাৎ মাথা ঘুরিয়া পড়িয়া গেল। বিনয় দৌড়িয়া গিয়া খুড়িমাকে তুলিতে চেষ্টা করিল, দেখিল চৈতন্য হীনা। বিনয়ের কথানুসারে কেহ মাথায় জল দিতে লাগিল, কেহ বাতাস দিতে লাগিল, কেহ ডাক্তার ডাকিতে ছুটিল। অবিলম্বে পারিবারিক চিকিৎসক আসিলেন, রোগীনীর নিকটে জনতা দেখিয়া তিনি বিনয়কে বলিলেন, "বিনয়! তুমি সকলকে যেতে বল, দু'তিন জন লোক উঁহার সেবা করিবার জন্য থাকুক।" চিকিৎসকের ইচ্ছানুসারে সকলে প্রস্থান করিল। রহিলেন কেবল ডাক্তার, বিনয়, ভবেশ ও বিনয়ের মাতা। ভবেশ শিয়রে বসিয়া ধীরে ধীরে ব্যজন করিতে লাগিলেন, বিনয় চোখে মুখে জল দিতে লাগিল, তাহার মাতা নিকটে বসিয়া রহিলেন, এবং মাঝে মাঝে কাঁদিতে কাঁদিতে "বউ বউ! বলিয়া ডাকিতে লাগিলেন। বিনয় বলিল, "মা! তুমি চুপ কর, আমি দেখিতেছি বর্দ্ধমানেও খুড়িমার এমনি ফিট্ হয়েছিল, কিছুক্ষণ পরেই ভাল হবেন, হাঁ ডাক্তার বাবু! এটা হিষ্টিরিয়া নহে?"

ডাক্তার। হাঁ এও একরূপ হিষ্টিরিয়া বই কি? তবে সাধারনতঃ হিষ্টিরিয়াতে শরীরের আক্ষেপ হয় অধিক, ইঁহার সে সব কিছু দেখিতেছি না কোন মানসিক উত্তেজনা হইলে বা শোক পাইলে এইরূপ মূর্চ্ছা হ'য়ে থাকে, তা এজন্য ভয় নাই এখনি ভাল হবেন, এইরূপ মূর্চ্ছা কতদিন বাদে হয়?

বিনয়। আগে কখনও দেখি নাই, মাস দুই পূর্ব্বে যখন বর্দ্ধমান ছিলেন, তখন একবার হয়েছিল আর এই আজ হ'ল।

ডাক্তার ঔষধের বন্দোবস্ত করিয়া প্রস্থান করিলেন। ভবেশ নলিনীর অনাবৃত মস্তকে ধীরে ধীরে জল সেচন করিতে লাগিলেন। প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টা পরে নলিনী নেত্রোন্মীলন করিয়া চাহিল, দেখিল তাহার শিয়রে ভবেশ; —ভবেশ তাহারই সেবায় নিযুক্ত! নলিনী নয়ন মুদ্রিত করিল, বোধ হইল তাহার সমস্ত দেহ অগ্নিময় করিয়া তাড়িৎ প্রবাহের ন্যায় কি একটা ছুটিয়া গেল সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড অন্ধকার বোধ হইতে লাগিল।

বিনয় বলিল, "চলুন মাষ্টার মহাশয় খুড়িমা এখন একটু ভাল হয়েছেন, আমরা বাহিরে যাই, সব বাবুরা এসেছেন।" ভবেশ গাত্রোত্তোলন করিলেন।

নলিনী অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত সেই অবস্থায় পড়িয়া রহিল, সমস্ত দিনটা তাহার প্রায় সেই ভাবেই কাটিয়া গেল। সন্ধ্যার সময় সামান্য মাত্র আহার করিয়া বারাণ্ডায় পদ চালনা করিয়া বেড়াইতেছে এমন সময় তাহার কর্ণে পৌছিল,—

"তোমারেই করিয়াছি জীবনের ধ্রুবতারা।
এ সমুদ্রে আর কভু হব নাকো পথহারা॥"

নলিনীর কর্ণে সে স্বর যেন স্বর্গীয় বীণার ন্যায় ধ্বনিত হইতে লাগিল, জানি না দ্বাপরে শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনি, রাধিকার শ্রবণে ইহাপেক্ষা মধুর বাজিত কি না। যে দিক হইতে গীতধ্বনি আসিতেছিল, নলিনী সেই দিকে কর্ণ পাতিল শুনিল,—

"তবমুখ সঙ্গোপনে, জাগিতেছে সদা মনে,
তিলেক বিচ্ছেদ হ'লে না দেখি কুলকিনারা।"

নলিনী সেইখানে বসিল! সে গান সমাপ্ত হইল, আরও দুই একটা গান হইল শেষে সভা ভঙ্গ করিয়া নিমন্ত্রিতেরা একে একে প্রস্থান করিলেন। রাত্রি প্রায় আটটা নলিনী সেই স্থানেই বসিয়া আছে, যেন সংজ্ঞাহীনা! একজন পরিচারিকা আলোক হস্তে তথায় আসিয়া দাঁড়াইল নলিনীর ভাব দেখিয়া সে স্তম্ভিত হইয়া গেল, কিছু পরে বলিল, "হাঁ মা ঠাকরুণ! এ কি গা? একলাটি আঁধারে এক কোণে বসে আছ কেন? বাবু উপরে এসেছেন আমি সারা রাজ্যি তোমাকে খুঁজে বেড়াচ্ছি, তুমি কি পাগল হ'লে?" বলা বাহুল্য এই পরিচারিকাটি জগদীশ বাবুর বাড়ীতে বহুকাল কার্য্য করিতেছে, তজ্জন্যই ইহার "মাঠাকুরাণীদের" উপর একটু প্রতিপত্তিও জন্মিয়াছিল এবং যখন প্রয়োজন মনে করিত, তখনই মা ঠাকুরাণীদের উপর একটু কর্ত্তৃত্ব করিতে ভুলিত না, ইহাতে অবশ্য ঠাকুরাণীরা বিরক্ত হইতেন না, সময় সময় পরিচারিকার প্রভুত্বসূচক বাক্য শুনিয়া তাঁহারা হাস্য সংবরণ করিতে পারিতেন না। নলিনী উঠিয়া দাঁড়াইল সঙ্গে সঙ্গে একটি সুদীর্ঘ নিশ্বাস পতিত হইল। পরিচারিকা বলিল, "এখানে বসে ছিলে কেন? আজ অসুখ হইয়াছে কোথায় সাবধান হ'য়ে ঘরে শুয়ে থাকিবে, তা না এই আঁধারে একলাটি বসে আছ, একটা বাতি দিতে বল্লেও কি তোমার

জুটতনা? ধন্তি মেয়ে বাপু!" পরিচারিকার সাদর ভৎর্সনায় নলিনীর মলিন ওষ্ঠাধর ঈষৎ হাস্য রেখায় রঞ্জিত হইল, বলিল "তুই এখন চল্, একটু আঁধারে থেকে আমার জাত্ যায়নি, বিনয়ের মাষ্টার গান কচ্ছিলেন তাই বসে শুন্‌লাম।"

ঝি। বাপ্‌রে, সে গান তো অনেকক্ষণ হ'য়ে গেছে, বড় মা পিসি মা সব গান শুনিতে তেতালায় গিয়াছিলেন, তোমার অসুখ হয়েছে বলে তোমাকে ডাকেন নাই। ডাক্তার বাবু বলেছেন যে কোনও গান বাজ্‌না বা আমোদ আহ্লাদ তুমি দেখিতে পাবে না।

নলিনী তাহার কথার উত্তর দিবার পূর্ব্বেই তাহারা জগদীশ বাবুর শয়ন গৃহের নিকটবর্ত্তী হইল, ঝি অন্য কার্য্যে প্রস্থান করিল, নলিনী গৃহে প্রবিষ্ট হইল।

বিংশ পরিচ্ছেদ।

নলিনীর জ্ঞানোদয়।

উক্ত ঘটনার পর প্রায় তিন বৎসর গত হইয়া গিয়াছে। নলিনীর এখন আর সে চঞ্চল স্বভাব নাই এখন আর তাঁহার কথায় কথায় মূর্চ্ছা বা হিষ্টিরিয়া হয় না। নলিনী এখন স্বামী গৃহের সর্ব্বময়ী গৃহিনী এবং একটি পুত্র ও একটি কন্যার জননী, জগদীশ বাবুও নলিনীর সেবা, ভক্তি ও ভালবাসায় পরম সুখী।

ভবেশচন্দ্র এখন আর কাশীতে নাই তিনি কলিকাতা কোন আফিসে সামান্য বেতনে কর্ম্ম করিয়া নিজের জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছেন। গিরিজা অনেক যত্ন করিয়াও তাঁহাকে বিবাহে সম্মত করিতে পারেন নাই।

একদিন জগদীশ বাবু একখানা পত্র হস্তে হাসিতে হাসিতে অন্তঃপুরে আসিলেন এবং স্ত্রীকে ডাকিয়া বলিলেন, "নলিনি! তোমার একটা শুভ সংবাদ আছে, বলিলে আমাকে কি পুরস্কার দিবে বল, নহিলে বলিব না।"

নলিনী বলিল, "আমি আর তোমাকে কি দিব? সকলি তো তোমার আমি দাসী মাত্র।"

জগদীশ বাবু হাসিয়া বলিলেন, "তুমি দাসী? এখনও তুমি দাসী? না তুমি এই ক্ষুদ্র গৃহের সর্ব্বময়ী কর্ত্রী, আমিই আজ কাল তোমার দাস!"

জিভ্ কাটিয়া নলিনী বলিল, "ছি ও কথা বলিতে নাই, কি সংবাদ বল, বর্দ্ধমানের কোনও সংবাদ?"

"না না বর্দ্ধমানের কোন সংবাদ হইলে আর পুরস্কার প্রত্যাশা করিতাম না, কলিকাতার সংবাদ!" বলিয়া জগদীশবাবু পত্রখানা নলিনীর হস্তে দিলেন। "কলিকাতায় আমার কে আছে?" বলিতে বলিতে নলিনী পত্র খুলিয়া পড়িতে আরম্ভ করিল—

কলিকাতা
হারিসন্ রোড

পরম পূজনীয়
শ্রীযুক্ত বাবু জগদীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
জমিদার মহাশয় দীনজন
প্রতিপালকেষু

আপনার অনুগ্রহ লিপি প্রাপ্তে অতিশয় আহ্লাদিত ও বাধিত হইলাম। পিতৃদেবের

পরলোকগমনের সহিতই সংসারের সহিত সম্বন্ধ আমার ছিন্ন হইয়াছে। নিজের জীবিকা নির্ব্বাহোপযোগী যে সামান্য অর্থের প্রয়োজন, তাহা আমি এখানেই উপার্জ্জন করিতেছি, ইহা অপেক্ষা অধিক আশা আমার নাই। তবে সংসারে কতদিন বাঁচিব বলিতে পারিনা, পৃথিবীতে এমন কেহ নাই যে, অসময়ে তাহার নিকট বিন্দুমাত্র পানীয়েরও প্রত্যাশা করিতে পারি তাই আজ আমার বন্ধুবান্ধবদের সহিত পরামর্শ করিয়া আপনার অনুগ্রহ প্রস্তাবে স্বীকৃত হইতেছি। আপনি চিরদিন আমাকে স্নেহ করিয়া থাকেন, তাই আমার প্রতি আপনার এত দয়া! জানিনা এই দরিদ্র জীবনে অনন্ত দয়াঋণের কণা মাত্রও পরিশোধ করিতে পারিব কিনা। আমি ৪।৫ দিবস মধ্যেই শ্রীচরণ সমীপে উপস্থিত হইয়া কার্য্য ভার গ্রহণ করিব শ্রীচরণে নিবেদন ইতি—

অনুগৃহীতভৃত্য
শ্রীভবেশ।

পত্রখানা পড়িয়া নলিনী প্রথমে একটু হাসিল, পরক্ষণেই তাহার মুখ গম্ভীর হইল, অস্ফুটস্বরে,—নেত্রদ্বয় ঊর্দ্ধদিকে স্থাপন করিয়া ধীরে ধীরে বলিল, "জলটুকু দিবার লোক নাই কি ভয়ানক!" জগদীশ বাবু বলিলেন, "কি নলিনি! কি বলিলে?" "না কিছু না—" বলিয়া নলিনী পত্রখানা খামে পুরিয়া স্বামীর হস্তে দিল, ধীরে, অতিশয় ধীরে প্রাণের নিভৃত প্রদেশ হইতে একটি যাতনা-বাহী দীর্ঘনিশ্বাস বহির্গত হইল, জগদীশ বাবু বলিলেন, "কি তুমি হঠাৎ এত বিমর্ষ হ'য়ে পড়িলে কেন? তোমার অনুরোধেই আমি তাহাকে আসিতে লিখিয়াছিলাম আমার বিশ্বাস সে এখানে আসিলে তুমি খুব সন্তুষ্ট হবে, তা না হয়ে তুমি এত ম্লান হলে কেন?

নলিনীর কৃষ্ণতারাময় আয়ত নয়ন দুইটি বাষ্পবারিতে পরিপূর্ণ হইল, চক্ষু মুছিয়া বলিল, তিনি বড় দুঃখী অসময়ে জলটুকু দিবার লোকও তাঁহার নাই, তাই ভাবিতেছিলাম, আমরা কি তাঁহার এ দুঃখ দূর করিতে পারি না?

যুবতী স্ত্রীর অপর যুবকের প্রতি এতদূর আন্তরিক টান দেখিয়া জগদীশ বাবু মনে মনে কিছু বিরক্ত হইলেন, কিন্তু নলিনীর সেই নিষ্পাপ সরল মুখপানে চাহিয়া তাহাকে আর অবিশ্বাসিনী মনে করিতে প্রবৃত্তি হইল না, বিরক্তি ভাব গোপনে রাখিয়া বলিলেন "পারিবে না কেন? আমার ম্যানেজারের বেতন ২০০ শত টাকা, ভবেশ নূতন লোক হইলেও তাহাই দিব, তা ছাড়া আমার বাড়ীতে আহারাদি করিবে ঝি চাকর পাইবে কোনই অভাব থাকিবে না।"

এবারে নলিনী একটু হাসিল, বলিল, "তা কি করে হবে? তিনি কি এখন আমাদের বাড়ী থাকিতে স্বীকৃত হবেন?"

জগদীশ বাবু। কেন থাকিবেন না? আর যদি নাই বা থাকে তাহাতেই বা তাহার ক্ষতি কি? মাসিক দুইশত টাকা একজন লোকের সচ্ছন্দে চলিতে পারে, হিসাব করিয়া খরচ করিলে কিছু জমাও হইতে পারে।

নলিনী। তা আমি বুঝিলাম, কিন্তু আমি ভাবিতেছিলাম আর এক কথা—তা আর তোমার কাছে বলে কি হবে?

জগদীশ। কেন? আমাকে বলিতে দোষ কি? আমি কি সাধ্যানুসারে তোমার ইচ্ছা পূর্ণ করিতে চেষ্টা করি না?

স্বামীর কথায় নলিনীর বড় লজ্জা হইল, বুঝি বড় দুঃখও হইল। নলিনী ভক্তি কৃতজ্ঞতাপূর্ণ নয়নে স্বামীর দিকে চাহিয়া মনে মনে বলিল, "আমার ন্যায় হতভাগিনী পাপীয়সীর প্রতি তোমার দয়া অতুলনীয় তুমি এমন দেবতা না হ'লে এ পাপিনীর পরিণাম না জানি কি ভয়ানকই হইত!" পরে ভূপৃষ্ঠে দৃষ্টি লগ্ন করিয়া কহিল, "তাই কি আমি বল্‌ছি?"

জগদীশ। তবে বলেই কেন ফেল না, দেখি ভবেশের জন্য তোমার আর কি ইচ্ছা?

নলিনী। কি বলিব? তুমি হয় তো আবার ঠাট্টা করবে, আমার না বলাই ভাল।

জগদীশ। নলিনী বড় মিথ্যা কথা বলিলে, আমি কখনও কোনও বিষয়ে তোমাকে উপহাস বা তাচ্ছিল্য করেছি? মনে নাই কি বিবাহের পর প্রথমে আমার সহিত কি প্রকার ব্যবহার করিয়াছিলে? কখনও কি সে জন্য কিছু বলেছি? বলা দূরে থাকুক আমি মনেও ভাবি নাই যে, তুমি আমাকে ভালবাস না, বা অন্য কাহাকেও ভালবাস বলিয়াও কখনও তোমাকে অবিশ্বাসের চক্ষে দেখিতে ইচ্ছা করি নাই। শুধু কেন তোমাকে বিবাহ করিয়া তোমার অসুখের কারণ হইয়া পরমেশ্বরের চরণে অপরাধী হইলাম, ইহাই ভাবিতাম। এক নিশ্বাসে এই কথা গুলি বলিয়া জগদীশ বাবু তাঁহার স্বাভাবিক ঔদার্য্যপূর্ণ দৃষ্টিতে স্ত্রীর দিকে চাহিলেন, নলিনীও ঠিক সেই সময় স্বামীর দিকে চাহিল; স্বামীর পবিত্র পুণ্যময় মূর্ত্তি দেখিয়া নলিনীর হৃদয় মুহূর্ত্তের জন্য কম্পিত হইয়া উঠিল; তাহার প্রাণেরদ্বার খুলিয়া চিররুদ্ধ হৃদয়ের উচ্ছ্বাস উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল, নলিনী বাষ্পাকুল নেত্রে স্বামীর পদদ্বয় ধারণ পূর্ব্বক কম্পিতকণ্ঠে বলিল, "স্বামি! দেবতা! আমি তোমার চরণে অনেক অপরাধে অপরাধিনী, তোমার অনন্ত ভালবাসা অবিচলিত বিশ্বাস পাইবার যোগ্য পাত্রী এ পাপিনী নহে, তুমি মানুষ নহ, স্বর্গের দেবতা তাই এমন দুশ্চরিত্রাকে যত্নে হৃদয়ে স্থান দিয়াছ, নতুবা আমি কি, না করিয়াছি; তোমার শত যত্ন সহস্র ভালবাসা উপেক্ষা করিয়া পিত্রালয়ে চলিয়া গিয়াছিলাম, তুমি সেখানেও আমাকে সুখে রাখিতে চেষ্টা করিয়াছ, আবার যখনি পাপিনী চরণে আশ্রয় ভিক্ষা চাহিল, অমনি সমস্ত অপরাধ বিস্মৃত হইয়া কাল সাপিনীকে হৃদয়ে তুলিয়া লইলে। আমি অতি ভাগ্যবতী বলিয়াই তোমার ন্যায় স্বামী রত্নের অধিকারিণী হইয়াছি, নতুবা তুমি ধনবান রূপবান হইয়া হতভাগিনীর নিকট অতদূর অবজ্ঞা পাইয়াও আমাকে ঘৃণা কর নাই বা আমার স্থানে অন্য কাহারও অধিকার দেও নাই, একি আমার কম সৌভাগ্যের কথা? দেবতা! আমাকে ক্ষমা কর আমি বাস্তবিকই তোমার চরণে অবিশ্বাসিনী! তুমি সে সকল দোষ ভুলে যাও।" নলিনী ফুপিয়া ফুপিয়া কাঁদিতে লাগিল, জগদীশ বাবু বলিলেন, "ছিঃ নলিনী! কাঁদ কেন? আর সে সব পুরাণো কথা মনে ভাবিয়া ক্লেশই বা পাও কেন? তুমি যাহাই হও আমি তাহা জানিতে চাহি না আমি তোমাকে পতিব্রতা সতী বলিয়াই মনে করিব এবং তাহাতেই আমার জীবনের শান্তি!" জগদীশবাবু সযত্নে স্ত্রীর হাত ধরিয়া তুলিয়া নিকটে বসাইলেন এবং চক্ষু মুছাইয়া দিয়া কহিলেন, "চুপ কর, আর কাঁদিও না" স্বামীর প্রবোধ বাক্যে নলিনীর

ক্রন্দন নিবৃত্ত হইল না, সে তেমনই কাঁদিতে কাঁদিতে কহিল, "না না আমার সমস্ত কথা শোন, পরে ইচ্ছা হয় চরণে স্থান দিও, না হয় দূর করিয়া দিয়া অথবা অন্য যে কোনও বিধানে হউক আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করাইও।" জগদীশবাবু হস্তদ্বারা নলিনীর গলদেশ বেষ্টন করিয়া তাহার অশ্রুসিক্ত আননে চুম্বনান্তর বলিলেন, "না, নলিনী! আমি আর কিছু শুনিব না, আমি তোমার বালিকা বয়সের চপলতা ক্ষমা করিয়াছি, তুমি আর সে সকল তুলিও না, আমি তোমাকে পাইয়া সুখে আছি, তুমি আর আমার সে শান্তি নষ্ট করিও না—আমি বিশ্বাস করি, তুমি এমন কোনও পাপ কর নাই, যদ্দ্বারা তুমি গৃহাশ্রমে বাস করিবার অনুপযুক্তা হইবে, বা তজ্জন্য তোমাকে কোনও কঠিন প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে, মনুষ্যের মন সকল সময় স্থির থাকে না। কত কত বিজ্ঞ ধার্ম্মিক পুরুষের চিত্ত সময় সময় এত চঞ্চল ও দুর্ব্বল হয় যে, তাঁহারা নরকের শেষ সীমায় যাইয়া উপনীত হন, তুমি তো ক্ষুদ্র বালিকা, তোমার মন যদি চঞ্চল হইয়া থাকে, সে আমি দোষের মধ্যে গণ্যই করি না, তুমিও সে জন্য অত ব্যাকুল হইও না।"

আর নলিনীর কোনও কথা বলা হইল না। জগদীশবাবু বলিলেন, "সত্য ও সুধাকে নিয়ে চল বিশ্বেশ্বর দেবের আরতি দর্শন করে আসি।" নলিনী ধীরে ধীরে উঠিয়া পুত্রকন্যা লইয়া স্বামীর সহিত বিশ্বেশ্বর দর্শনে যাত্রা করিল।

ক্রমশঃ—

শ্রীকুমুদেন্দু দেবী।

জাতিয় মহাসমিতি।

বিগত বড়দিনের অবকাশের সময় দক্ষিণ ভারতের সুপ্রসিদ্ধ মান্দ্রাজ নগরীতে জাতীয় মহাসমিতির সপ্তদশ বার্ষিক অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। অন্যান্য বৎসরের ন্যায় এবারও ভারতের স্বদেশ প্রেমিক সন্তানগণ মাতৃসেবার্থে মহাসমিতিতে উপস্থিত হইয়াছিলেন। স্বনামখ্যাত বাবু লালমোহন ঘোষ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। মান্দ্রাজ বাসীগণ মহাসমারোহে সভাপতির অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন। সভাপতি মহাশয় ভারতের বর্ত্তমান রাজনীতি সম্বন্ধে সুদীর্ঘ বক্তৃতা প্রবন্ধাকারে লিখিয়া নিয়াছিলেন; তাঁহার সুযোগ্য জামাতা ডাক্তার শরৎ মল্লিক উহা সভাতে পাঠ করেন। এবারও মহাসমিতির অধিবেশনের সঙ্গে সামাজিক সমিতি, একেশ্বরবাদীদিগের সমিতি ও শিল্প প্রদর্শনীর প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল।

সামাজিক সমিতির সভাপতি মান্দ্রাজ ব্যবস্থাপক সভার সদস্য বেল্লারীনিবাসী শ্রীযুক্ত বেঙ্কট রাও মহাশয় হইয়াছিলেন। উপযুক্ত ব্যক্তিই সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন।

শিল্পপ্রদর্শনী—মান্দ্রাজস্থ শিল্প প্রদর্শনীতে গত বৎসরের অপেক্ষা অধিক ও বিভিন্ন দেশীয় শিল্পদ্রব্য সংগৃহীত হইয়াছিল। মহীশূরের সুশিক্ষিত মহারাজা প্রদর্শনীর দ্বার উদ্ঘাটন সময়ে জাতীয় শিল্পোন্নতি সম্বন্ধে আমাদের কর্ত্তব্য বিষয়ে অতি সুন্দর সারগর্ভ বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলেন। মান্দ্রাজ গবর্ণমেণ্ট ও মহীশূররাজ প্রদর্শনীর সাহায্যার্থে অর্থদান

করিয়াছিলেন। বিশেষ আনন্দের বিষয় যে বাঙ্গালী চিত্রকরগণ চিত্রবিদ্যার জন্য বিশেষ প্রশংসালাভ করিয়াছেন। আশা করি এই শিল্প প্রদর্শনীর দ্বারা ভারতের দারিদ্র্য নিবারণ হইবে। ভারতবাসীগণ স্বদেশীয় শিল্পদ্রব্যের আদর করিতে শিখিবেন। শিল্পোন্নতি সাধনের জন্য ভারত নারীগণও সাহায্য করিতে পারেন।

স্ত্রীশিক্ষা

মুসলমান শিক্ষাসমিতি—বিগত ২৮ এ ডিসেম্বর (১৯০৩) বোম্বাই নগরে সমিতির অধিবেশন হয়। মুসলমান সমাজের অনেক গণ্য মান্য শিক্ষিত ভদ্রলোক সমিতিতে যোগদান করিয়াছিলেন; মুসলমান মহিলাগণের বসিবার স্থান মণ্ডপের এক পার্শ্বে যবনিকার অন্তরালে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। বহুসংখ্যক ভদ্রমহিলা অন্তরালে বসিয়া সভার বক্তৃতা শ্রবণ করিয়াছিলেন। পার্শি মহিলাদিগের জন্য প্রকাশ্যে বেদীর উপরে স্থান নির্দ্দিষ্ট ছিল। বোম্বাইর লাটসাহেবও সভাতে উপস্থিত ছিলেন। বোম্বাই হাইকোর্টের বিচারপতি শ্রীযুক্ত বদরুদ্দিন তায়েবজী সভাপতি মনোনীত হন। সভাপতি মহাশয় মুসলমান সমাজের হিতার্থে সময়োপযোগী সারগর্ভ বক্তৃতা প্রদান করেন। আমরা তাঁহার বক্তৃতা হইতে স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে বক্তব্যের সারাংশ উর্দ্ধৃত করিলাম :—

মুসলমানদিগের অধোগতির প্রথম কারণ ধর্ম্ম ও শিক্ষা সম্বন্ধীয় কুসংস্কার; দ্বিতীয় কারণ আমাদের মধ্যে স্ত্রীশিক্ষার অভাব। যে শিক্ষাতে হৃদয় ও মনের সম্যক্ বিকাশ সাধন করে, তাহাই প্রকৃত শিক্ষা। আমাদের স্ত্রী জাতির মধ্যে এই শিক্ষার প্রচলন না হইলে, আমরা কখনও জগতের জাতিসমূহের মধ্যে উন্নত স্থান অধিকার করিতে পারিব না; ভারতের অপরাপর জাতি সমূহের সঙ্গে প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে আমরা জয় লাভ করিতে পারিব না। যে সব কারণে আমাদের পুরুষদিগের অধোগতি হইয়াছে, তাহাতেই আমাদের স্ত্রী জাতির উন্নতি-পথে দ্বিতীয় আর একটি বাধা আছে। সেটী অবরোধ প্রথা। ধর্ম্ম, সমাজ স্বাস্থ্য ও জ্ঞানের উৎকর্ষ, এই চারিদিক হইতে এই প্রথাকে বিচার করা যাইতে পারে।

ধর্ম্মের দিক্ হইতে এই প্রথা সম্বন্ধে আমি বেশী কিছু বলিতে ইচ্ছা করি না। এই বিষয়ে চিন্তা করিয়া আমার এই ধারণা জন্মিয়াছে যে, অবরোধ প্রথার মূলে ধর্ম্ম অপেক্ষা দেশাচারের প্রাধান্যই অধিক। বর্ত্তমান সময়ে আমাদের সমাজে যে অবরোধ প্রথা প্রচলিত আছে, কোরাণে তাহার কোন বিধি দেখিতে পাওয়া যায় না। আমাদের ধর্ম্মগ্রন্থসমূহে এরূপ কোন বচন দেখিতে পাওয়া যায় না, যাহাতে স্ত্রীলোকের বহির্গমন, মুক্ত বায়ুসেবন কিম্বা ব্যায়াম চর্চ্চা নিষিদ্ধ হয়। অবরোধ প্রথা অল্পদিন হইল আমাদের সমাজে প্রচলিত হইয়াছে, এবং একমাত্র দেশাচারের উপরেই ইহা প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। "তারিক-ই ইস্‌লাম"ও "অল ইস্‌লামের" খ্যাতনামা গ্রন্থকার এবিষয়ে আমার মতের পোষকতা করেন দেখিয়া আনন্দিত হইয়াছি। তারপর গত বৎসর এই সমিতিতে বহুমান্যাস্পদ শ্রীযুক্ত আগা খাঁ আমার উক্ত মতের সমর্থন করিয়াছেন। অবরোধ প্রথার সমর্থক কোন বচন যে কোরাণে দৃষ্ট হয় না, এবিষয়ে তিনিও সাক্ষ্য দিয়াছেন।

বাল্যকাল হইতেই আমরা সমাজ মধ্যে এই প্রথা প্রচলিত দেখিতে পাইতেছি; সুতরাং এই প্রথা আমাদের অভ্যাসগত হইয়া পড়িয়াছে। ইহার পক্ষে যা' কিছু বলিবার আছে, তাহা আমাদের নিকট গুরুতর ও মনোরম বোধ হয়। পাশ্চাত্য সমাজের দোষ কলঙ্ক উদ্ঘাটনে আমাদের যথেষ্ট আগ্রহ, আনন্দ দেখিতে পাওয়া যায়। স্ত্রীস্বাধীনতার ফলে কোন অমঙ্গল ঘটিয়াছে বলিয়া খবরের কাগজে কোন ঘটনার উল্লেখ দেখিতে পাইলে, আমাদের নিকট তাহা পরম প্রীতিকর বলিয়া মনে হয়! কিন্তু পাশ্চাত্য জগতের যে সমুন্নত, সুশিক্ষিত শিষ্ট পবিত্র নারীসমাজ তাহার প্রতি আমাদের দৃষ্টি পতিত হয় না। যাহা হউক, বিষয়টি যে গুরুতর তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু এ সম্পর্কে আমার কর্ত্তব্য এই যে, খবরের কাগজে যে দুই চারিটী অপ্রীতিকর ঘটনার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাদ্বারা এরূপ গুরুতর বিষয়ের মীমাংসা হইতে পারে না।

অবরোধ প্রথাতে মহিলাদের স্বাস্থ্যনাশের যে যথেষ্ট আশঙ্কা রহিয়াছে, তাহা সহজেই বুঝা যাইতে পারে। এই সমিতিতে মুসলমান স্ত্রীলোকদের শিক্ষা সম্বন্ধে আলোচনা ও আয়োজন হইবে। জিজ্ঞাসা করি, অবরোধ প্রথা বিদ্যমান থাকিলে, স্ত্রীজাতির পক্ষে সুশিক্ষা লাভ কিরূপে সম্ভবপর হইতে পারে? দ্বাদশ কিম্বা ত্রয়োদশ বৎসরের মধ্যে আমাদের বালিকাদিগকে শিক্ষা শেষ করিতে হইবে। এই অল্প সময়ের মধ্যে সুশিক্ষা লাভ কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? যেদিক হইতেই দেখুন, বর্ত্তমান অবরোধ প্রথার কঠোরতা অন্ততঃ কিয়ৎপরিমাণে হ্রাস না করিলে, মুসলমান জাতি চিরদিনই অর্দ্ধ শিক্ষিত ও দুর্ব্বল অক্ষম জাতি হইয়া অন্যান্য জাতির পশ্চাতে পড়িয়া থাকিবে। সুতরাং আমি আশা করি, আমাদের শিক্ষিত বন্ধুগণ এই অবরোধ প্রথার কুফল নিবারণে যত্নশীল হইবেন।

শ্রীযুক্ত তায়েবজী মুসলমান সম্প্রদায়ের একজন প্রসিদ্ধ নেতা।

সভাপতির বক্তৃতা শেষ হইলে লাটসাহেবও সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা করিয়া সমিতির প্রশংসা করেন। তৎপরে কুমারী সোরাবজী বি, এ, শিক্ষার উপকারিতা সম্বন্ধে একটী সুন্দর বক্তৃতা করেন, তিনি বলেন, "যে সমাজের লোক সংখ্যা ছয় কোটী তাহার মাত্র চারি হাজার বালিকা বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থিনী ইহা বড়ই লজ্জা ও পরিতাপের বিষয়।"

মান্দ্রাজের ডেপুটি কলেক্টার সুলতান-মোহিদ্দীন মহোদয়ের পত্নী শ্রীমতী চাঁদবেগম সাহেবা একটী প্রবন্ধ লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন। শ্রীমতী কাব্রাজী উহা সভাতে পাঠ করেন। উক্ত প্রবন্ধ সমিতির সংশ্লিষ্টে একটী শিল্প প্রদর্শনী সংযুক্ত করিবার প্রস্তাব লিখিত হয়। প্রবন্ধ লেখিকা লেখেন যে, মুসলমান নারীগণের হস্তরচিত শিল্প দ্রব্য প্রদর্শিত হউক এবং অবশেষে বিক্রয় করিয়া সেই অর্থ দরিদ্র মুসলমানদিগের সাহায্যার্থে প্রদত্ত হউক।" বেগমসাহেবা স্বয়ং এইজন্য উক্ত টাকা দান স্বরূপ প্রেরণ করিয়াছিলেন। তাঁহার এই সুদৃষ্টান্ত দর্শনে দর্শকবৃন্দ মুগ্ধ ও উৎসাহিত হইয়াছিলেন। সভাস্থানেই নগদ একসহস্র মুদ্রা সংগৃহীত হয়। লেখিকার সদুদ্দেশ্য সফল হইল। প্রতি বৎসর সমিতির সহযোগে শিল্প প্রদর্শনীর দ্বার উন্মুক্ত হইবে। এই প্রস্তাব সকলেই সমর্থন করেন।

রাজকুমার কলেজের পারস্য ভাষায় অধ্যাপক মহোদয় প্রস্তাব করেন যে "মুসলমান-

দিগের সমাজের প্রচলিত রীতি নীতি যথাসম্ভব রক্ষা করিয়া সর্ব্বত্র বালিকাদের উপযোগী বিদ্যালয়ের সংখ্যা বৃদ্ধি করিতে হইবে। সর্ব্বশেষে অন্ধ বালকদিগের প্রস্তুত কতকগুলি শিল্পদ্রব্য প্রদর্শিত হয়।

কি মুসলমান সমাজ, কি হিন্দু সমাজ, কি ব্রাহ্ম সমাজ, এবং খৃষ্টান সকলেরই কর্ত্তব্য পরনিন্দা পরচর্চ্চা পরিত্যাগ করিয়া স্বীয় স্বীয় সমাজের নারীগণের উন্নতির পথ উন্মুক্ত করেন। তায়েবজী মহোদয়ের বক্তৃতার অবরোধ প্রথা, স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধীয় বিষয়ের প্রতিবাদ কোন কোন সহোযোগী করিয়াছেন। আমরা কিন্তু তাঁহার প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা আমাদের কর্ত্তব্য মনে করিতেছি।

বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্টের বিগতবৎসরের শিক্ষা-বিভাগের কার্য্য বিবরণী হইতে আমরা স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধীয় মন্তব্য উদ্ধৃত করিয়া পাঠিকা-গণকে দেখাইতেছি :—

গত বৎসরে শিক্ষাসম্বন্ধীয় মন্তব্য প্রকাশ স্থলে এদেশে স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে তেমন উন্নতি না দেখিয়া গবর্ণমেণ্ট দুঃখপ্রকাশ করিয়া-ছিলেন। উক্ত বৎসর সে জন্য স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে অনেকটা যত্ন লওয়া হইয়াছে। ওসম্বন্ধে যে সকল ত্রুটি ছিল, সেই সকল ত্রুটির সংশোধনপূর্ব্বক উহার প্রসার সাধন ও উহাতে উৎসাহদান জন্য গবর্ণমেণ্টও অনেকটা কাজ করিয়াছেন। ঐ উদ্দেশ্যে কয়েকটি জেলায় আদর্শ প্রাথমিক বিদ্যালয় সংস্থাপিত হই-য়াছে। চট্টগ্রামে একটি উচ্চ ইংরাজী স্কুল সংস্থাপিত এবং হিন্দু ও মুসলমান পুরস্ত্রী-গণকে শিক্ষা দিবার জন্য, হিন্দু ও মুসলমান শিক্ষয়িত্রী নিযুক্ত রাখা হইয়াছে। ইত্যাদি উপায়সমূহ অবলম্বনে কতকটা ফল হইয়াছে দেখিয়া ছোটলাট বাহাদুর সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছেন। বৎসরকাল মধ্যে স্ত্রীশিক্ষার জন্য স্কুল এবং ঐ সকলে ছাত্রীসংখ্যাও বৃদ্ধি পাইয়াছে বটে, কিন্তু স্কুলে পড়িতে যাইবার উপযুক্ত বয়ঃপ্রাপ্ত বালিকাসংখ্যার মধ্যে শতকরা ২·২৬ জন মাত্র বালিকা স্কুলে অধ্য-য়ন করিয়াছে। ডিরেক্টর মহাশয় বলিয়াছেন, স্থির ও ধীর ভাবে অনেকদিন ধরিয়া চেষ্টা করিতে পারিলে তবে বাঙ্গালায় স্ত্রীশিক্ষার অবস্থা কতকটা সন্তোষ জনক হইতে পারে। ছোট লাট বাহাদুরও এই কথাই ঠিক বলিয়া মনে করিয়াছেন।

কিন্তু সাধারণে পৃষ্ঠপোষক না হইলে গবর্ণমেণ্টের এ সম্বন্ধে চেষ্টা ফলবতী হইবে না বুঝিয়া ছোটলাট বাহাদুর এই ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন যে, হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের নেতৃবর্গ এ বিষয়ে গবর্ণমেণ্টকে যেন সহায়তা করেন। মধ্য শ্রেণীর বালিকা স্কুল সমূহে বালিকা সংখ্যা কম হওয়ার হেতু এই যে, মেয়ে বিবাহ যোগ্য বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে তাহার অভিভাবক আর তাহাকে স্কুলে পাঠাইতে চাহে না। এদেশের স্ত্রী শিক্ষার তেমন উন্নতি না হইবার পক্ষে যতগুলি কারণ দেখান হইয়াছিল, গত বৎসরের শিক্ষাসংক্রান্ত মন্তব্য প্রকাশ সময়ে তন্মধ্যে দুইটি বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য পড়ে—(১) উপ-যুক্ত শিক্ষয়িত্রীর অভাব, (২) পুরস্ত্রীগণকে শিক্ষাদানের পক্ষে বিশেষ কোন ব্যবস্থা না থাকা। প্রথমোক্ত অভাবটির পূরণ উদ্দেশ্যে কতিপয় উচ্চ ইংরাজী ও মিশন স্কুলে শিক্ষয়িত্রী প্রস্তুত করিয়া লইবার জন্য শ্রেণী খোলা হয়। পুরস্ত্রীগণের মধ্যে শিক্ষার প্রসার জন্য বিশিষ্ট বিভাগীয় অভিজ্ঞ কর্ম্ম-চারিগন লইয়া এ কটী সভা করা হইয়াছিল

বর্ম্ম দেশীয় মহিলা ।

উহাতে এই স্থির হয় যে —(১) পুরস্ত্রীগণকে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা এমন করিতে হইবে, যেন তাহা দেশীয় সমাজের অনুমোদিত হইতে পারে; হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচলিত নীতিধর্ম্মমূলক আখ্যায়িকা সংবলিত সুপাঠ্য পুস্তক সাহায্যে সেই শিক্ষা দেওয়ার প্রয়োজন; (২) বেশী লোক আছে এমন সকল গ্রামে হিন্দু ও মুসলমানদিগের মধ্যে স্বধর্ম্মানুরাগী সম্ভ্রান্ত লোকদিগকে লইয়া ছোট ছোট কমিটী গঠন করা আবশ্যক; (৩) গ্রাম্য পুরস্ত্রীগণকে শিক্ষা দিবার জন্য শিক্ষয়িত্রী নিযুক্ত হইবেন; শিক্ষাদান বিষয়ে তাঁহারা এই সকল কমিটীর উপদেশমত কার্য্য করিবেন। বৎসরের শেষ ভাগে এই প্রস্তাবগুলি গবর্ণমেণ্টের অনুমোদিত হয় এবং কয়েকটি মনোনীত স্থানে এই প্রস্তাবানুযায়ী কার্য্যও চালাইবার সম্বন্ধে কতকটা ব্যবস্থা বৎসরকাল মধ্যেই করা হইয়াছে।

বড় সুখের বিষয় ইংলণ্ডের ও স্কটলণ্ডের বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষগণ নারীজাতিকে তাঁহাদের শিক্ষোন্নতি সম্বন্ধে স্বাধীনতা ক্রমেই আরও অধিক প্রদান করিতেছেন। আমাদের বাঙ্গলা, বোম্বাই, মান্দ্রাজ ও পঞ্জাব প্রদেশস্থ বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ এসম্বন্ধে পূর্ব্বাবধি অধিক উদারতা প্রদর্শন করিয়াছেন। কিন্তু দুর্ব্বলা চির আশ্রিতা পদদলিতা নারীজাতির জ্ঞানোন্নতি দর্শনে আমাদের জনৈক সহযোগীর বড়ই গাত্রজ্বালা আরম্ভ হইয়াছে; তিনি ইতিমধ্যে বিদুষী মহিলাদিগের প্রতি বিদ্রূপোক্তি প্রকাশ করিয়া বীরত্বের গৌরব রক্ষা করিয়াছেন।

দুটী বোন।

[১]

শনিবার, একটী ইষ্টক নির্ম্মিত বাড়ীর পাশে একটা ছোট উদ্যানে গীতা ও সংগীতা নামে দুইটী মেয়ে খেলা করিতেছিল। ইহাদের বয়স ১০ এবং ১২ বৎসর। সেই বাগানে অনেক রকম ফুল ফুটিয়াছিল। আজ শনিবার সকালে স্কুল ছুটী হইয়াছে তাই দুটী বোনে মিলিয়া এইখানে খেলা করিতে আসিয়াছে। সংগীতা একটি কুন্দ ফুল তুলিয়া বলিল, "দেখ দিদি! এটী কেমন সুন্দর ফুল, এটীর নাম কি দিদি?"

গীতা—হাঁ, হাঁ, এই ফুলটাই মা আমাকে একদিন দেখাইয়াছিলেন; এটীর নাম কুন্দ ফুল।

সংগীতা—এই ফুল আজ খোঁপায় গুঁজতে হবে।

গীতা—দূর হাবি! এত ছোট ফুল কি খোঁপায় গুঁজা যায়। এর বিনা সুতায় বেশ সুন্দর হার হয়, আমি গাঁথতে জানি তাই আজ খোঁপায় গুঁজতে হবে। আচ্ছা সংগীতা! বল্ দেখি এটী কি ফুল?

সংগীতা ছোঁ দিয়া গীতার হস্ত হইতে ফুলটী লইয়া নাসিকার নিকট ধরিল, একটু হাসিয়া বলিল, "এটী গন্ধরাজ!"

গীতা—ঐ দেখ সংগীতা! ওদিকে ও

কি ফুল। চল ঐ ফুল তুলিগে। দুই বোনে হাত ধরাধরি করিয়া সেই দিকে চলিল।

সংগীতা একটী ফুল তুলিয়া,—"ফুলটী দেখ্‌তে বেশ! কিন্তু কি ফুল চিনিনে, তুমি চেন দিদি?"

গীতা—না। যা সংগীতা তুই একখান সাজি নিয়ে আয়। ফুল তুলে নিয়ে বাসায় যাই; এটী কি ফুল মা অবশ্য চিনিতে পারবেন।

সংগীতা সাজি আনিতে ছুটিয়া চলিয়া গেল। গীতা সেই খানে বসিয়া রহিল। অনেকক্ষণ চলিয়া গেল সংগীতা আসিল না। গীতা উচ্চৈঃস্বরে ডাকিল "সংগীতা! সাজি আন্‌তে কত দেরী হয়লো?" সংগীতা সাজি হাতে আসিয়া বলিল, "এই যে এসেছি সাজি খুঁজে আন্‌তে এত দেরী হয়ে গেল।"

উভয়ে সাজি হাতে ঘুরিয়া ফিরিয়া গোলাপ, বেলী, মালতী, জুঁই চামেলী, ইত্যাদি কত রকম ফুল তুলিয়া বাসায় চলিল।

সংগীতা বলিল, "দিদি! আজ কি রকম চুল বেঁধে দেবে?"

গীতা—আজ তোকে "ভিক্টোরিয়া" খোঁপা বেঁধে দেব।

সংগীতা—না দিদি! আজ "মেঘমালতী সরস্বতী" খোঁপা বেঁধে দিও তুমি বেশ বাধ্‌তে পার।

সংগীতা গৌরাঙ্গী এবং পরমা সুন্দরী, গীতাও গৌরাঙ্গী সুন্দরী কিন্তু সংগীতার মত নহে।

দুই বোনে চুল বান্ধিয়া, ফুল গুঁজিয়া, গা মুছিয়া পড়িতে বসিল। গীতা নিম্ন প্রাইমেরী ও সংগীতা বোধোদয় আর পদ্য পাঠ পড়ে। তাহারা আপন আপন বই লইয়া পড়িতে বসিল, পার্শ্বে পুষ্প পূর্ণ পুষ্প সাজি রহিয়াছে। এমন সময় একজন বিধবা প্রৌঢ়া আসিয়া বলিল, "গীতা, সংগীতা তোদের কি খাবার কথা মনে থাকে না? খাবার যে ঠাণ্ডা হয়ে গেল।" সংগীতা বই রাখিয়া উঠিল সাজি হইতে গোটা দুই তিন সেই অপরিচিত ফুল লইয়া বিধবাকে দেখাইয়া বলিল, "দিদিমা! আগে তুমি এ ফুলটীর নাম বল?"

বিরক্তি ভাবে দিদিমা বলিল, "বাছা সারাদিনই কি ফুল নিয়ে থাক্‌তে হয়। এটী চাঁপা ফুল।"

গীতা—চল দিদিমা খাবার ঘরে যাই।

সুধীর বাবুর পুত্র সন্তান নাই। গীতা ও সংগীতাই তাহার দুইটী আদরের সন্তান। তিনি প্রত্যহ কাছারী হইতে আসিবার সময়, তাহাদের জন্য খেল্‌না, না হয় খাবার লইয়া আসেন।

দুই বোনে খাবার খাইয়া কাপড়, জামা, জুতা, মোজা পরিয়া রাস্তায় বাহির হইল।

সংগীতা—দিদি বাবার আসবার সময় হয় নাই?

গীতা—হয়েছে বৈকি; এক্ষুণি আসবেন ঐ তোর মাথার জুঁই ফুলটা পড়ে গেল আয় গুঁজে দি।

সংগীতা করতালি দিয়া বলিল ঐযে বাবা আস্‌ছেন, হাতে এক খানা বই, ও খানা কি বই দিদি?

গীতা—আমি কি করে জান্‌ব? চল জিজ্ঞাসা করিগে। উভয়ে ছুটীয়া সুধীর বাবুর সম্মুখীন হইল।

সংগীতা—বাবা! তোমার হাতে ও খানি কি বই?

গীতা—বই খানি কাকে দিবে? আমাকে না গীতাকে?

সুধীর বাবু—এখানি স্বর্ণকুমারী দেবীর "গল্পস্বল্প"। গীতা দেখ্‌তে বইয়ের উপরে কার নাম লেখা আছে। কৌতূহল দৃষ্টিতে গীতা দেখিল বইয়ের মলাটের উপরে লেখা আছে "কুমারী গীতা"। "এখানি আমার বই" বলিয়া গীতা বই খানি হাতে করিয়া পাতা উল্টাইতে লাগিল।

সুধীর—সংগীতা! কাল তোমাকে এক খানি "মেজ বৌ" আনিয়া দিব।

সংগীতা—বাবা! সে খানি খুব ভাল বই নাকি?

সুধীর—হ্যাঁমা সে খানি বেশ বই। তাতে অনেক শিক্ষার কথা আছে।

সংগীতা—বাবা! আজ আমার খোঁপা কেমন হয়েছে?

গীতা—বাবা! আমার খোঁপা দেখ।

সুধীর—আগে খোঁপার নাম বল।

সংগীতা—আমার খোঁপার নাম "মেঘ মালতী সরস্বতী" খোঁপা।

গীতা—আমার খোঁপার নাম "ময়ূর পুচ্ছ" খোঁপা।

সুধীর—তোরা কত রকম চুল বাঁধাই জানিস্। সংগীতার খোঁপা ভাল হয়েছে।

গীতা নিম্ন প্রাইমারী পাশ করিয়াছে। সংগীতাও এখন নিম্ন প্রাইমারী পড়িতেছে সুধীর বাবু গীতাকে শ্রীযুক্তা অম্বুজাসুন্দরী দাসের এক খানি "প্রীতি ও পূজা" দিয়াছেন সংগীতা গীতার নিকট হইতে বইখানি লইয়া পড়িল, বইখানি বড়ই সুন্দর, সংগীতা বাপের নিকট বায়না ধরিল, আমাকে একখানি "প্রীতি ও পূজা" দিতে হইবে।

শীতকালে একদিন রবিবার দ্বিপ্রহরে সংগীতা লেপের তলে ঘুমাইতেছিল, হঠাৎ কাহার ডাকে তাহার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল উঠিয়া বসিয়া দেখিল, সুধীর বাবু একখানি "প্রীতি ও পূজা" লইয়া তাহাকে ডাকিতেছেন। সংগীতা ছুটিয়া গিয়া বই খানি লইল, সতৃষ্ণ নয়নে দেখিতে লাগিল সুধীর বাবু চলিয়া গেলেন। তখন সংগীতা তাহার সাধের বই খানি দিদিকে দেখাইবার জন্ত ছুটিয়া অন্য কক্ষে চলিয়া গেল।

গীতা আর এখন স্কুলে যায় না। সে এখন বড় হইয়াছে।

সংগীতার পরীক্ষা সম্মুখে, সে এখন, বাগানে যায় না, ফুল তুলে না, গল্প করে না, ভাল করিয়া খায়ওনা, কেবল পড়িবার ঘরে বসিয়া পড়ে।

সংগীতার পরীক্ষা হইয়া গেল।

পরীক্ষা দেওয়ার একমাস পরে সংগীতা একদিন দশটার সময় আপনার পড়িবার ঘরে বসিয়া "প্রীতি ও পূজার" "নৈশ কোকিল" পড়িতেছিল, এমন সময় শোভা নাম্নী স্কুলের একটী ছাত্রী সেইঘরে প্রবেশ করিয়া বলিল "হ্যাঁ সংগীতা! আজযে পরীক্ষার ফল বেরুবে শিগ্‌গির করে স্কুলে যেতে হবে। গাড়ী বাইরে দাঁড়িয়ে আছে।"

"সত্যইত" বলিয়া সংগীতা শোভার হাত ধরিয়া গাড়ীতে গিয়া উঠিল।

বৈকালে স্কুল হইতে আসিয়া সংগীতা জানাইল এবং দেখাইল যে সে পরীক্ষায় পাশ হইয়াছে এবং মাথার একটী সোনার ফুল পাইয়াছে। গীতা খুব ভাল করিয়া তাহার চুলে "গোলাপ বাগান" বান্ধিয়া সেই সেই ফুল গুজিয়া দিল।

গীতার আর আনন্দ ধরেনা সে এক জনকেই দুই তিন বার করিয়া ফুল দেখা-

হইতেছে। একবার মাথা হইতে খুলিতেছে আবার গুঁজিতেছে।

গীতা ও সংগীতা আজ সেই বাগানে গিয়া বসিল।

গীতা—বলিল, বল্ দেখি সংগীতা! তুই কি করে পাশ হলি।

সংগীতা—খুব পড়েছি, তাই হলুম।

গীতা—না সংগীতা। তোমার বুঝিবার ভুল। তুমি হাজার পড়লেও করুণাময় ঈশ্বরের করুণা ব্যতীত পাশ হতে পারিতে না।

আকাশের দিকে তাকাইয়া বলিল, "করুণাময় ঈশ্বর কে দিদি?"

গীতা—তিনি ব্রহ্মাণ্ডের পতি ঈশ্বর, তিনি যদি তোর উপরে অসন্তুষ্ট হন, তা'হলে তুই পাশও হতে পারবিনে, সুখীও হতে পারবিনে আগ্রহভরে সংগীতা বলিল, "তবেত তাঁকে সন্তুষ্ট রাখা উচিত। দিদি! তিনি কিসে সন্তুষ্ট হন?"

গীতা—জগতের কাউকে ঘৃণা করতে নাই। গরীব দুঃখীকে দান করা উচিত, দরিদ্রকে দান কল্লেই তিনি পান। চুরিকরা মিথ্যাকথা বলা, কপটতা করা, মা বাবার কথা না শোনা, এই সব না কল্লেই তিনি সন্তুষ্ট হন্।

সংগীতা স্থির ভাবে বসিয়া গীতার কথা গুলি শুনিল, বলিল "দিদি! আমি কি মিথ্যা কথাও বলি? কৈ, না আমারত মনে পড়ে না আমি মিথ্যাকথাও বলিনা কপটতাও করি না, মা বাবার কথাও শুনি, দীন দরিদ্রকেও কিছু কিছু দান করি, এখন থেকে আরও বেশী দেব, তবুও কি তিনি আমার উপর সন্তুষ্ট হবেন না?"

গীতা—হাঁ হবেন, তোমাকে সুখে রাখিবেন।

সংগীতা—দিদি! তোমারও আমার মাসিক জলখাবারের টাকা একত্র করলে ত্রিশ টাকা হয়, তারপর মা বাবার কাছ থেকে চেয়ে কিছু নিয়ে আমরা দীন দরিদ্রের জন্য মাসিক একটা ভোজ করব—কেমন? আমরা কত ভাল ভাল জিনিষ খাই, কিন্তু দীন দরিদ্রেরাও তাহাদের পুত্র কন্যারা কিছুই খায়না, ইহাতে আমার বড়ই কষ্ট হয়।

গীতা—হাঁ সংগীতা ঠিক্ বলেছিস্, বাবা যখন তোকে পাশের পুরস্কার দিবেন, জিজ্ঞেস্ করবেন্ তখন তুই ১৫৲ টাকা চেয়ে নিস্। এই রকম করে আমরা মাসে মাসে দীন দরিদ্রের জন্য একটা ভোজের ব্যবস্থা করব।

তখন সন্ধ্যা হইয়াছিল, দুইজনে বাসায় আসিল। সুধীর বাবুর বাসায় এখন মাসে মাসে, দীন দরিদ্রের জন্য ছোট খাট ভোজ হয়। ইহা গীতা ও সংগীতার, যত্ন চেষ্টা ও মাসিক সঞ্চিত ধনে হয়। এই ভোজ যে দীন দরিদ্রেরা ভোজন করে তাহাতে গীতা ও সংগীতার প্রাণে যে অনির্ব্বচনীয় আনন্দ, তাহা কি বলিব।

কুমারী সুরচীবালা দাস গুপ্তা
(বয়স ১১ বৎসর।)

বঙ্গে সূচিশিল্প প্রদর্শনী।

বিগত ১৫ই ১৬ই ডিসেম্বর বঙ্গের সূচি-শিল্প প্রদর্শনী হইয়াছিল। বঙ্গদেশীয় বালিকাবিদ্যালয়সমূহের ইন্‌স্পেক্ট্রেস্ শ্রীমতী এ, সি, মেরী মুরাট এই প্রদর্শনীর প্রতিষ্ঠাত্রী। বঙ্গীয় সংসারের জীবিকার্জ্জনের পথ দিনে দিনে সঙ্কুচিত হইয়া আসিতেছে এবং দিনে দিনে অভাবের বৃদ্ধি হইতেছে। এক্ষণে যদি বঙ্গীয় রমণীগণ সূচিশিল্প বিষয়ে পারদর্শিতা লাভ করিতে পারেন, তাহা হইলে বঙ্গীয় সংসারের কিয়ৎপরিমাণে ব্যয় লাঘবের—সুতরাং সুখসমৃদ্ধি বৃদ্ধির সম্ভাবনা।

এই শুভানুষ্ঠানে লেডী কার্জ্জন, ছোটলাট পত্নী সদয়-হৃদয়া শ্রীমতী ফ্রেজার এবং বঙ্গ-দেশীয় বিদ্যালয়সমূহের ডাইরেক্টর পেড্‌লার সাহেব মহোদয়ের সহানুভূতি দেখিয়া পরম আপ্যায়িত হইয়াছি। দেশীয় মহারাজা, রাজা, রাণী প্রভৃতির এতদ্বিষয়ে উৎসাহ দেখিয়া আনন্দিত হইয়াছি।

টাউনহল এই প্রদর্শনীর জন্য নির্ব্বাচিত ও বৃক্ষলতা ধ্বজপতাকা দ্বারা উত্তম রূপে সুশোভিত হইয়াছিল। ইটালিস্থ ব্যাপ্টাইষ্ট জেনানা মিসন চর্চ্চ অফ্ ইংল্যাণ্ড মিসন স্কুল হোমফর হোমলেস উওম্যান, নর্ম্ম্যাল স্কুল, ব্রাহ্মবালিকা বিদ্যালয়, কৃষ্ণনগরস্থ চার্চ্চমিসনারী সোসাইটীর বোর্ডিং বালিকা বিদ্যালয়, কৈলাসচন্দ্র হিন্দু অবৈতনিক বালিকা বিদ্যালয়, ডাইওস্থান-মিসন, লণ্ডন মিসন, ইউনাইটেড্ ফ্রিচার্চ্চ অফ্ স্কটল্যাণ্ড বোর্ডিং স্কুল, আসানসোলের মেথডীষ্ট এপীস্কোপল মিসন, সেণ্ট থরোসান, লণ্ডন মিসন বোর্ডিং বালিকা বিদ্যালয়, বাঁকিপুর ব্যাপ্‌টিষ্ট জেনানা মিসন বোর্ডিং স্কুল, বরাহনগর হিন্দু বালিকা বিদ্যালয়, ঈশ্বর ঠাকুরের লেনের বালিকা বিদ্যালয়, ভবানীপুরস্থ প্রিয়নাথ হিন্দু বালিকা বিদ্যালয়, ভবানীপুরস্থ প্রাণনাথ হিন্দু বালিকা বিদ্যালয়, চার্চ্চ মিসনারী সোসাইটীর ক্রাইষ্ট চার্চ্চ স্কুল, মহম্মদীয় মিসন কলিকাতা, আন্দুলস্থ চার্চ্চ মিসনরী জেনানা স্কুল, চাতলপাড়া হিন্দু বালিকা বিদ্যালয়, রাজেন্দ্র সেনের গলিতে অবস্থিত হিন্দু বালিকা বিদ্যালয় এবং সেণ্ট ক্রোজ বালিকা বিদ্যালয় হইতে বালিকা ও শিক্ষয়িত্রীগণের প্রস্তুত সূচিশিল্প সম্বন্ধীয় পদার্থ সকল প্রেরিত ও টাউনহলে সজ্জিত হইয়াছিল।

১৫ই ডিসেম্বর পূর্ব্বাহ্ণ দশ ঘটিকার সময় ছোটলাট-পত্নী লেডী ফ্রেজার টাউনহলে পদার্পণ করিলে শ্রীমতী মেরী মুরাট অগ্রসর হইয়া একটী সুবৃহৎ পুষ্পস্তবক তাঁহার হস্তে প্রদানপূর্ব্বক অভ্যর্থনা করিয়া টাউনহলের উপরতলে লইয়া যাইলে ঐক্যতানবাদন আরম্ভ হয়। অনন্তর অনারেবল শ্রীযুক্ত বাবু ভূপেন্দ্রনাথ বসু নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা দ্বারা এতাদৃশী প্রদর্শনীর উপযোগিতা প্রতিপাদন পূর্ব্বক মহামতি লেডী ফ্রেজারের অনুমতি-ক্রমে প্রদর্শনী উন্মুক্ত করেন। তদনন্তর ছোটলাট-পত্নী পূর্ব্বোক্ত বিদ্যালয় সকলের দ্রব্যাদি দর্শন করিয়া অতীব প্রীত হন এবং আসানসোলের মিসন স্কুলের জন্য একটি অতিরিক্ত রৌপ্যপদক প্রদান করেন।

প্রদর্শনীতে প্রেরিত সীবনকার্য্যের উৎকৃষ্টতা ও অপকৃষ্টতা নির্ব্বাচনের জন্য শ্রীমতী মেরী মুরাট্, মিসেস্ রিভার্স ক্যারী,

মিসেস্ ইউম্যান, মিসেস্ নর্ম্ম্যান, মিসেস্ ফাল্‌প্‌স, মিস ক্লার্ক, মিসেস্ মার্সেস, মিসেস্ পোপ ও মিস ডুম্যানকে লইয়া একটী সমিতি গঠিত হইয়াছিল; ঐ কমিটির বিচারে নিম্নলিখিত বালিকা ও শিক্ষয়িত্রীগণ নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ কর্ত্তৃক প্রদত্ত স্বর্ণ ও রৌপ্য পদক প্রাপ্ত হইয়াছে :—

১ম—লেডী কার্জ্জনের রৌপ্যপদক; শ্রীমতী সাধনবালা দে নর্ম্ম্যাল স্কুল।

২য়—লেডী ফ্রেজারের রৌপ্যপদক; শ্রীমতী শৈলজা চৌধুরী ব্রাহ্মবালিকা বিদ্যালয়।

৩য়—লেডী ফ্রেজারের রৌপ্যপদক; আসানসোল মিসন বালিকা বিদ্যালয়।

৪র্থ—পেড্‌লার সাহেবের রৌপ্যপদক; শ্রীমতী প্রমোদা দাসী, ডব্লিউ এফ্, সি, এস্ মিসন্।

৫ম—কাশীমবাজার রাজ প্রদত্ত স্বর্ণপদক; শ্রীমতী তারাপানী জান, হোম্ ফার্ দি হোম্‌লেস্ ফ্রেণ্ডলেস্ উওম্যান, ইটালী।

৬ষ্ঠ—মুরাণ সাহেবার প্রদত্ত রৌপ্যপদক; ডাইওসান মিসন্।

৭ম—নশীপুরস্থ রাজপ্রদত্ত রৌপ্য-পদক; শ্রীমতী সরোজিনী বিশ্বাস, শিক্ষয়িত্রী, সি, এস, এম্ স্কুল।

৮ম—উত্তরপাড়ার রাজপ্রদত্ত রৌপ্য-পদক; শ্রীমতী এমিলী গেলল্ড্ স্মিথ্, ক্রাইষ্ট চার্চ্চ স্কুল।

৯ম—আজিমগঞ্জের শ্রীমতী শিখর কুমারী প্রদত্ত রৌপ্যপদক; শ্রীমতী শিলবাণী মল্লিক, সি, এম্, এস্ কৃষ্ণনগর বোর্ডিং স্কুল।

১০ম—শ্রীমতী পেক্ প্রদত্ত রৌপ্যপদক; শ্রীমতী বাগ্দী টীকা (একটী কোল বালিকা) রাঁচী।

১১শ—বর্দ্ধমান বিভাগের বিদ্যালয়সমূহের ইনস্পেক্টর শ্রীযুক্ত মৌলবী মহম্মদ ইব্রাহিম প্রদত্ত রৌপ্যপদক; একটী মুসলমান ছাত্রী শিবাদহ, সি,ই, টি, এন্, এস্ স্কুল।

১২শ—ময়মনসিংহ রাজপ্রদত্ত রৌপ্য-পদক; শ্রীমতী মন্দোদরী, একজনশিক্ষয়িত্রী।

১৩শ—কাঁকিনার রাণী প্রদত্ত রৌপ্য-পদক; শ্রীমতী ভগবতীয়া, উভয় হস্তবিহীনা একটী বালিকার পদদ্বয় দ্বারা সীবন কার্য্যের জন্য।

১৪শ—শোভাবাজারের রাজ প্রদত্ত রৌপ্য-পদক; শ্রীমতী মৃণালিনী মণ্ডল, সি, এম্, এস স্কুলের ছাত্রী।

১৫শ—কুঙ্গার শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ মিত্র প্রদত্ত রৌপ্যপদক; শ্রীমতী পরিতোষকুমারী ঘোষ, কৈলাসচন্দ্র হিন্দু অবৈতনিক বালিকা বিদ্যালয়, ইটালী।

১৬শ—শ্রীমতী ডুম্যান প্রদত্ত রৌপ্য-পদক; বাঁকিপুরের ব্যাপ্টিষ্ট জেনানা মিসন্।

নিম্নলিখিত বালিকা ও শিক্ষয়িত্রী "অতিশয় প্রশংসার্হ" বলিয়া প্রশংসাপত্র পাইয়াছেন :—

শ্রীমতী সুধাংশুবালা প্রাণনাথ হিন্দু বালিকা বিদ্যালয়, রজনী ঘোষ আন্দুল, সুরস দাস ঐ, কমলিনী মণ্ডল নর্ম্মাল স্কুল, শরৎশশী মিত্র শ্যামবাজার বালিকা বিদ্যালয় (এন, এফ, সি মিসন), মীরাবাই দাসী ক্রাইষ্ট চার্চ্চ স্কুল, মালতী সরকার এন, এফ, সি বোর্ডিং, অনিল মুখোপাধ্যায় শ্যামবাজার এন, এফ, সি বোর্ডিং, মানদালী টীকা রাঞ্চী একটী মুসলমান বালিকা পাটোয়াবাগান।

নিম্নলিখিত বালিকা ও শিক্ষয়িত্রী অতি প্রশংসার্হ বলিয়া প্রশংসাপত্র পাইয়াছে :—

শ্রীমতী স্বর্ণময়ী দত্ত (শিক্ষয়িত্রী)

কৈলাসচন্দ্র হিন্দু অবৈতনিক বালিকা বিদ্যালয়, কামিনী কুমারী নাএক নর্ম্মালস্কুল, লীলাবতী দাসী ক্রাইষ্ট চার্চ্চ স্কুল, জ্ঞানদা দত্ত ব্যাপটাইষ্ট জেনানা মিসন, স্বর্ণ (শিক্ষয়িত্রী) বরাহ নগর মিসন, নাথর (শিক্ষয়িত্রী, সি, ই, জেড মিসন, দয়ামণি সি, ই, জেড কন্‌ভার্ট ইণ্ডষ্ট্রিয়াল, ছুলু সরকার মুসলমান সি, ই, জেড এম শিবাদহ, গ্যাসওয়ার্কস, অনন্তময়ী কর্ম্মকার সি, এম, এস বোর্ডিং কৃষ্ণনগর।

নিম্নলিখিত বালিকা ও শিক্ষয়িত্রী প্রশংসার্হ বলিয়া প্রশংসপত্র পাইয়াছে :—

শ্রীমতী মেরী (শিক্ষয়িত্রী) কৈলাসচন্দ্র হিন্দু বালিকা বিদ্যালয়, উমাসুন্দরী দে শ্যামপুকুর বালিকা বিদ্যালয়, কুঞ্জি মণ্ডল সি এম, এস বোর্ডিং স্কুল কৃষ্ণনগর, সুবর্ণ বসু সি, ই, এফ, এম সেণ্ট্রাল স্কুল, কৃষ্ণভাবিনী দাসী দর্জ্জীপাড়া হিন্দু বালিকা বিদ্যালয়, কমলা সি,এম, এস বালিকা ডে স্কুল কৃষ্ণনগর।

(উদ্ধৃত)

কবিতা।

নববিবাহিতা বধূর প্রতি কুমারীর উক্তি।

তুই, বেয়ে যা তরণী
আমি তীরে বসে দেখি ;
মৃদুল মলয়ভরে নাচিয়ে নাচিয়ে
তুলিয়ে বাতাসে পাল,
চলে যা রাখিয়ে ঠিক
নৌকার পিছন হাল ;
গেয়ে যা একটী গান
জুড়াক পিয়াসী প্রাণ ;
বেয়ে যা তরণী পবনের ভরে
আমি তীরে বসে থাকি।
সময় হইলে পরে
সকলিত যেতে পারে
কে আর রহিবে বাকি ?

তুই বেয়ে যা তরণী
তুলিয়ে বাতাসে পাল
আমি বসে বসে শুধু থাকিলো একাকী।
যা তোর উদ্দেশ্য পথে,
গেয়ে যা একটী গান
আমিও মিশাব তান
তুহারি গানের সাথে।
আমার তরণী পারে
আমিও উঠাব পাল
যাইব উদ্দেশ্য পথে গাহিয়ে সে গান
আছি শুধু পথ চেয়ে ;
আসিলে কাণ্ডারী বর
তাহাকে করিয়া ভর
যাব লো তরণী বেয়ে॥

শ্রীসরযূ বালা দেবী।

সমালোচনা ও প্রাপ্তিস্বীকার।

আলিসাকান্দা মাদকতা নিবারণী ও সামাজিক পবিত্রতারক্ষিণী সভার বার্ষিক কার্য্যবিবরণী পাঠে সভার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে যতটা বুঝিতে পারা গেল তাহাতে আমরা বিশেষ প্রীতি লাভ করিয়াছি। সভার উদ্দেশ্যগুলি এত মহৎ ও পবিত্র যে সে গুলি আমরা নিম্নে উদ্ধৃত না করিয়া থাকিতে পারিলাম না।

১। কোন প্রকার মাদক দ্রব্য নেশা-রূপে ব্যবহার করিবে না—এবং মাদক দ্রব্য সেবন নিবারণ করিতে সাধ্যানুসারে যত্ন করিবে।

২। স্বীয় চরিত্রের পবিত্রতা রক্ষার্থ সর্ব্বপ্রকার উপায় অবলম্বন করিবে এবং অন্যেরাও যাহাতে তদ্বিষয়ে যত্নশীল হন, তাঁহার চেষ্টা করিবে।

৩। নারী জাতীকে শ্রদ্ধা করিবে এবং তাঁহাদের অবনতির প্রতিরোধ করিতে চেষ্টা করিবে।

৪। অশ্লীল ভাষা এবং নীচ-ঠাট্টা চাতুরী নিবারণ করিতে চেষ্টা করিবে।

৫। যেরূপ আমোদে পতিতা নারীগণ সংসৃষ্ট থাকে, তাহাতে যোগ দিবে না অথবা কোন প্রকারে উৎসাহ প্রদান করিবে না।

এইরূপ সভা সমিতির সংখ্যা যত বৃদ্ধি হয় দেশের ততই মঙ্গল। কিন্তু বড়ই ক্ষোভের বিষয় যে যে পরিমাণ আর্থিক সাহায্য প্রাপ্ত হইলে, এইরূপ সভা সমিতির কার্য্য সুসিদ্ধ হইতে পারে সেই পরিমাণ অর্থ দানে এদেশ বাসী নর নারী প্রায়ই উদাসীন। সুতরাং অনেক স্থলে অর্থাভাবে সৎকার্য্যের প্রস্তাব সমূহ কার্য্যে পরিণত হইবার পূর্ব্বেই বিলীন হইয়া যায়। আমরা এই সভার দীর্ঘায়ু কামনা করি এবং আশা করি যে ইহার প্রতি জনসাধারণের সহানুভূতি আকৃষ্ট হইবে।

আমরা কৃতজ্ঞতাসহ নিম্নলিখিত পত্রিকা ও পুস্তকের প্রাপ্তিস্বীকার করিতেছি। পরে সমালোচনা করিব।

(১) পারিবারিক জীবন, বাঙ্গালীর যশোগান, সহানুভূতি, ধুমকেতু, প্রবাসী, বঙ্গভাষা, ভারতী, Wings, Abkari.
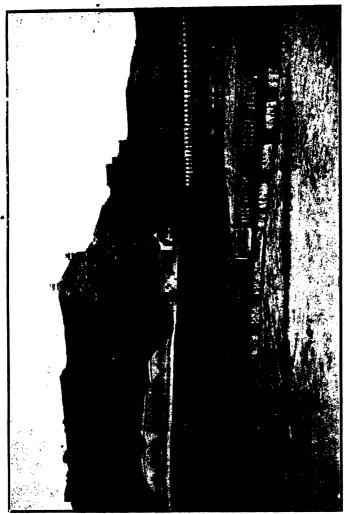
অম্বর দরবার হল্‌। জয়পুর।

অন্তঃপুর

সচিত্র মাসিক পত্রিকা।

ANTAHPUR

AN ILLUSTRATED MONTHLY JOURNAL IN BENGALI

Edited and contributed to by the ladies only.

কেবল মহিলাগণ কর্ত্তৃক লিখিত ও সম্পাদিত।

শুষ্ক শাখে ফুটে ফুল, মরুভূমে নদী বয়,
অতুল কৃপায় তব, হে বিভু করুণাময়।
নিরাশায় ম্রিয়মাণ, নিরস এ শুষ্ক প্রাণ,
চরণ-রাজীব তব বিকাশো হে দয়াময়!

৬ষ্ঠ বর্ষ।	১৩১০ মাঘ বঙ্গাব্দ	VOL. VI
১০ম সংখ্যা।	FEBRUARY, 1904.	No X.

সীতা।

স্মর(১)

মিথিলাধিপতি মহর্ষি জনক নিঃসন্তান ছিলেন। দৈবানুগ্রহে তিনি একটি কন্যারত্ন লাভ করিয়া পরমানন্দিত চিত্তে প্রাণপণ স্নেহ যত্নে শিশুটীকে সন্তান নির্ব্বিশেষে পালন করিতে লাগিলেন। দিনে দিনে কন্যাটী বয়োবৃদ্ধি সহকারে অপূর্ব্ব কান্তি ধারণ করিয়া স্নেহপ্রবণ পিতার হৃদয়ে অমিয় বর্ষণ করিতে লাগিল, বালিকার কমনীয় মুখ-কান্তি দর্শন করিয়া মহর্ষি জনকের সেই গাম্ভীর্য্যপরিপূর্ণ অটল চিত্তও দ্রবীভূত হইল। যে সংসারে সদ্য প্রস্ফুটিত পুষ্পের ন্যায় সুমধুর হাস্যলহরী-সংযুক্ত শিশুর সরল মুখখানি দেখিতে পাওয়া যায় না, তাহা মরুভূমি সদৃশ। নিরপত্য থাকাতে অতুল ঐশ্বর্য্যবান মহাপ্রতাপশালী ভূপতি জনক বড়ই মনঃক্ষুণ্ণ ছিলেন এবং সুবৃহৎ রাজভবনখানিও যেন তাহাদের অধিস্বামীর ক্ষুব্ধান্তঃকরণ দর্শনে এতদিন বিষাদের অন্ধকারে ডুবিয়াছিল, এখন বালিকার ফুল্ল-কুসুমতুল্য সহাস্য আননখানি দেখিয়া যেন তাহারাও হাসিয়া উঠিল। সেই অসংখ্য লোকাকীর্ণ রাজপ্রাসাদ যেন একটী ক্ষুদ্র বালিকার স্নিগ্ধ জ্যোতিপূর্ণ মুখখানির অভাবে মলিন বেশ ধারণ করিয়া আপনাকে নিতান্তই অস্তিত্ববিহীন বলিয়া মনে করিতেছিল।

(২)

যাহাহউক অলৌকিক রূপসম্পন্না দুহিতা জানকী ক্রমে ক্রমে বয়ঃস্থা হইয়া উঠিতেছেন দেখিয়া স্নেহময় পিতা এই অতুলনীয়া দুহিতা-রত্ন কাহার হস্তে সমর্পণ করিবেন এই চিন্তায় আকুল হইয়া উঠিলেন, প্রাণাধিকা তনয়া জানকীর উপযুক্ত পাত্র কোথায় মিলিবে? চিরদিনের জন্য, তাঁহার অঙ্ক-শোভিতা জানকীকে যাহার করে সমর্পণ করিবেন, তাহার উপযুক্ত হইবে কি না, এই অনির্দ্দিষ্ট আশঙ্কায় স্নেহশীল জনক-হৃদয় বড়ই উচাটিত হইল।

অনেক চিন্তার পর তিনি কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া তৎপর একটী উপায় উদ্ভাবন করিলেন। দেবাদিদেব মহাদেব প্রদত্ত বিশাল ধনুর্ব্বাণ যিনি ভঙ্গ করিতে পারিবেন, তাঁহার করেই জানকীকে সমর্পণ করিব। যে বীরের অমিত তেজপুঞ্জশালী কান্তিযুক্ত বিশাল বাহুদ্বয় এই প্রকাণ্ড হর-ধনুক উত্তোলন করিয়া তাহাতে গুণ দিতে সক্ষম হইবে, সেই করই তাঁহার প্রাণসমা তনয়ার পানিপীড়নের উপযুক্ত; এই হরধনুর্ভঙ্গ রূপ পরীক্ষা দ্বারা জানকীর উপযুক্ত পাত্র খুঁজিয়া লওয়া প্রকৃষ্ট উপায় মনে করিয়া দেশ বিদেশে তাহা প্রচার করিলেন।

(৩)

বড় বড় রাজবৃন্দ নিজ নিজ শৌর্য্য বীর্য্য সম্বন্ধে কিছুমাত্র চিন্তা না করিয়াই পরম রূপবতী গুণশীলা ভার্য্যা লাভাশায় উৎসাহিত হইয়া মিথিলা নগরে আগমন করিলেন কিন্তু সেই বৃহদায়তন ধনুতে গুণ যোজনা করা দূরের কথা, কেহ কেহ তাহার আকৃতি দর্শনেই হতবুদ্ধি হইয়া তাঁহাদের উচ্চাকাঙ্ক্ষা পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন এবং কেহ কেহ বা তরুণী জানকীর কমলানন কল্পনা করিয়া তাঁহাকে বাম দিকে শোভিত করিবার জন্য উত্তেজিত চিত্তে প্রাণপণে বল সংগ্রহ করিয়া ধনু উত্তোলনে প্রয়াসী হইলেন। কিন্তু তাঁহাদের সেই অসীম সাহস ফলবান না হইয়া চতুঃপার্শ্বস্থ দর্শক মণ্ডলীর মধ্যে কেবল মাত্র হাস্যাবেগ সঞ্চার করিয়া তাহাদের অধিনায়কগণকে অবমানিত এবং ঘৃণাস্পদ করিয়া তুলিল।

মোহময় আশার ছলনায় মুগ্ধ হইয়া এমন দুঃসাহসিক কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া কেবল অনর্থক লোকের নিকট হাস্যভাজন হইতে আসিয়াছিলাম মনে করিয়া ভূপালগণ নিজেদের ধিক্কার প্রদান করিতে করিতে ক্ষুব্ধ-চিত্তে অবনত মস্তকে স্ব স্ব রাজ্যে প্রস্থান করিলেন। এইরূপে কত শত সম্রাটগণ জানকী লাভে বঞ্চিত হওয়াতে ব্যর্থ মনোরথ হইয়া নিজ নিজ ভাগ্যকে নিন্দা করিতে লাগিলেন।

এ দিকে ইক্ষ্বাকু কুল জাত রাজা দশরথের জ্যেষ্ঠপুত্র রামচন্দ্র বিশ্বামিত্র মুনিদ্বারা তারকা-রাক্ষসীর বধার্থে তাঁহার অনুজ লক্ষ্মণ সহ মিথিলা নগরীর নিকটবর্ত্তী কাননে আনীত হওয়ায় তাঁহারা এই অদ্ভূত ব্যাপারের কথা শ্রবণ করিলেন। তদ্দর্শনে তাঁহাদের অতিশয় কৌতূহল জন্মিল, মুনিবরও এই বিষয়ে অনুরোধ করাতে তাঁহাদের বাসনা পূর্ণ হইতে চলিল। তাঁহারা অবিলম্বে মিথিলা নগরে আগমন করিয়া জনকদুহিতার পরিণয় ব্যাপার জনিত এই বিরাট আয়োজন দর্শন করিয়া বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন, মহাপরাক্রান্ত অতুল বীর্য্যশালী মহীপালগণকে সেই সুবৃহৎ ধনু উত্তোলনে অসমর্থ দেখিয়া দশরথাত্মজ শ্রীরামচন্দ্র নিজ বাহুবল পরীক্ষা করিবার জন্য কৌতূহলী হইয়া আপন অভীষ্ট ব্যক্ত করি-

লেন; মনোরম কান্তিবিশিষ্ট অত্যল্প বয়স্ক একটী যুবকের এই অত্যাশ্চর্য্য সাহসিকতা দর্শনে সকলে অবাক্ হইলেন, কেহ বা যুবকটীর এই অদম্য উৎসাহ কেবল অপরিণামদর্শী উশৃঙ্খল প্রকৃতির দাম্ভিকতা পরিপূর্ণ আস্ফালন বলিয়া মনে করিয়া তাঁহাকে বিদ্রূপ করিতে লাগিলেন। এবং কেহ বা রামচন্দ্রের মোহন মূরতি সন্দর্শনে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার সেই সুকোমল কর এই গুরুভারযুক্ত ধনু ধারণে ক্লিষ্ট হইবে মনে করিয়া ব্যথিতচিত্তে এই নবাগত মধুর দর্শন যুবকটীকে তাহা হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু রামচন্দ্র কোন কথায় কর্ণপাত না করিয়া নিজ অভীষ্ট সাধনে যত্নবান হইলেন। ভূপতি জনকও রামচন্দ্রের মনোমুগ্ধকর সৌম্য মূর্ত্তি দর্শনে বিস্মিত হইয়া ইঁহাকেই দুহিতা জানকীর উপযুক্ত পতি বলিয়া মনোনীত করিলেন, কিন্তু তাঁহার কঠোর প্রতিজ্ঞা কি এই মনোহর বপুবিশিষ্ট অল্প বয়স্ক যুবকটী সাধন করিতে সক্ষম হইয়া তাঁহার মনোভিলাষ পূর্ণ করিতে পারিবে? নিজ প্রতিজ্ঞা স্মরণে ক্ষুব্ধ হইয়া তিনি এ বিষয়ে নিরাশ হইতেছিলেন, ইতিমধ্যে রামচন্দ্র হেলায় ধনুক উত্তোলন পূর্ব্বক দর্শকমণ্ডলীর আগ্রহোৎসুক দৃষ্টি আকর্ষণে অনায়াসে তাহা দ্বিখণ্ডিত করিয়া বিদ্রূপকারীগণের হৃদয় আলোড়িত করিয়া মহর্ষি জনকের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিলেন। তাঁহার এই আশ্চর্য্য বীরত্ব-দর্শন করিয়া অনন্ত সমুদ্রের ন্যায় অগণন লোক সমূহ জয়ধ্বনিতে আকাশ নিনাদিত করিয়া মিথিলানগরী যেন সজীব করিয়া তুলিল।

মিথিলাধিপতি মহা হর্ষোৎফুল্লচিত্তে দুহিতা-রত্নকে অতুল গুণধর রামচন্দ্রের করে সমর্পণ করিতে উদ্যত হইলেন। কিন্তু পিতৃভক্ত পুত্র পিতার অনুপস্থিতিতে উদ্বাহক্রিয়া সম্পন্ন করিতে অনিচ্ছুক হইয়া তাহাতে আপত্তি করিলেন, ভূপাল ত্বরিতগমনে সমর্থ দূতগণকে আহ্বান করিয়া এই পরিণয়জনিত শুভ সম্বাদ অযোধ্যাপতি দশরথের নিকট প্রেরণ করিলেন। এদিকে পুত্রবৎসল পিতা পুত্রের অমঙ্গল আশঙ্কায় আকুল হইয়া বহুকষ্টে কালাতিপাত করিতেছিলেন, তাঁহার সর্ব্বদাই আশঙ্কা হইতেছিল, কখন যেন পুত্রদ্বয়ের অমঙ্গল বার্ত্তা তাঁহার শ্রুতিপথে প্রবিষ্ট হইয়া, পুত্রশোকোত্তপ্ত মুনিবরের অভিশাপের সফলতা লাভ করিবে। কিন্তু বিধির আশ্চর্য্য বিধানে রাজা দশরথ এই আতঙ্কের পরিবর্ত্তে অভাবনীয় আনন্দলাভ করিলেন। মিথিলানগরীতে তাঁহার চারি পুত্রেরই পরিণয় ব্যাপার সম্পন্ন হইবে, জনক রাজার প্রেরিত দূতমুখে এই শুভ বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া তিনি আনন্দসাগরে নিমগ্ন হইলেন, এই মঙ্গল বার্ত্তা তিনি রাজ্য মধ্যে প্রচার করিয়া মিথিলানগরীতে যাত্রার আয়োজন করিতে লাগিলেন, মহা সমারোহে অন্য দুই পুত্র সমভিব্যাহারে তিনি মিথিলাভিমুখে গমন করিয়া অনতিকাল মধ্যেই তথায় উপস্থিত হইলেন।

আজ বিপুল ঐশ্বর্য্যশালী মহা পরাক্রান্ত ভূপতি জনকের একমাত্র দুহিতা জানকীর বিবাহ। চতুর্দ্দিক আলোকমালায় সুসজ্জিত, রাস্তার উভয় পার্শ্বে কদলী বৃক্ষসমূহ প্রোথিত করিয়া তৎসান্নিধ্যে আম্রপল্লবে সুশোভিত সুবর্ণ কলসী সুসজ্জিত করা হইয়াছে; নানাবর্ণ পতাকাগুলি মৃদু মন্দ সমীরণে দোলায়মান হওয়াতে বোধ হইতেছে যেন তাহারা আনন্দে নাচিয়া নাচিয়া জানকীর শুভ পরিণয়োৎসব জনসাধারণের নিকট ব্যক্ত করিতেছে। বৃহৎ রাজ্য মিথিলা নগরীর আবাল বৃদ্ধ সক-

লেই আজ আনন্দে মাতোয়ারা, তাহারা যেন শোকতাপ পরিপূর্ণ সংসারের কেহ নহে, অপরিসীম আনন্দ লইয়াই যেন সুখ-ক্রীড়া করিবার জন্য এই মর্ত্ত্য জগতে তাহারা চলিয়া আসিয়াছে। দুঃখ, কষ্ট, শোক, তাপ, যেন আনন্দ হিল্লোলে পরিপূরিত এই শুভ্র হৃদয়-গুলিতে প্রবেশ করিয়া কালিমা সঞ্চার করিতে পারে নাই। কেবল চারিদিকে উৎসবজনিত আনন্দকোলাহল ভিন্ন আর কিছুই শ্রুতি গোচর হইতেছে না। বিবাহ সভা সুসজ্জিত হইলে শুভ লগ্নানুসারে হেমবর্ণা জানকী তথায় আনীতা হইলেন। জানকীর অপরূপ লাবণ্য-চ্ছটায় সভাস্থল যেন উজ্জ্বলতর হইয়া উঠিল। রামচন্দ্র তাঁহার আয়াসলভ্য প্রতিমা জানকীর দিকে সতৃষ্ণ নয়নে দৃষ্টিপাত করিয়া তাঁহার অতুলনীয় রূপ মাধুরী দর্শনে মুগ্ধ হইলেন। সেই বীর হৃদয়ে একটী সুকোমলাঙ্গী বালিকার করস্পর্শে মহা বিপ্লব উপস্থিত হইল, প্রতি শিরায় শিরায় ধমনীতে ধমনীতে যেন অতি বেগে বৈদ্যুতিক প্রবাহ সঞ্চারিত হইয়া তাঁহার হৃদয়কে স্পন্দিত করিতে লাগিল, তিনি অনিমিষ নয়নে অতৃপ্ত হৃদয়ে জানকীর রূপসুধা পান করিতে লাগিলেন। রামচন্দ্রের নব কিশলয়বৎ শ্যামবর্ণ সুগঠিত তনু কি মনোরম দৃশ্য! তাঁহার সেই কমলের ন্যায় আঁখিবিশিষ্ট সুগঠিত মুখখানি কর্ণযুগলে শোভিত মূল্যবান কুণ্ডলদ্বয়ে বেষ্টিত হওয়াতে আরও অপূর্ব্ব শ্রীধারণ করিয়াছে। নবজলধর সদৃশ রামচন্দ্রের মোহন মূরতির বামদেশে যখন বিদ্যুল্লতিকার ন্যায় শুভ্রকান্তিবিশিষ্টা জানকী উপবিষ্টা হইলেন, তখন দর্শকমণ্ডলীর মধ্যে সবরই এই ভাব উপস্থিত হইল, যেন সুনীল মেঘ মধ্যে চপলা হাসিতেছে, তাঁহার এই চারু দর্শনে মোহিত হইয়া, সকলে আনন্দ-ধ্বনিতে আকাশ পূর্ণ করিলেন।

মহাসমারোহের সহিত শ্রীরামচন্দ্র জান-কীর পাণিগ্রহণ করিলেন। এক দিবসে ও এক লগ্নেই তাঁহার তিন ভ্রাতা জানকীর অন্য তিনটী ভগিনীর সহিত বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হইলেন। রাজা দশরথ, পুত্রদিগের বিবাহান্তে স্বরাজ্যে প্রস্থান করিতে উদ্যোগী হইলেন।

বহু চিন্তা এবং বহু আয়াসের পর ভূপতি-জনক প্রাণসমা দুহিতা জানকীকে সুযোগ্য পাত্রে অর্পিত করিয়া, অতুল আনন্দলাভ করিয়া সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত হইয়াছিলেন, তাঁহার প্রাণপণ স্নেহযত্ন পালিতা তনয়াকে এত দিন পর তাঁহার ক্রোড় হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া স্বামীগৃহে পাঠাইতে হইবে মনে করিয়া বড়ই আকুল হইলেন, এক দিকে সুযোগ্য পাত্রে জানকীকে অর্পণ করিয়া যেমন হর্ষলাভ করিতেছিলেন, সেইরূপ অন্য দিকে কন্যাবিরহজনিত অসহ্যকষ্ট মনোমধ্যে উদিত হইয়া তাঁহাকে আকুল করিতে লাগিল। রাজর্ষি জনক এই দুই সমস্যার পড়িয়া যেন ক্ষণেকের জন্য আত্ম-হারা হইলেন, কিন্তু স্বাভাবিক গাম্ভীর্য্য দ্বারা তাহা সম্বরণ করিয়া দুহিতাকে শিরশ্চুম্বনপূর্ব্বক আশীর্ব্বাদ করতঃ জামাতৃ-করে সমর্পণ এবং তাঁহাদিগকে অশ্রুজলে অভিষিক্ত করিয়া, স্বীয় অনুচরবর্গ দ্বারা নানাবিধ যৌতুক সহ কন্যাকে স্বামীগৃহে প্রেরণ করিলেন। ক্রমশঃ

শ্রীনিরুপমা দেবী।

নলিনী

একবিংশ পরিচ্ছেদ।

মাতৃ-বিয়োগ।

আজ তিন দিন হইতে জননীর বড় জ্বর, জ্বরের সঙ্গে সঙ্গে অজ্ঞানাবস্থা, তাই সুরজা আজ বড় চিন্তাকুল। রাত্রি ৩টা বাজিয়া গিয়াছে, সুরজা স্পন্দহীন-নেত্রে জননীর ব্যাধিপীড়িত মুখ পানে চাহিয়া বসিয়া আছে। অনেকক্ষণ পরে জননী ক্ষীণ কণ্ঠে জল চাহিলেন, সুরজা মাতার মুখে জল দিয়া বলিল, "মা! জেগেছ? ওষুধ খাবার সময় হয়েছে খাও।" মাতা সে কথার কোন উত্তর না দিয়া আপন মনে বলিলেন,—"কৈ? নরেশ! এসেছ? প্রকাশ কোথায়? সে কি এত দুষ্ট হয়েছে!"

সুরজা চমকিয়া উঠিল, পীড়ার আরম্ভ হইতে সে মাতার মুখে এ পর্য্যন্ত এরূপ অসম্বদ্ধ বাক্য শুনে নাই, এক্ষণে তাহার বড় ভয় হইল বলিল, "মা! কি বল? আমি মামাবাবুকে টেলিগ্রাফ করেছি, তিনি হয়তো আজকেই এসে পৌঁছিবেন।"

মাতা তেমনই প্রলাপ ভাবে বলিলেন, "বাপ্‌রে বাপ্! এমন নিষ্ঠুর! আজ যোল বছর, আমি আর কতদিন মেয়ে রাখ্‌বো? তোরা কেউ যা তাকে ডেকে আন্ আমি মেয়ে পাঠাব।"

সুরজার প্রাণে বড় আঘাত লাগিল, বুঝিল জননী প্রলাপ বকিতেছেন, তাঁহার চরমকাল সমীপবর্ত্তী। সুরজা চক্ষু মুছিয়া শিশি হইতে একমাত্রা ঔষধ ঢালিয়া লইয়া মাতার মুখে দিতে গেল, তিনি অজ্ঞাতেই হস্ত নাড়িয়া তাহা ফেলিয়া দিলেন, সুরজা ব্যাকুল ভাবে জিজ্ঞাসা করিল, "ও কি মা! ঔষধ ফেলে দিলে?" অস্বাভাবিক হাসি হাসিয়া বলিলেন, "ছাই! ছাই! বড় আশায় ছাই! কোথায় যাব?" সুরজা বস্ত্রাঞ্চলে নেত্র মার্জ্জনান্তর উঠিল, যে দুই জন প্রতিবেশিনী স্ত্রীলোক রাত্রি জাগরণ করিবার নিমিত্ত আসিয়া সুরজার ইচ্ছানুসারেই নিদ্রিত হইয়াছিলেন, তাঁহাদের ডাকিয়া মাতার অবস্থা জ্ঞাপন করিল, তাঁহারাও ভীত হইলেন এবং ভৃত্যকে ডাকিয়া কবিরাজ মহাশয়কে ডাকিতে পাঠাইলেন। নিকটেই কবিরাজ মহাশয়ের বাড়ী, তাঁহার আসিতে অধিক বিলম্ব হইল না, কবিরাজ রোগিনীর নিকট বসিয়া কিয়ৎক্ষণ তাঁহার অবস্থা পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন, শেষে দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক উঠিয়া বাহিরে গেলেন, সুরজা বুঝিল, জননীর আর বিলম্ব নাই তথাপি আশা ও নৈরাশ্যপূর্ণহৃদয়ে চিকিৎসকের মন্তব্য শ্রবণ করিবার নিমিত্ত উৎকণ্ঠিত হইয়া রহিল, চিকিৎসক যাহা বলিলেন, তাহা শুনিয়া তাহার বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ হইতে লাগিল, পাগলিনীর ন্যায় জননীর চরণদ্বয় মস্তকে লইয়া "মা! মা!" রবে ডাকিতে ডাকিতে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল।

যথাসময়ে মাতার সৎকার করিয়া মাতার চিতাভস্ম জাহ্নবীনীরে ভাসাইয়া পৃথিবীর এক মাত্র অবলম্বন বিসর্জ্জন দিয়া সুরজা গৃহে প্রত্যাগমন করিল, দেখিল শূন্য গৃহে তাহার মাতুল নরেশচন্দ্র অধোমুখে উপবিষ্ট হইয়া নীরবে অশ্রুবারি বর্ষণ করিতেছেন। মাতুলকে দেখিয়া সুরজার যন্ত্রণা যেন দ্বিগুণ বেগে উথলিয়া উঠিল, নরেশবাবুও একে ভগ্নী বিয়োগে নিতান্ত ব্যথিত হইয়াছেন,

তাহার উপর সুরজার এই পাগলিনী বেশ দেখিয়া তাঁহার স্নেহপ্রবণ হৃদয় যেন ভাঙ্গিয়া পড়িতে লাগিল। অনেকক্ষণ উভয়ে হৃদয়াবেগে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। সমবেত প্রতিবেশীবর্গের সান্ত্বনাবাক্যে এবং দয়াময় পরমেশ্বরের অসীম কৌশলে ধীরে ধীরেশোকবেগ লাঘব হইলে প্রতিবেশীগণ অনেক চেষ্টা ও যত্নের পর নরেশবাবুকে কিঞ্চিৎ আহার করাইলেন সুরজা আর সে দিন জল গ্রহণ করিল না। আহারাদির পর নরেশবাবু বলিলেন, "চল সুর, আর এখানে থাকিবার প্রয়োজন নাই কালকেই আমরা কলিকাতা যাই।" সুরজা বুঝিল আর তাহার সুবর্ণপুরে থাকা হইবে না, তথাপি মাতার শ্রাদ্ধাদির পূর্ব্বে স্থানান্তরে না যাইবার ইচ্ছা মাতুলকে জানাইল। মাতার পারলৌকিক কার্য্য শেষ হইলে সুরজা তাহার ক্ষুদ্র সংসার গুছাইতে আরম্ভ করিলেন, এবং সমস্ত বন্দোবস্ত করিবার জন্য তাহার অভিভাবক ও আত্মীয় পূর্ব্বোক্ত বৃদ্ধ জমিদার মহাশয়কে ডাকিয়া পাঠাইলেন, তিনি আসিলে সুরজা সাষ্টাঙ্গে প্রণামপূর্ব্বক সাশ্রুনেত্রে বলিলেন, "দেব! আপনাকে ডাকিয়াছি, আপনার চরণে কয়েকটি প্রার্থনা আছে।" জমিদার মহাশয় স্নেহমাখা স্বরে বলিলেন, "কি বলিতে চাও বল, তোমাকে তো আর নরেশবাবু এখানে থাকিতে দিবেন না, তা জানি?"

সুরজা চক্ষু মুছিয়া বলিল, "হাঁ তা জানি —জন্মেরমত সুবর্ণপুর ছাড়িয়া যাইতে হইবে তা জানি।"

জ। "কেন মা! জন্মেরমত যাবে কেন? তোমার বাড়ী ঘর সকলি থাকিবে, যখন ইচ্ছা হইবে তখনি এস, তুমি সুবর্ণপুরের জননী হইয়া কি সন্তানদের কথা ভুলে যাবে?" এই 'জননী' কথায় সুরজার হৃদয়ে জননীর শোক উথলিয়া উঠিল, কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "না—না আর না আর যেন এখানে আসিতে হয় না, এখানে আমার সকলি রহিল, আমি আর থাকিব না।"

জ। "ছিঃ মা, কেঁদনা, তোমার ন্যায় ধৈর্য্যশীলা বুদ্ধিমতী মেয়ে কি কথায় কথায় কাঁদে? তোমার মাতা পবিত্র ভাবে জীবন কাটাইয়া স্বর্গপ্রাপ্ত হইয়াছেন, সেজন্য কান্না কেন? সকলেই তো তথায় যাইবে, এখন তোমার নিজ জীবনের দায়িত্বপূর্ণ কার্য্যগুলি তুমি ধীরভাবে সম্পন্ন কর, আবার এমন দিন আসিবে যে দিন তোমার এই পুণ্যময় জীবনও ভগবচ্চরণে লয় প্রাপ্ত হইবে, তুমি ত অনেক শাস্ত্র গ্রন্থ পাঠ কর, বল দেখি কোন্ শাস্ত্রে শোকে অধীর হইয়া কর্ত্তব্যে অবহেলা করিতে উপদেশ দিয়াছে? —এখন বল আমাকে ডাকিয়াছ কেন?"

সুরজা চক্ষু মুছিয়া চিত্তকে একটু প্রশমিত করিয়া ধীরে ধীরে বলিল, "আমার মনে একটা ইচ্ছা আছে এবং একটি গুরুতর দায়িত্বভারও আমার প্রতি ন্যস্ত আছে, আপনার সাহায্য ব্যতীত সে ইচ্ছা পূর্ণ হইবার উপায় নাই।"

জ। "আমি কি সাহায্য করিব মা?"

সু। "আপনি জানেন, কয়েক বৎসর পূর্ব্বে আমি আমার একটি আত্মীয়া প্রদত্ত উইলে প্রায় পঁচিশ হাজার টাকা প্রাপ্ত হই, এ পর্য্যন্ত তাহা হইতে এক কপর্দ্দকও ব্যয় করি নাই, আরও বোধ হয়, এত দিনে তাহার কিছু বৃদ্ধি হইয়াছে, সে টাকাতে আমার কোনও প্রয়োজন নাই, তাই ইচ্ছা যে সেই অর্থ দ্বারা তাঁহাদেরই স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ একটা দেবমন্দির প্রতিষ্ঠা হউক,—আর

তাহারই পাশে আমাদের জমাজমি বিক্রয় করিয়া, যে অর্থ পাওয়া যাইবে, তদ্দ্বারা এই অভাগিনীর মাতার একটি ক্ষুদ্র সমাধি-মন্দির—" সুরজার দুই চক্ষু জলে পূর্ণ হইল। জমিদার মহাশয় বলিলেন, "খুব সাধুইচ্ছা করিয়াছ, এ ইচ্ছা তোমার ভগবান অবশ্যই পূর্ণ করিবেন, ইহাতে আমার সাহায্যের আবশ্যকতা কি মা? তবে যখন সকল বিষয়েই মা এই বুড়ো ছেলের মত জিজ্ঞাসা কর তখন একটা কথা এই স্থলে বলা প্রয়োজন মনে করিতেছি।"

সু। "অনুমতি করুন।"

জ। "দেবমন্দিরের পরিবর্ত্তে একটা অনাথ আশ্রম করিলে হয় না? দেবমন্দিরের তো অভাব নাই, অনাথ দুঃখীদের প্রতি দয়া করিবার লোকই প্রায় দেখা যায় না।"

সু। "(কৃতজ্ঞতাসহকারে) খুব ভাল যুক্তি দিয়াছেন; কিন্তু ঐ সামান্য অর্থে কি তাহা হইবে?"

জ। "সে আমি হিসাব করিয়া দেখিব, —নিশ্চয় হইবে, 'সাধু যাহার সংকল্প ঈশ্বর তাহার সহায়' এই কথাটি সর্ব্বদা স্মরণ রাখিও, তোমার স্নেহের বালিকাবিদ্যালয়ের কি বন্দোবস্ত করিবে মনে করিয়াছ?"

সু। "আপনাদের আশীর্ব্বাদে এবং পরমেশ্বরের কৃপায় আমার সকল সাধই পূর্ণ হইয়াছে, আমি আর কি করিব? বালিকা-বিদ্যালয় বাস্তবিকই আমার বড় স্নেহের সামগ্রী; কিন্তু নিতান্ত নিরুপায় হইয়াই তাহার সহিত সংস্রব ত্যাগ করিতে হইতেছে, আপনি অনুগ্রহপূর্ব্বক উহার দায়িত্ব গ্রহণ করিলে উহা জীবিত থাকিবে, নতুবা নহে।"

জ। "আমি উহার দায়িত্ব গ্রহণ—অর্থাৎ অর্থাদির আবশ্যক হইলে সাহায্য করিতে প্রস্তুত আছি; কিন্তু উহার উন্নতির জন্য প্রাণপণে যত্ন ও পরিশ্রম কে করিবে?"

সু। (বিনম্রস্বরে) "আমি আর কি করিয়াছি, জানিই বা কি? আপনার কৃপা-দৃষ্টি থাকিলেই, বালিকা বিদ্যালয়ের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি হইবে।"

জ। "আচ্ছা মা! তোমার যাহা ইচ্ছা তাহাই হইবে, কিন্তু দেখিও যেন এই সুবর্ণপুরের দরিদ্রদের এবং এ বুড়ো ছেলেটিকে ভুলে যাইও না।"

জমিদার মহাশয় উঠিলেন, সুরজা আবার ভক্তিভরে তাঁহার চরণে প্রণত হইল। ইহার কিছু দিন পরে সুরজা কাঁদিতে কাঁদিতে সুবর্ণপুর হইতে বিদায় গ্রহণ করিল! জমিদার মহাশয় হিসাব করিয়া দেখিলেন, সুরজার টাকা সুদে আসলে প্রায় পঞ্চাশ হাজার দাঁড়াইয়াছে; সুতরাং টাকায় কুলাইবে না বলিয়া সুরজা যে ভয় করিয়াছিল তাহা আর রহিল না, জমিদার মহাশয় সুরজার অনুরোধে সমস্ত কার্য্যের তত্ত্বাবধায়ক হইয়া দারিদ্র্যাবাসের কার্য্য আরম্ভ করিলেন। গৃহাদি নির্ম্মিত হইলে সুরজার ইচ্ছানুসারেই আশ্রমের দ্বারে প্রস্তরফলকে স্বর্ণ অক্ষরে লিখিত হইল "স্বর্গীয়া ভবতারিণী দাসী ও তদীয় পুত্র স্বর্গগত প্রকাশচন্দ্র ঘোষের স্মৃতি-চিহ্ন স্বরূপ এই দারিদ্র্যাবাস স্থাপিত হইল।" তাহার পর সুরজার পৈত্রিক বিষয় যাহা ছিল, তৎসমুদায় বিক্রয় করিয়া মোট ৪০০০ হাজার টাকা হইল, তদ্দ্বারা সুরজাদের বসত বাটীর উপরে একটি উচ্চ চূড়াবিশিষ্ট মন্দির নির্ম্মিত হইল, তন্মধ্যে রজতপাত্রে সুরজার মাতার চিতাভস্ম ও তাঁহার একখানা চিত্র রক্ষিত হইল। সেই মন্দিরের নাম "সুহাসিনী দেবীর সমাধিমন্দির," রাখা হইল।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ।

প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ।

আমাদের ক্ষুদ্র আখ্যায়িকা প্রায় শেষ হইল, আর দুই চারিটি কথা বলিয়াই আমরা পাঠিকা মহাশয়ার নিকট বিদায় লইব।

ভবেশ কাশীতে আসিয়া কার্য্যভার গ্রহণ করিলে আরও এক বৎসর গত হইয়া গিয়াছে, নলিনী ভবেশকে বিবাহ দিবার নিমিত্ত অনেক যত্ন করিয়াছেন, ভবেশের সেই একই উত্তর "না"।

* * * * *

আজ জগদীশ বাবুর বাড়ীতে বড়ই অনন্দোৎসব, রাত্রি প্রভাত না হইতেই নহবৎখানায় নানা রাগরাগিণীতে সুমধুর বাগু বাজিতে আরম্ভ হইয়াছে। অসংখ্য গাড়ী ঘোড়ায় জগদীশচন্দ্রের সিংহদ্বার পরিপূর্ণ। কত লোক যাতায়াত করিতেছে তাহার গণনা করা দুঃসাধ্য। আজ এ বাটীতে কিসের উৎসব? বেলা দশটা না বাজিতেই বিবাহের সাজসজ্জায় ভূষিত হইয়া নানা চিত্র বিচিত্রে সুশোভিত, চৌঘুড়িতে বর বাহির হইল, তাহার অগ্রে পশ্চাতে ইংরাজী বাজনা ও সেই অসংখ্য গাড়ী ঘোড়া বর যাত্রী দারোয়ান ভৃত্য ইত্যাদিতে পূর্ণ হইয়া ষ্টেশনাভিমুখে ছুটিল। বলিতে হইবে কি আজ বিনয়কুমারের বিবাহ। বিবাহ হইবে কলিকাতায়। জগদীশবাবুর প্রকাণ্ড পুরীতে কেবলমাত্র কয়েকজন দাস দাসী লইয়া মহিলাগণ রহিলেন, তদ্ব্যতীত সকলেই বরের সহিত চলিলেন।

যথাসময়ে বর বিবাহসভায় উপস্থিত উপস্থিত হইলেন, পুরাঙ্গনাগণ "স্ত্রীআচার" প্রভৃতি সম্পন্ন করিলে পাত্রী সভায় হইল।

ঠিক এই সময়ে এই বিবাহ বাটীর অন্য একটী স্থানে কি হইতেছিল, তাহাই আমাদিগকে দেখিতে হইবে। চলুন পাঠিকা! আমাদের বিবাহ দেখা স্থগিত থাকুক। সকলে বিবাহ সভায় চলিয়া গিয়াছেন, ভবেশও যাইবার জন্য উঠিতেছিলেন, জগদীশবাবু সেই সময় তাঁহাকে অপেক্ষা করিতে বলিলেন, ভবেশ দাঁড়াইলেন জগদীশবাবু ভবেশের নিকটে আসিয়া তাঁহার হস্তধারণ পূর্ব্বক গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "ভবেশ, তুমি আমাকে তোমার পিতার ন্যায় ভক্তি ও সম্মান কর, তাহা আমি জানি, আজ আমার একটি অনুরোধ তোমাকে রক্ষা করিতে হইবে।" ভবেশ জগদীশবাবুর কথায় আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন; কারণ তিনি কখনও জগদীশবাবুর নিকট এরূপ ব্যবহার পান নাই। ভবেশ নতমুখে বলিলেন, আপনার আজ্ঞা সাধ্যানুসারে কখনই লঙ্ঘন করি নাই, এখনও করিব না, আপনি অনুমতি করুন কি করিতে হইবে?"

জগদীশবাবু পূর্ব্ববৎ গম্ভীরস্বরে বলিলেন, "অন্য বাবু নরেশচন্দ্র বসু মহাশয়ের কোনও বিধবা আত্মীয়ার কন্যা শ্রীমতী বিনোদিনীর সহিত তোমার বিবাহ হইবে, নরেশবাবু পাত্রী লইয়া সস্ত্রীক এখানে উপস্থিত আছেন শুধু তোমার মতসাপেক্ষ।"

কি ভয়ানক অনুরোধ! ভবেশ স্বপ্নেও জানিতেন না, অত বড় বিজ্ঞ বিদ্বান তাঁহার পূজনীয় মনিব তাঁহাকে আজ এই অবিজ্ঞের ন্যায় অনুরোধ করিবেন, ভবেশ কম্পিত কলেবরে বসিয়া পড়িলেন, কিছুক্ষণ তাঁহার কথা বলিবার সমর্থ রহিল না। জগদীশবাবু পুনরায় বলিলেন, "এখন বিবেচনা করিবার সময় নাই, তুমি হয় তো ভাবিতেছ তোমাকে এ প্রকার অনুরোধ করা আমার অনধিকার

চর্চ্চা হইল, আমার ও তোমাকে এরূপ অন্যায় অনুরোধ করিতে ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু তোমাকে বিবাহ দিবার জন্য আমার স্ত্রীর প্রাণ পর্য্যন্ত পণ, তাঁহার অনুরোধে বাধ্য হইয়াই আমি নরেশবাবুকে চিঠি লিখিয়া সমস্ত ঠিক করিয়াছি, আমার দৃঢ় বিশ্বাস তুমি আমার অবাধ্য হবে না, উঠ সময় বয়ে যাচ্ছে।”

ভবেশ ললাটের স্বেদ মোচন করিলেন এবং ধীরে ধীরে বলিলেন, “আপনার অনুমতি শিরোধার্য্য, কিন্তু আমাকে এরূপ বিপদে ফেলিয়া আপনাদের কি লাভ, তাহা বুঝিলাম না।” জগদীশবাবু ঈষদ্ধাস্যে বলিলেন, “কি লাভ তাহা আমি জানি না, যিনি বিবাহ দিতে ব্যস্ত, তিনিই জানেন ;—আমিও বলি, চিরদিন বিবাহ না করিয়াই বা থাকিবে কেন ? চল, আর অপেক্ষা করিও না।”

ভবেশ আর কোনও কথা বলিলেন না। নীরবে জগদীশবাবুর অনুগমন করিলেন, মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, “বিবাহই যদি হইল, বেশ অন্যত্র হইলেই হইত! আবার সেই নরেশ বসুর বিধবা আত্মীয়ার কন্যা! তবে কি এ অন্য নরেশ বসু ? স্ত্রীলোকের অসাধ্য কাজ নাই। আমি বিবাহ করি বা না করি, তাহাতে জগদীশ বাবুর স্ত্রীর ক্ষতি বৃদ্ধি কি ? এ বোধ হয় নরেশ বাবুর স্ত্রীর চক্রান্ত !”

ভবেশ এই সকল চিন্তা করিতে করিতে যাইতেছিলেন, ইতিমধ্যে একটী ভদ্রলোক আসিয়া জগদীশবাবুকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিলেন, “কৈ মহাশয় ! আপনার আসিতে এত বিলম্ব যে ? পুরোহিতেরা বলিতেছেন লগ্ন উপস্থিত।” ভবেশের চিন্তাসূত্র ছিন্ন হইল, এ স্বর কাহার ? এ যে তাঁহারই পূর্ব্ব প্রতিপালক নরেশচন্দ্র বসু—ভবেশের আর কিছু বুঝিতে বাকী রহিল না। নীরবে বিবাহ সভায় উপস্থিত হইলে, যিনি যাহা আদেশ করিলেন, ক্রীড়াজনিত পুত্তলিকার ন্যায় বিনা প্রতিবাদে তাহাই সম্পন্ন করিলেন, দুই ঘণ্টা সময়ের মধ্যে তাঁহার জীবনে অভাবনীয় ঘটনা সংঘটিত হইয়া গেল। ভবেশের স্থির প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হইল।

শ্রীকুমুদেন্দু দেবী।

রন্ধনে রমণী

আমাদের ভারতীয়া মহিলাগণ চিরদিনই রন্ধনে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়া আসিতেছেন। কিন্তু বড়ই দুঃখ ও পরিতাপের বিষয় যে আমাদিগের বর্ত্তমান কালের শিক্ষিতা ও অর্দ্ধশিক্ষিতা মহিলাগণকে উক্ত বিষয়ে বড়ই উদাসীন দেখিতে পাওয়া যায়। কি ধনী কি নির্ধন প্রায় অধিকাংশ মহিলাবর্গই রন্ধনকে একটি অতীব নিকৃষ্ট ও কষ্টকর কার্য্যের মধ্যে পরিগণিত করিয়া ক্রমেই তাহা হইতে সম্পূর্ণ অবসর গ্রহণ করিতেছেন। যদিও বহু দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত লোকের অধিকাংশ রমণীবর্গকেই অবস্থানুসারে নিতান্ত বাধ্য হইয়াই উক্ত কার্য্য আপনাদিগকেই সম্পন্ন করিতে হয় কিন্তু তাহাতে তাঁহারা অত্যন্ত দুঃখ ও বিরক্তি প্রকাশ করিয়া থাকেন। প্রকৃতপক্ষে রন্ধনকে অধিকাংশ শ্রমবিমুখ বিলাস পরায়ণ নব্য সম্প্রদায়গণই অতীব ভীতি ও অবজ্ঞার চক্ষে পরিদর্শন

করিয়া থাকেন। বিশেষতঃ পল্লীগ্রাম অপেক্ষা সহরবাসিনী বিলাস প্রিয়া অলস ধনাঢ্য রমণীগণের মধ্যেই এই ভ্রমমূলক বহু অনিষ্টকর প্রথা এত অধিক পরিমাণে বিস্তৃত হইয়া পরিতেছে যে, তাহা দর্শনে দুঃখাভিভূত ও বিস্মিত হইতে হয়। যে খাদ্য দ্রব্যের উপর শারীরিক স্বাস্থ্য মানসিক উন্নতি এমন কি আমাদিগের জীবন অবধি সম্পূর্ণ নির্ভর করিতেছে, যে রন্ধন আমাদের হৃদয়ের আনন্দদায়ক রসনার তৃপ্তিকর তাহা কখনই সামান্য ও নিকৃষ্টের মধ্যে পরিগণিত হইতে পারে না। একটু বিশেষরূপে চিন্তা করিয়া দেখিলে বরং ইহাই প্রতীয়মান হইবে যে আমাদিগের জীবন যাত্রা নির্ব্বাহের জন্য প্রতিদিন আমরা যতগুলি অতি প্রয়োজনীয় সাংসারিক কার্য্য সম্পন্ন করিয়া থাকি তাহার মধ্যে রন্ধনই একটি অতীব প্রীতিকর ও সর্ব্বোৎকৃষ্ট কার্য্য।

আমাদিগের পুণ্যবতী পৌরাণিক মহিলাগণ নিরক্ষরা ও নিতান্ত অশিক্ষিতা হইলেও তাঁহাদিগের হৃদয়াভ্যন্তরে এরূপ অনেক বহুমূল্য সদ্গুণ রাশির একাধারে সমাবেশ দেখা যাইত যে বর্ত্তমান কালের মার্জ্জিতাবুদ্ধিমতী সুশিক্ষিতাদিগের মধ্যেও সেই সমুদয় দুর্লভ সদ্গুণ রাশির সর্ব্বত্র সম্পূর্ণ অভাব লক্ষিত হয়। প্রাচীনাদিগের দয়া, দাক্ষিণ্য, সাহস, উৎসাহ, শ্রমশীলতা, পতিভক্তি, অতিথিপরায়ণতা, ত্যাগস্বীকার, কষ্টসহিষ্ণুতা ও নিঃস্বার্থ পরোপকারীতা জগতে অতুলনীয়। হায়! যে দেশের মহিলাগণ একদিন আপনি অনাহারী থাকিয়া আপন মুখের গ্রাসে ক্ষুধার্ত্ত শ্রান্ত অতিথির পরিচর্য্যা করিয়া কত সন্তোষ ও তৃপ্তিলাভ করিতেন এবং * সহাস্য বদনে পতির জলন্ত চিতায় আত্ম সমর্পণ করিয়া দুর্লভ সতীত্ব ও ত্যাগ স্বীকারের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া গিয়াছেন। যে দেশের মহিলাগণ একদিন প্রতিবেশিনী, এমন কি নিতান্ত নিঃসম্পর্কীয়াদিগের বৃহৎ বৃহৎ ক্রিয়া কর্ম্মে, একা অক্লান্ত পরিশ্রমে ও অতুল উৎসাহে শত শত লোকের রন্ধন ও পরিবেশনে, মুহূর্ত্তের নিমিত্তও ক্লান্তি বা বিরক্তি প্রকাশ করেন নাই; বরং সমধিক আনন্দ ও প্রীতি প্রকাশ করিয়া তাঁহারা অদ্ভুত কার্য্য কুশলতা ও নিঃস্বার্থ পরার্থপরতার জলন্ত দৃষ্টান্ত দেখাইয়া জগতে ধন্য হইয়া গিয়াছেন। আর আজ কিনা সেই দেশেই প্রতিবেশী ত দূরের কথা, স্ব স্ব পতি পুত্রের নিমিত্তও সামান্য একটু পরিশ্রম করিয়া রন্ধন করিতে হইলে আর তাঁহাদিগের দুঃখের ও ক্ষোভের সীমা পরিসীমা থাকে না। ইহাই কি আমাদিগের সমাজের ললনা কুলের অধঃপতনের চরম সীমা নহে?

পাঠিকা ভগিনীগণ একবার মনে ভাবিয়া দেখুন দেখি যে, আমাদের পতি পুত্র ভ্রাতা পিতা প্রভৃতি আমাদিগের ভরণ পোষণ এবং সুখ বর্দ্ধন জন্য প্রাতিদিবস মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া কত খাটিতেছেন। আর আমরা তাঁহাদিগের সুখ সন্তোষের নিমিত্ত সামান্য একটু ক্লেশ স্বীকার করিতেও প্রস্তুত নাহি। যে শিক্ষার বলে মনুষ্যের হৃদয় উন্নত, বুদ্ধি মার্জ্জিত, জ্ঞানের বিকাশ ও কর্ত্তব্য সম্পাদনে দৃঢ়তা জন্মে; প্রকৃত পক্ষে মনুষ্য দেবত্ব লাভ করে, কে বলিবে যে আমাদের সমাজের রমণীগণ সেই শিক্ষায় শিক্ষিতা হইতেছেন? যদ্যপি প্রকৃতই তাঁহারা সেই শিক্ষা প্রাপ্ত

* ইহা অধিকাংশ স্থলেসন্দেহের বিষয়। অঃ সঃ

হইতেন তবে আর আজ বঙ্গের প্রতি গৃহে গৃহে এরূপ কুশিক্ষার ভীষণ তরঙ্গ উত্থিত হইয়া হতভাগ্য বঙ্গসমাজকে এরূপ আলোড়িত ও নিষ্পেসিত করিতে কখনই সক্ষম হইত না। তাহা হইলে আজ আমরা বঙ্গের প্রতি গৃহে গৃহে সুমাতা ও সুগৃহিণী দেখিয়া নয়ন চরিতার্থ ও জীবন সার্থক করিতে পারিতাম। হায়! আমাদিগের সে শিক্ষা যে এখনও সুদূরাৎ সুদূরে।

অবশ্য যাঁহাদিগের পাচক পাচিকা রাখিবার ক্ষমতা আছে তাঁহারা প্রতিদিন না রাঁধিতে পারেন। তাই বলিয়া কি তাঁহাদিগের একবারে রন্ধনে অবসর লওয়া উচিত? যদি আমাদের পতি পুত্র পিতা প্রভৃতি কখনও আমাদের হস্তের রন্ধন খাইতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন তবে কি আমরা তাহা দিব না? আমাদিগের রন্ধনে দক্ষতা থাকিলে আমাদের দ্বারায় যেরূপ নানামত সুস্বাদু আহার্য্য প্রস্তুত হওয়া সম্ভব; সামান্য বেতন ভোগী নিতান্ত নিঃসম্পর্কীয় পাচক পাচিকা দ্বারায় কখনই তদ্রূপ হওয়া সম্ভব পর নহে। বস্তুতঃ এখন আমাদিগের বক্তব্যের বিষয় ইহাই, যে পাচক সত্বেও প্রত্যেক গৃহিণী জননী এবং তনয়া গণেরই রন্ধনে অবজ্ঞা প্রকাশ না করিয়া যথা সাধ্য চেষ্টা যত্ন ও উৎসাহের সহিত বিবিধ রসনার তৃপ্তিকর সুস্বাদু আহার্য্য প্রস্তুত করিয়া আত্মীয় স্বজনবর্গকে যথাবিধি যত্নের সহিত আহার করান সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। সুতরাং উক্তবিষয়ে যাঁহারা আলস্য ও উদাসীন্য প্রকাশ করিয়া থাকেন তাঁহাদের কি কর্ত্তব্যকাজে ক্রটী হয় না?

সম্প্রতি সভ্য প্রধান ইউরোপের কোন কোন দেশের মহিলাবর্গের মধ্যেও রন্ধন বিদ্যা শিক্ষার রীতি প্রচলিত হইতেছে। এমন কি ইহাও স্থির হইয়াছে যে, যিনি রন্ধন বিদ্যার সার্টিফিকেট প্রাপ্ত না হইবেন তিনি বিবাহে অধিকারিণী হইতে পারিবেন না। আমাদিগের যে বিদ্যা লইয়া বিদেশীয়গণ গৌরব করিতে প্রয়াস পাইতেছেন, আর আমরা কিনা আলস্যের দাস হইয়া অম্লান বদনে তাহাকেই পরিত্যাগ করিয়া, নিরপেক্ষ ভাবে কালযাপন করিতেছি।

এখন ইহাই আমাদিগের শেষ বক্তব্য যে ধনবানই হউক কি নির্ধনই হউক প্রত্যেক বঙ্গরমণীগণেরই রন্ধনে পারদর্শীতা বিশেষরূপে প্রয়োজন আছে। প্রত্যেকেরই সম্যক যত্ন ও উৎসাহের সহিত পরিবেশন প্রভৃতি শিক্ষা করা এবং তাহাতে পারদর্শিনী হওয়া একান্ত কর্ত্তব্য। এবং বিদ্যা শিক্ষা, গৃহকর্ম্ম, শিল্পকর্ম্ম প্রভৃতি অন্যান্য শিক্ষার সহিত বাল্যকাল হইতেই স্ব স্ব তনয়াগণকে রন্ধনে সমধিক উৎসাহিত করা এবং উত্তমরূপে উক্ত বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া অত্যাবশ্যক। আবার অনেক জননীগণ তনয়াদিগকে বাল্যকালে গৃহকর্ম্ম রন্ধন পরিবেশন প্রভৃতি কার্য্যে নিজে লিপ্ত থাকিয়া শিক্ষা দিতে নিতান্ত অনভিলাসিনী। বলিতে কি এসমুদয় তাঁহাদিগের নিতান্ত ভ্রম; কারণ বহু সদাশয় মহাপ্রাণ ব্যক্তিগণ, বাল্যকালই প্রকৃত শিক্ষার সময় নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। বাস্তবিকই মনুষ্যের বাল্যশিক্ষা যেরূপ কার্য্যকরী হইয়া থাকে অপর কোন সময়ের শিক্ষাই তদ্রূপ কার্য্যকারী হইতে পারে না। তাহার কারণ বাল্যে মন যেরূপ কোমল থাকে স্মৃতিশক্তিও তদ্রূপ প্রবল থাকে; সেই জন্যই মানুষের তৎকালের শিক্ষার নিকট অপর সকল সময়ের শিক্ষারই পরাজয় স্বীকার করে।

আশা করি আমাদিগের বুদ্ধিমতী মনস্বিনী পাঠিকা ভগ্নিগণ সকলেই রন্ধনের প্রয়োজনীয়তা হৃদয়ঙ্গম করিতে এবং উক্ত বিষয়ে সাধ্যমতে যত্নবতী ও অভ্যস্তা হইতে কেহই কখনও পশ্চাৎপদ হইবেন না।

শ্রীসরোজিনী দেবী।

আমাদের জাতীয় জীবনে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাব।

পাশ্চাত্য প্রথানুযায়ী স্ত্রী শিক্ষার বিস্তার এদেশে কদাচ বাঞ্ছনীয় নহে। প্রচলিত শিক্ষা প্রণালীর দ্বারা মহিলা সমাজের উপকার না হইয়া, বরং সমধিক অপকারই সংসাধিত হইতেছে। স্ত্রী ও পুরুষের কর্ম্মক্ষেত্র এক নহে। গুরুতর দায়িত্ব ভার স্কন্ধে লইয়া আমাদের জন্ম। সেই গুরুভার যাহাতে নির্ব্বিঘ্নে বহন করিয়া নারীজন্মের সার্থকতা সম্পাদন করিতে পারি, এরূপ শিক্ষা আমাদের আবশ্যক। আপনার ভোগ স্পৃহাকে দমন পূর্ব্বক পরের সুখ স্বচ্ছন্দতার জন্য জীবন উৎসর্গ করাই নারীজীবনের অন্যতম প্রধান কর্ত্তব্যের মধ্যে পরিগণিত। যে শিক্ষা আমাদের দুর্ব্বল হৃদয়কে তাদৃশ কঠোর কর্ত্তব্য সাধনের উপযোগী করে, যে শিক্ষা দ্বারা আমাদের স্বার্থপরতারূপ প্রগাঢ় কুজ্ঝটিকাচ্ছন্ন হৃদয়াকাশে পরার্থপরতার উজ্জ্বল কিরণ বিকীর্ণ হয়, তাহাই প্রকৃত শিক্ষা। পরিতাপের বিষয়, বর্ত্তমান সময়ে স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে যেরূপ অপ-প্রণালী অবলম্বিত হইতেছে তাহা আমাদের পক্ষে তত সুফলদায়ক বলিয়া বোধ হয় না। পাশ্চাত্য শিক্ষানীতির প্রভাবে, আমরা স্কুল কলেজে যাইয়া মেম সাজিয়া, ক্রমশঃ অপরিমিত বিলাসিতার দাসী হইয়া পড়িতেছি। এখন আমরা জাতির প্রধান ধর্ম্ম আত্মনিগ্রহের পরিবর্ত্তে ভোগলালসা পরিতৃপ্তির জন্য লালায়িত। সীতা, সাবিত্রীর দেশে জন্মগ্রহণ করিয়া, ইহাপেক্ষা শিক্ষার অপকর্ষতা আর কি হইতে পারে? কোন পাঠিকা ভগিনী ইহাতে যেন আমাকে স্ত্রী-শিক্ষার বিরোধী বলিয়া মনে না করেন। প্রকৃত পক্ষে যে শিক্ষাদ্বারা আমাদের মানসিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি সংসাধিত, হৃদয় উন্নত, উদার এবং জ্ঞান পরিমার্জ্জিত হয়, যে শিক্ষার ফলে আমরা আত্মসুখবাসনাকে সংযত করিয়া, মৈত্রেয়ী শাণ্ডিলী অরুন্ধতি, সীতা, সাবিত্রী প্রভৃতি আদর্শ নারীকুলশিরোমণি আর্য্য মহিলা রত্নদের পবিত্র চরণরেণু মস্তকে ধারণ পূর্ব্বক মহান্ কর্ত্তব্য পথে অগ্রসর হইতে পারি, সেই শিক্ষারই আমরা একান্ত পক্ষপাতী। অর্থকরী বিদ্যার আমাদের কোন প্রয়োজন নাই।

যে সকল ভগিনী পাশ্চাত্য সুশিক্ষা পাইয়া, স্বীয় মাতৃত্ব ভুলিয়া, পুরুষের অধিকার লাভের নিমিত্ত আগ্রহান্বিতা, আমরা কোনক্রমেই তাঁহাদের বুদ্ধিমত্তার প্রশংসা করিতে পারি না। ভগবৎ নির্দ্দিষ্ট অসীম কর্ম্মক্ষেত্রের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শনপূর্ব্বক পরাধিকার লাভে আগ্রহাতিশয্য, কম ধৃষ্টতার পরিচায়ক নহে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আত্মসংযম ও সুখ লালসায় বীতস্পৃহাই অবলাকুলের প্রধান ধর্ম্ম। আপনার ভোগতৃষ্ণা-নিরোধ পূর্ব্বক শ্বশুর, শ্বশ্রূ, পতি, পুত্র, দেবর প্রভৃতি আত্মীয় স্বজনের পরিচর্য্যা ও তাঁহাদের সুখ সম্বর্দ্ধনার জন্যই আমাদের সৃষ্টি। পুরুষের ন্যায় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিযোগী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া, অর্থাগমের জন্য নানাবিধ ব্যবসায় অবলম্বন নারীজীবনের লক্ষ্য নহে। শুদ্ধ বহুমূল্য সুশুভ্র পরিচ্ছদে অঙ্গের শোভাবর্দ্ধন করিয়া, আরাম কুর্সিতে উপবেশন পূর্ব্বক নাটক নভেলাদি পাঠ করিলে আমাদের চলিবে না; নারীজন্মের আরও অনেক আবশ্যকতা আছে। আদর্শ গৃহিণীর পদলাভ করিতে হইলে, আমাদিগকে সাহিত্য, ইতিহাস, গণিত ও বিজ্ঞান শাস্ত্রে কিছু কিছু অভিজ্ঞতা লাভের সহিত গৃহস্থালীর কার্য্যে দক্ষতা, আত্মনিগ্রহ, ঔদার্য্য, ইন্দ্রিয় সংযম প্রভৃতি আরও কতকগুলি সদ্‌গুণাবলীর অধিকারিণী হইতে হইবে।

আজকাল অনেক পিতামাতাই স্বীয় স্বীয় দুহিতাকে স্কুলে পাঠাইয়াই, তাহার শিক্ষা সম্বন্ধে আপন কর্ত্তব্য শেষ হইল, এরূপ মনে করিয়া থাকেন। কন্যাও শৈশবাবধি মেমের পোষাকে বিভূষিতা হইয়া, স্কুলে গমন করিতে করিতে এবং সমপাঠিনী বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী বালিকাগণের বেশভূষা আচার ব্যবহার দর্শনে তদনুকরণে অভ্যস্ত হইয়া পড়ে। পরন্তু পিতা মাতার ঔদাস্যপ্রযুক্ত অনেক স্থলেই বালিকা-গণের গৃহস্থালী কার্য্যে তাদৃশ অভিজ্ঞতা লাভের তাদৃশ সুবিধা ঘটে না। কাজে কাজেই এই সকল সংসারানভিজ্ঞা —বিলাস পরায়ণা বালিকা বিবাহিত জীবনে স্বামীর সংসারে সুখ শান্তির পরিবর্ত্তে অশান্তিরই সূত্রপাত করিয়া থাকেন। ইঁহাদের পাশ্চাত্য সভ্যতানুকরণের ফল অসীম ভোগলালসার চরিতার্থতা সাধনের নিমিত্ত বিবিধ বিলাস-সামগ্রী সংগ্রহ করিতে করিতে দরিদ্র স্বামী বেচারীকেও নিতান্ত জ্বালাতন সহ্য করিতে হয়। ইত্যাকার পাশ্চাত্য শিক্ষাভিমানিনী মহিলাগণের বিদ্বেষপূর্ণ কটাক্ষ বহ্নিতে বিদগ্ধা হইয়া পরিবারস্থ অন্যান্য ব্যক্তিগণও ক্রমশঃ পৃথক হইয়া পড়েন। সংসার মরীচিকার সুস্নিগ্ধ উৎস স্বরূপিনী রমণীসমাজ বিকৃত-শিক্ষার ফলে এইরূপে বিষবৃক্ষে পরিণত হওয়ায়, ইংলণ্ড প্রভৃতি পাশ্চাত্য প্রদেশের ন্যায় বঙ্গ হইতে ক্রমশঃ বহুপরিবার প্রথার মূলোচ্ছেদ হইতেছে। ভগিনিগণ! সুশিক্ষা লাভে কোথায় আমরা পরিবারের আনন্দ-দায়িনী হইয়া নারীজীবনের প্রধান লক্ষ্য, সর্ব্বোচ্চ আকাঙ্ক্ষা—শ্বশুর, শ্বশ্রূ, পতি, পুত্র, দেবর প্রভৃতি পরিজনবর্গের পরিচর্য্যা দ্বারা নারীজীবনের সাথকতা এবং জগত সমক্ষে আদর্শ পরিবারের ছবি প্রদর্শন করিব, না স্বার্থপরতার মোহঘোরে অভিভূত হইয়া অলীক আত্মসুখান্বেষণে জীবন যাপন পূর্ব্বক সংসারে অশান্তির বীজ বপন করিতেছি। তাই বলি ভগিনিগণ! পাশ্চাত্য সভ্যতার বাহ্যিক চাকচিক্য দর্শনে বিমোহিত হইয়া বিলাসিতার অনল কুণ্ডে আত্মসমর্পণ করিও না। উহাতে আপাতঃ মধুর রসাস্বাদ অনুভূত হইতে পারে সত্য, কিন্তু তাহার ভাবী ফল বড় বিষময়। যদি বিমল শান্তি-সুধা পানের প্রয়াসী হও, যদি ঐহিক পারলৌকিক সুখ কামনা কর, তাহা হইলে প্রাচ্য জগতের রমণী কুল-শিরোমণি আর্য্য মহিলাগণের উজ্জ্বল আদর্শ সম্মুখে স্থাপন পূর্ব্বক তাঁহাদের পদাঙ্ক

অনুসরণ কর। নতুবা যে শিক্ষা স্ত্রীলোকের প্রকৃত কর্ত্তব্যপথ প্রদর্শনের পরিবর্ত্তে আমাদিগকে পুরুষ করিয়া তোলে, তদ্দারা আমাদের মঙ্গলের সম্ভাবনা কোথায়?

শ্রীসুবাসিনী সেহানবীশ।

ইংলণ্ডের রাজলক্ষ্মী ও ভারতসাম্রাজ্ঞী

যে সতী সাধ্বী পতিব্রতা অশেষ গুণ সম্পন্না রমণী ইংলণ্ডের রাজলক্ষ্মী ও ভারতসাম্রাজ্ঞী রূপে জগতবিখ্যাতা হইয়াছেন, আমরা তাঁহারই পূতচরিত্রের সংক্ষিপ্ত বিবরণ পাঠিকাদিগকে উপহার দিতেছি।

আদর্শমাতা পরলোকগতা মহারাণী ভিক্টোরিয়ার স্নেহ-ক্রোড়ে লালিত পালিত হইয়া কেবল আমাদিগের বর্ত্তমান সম্রাট ও তদীয় ভ্রাতা ভগিনীগণই যে শৈশবে সুশিক্ষালাভ করিয়াছিলেন, তাহা নহে, কিন্তু প্রাতঃস্মরণীয়া স্বর্গীয়া মহারাজ্ঞীর জ্যেষ্ঠা পুত্রবধূ রাজকন্যা আলেকজেন্দ্রারও ভাবী-জীবন পূজনীয়া শ্বশ্রূঠাকুরাণীর কর্ত্তব্যপরায়ণ জীবনের আদর্শে গঠিত হইয়াছিল।

রাণী আলেকজেন্দ্রা দিনেমারাধিপতির জ্যেষ্ঠা কন্যা। ১লা ডিসেম্বর ১৮৪৪ সালে কোপেনহেগেন রাজধানীতে জন্মগ্রহণ করেন। জন্মাবধি তিনি অসামান্যা সুন্দরী বলিয়া বিখ্যাতা। এক্ষণে তাঁহার বয়স ৬০ বৎসর; কিন্তু যৌবনসীমা অতিক্রম করেন নাই। এমন কি তাঁহাকে অনেকে চিরযৌবনশালিনী বলিয়া মনে করেন। একদা সমগ্র ইউরোপ-খণ্ডের রূপসীগণের রূপ সমালোচনায় আমাদিগের বর্ত্তমান সাম্রাজ্ঞী প্রধানারূপবতীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠা বলিয়া পরিগণিতা হইয়াছিলেন। বহিঃসৌন্দর্য্যে মহারাণী আলেকজেন্দ্রা নারী-সমাজে যেমন সর্ব্বশ্রেষ্ঠা, ঈশ্বর ভক্তি ও প্রেমে, আন্তরিক পবিত্র স্বর্গীয় শোভায় তাঁহার হৃদয় তেমনি আলোকিত। ৺ মহারাণী ভিক্টোরিয়া লক্ষ্মীরূপিণী পুত্রবধূকে পাইয়া যে অপার সুখে সুখী হইয়াছিলেন ইহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। যুবরাজ এডওয়ার্ডের সহিত সমুদ্রাধিপতির জ্যেষ্ঠা কন্যা আলেকজেন্দ্রার পরিণয় সম্বন্ধে এক অপূর্ব্ব আখ্যায়িকা শ্রুত হওয়া যায়। ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে যখন যুবরাজের বয়ঃক্রম ১৯ বৎসর মাত্র, সে সময়ে তিনি তাঁহার কোন বয়স্যের নিকট রাজকুমারীর একখানি চিত্র দেখিতে পান, এবং সেই চিত্র তাঁহার প্রাণকে এ দূর আকর্ষণ করিয়াছিল যে তিনি চিত্রাঙ্কিত রাজকুমারীকে দর্শন করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। অবশেষে অনতিবিলম্বে শরৎকালে জর্ম্মনির অন্তর্গত স্পীয়ার নগরের ধর্ম্মালয়ে প্রণয়ী যুগলের সাক্ষাৎ হইল। সন্দর্শন মাত্র উভয়েই পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হইলেন এবং অবশেষে আত্মসমর্পণ করিলেন।

১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে পার্লিয়ামেণ্ট মহাসভাতে মহারাণী ভিক্টোরিয়া বিবাহে সম্মতিপ্রদান করিলেন। রাজভাণ্ডার হইতে যুবরাজের জন্য ৬০০,০০০ এবং ১৫০,০০০ মুদ্রা রাজবধূর বার্ষিক ব্যয়ের জন্য নির্দ্ধারিত হইল। এতদ্ব্যতীত কর্ণওয়ালের ভূসম্পত্তি হইতে যুবরাজের জন্য ৯০০,০০০ মুদ্রা বার্ষিক আয় পূর্ব্ববৎই রহিল।

ডেনমার্ক হইতে রাজকন্যা আলেকজেন্দ্রাকে ইংলণ্ডে আনিবার আয়োজন করা হইল। সমুদ্রতীর হইতে ইংলণ্ডীয় রেলওয়ের ষ্টেসন পর্য্যন্ত রাজপথ পুষ্পের দ্বারা আচ্ছাদিত হইল। আঠজন সঙ্গিনী বেষ্টিতা হইয়া রাজকন্যা অর্ণবপোত হইতে অবতরণ করিলেন। যুবরাজ ভাবীপত্নীর অভ্যর্থনার্থ পূর্ব্বেই সেখানে উপস্থিত ছিলেন এবং আলেকজেন্দ্রাকে দর্শনমাত্র অগ্রসর হইয়া সপ্রেম অভ্যর্থনা করিলেন। শত সহস্র দর্শকবৃন্দ এই দৃশ্য দেখিয়া আনন্দে জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল। রাজকুমারী প্রেমের উচ্ছাসে লজ্জাবনতবদনে যুবরাজের হস্তধারণ পূর্ব্বক পুষ্পাচ্ছাদিত রাজপথের উপর দিয়া রেলওয়ে ষ্টেসনে আগমন করিলেন। লণ্ডনেও তাঁহার অভ্যর্থনার জন্য বিপুল আয়োজন হইয়াছিল। লণ্ডনবাসী প্রজামণ্ডলী তাঁহাকে দেখিয়া যার পর নাই সুখী হইয়াছিল। এই আনন্দোচ্ছাসের বিবরণ তৎকালীন কবিকুলশিরোমণি রাজকবি টেনিসন কবিত্বপূর্ণ ভাষায় বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। অতি সমারোহের সহিত ইংলণ্ডের ভাবী উত্তরাধিকারীর শুভ পরিণয় কার্য্য সম্পন্ন হইল। বিবাহের অত্যল্পকাল পরেই রাজবধূ স্বীয় সদ্‌গুণেরদ্বারা পতিগৃহের সকলের হৃদয়ের শ্রদ্ধাভক্তি আকর্ষণ করিলেন। যদিও তাঁহাকে রাজকুলোচিত বাহ্যিক আড়ম্বরে অনেক সময় ব্যাপৃত থাকিতে হইত, তথাপি ইহার ভিতরেও তিনি গৃহধর্ম্মপালনে সর্ব্বদাই যত্নশীলা ছিলেন। সাণ্ড্রিংহাম রাজপ্রাসাদ তাঁহাদের বাসভবনরূপে নির্দ্ধারিত হইয়াছিল। রাজবধূ তাঁহার প্রাসাদের চতুঃপার্শ্বস্থ কুটীরবাসী প্রজামণ্ডলীর সুখ দুঃখে এমনিভাবে তাহাদের সহিত মিশিতেন যে সকলেই তাঁহাকে আপনার জন বলিয়া মনে করিত। বিবাহের কয়েক বৎসর পরেই তাঁহাদের গৃহ শিশুদিগের আনন্দ কোলাহলে পূর্ণ হইল। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র আলবার্ট ভিক্টর ৮ই জানুয়ারী ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে এবং দ্বিতীয় রাজপুত্র সম্রাট সপ্তম এডওয়ার্ডের ভাবী উত্তরাধিকারী যুবরাজ জর্জ্জ ইয়র্কের ডিউক ৩রা জুন ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন, তৎপর ৩টী রাজকন্যা রাজকুমারী লুইসা মড, এবং কনিষ্ঠা ভিক্টোরিয়ার জন্ম হয়। সর্ব্বশেষে একটী পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়া কয়েক দিন পরেই মৃত্যুগ্রাসে পতিত হয়। রাণী আলেকজেন্দ্রা যে এই একমাত্র সন্তানশোক সহ্য করিয়াছিলেন তাহা নহে। ইহার বহুবৎসর পরে জ্যেষ্ঠ পুত্র যুবরাজ আলবার্ট ভিক্টরকে অকালে হারাইয়া তাঁহাকে সন্তান শোকের দারুণ আঘাত সহ্য করিতে হইয়াছিল।

আদর্শ রাজমাতা ভিক্টোরিয়ার ন্যায় রাজবধূ আলেকজেন্দ্রা সন্তানদিগের ভাবী জীবন গঠনের জন্য বিশেষরূপে যত্ন করিয়াছেন। রাজমাতার প্রধান কর্ত্তব্য ভাবী বংশধরদিগকে সংশিক্ষা দান-সম্বন্ধে রাণী কখনও উদাসীন হইতেন না, তাহাদিগকে শৈশবাবধি স্বীয় তত্ত্বাবধানে শিক্ষাদানের সুবন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। মাতা সন্তানদিগের সহিত ক্রীড়াকৌতুক করিতেন, এবং পাঠে উৎসাহ বর্দ্ধনের নিমিত্ত ও সর্ববিষয় নানা ভাবে শিক্ষা দিবার জন্য সর্ব্বদা যত্ন করিতেন। এবম্বিধ সন্তানবাৎসল্য দেখিয়া অনেকে তাঁহার প্রতি দোষারোপ করিতেন, কিন্তু স্নেহশীলা জননী সন্তানের প্রতি কর্ত্তব্যপালনে কিছুতেই বিমুখ হইতেন না।

রাণী আলেকজেন্দ্রা আদর্শ রমণী বলিয়া এমনই সুপরিচিতা হইয়াছিলেন যে ইংলো-

রোপীয়া মহিলাগণ ইহাঁর অনুকরণ করিতে গিয়া এমনি অন্ধ হইয়া যাইতেন যে এ সম্বন্ধে একটী কৌতুকপূর্ণ ব্যাপার সংঘটিত হইয়াছিল। একদা রাণী আলেকজেন্ড্রা বাতব্যাধিতে আক্রান্তা হইয়া বহুক্লেশ ভোগ করিয়াছিলেন। তজ্জন্য কিছুকাল উপযুক্তরূপে হাঁটিতে পারিতেন না, এবং একটু খোঁড়াইয়া খোঁড়াইয়া হাঁটিতে হইত। ইংরাজ রমণীগণ এতই অনুকরণপ্রিয় তাহারা মনে করিল রাজবধূ যখন এইরূপে হাঁটেন তখন তাহাদিগেরও সেইভাবে চলা উচিত। অমনি তাহারাও তদনুকরণে হাঁটিতে আরম্ভ করিল; এইরূপ অনুকরণস্পৃহা কিছুকাল প্রচলিত ছিল। সৌভাগ্যক্রমে রাজবধূ আরোগ্য লাভ করিয়া পুনর্ব্বার উপযুক্ত রূপে হাঁটিতে পারিলেন।

ক্রমশঃ

রন্ধন।

মাংসের চপ্।—প্রথমে কতকগুলি গোল আলু সিদ্ধ করিয়া খোসা ছাড়াইয়া বেশ চটকাইয়া মাখিয়া ঢাকা দিয়া রাখ। পরে মাংস বাটিয়া তাহা বেশ করিয়া ধুইয়া পরিষ্কার যায়গায় রাখ। কড়াতে ঘি চড়াইয়া তাহার গেঁজলা মরিলে তেজপাতা ও সরু সরু পেঁয়াজ কুচো দাও, পেঁয়াজের রং বাদামের মত হইলে মাংস বাটাতে হলুদ, ধনে, লঙ্কা, আদা, জিরামরিচ, পেঁয়াজ, রসুন বাটা, মসলা এবং দই লবন দিয়া মাখিয়া ঐ কড়াতে দিয়া নাড়িয়া ঢাকা দাও, এবং বারম্বার ঢাকা তুলিয়া দেখিবে যেন পুড়িয়া না যায়। বেশ ভাজারকম হইলে তখন একটু সামান্য জল দিয়া নাড়িয়া দেখিবে বাটা মাংসটা সিদ্ধ হইল কিনা; পুনরায় ঢাকা দিবে, জল মরিলে নাড়িয়া ভাজা ভাজা হইলে তখন নামাইয়া ছোট এলাচের গুঁড়া দিয়া ঢাকিয়া রাখিবে। পরে ঐ গোল আলুতে একটু ময়দা কিম্বা বেসন ও লবণ মিশাইয়া পুনরায় মাখিয়া লেচি কাটিয়া উহার মধ্যে ঐ মাংসবাটার পুর ভরিয়া বেশ করিয়া মুখ আঁটিয়া দিবে যেন খুলিয়া না যায়। একটা পৃথক যায়গায় কাঁচা হাঁসের ডিম ভাঙ্গিয়া লবণ দিয়া ফেনাইয়া লও। কড়াতে ঘি চড়াইয়া তাহার গেঁজেলা মরিলে ঐ হাঁসের ডিমে চপ ডুবাইয়া ঘিয়ে ভাজ। বেশী আঁচ দিলে খারাপ হইয়া যাইবে। এ সকল খাদ্য গরম গরম খাইতে হয়, ঠাণ্ডা হইয়া গেলে ভাল লাগে না।

শ্রীকমলে কামিনী গুপ্তা।

কবিতা।

কেঁদ না।

কেঁদ না মানব   দুখ শোকাধার
হয়েছে অবনী বলে,
বিধাতার শাপ   মানব জীবন
(বলিয়া) ভেসোনা নয়ন জলে।

দুখ শোক যত   হয় মানবের
সুমহান উপদেষ্টা,
তাদের নিকট   শিক্ষা করি মোরা
অসীম ধৈর্য্যের বার্ত্তা।

স্রষ্টার আশীষ   মানব জীবন
ইহা গো জানিও সার,
সন্তাপে আকীর্ণ   এ ধরণী হয়
আত্মার পরীক্ষাগার।

এ পরীক্ষাগারে   না হলে উত্তীর্ণ
না করে যদি প্রাণ?
সেথাকার এই   তিক্ত বারিধারা
আকণ্ঠ ভরিয়া পান।

হয়ো নাকো শ্রান্ত   পূর্ণতা সম্পূর্ণ
মানবত্ব আমাদের,
হই নাকো যোগ্য   দাঁড়াইতে মোরা
যাত্রীপদে অনন্তের।

শ্রীলজ্জাবতী বসু।

বড় ভালবাসি।

১

বড় ভালবাসি আমি ভাইফোঁটা তোরে।
শরদ জোছ্না রাশি,
তোর মুখে উঠে ভাসি,
উল্লাস হরষামোদে মলিনতা হরে।

আয় আয় ভ্রাতৃ পূজা আয় মোর ঘরে।
তুই পারিজাত ফুল,
ভগিনী গৌরব মূল,
আনন্দ উৎসব মেলা লভি তোর বরে।

৩

হিন্দু নারী পূজে তোরে যুগ যুগান্তরে।
তুই রে সাধের বাঁশী,
মঙ্গল বাজাও আসি,
আবার নূতন করে সুকল্যাণী সুরে।

৪

ভগিনী পরাণ সিক্ত করুণার নীরে।
জনমেই পরিচিত,
সৌহৃদ্যে পরিপূরিত,
জীবনে প্রথম স্নেহ ভ্রাতৃমুখ হেরে।

৫

একই জননী গর্ভে সোদরা সোদরে।
একই যতনে প্রাণ,
এক স্নেহে বৰ্দ্ধমান,
এক সুখ এক শান্তি দোঁহার ভিতরে!

৬

শৈশবে সহায় সঙ্গী ভ্রাতা ভগিনীরে
সুখে দুখে সমভাবে,
নিন্দা বা খ্যাতি গৌরবে,
অটুট স্নেহের ডোর জীবনের তরে।

৭

ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই প্রবাদেতে ঘোষে।
ভগিনীর চিরাশ্রয়,
ভ্রাতার মুক্ত আলয়,
দারিদ্র্য বা ধনময় সংসারের স্রোতে।

জগত যেদিন ঠেলে পায় রমণীরে।
বিষম বৈধব্য দশা,
গ্রাসে স্বর্গ সুখ আশা
ডুবে যায় ধ্রুবতারা বিঘোর তিমিরে।

৯

পিতৃহীনা সুতা যবে ভাসে পাবাবারে।
অকূল শোকের সিন্ধু,
শুকায় শোণিত বিন্দু,
অসার ক্রন্দনে শুধু হৃদি ভগ্ন করে।

১০

কে দেয় আশ্রয় ঠাঁই মমতার ভরে?
অশন বসন দিয়ে,
সান্ত্বনা হৃদে ঢালিয়ে,
সংসার সংগ্রামে রক্ষা করে চিরতরে।

১১

ভগিনী সুহৃদ হেন কে আছে সংসারে?
দিয়ে স্বার্থ বলিদান,
রাখে সতত সম্মান,
একমাত্র সু-ভ্রাতাই বিপদ মাঝারে।

১২

হউক না চিরন্তন শত্রু অজানিত।
একবার স্নেহবোলে,
ভাই বলিয়া ডাকিলে,
গলে যায় পাষাণের নিরমল চিত।

১৩

জগত ব্রহ্মাণ্ড নাথ নিজ হাত দিয়ে।
গঠিল এ জীব হিয়ে,
একই শোণিত দিয়ে,
একবৃন্তে পুষ্পদাম প্রকৃতি ভরিয়ে।

১৪

স্ত্রী, পুত্র, বান্ধব, সখা, মানব রচিত।
ভাই বোন স্নেহ ছবি,
সুন্দর লাবণ্য সবি,
বিভু দত্ত বর দানে বিশ্ব পুলকিত।

১৫

সেই সুবিমল দানে ভগিনী ভূষিত।
গৌরব মহার্ঘ মান,
ভ্রাতার সুখ কল্যাণ,
ব্যথা জ্বালা রোগ শোক ঢালে শত প্রীত।

১৬

বঙ্গনারী ভক্তি মতি ভ্রাতৃ দ্বিতীয়ারে।
শুভ্র শিশির ফোঁটা,
চন্দনে কুসুমে ঘটা,
শ্যাম দূর্ব্বাদল দানে আশীষ বিতরে।

১৭

বর্ষে বর্ষে ভাই ফোটা উদে সুখভরে।
দধি ফোটা একবিন্দু,
উথলয়ে স্নেহ সিন্ধু,
বাড়ায় উৎসব স্নেহের আখি শিখরে।

১৮

এ নহে আনন্দ শুধু উৎসবের মেলা।
শিখায় পবিত্র নীতি
জ্ঞান বুদ্ধি শুভ রীতি
দান প্রতিদানে সংসারের খেলা।

১৯

ভাইফোটা আশীর্ব্বাদে ধুয়ে যায় মলা।
দূরে যায় হিংসাদ্বেষ,
ঘুচায় অশান্তি ক্লেশ,
জাগায় মানব প্রাণে স্বরগের লীলা।

২০

ভাল বাসি ভাই ফোটা আমি আজীবন।
দেবতা জনক মোরে,
ভ্রাতৃ পূজা করিবারে,
শিশু প্রাণে দিলা মন্ত্র করিয়ে যতন।

২১

সেই পূত উপদেশ হৃদয়ে গাঁথিয়ে রেখে।
পালিব ভগিনী ব্রত,
ভ্রাতৃ হিতে চির রত,
স্নেহ প্রীতি ভালবাসা সরলতা মেখে।

২২

সৌভাগ্য সম্ভ্রম যুতা সে ভগিনী মাঝে।
ধার্ম্মিক যে জন ভ্রাতা,
শুদ্ধ নীতি পবিত্রতা,
লভে সেই খ্যাতি মান সুমহান সাজে।

২৩

ভ্রাতার সুকীর্ত্তি ধ্বজা গৌরব পরশে।
ভগ্নি হৃদি পারাবার,
সুখস্রোতে অনিবার,
আন্দোলি তরঙ্গ মালা ছুটিছে হরষে।

২৪

উদ্ঘাটি স্নেহের উৎস ভাই ফোটা আসে।
আজি সেই শুভদিন,
আনন্দে অবনীলীন,
সুফল এ ভাই ফোটা ডাকি পরমেশে।

২৫

নবোৎসাহে নবোদ্যমে সাজি নববেশে।
এনেছি আশীষ তাই,
মাথা পাতি লহ ভাই,
বাজিছে মোহন বেণু হেমন্তের শেষে।

২৬

প্রকৃতি রুচির বালা ডাকি হেসে হেসে।
হরষে ফুটায় ফুল,
গন্ধে মুগ্ধ অলিকুল,
সমীর ছুটিছে ধেয়ে সুরভির বেশে।

২৭

এহেন মঙ্গল দিনে নব উষাকালে।
এনেছি সৌভাগ্য মালা,
দীপ্ত যেন শশী আলা,
জ্যোতির্ম্ময় করে তব হৃদি নভস্থলে।

২৮

ভাইফোটা অবিনাশী হোক ভগ্নীবরে।
অজয়ী বিজয়ী হয়ে,
জগত ব্রহ্মাণ্ড ছেয়ে,
বহুক শান্তির ধারা প্রতি হৃদি সরে।

২৯

আয় আয় ভাই ফোটা আয় মোর ঘরে।
ইহকালে পরকালে,
তোর ঐ পুণ্য ফলে,
স্নিগ্ধ হক মোর প্রাণ অস্থি মজ্জা ভরে।

৩০

শীতল করণা শান্তি, ঘুচায়ে ভুল ভ্রান্তি।
আন নিত্য নব সুখ এ মরু আগারে।
অক্ষয় অনন্ত তুমি হও চির তরে।

শ্রীনিস্তারীণী দেবী।

আকুল উচ্ছ্বাস।

একি শুনি অকস্মাৎ,
বিনা মেঘে বজ্রাঘাত,
ঢাকা ময়মনসিং যাবে আসামের সনে।

শুনিয়া কাঁপিল বুক,
ভয়ে শুখাইল মুখ,
কত যে গো বিভীষিকা, হেরি ক্ষণে ক্ষণে।

বড়লাট মহাশয়,
শুনি- অতি সদাশয়,
তাঁহার এমন কাজ, মনে নাহি পায় স্থান।

বাঙ্গালী দরিদ্র অতি
তাদের কি হবে গতি ?
মনেতে কি বড়লাট ভেবেছে কখন।

ঢাকা ময়মনসিং,
হলে আসাম সামিল,
কত যে গো দুঃখ, হবে বাঙ্গালীর।

নিও না আসামে,
দুঃখ দিও না মরমে,
বাঙ্গালীর দুঃখ হেরি, বহেনা কি চোখে নীর।

দীন জনে দয়া কর,
হে বড়লাট কৃপা কর,
ঢাকা ময়মনসিং আসামেতে নিও না।

আসামে না গেলে,
বাঙ্গালী সকলে,
প্রাণভরে করিবে গো, তব মঙ্গল কামনা।

ঢাকা ময়মনসিং,
না হলে আসাম সামিল ?
তব যশোগীতি গাবে, আজীবন সকলে।

বল গো আশ্বাস বাণী,
জুড়াক মোদের প্রাণী,
প্রাণ ভরে ধন্যবাদ দেই সবে মিলে।

আসামেতে নেও যদি,
মোদেরে প্রাণেতে বধি,
তবে ঢাকা ময়মনসিং নেও গো, আসামে,
আমাদের কোন দুঃখ রবে না গো মরমে॥

শ্রীমাতঙ্গিনী দত্ত মজুমদার

শ্রীপঞ্চমী।

দুরন্ত হেমন্ত হিমানী মণ্ডিত
হল অন্তর্হিত বসন্ত এ'ল,
মলয় মারুত মৃদুল হিল্লোলে
পুলকে প্রফুল্ল জগত হ'ল।
কোকিল কূজনে ভ্রমর গুঞ্জনে
মুখরিত ধরা আনন্দময়,
যে দিকে নিরখি সব হাস্যমুখী
প্রাবৃটান্তে যেন শরতোদয়।
এ সুখের দিনে হরষিত মনে
ভারতীর পূজা করি গো এ'স,
হয়ে কুতূহলী ভক্তি পুষ্পাঞ্জলি
পদকোকনদে দিব গো এ'স।
বেদ প্রসবিনী বিজ্ঞান দায়িনী
তমসে নাশিনী জগৎমাতঃ!
বীণার ঝঙ্কার সুস্বর লহরী
ছড়ায়ে মোদের মাতাও চিত।
বাণীর তনয়া হয়ে আমরা
জ্ঞানের আলোকে বঞ্চিত র'ব ?
মাতা জ্ঞানময়ী দুহিতা অজ্ঞান
হেন অপবাদ কেমনে স'ব।
তাই বলি বোন, এ'স সবে মিলি
যুক্তকরে ডাকি আপনা ভুলে,
দয়াময়ী মাতা ডাকিলে কাতরে
সন্তানে সাদরে ল'বেন কোলে।
(মোদের) হৃদয় মন্দির করিয়া উজল
জ্ঞানের প্রদীপ দিবেন জ্বেলে,
(বঙ্গে) খনা লীলাবতী জনমিবে পুনঃ
মায়ের অপার করুণা হ'লে।
মানস উদ্যান হইতে মোদের
ভাবের কুসুম চয়ন করি,
(এ'স) সাজাই মায়ের সাহিত্য ভাণ্ডার
(মোরা) অন্তঃপুরবাসী যতেক নারী।

শ্রীসুবাসিনী সেহানবীশ

সমালোচনা।

পারিবারিক জীবন—শ্রীযুক্তা প্রসন্নতারা গুপ্তা প্রণীত; মূল্য ১।৷০ টাকা (উৎকৃষ্ট ছাপা এবং উৎকৃষ্ট কাগজ।) প্রাচীন আর্য্যঋষিগণ মানবজীবনকে চারি ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। গৃহস্থাশ্রমকে সর্ব্বপ্রধান স্থান দিয়াছেন। পারিবারিক জীবন গ্রন্থে গৃহস্থাশ্রমের বিভিন্ন অবস্থার কর্ত্তব্য সমূহ সুন্দররূপে বর্ণিত হইয়াছে। স্ত্রীপুরুষ উভয়কে লইয়া পরিবার। সুতরাং উভয়েরই নানাবিধ কর্ত্তব্য বিধাতা কর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট রহিয়াছে, এবং সেই সমুদয় পালন করিবার পক্ষে উভয়েরই প্রস্তুত হওয়া একান্ত কর্ত্তব্য। গ্রন্থকর্ত্রী পারিবারিক জীবনের ভিন্ন ভিন্ন অবস্থার বর্ণনায় স্বকীয় দৃঢ়তা, উদারতা ও স্বাধীন ভাবের বিশেষ পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। শিক্ষিত ব্যক্তি মাত্রকেই এই অমূল্য গ্রন্থখানি পাঠ করিতে আমরা বিশেষ ভাবে অনুরোধ করি। স্ত্রীশিক্ষা বাল্যবিবাহ, বিধবাবিবাহ ও স্ত্রীস্বাধীনতা সম্বন্ধে বর্ত্তমান সময়ে বিশেষ আন্দোলন হইতেছে। গ্রন্থকর্ত্রী যে এই বাগ বিতণ্ডার দিনে উপন্যাস গল্প বা ভাববিহীন রচনা লিখিয়া শক্তিক্ষয় না করিয়া, সর্ব্বসমক্ষে পারিবারিক জীবনের উচ্চ আদর্শ ধরিয়া দেশের প্রকৃত হিতসাধন করিতে অগ্রসর হইয়াছেন, সেজন্য তিনি আমাদিগের কৃতজ্ঞতার পাত্রী। গ্রন্থকর্ত্রীকে আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি এবং জীবনের উচ্চ আদর্শ ও লক্ষ্য সম্বন্ধে তিনি তাঁহার বিশুদ্ধ ও সুললিত ভাষায় যেরূপ বর্ণনা করিয়াছেন, তাহারই কয়েক পংক্তি আমরা নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি—গ্রন্থকর্ত্রী লিখিয়াছেন :—

"শিশু হইতে বৃদ্ধ পর্য্যন্ত সকলেরই মনে ধ্রুব বাক্য নিহিত থাকা উচিত যে আমরা কেবল ইন্দ্রিয়ের সেবা করিতে এ সংসারে আসি নাই, এতদপেক্ষা আমাদের আরও কিছু উচ্চ উদ্দেশ্য ও উচ্চ কার্য্য করণীয় রহিয়াছে। সংসারে খাওয়া পরা ভিন্ন আরও অধিক কর্ত্তব্য কার্য্য আছে। কেবল সংসারে নিরন্তর মুগ্ধ থাকিয়া সেই মহৎ লক্ষ্য ভুলিয়া যাওয়া অন্যায়। মনুষ্যের মন কেবল বিষয়সুখে তৃপ্ত হয় না। গার্হস্থ্যজীবনের সমুদয় সুখ দুঃখ ইহার উপর নির্ভর করে। জীবনের যাবতীয় কর্ত্তব্য সম্পূর্ণরূপে পালন করিতে পারিলেই গার্হস্থ্য জীবনের আদর্শ রক্ষা হয়। এই সংসারের বিবিধ প্রকার কর্ত্তব্যের মধ্যে যাঁহার আত্মা দিগ্‌নির্ণয় যন্ত্রের কাঁটার ন্যায় নিরন্তর ঠিক লক্ষ্যমুখীন থাকিতে সমর্থ হয় তিনিই অবশেষে পরম পবিত্রতা লাভ করিয়া বিমল আনন্দ অনুভব করেন এবং ইহকালে অপার শান্তি ও পরকালে আবার পুণ্যের অধিকারী হন। এই প্রকার আদর্শ সংসারীই জীবনে সর্ব্বসিদ্ধিদাতা মঙ্গল বিধাতার ইচ্ছা পূর্ণ করিয়া ধন্য হইয়া থাকেন।" পাঠিকা ভগিনীগণ গ্রন্থে লিখিত স্ত্রীলোকের কর্ত্তব্য শিক্ষা ও স্বাধীনতা সম্বন্ধে প্রবন্ধগুলি পাঠ করিয়া অনেক শিক্ষালাভ করিতে পারেন। অন্যান্য শিক্ষিতা ভগিনীগণ, বিদুষী ভারতমহিলাগণ গ্রন্থকর্ত্রীর অনুসরণ করিয়া স্ত্রীশিক্ষার বিরুদ্ধে আন্দো-

লনকারীগণের তীব্র সমালোচনার প্রতিবাদে লেখনী ধারণ করেন ও স্ত্রীশিক্ষার সুফল প্রদর্শন করিতে যত্নবতী হয়েন বর্ত্তমান সময় ইহা নিতান্ত বাঞ্ছনীয় ও একান্ত প্রয়োজনীয়।

খোকা।—মাতৃ হৃদয়ের শোকোচ্ছ্বাস পূর্ণ কবিতা পুস্তক—শ্রীযুক্তা অম্বুজাসুন্দরী দাস প্রণীত। এই পুস্তকের কোন কোন কবিতা পাঠ করিলে অশ্রু সম্বরণ করিতে পারা যায় না। শান্তিদাতা শান্তি দান করুন। প্রীতি ও পূজা এই সুন্দর কবিতাগ্রন্থও সুলেখিকা শ্রীযুক্তা অম্বুজাসুন্দরী দাসের প্রণীত। প্রীতি ও পূজার অধিক পরিচয় আমাদের দেওয়া অনাবশ্যক। রচয়িত্রী স্বনামখ্যাতা সুকবি। বর্ত্তমান সময় অনেক রমণী সামান্য লেখাপড়া শিখিয়াই কবিতা লেখেন; ইহা সেই শ্রেণীভুক্ত নহে। এই পুস্তকের কবিতাগুলি বড়ই মধুর ধর্ম্মভাব পূর্ণ। হৈমন্তিক শিশির সিঞ্চিত সেফালিকা ফুলের ন্যায় সুকোমল ও সৌরভময়। নারী-হৃদয়ের প্রকৃত ভাব ব্যঞ্জক এই সুন্দর গ্রন্থ বন্ধুদিগকে উপহার দিবার উপযুক্ত।

বাঙ্গালির যশোগান।—এ খানিও অতি ক্ষুদ্র কবিতা পুস্তক। ইহাতে বাঙ্গালীর জীবনের চিত্র কবিতাচ্ছন্দে প্রকাশিত হইয়াছে। পড়িবার যোগ্য। বাক্যবাগীশ বাঙ্গালীর ইহাতে অনেক শিখিবার আছে।

সহানুভূতি।—শ্রীতারিণী চরণ সেন প্রণীত—মূল্য ॥০। সহানুভূতির জন্য নরনারী সকলেই লালায়িত। ধর্ম্মরাজ্যে, ভাবরাজ্যে দেশভক্তিতে ও জীবহিতব্রতে সহানুভূতির আবশ্যকতা সম্বন্ধে গ্রন্থকর্ত্তা অতি সুন্দররূপে আলোচনা করিয়াছেন, এবং এই জন্য নানা দেশীয় ধর্ম্মবীর কর্ম্মবীর ও জ্ঞানবীর নর-নারীগণের জীবনের দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিয়াছেন। আমাদের জাতীয় উন্নতি সাধনের পক্ষে পরস্পরের সহানুভূতি অমোঘ দৈব ঔষধ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। সহানুভূতির অভাবে আমরা মৃতপ্রায় হইয়া রহিয়াছি। গ্রন্থের ভাষা মার্জ্জিত ও সুললিত; গ্রন্থকর্ত্তা বড় সুসময়ে এই উপদেশপূর্ণ গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন। আমাদের পাঠিকাগণকে আমরা এই সদুপদেশপূর্ণ গ্রন্থ পাঠ করিতে অনুরোধ করিতেছি।

বিবিধ প্রসঙ্গ

শিল্পশিক্ষায় সরকারী বৃত্তি।—এদেশীয় বর্ত্তমান শিল্পগুলির যাহাতে উন্নতি সাধিত হয়, এবং স্থলবিশেষে নূতন নূতন শিল্পও উদ্ভাবিত হইতে পারে এই উদ্দেশ্যে ভারত গবর্ণমেণ্ট আপাততঃ পরীক্ষা-স্বরূপে কয়েকটি সরকারী বৃত্তি দেওয়ার ব্যবস্থা করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন। ভারতবাসী-দিগের মধ্যে বিশেষ বিশেষ শিল্পবিষয়ে কুশল সম্পন্ন এবং উন্নতিসাধনক্ষম ব্যক্তিগণ মধ্য হইতেই এই বৃত্তি পাইবার অধিকারী নির্ব্বাচিত হইবেন। বৃত্তিপ্রাপ্ত ছাত্র গ্রেটব্রিটেন, ইউরোপ অথবা আমেরিকার যেখানে ইচ্ছা শিল্প-শিক্ষার জন্য যাইবেন। তাঁহাদের যাতায়াত ব্যয় যে স্কুলে থাকিয়া তাঁহারা শিল্পশিক্ষা করিবেন তথাকার বেতন এবং তদ্ব্যতীত বাৎসরিক আরও দেড়শত পাউণ্ড করিয়া

তাঁহাদিগকে দেওয়া হইবে। স্থলবিশেষে এই বৃত্তির পরিমাণ বাড়াইবার সম্বন্ধেও গবর্ণমেণ্ট বিবেচনা করিবেন।

প্রত্যেক বৃত্তি দুই বৎসর যাবৎ দেওয়ারই সাধারণ ব্যবস্থা থাকিবে, স্থলবিশেষে সময় বাড়ান কমানও যাইতে পারিবে।

আইন, চিকিৎসা, বনবিভাগের কার্য্য, গবাদির চিকিৎসাতত্ব, কৃষি এবং ইঞ্জিনিয়ারীং—ইহাদের মধ্যে কোনটি শিক্ষার জন্য এই বৃত্তি দেওয়া অভিপ্রেত নয়। প্রধানতঃ বাঙ্গলার খনিজতত্ত্ববিষয়ক শিল্পের উৎসাহদানার্থেই এই বৃত্তিদানের কল্পনা। অন্যান্য শিল্পের সাহায্যার্থেও এই বৃত্তি দেওয়া যাইতে পারিবে। যে সকল শিল্পে দেশীয়গণ অর্থ ও অধ্যবসায় বিনিয়োগ করিয়াছেন অথবা সম্ভবতঃ করিতে পারেন, যাহাদের উন্নতিসাধন বিষয়ে বৃত্তিপ্রাপ্তগণ শিল্প শিক্ষাকরতঃ দেশে ফিরিয়া আসিয়া বিশেষ কৃতিত্ব দেখাইবার সুযোগ পাইবেন সেই সকল শিল্পের জন্যই বৃত্তিদানের ব্যবস্থা বিশেষরূপে করা হইবে।

আইনে * ভারতবাসী বলিতে যাহাদের বুঝায় বৃত্তি কেবল তাঁহাদের মধ্যেই দেওয়া হইবে। বৃত্তিপ্রাপ্ত ছাত্রের ইংরাজী ভাষা অথবা যে দেশে যাইয়া তিনি শিল্পবিদ্যা শিখিবেন তথাকার ভাষা রীতিমত জানা চাই,

বৃত্তি পাইবার অধিকারী নির্ণয় স্থল গবর্ণমেণ্ট বৃত্তিপ্রার্থীর সম্বন্ধে নিম্নলিখিত কয়েকটি বিষয় বিবেচনা করিবেন—তাঁহার বিদ্যাবুদ্ধি, তিনি যে শিল্প শিখিতে যাইবেন তদ্বিষয়ে তাঁহার কি পরিমাণ অনুরাগ এবং এবং ঐ শিল্পের সহিত তাঁহার কিরূপ সংস্রব আছে এবং তিনি শিল্প শিখিয়া ভারতে ফিরিয়া আসিয়া ঐ শিল্পেরই আলোচনায় প্রবৃত্ত থাকিবেন কি না। বৃত্তি প্রার্থী ডিগ্রী পাইয়া থাকিলেই তাঁহাকে যোগ্য বলিয়া মনে করা হইবে না, যোগ্যতা পরীক্ষার জন্য কোনরূপ প্রতিযোগী পরীক্ষা গৃহীত হইবে না। কেবল দেখিতে হইবে, বৃত্তিপ্রার্থী যে শিল্প শিখিবার জন্য যাইতেছেন সেই শিল্পশিক্ষা এদেশে যতদূর হইতে পারে তাহা তাঁহার হইয়াছে কি না এবং শিল্প শিখিতে পারিবার মত তাঁহার যোগ্যতা প্রকাশ পাইয়াছে কি না।

বৃত্তিপ্রার্থীর বয়স সম্বন্ধে কোনরূপ বাঁধাবাধি নাই, তবে স্থলবিশেষে গবর্ণমেণ্ট উহা নির্দ্দিষ্ট করিয়াও দিতে পারিবেন। নিম্নলিখিত কয়েকটি বিষয়ে উপযুক্ত ব্যক্তির প্রদত্ত সার্টিফিকেট বৃত্তিপ্রার্থীকে দেখাইতে হইবে—(১) চরিত্র, (২) যে দেশে শিল্পশিক্ষার জন্য যাইতেছে সেই দেশের ভাষাজ্ঞান; এবং (৩) স্বাস্থ্য ও কর্ম্মপটুতা।

ইংলণ্ড অথবা অন্যত্রে যাঁহারা শিল্প শিক্ষার জন্য যাইবেন তাঁহাদিগকে ষ্টেট সেক্রেটরীর তত্বাবধানাধীনে থাকিতে হইবে ভারত গবর্ণমেণ্টের প্রদত্ত বৃত্তির সম্বন্ধে যেরূপ বিধিব্যবস্থা আছে, এই বৃত্তি সম্বন্ধেও সেইরূপ থাকিবে। বৃত্তিপ্রাপ্ত ছাত্রের চরিত্র এবং শিক্ষা বিষয়ে উন্নতি যদি সন্তোষজনক না হয় তবে তাঁহাকে ভারতে ফিরাইয়া আনা হইবে।

শিল্পবিদ্যা শিখিয়া ভারতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়াই ছাত্রগণ নিজেদের সম্বন্ধে কোন্ বৃত্তি অবলম্বনীয় তাহা নিজেরাই স্থির করিয়া লইবেন। সরকারী, অথবা বেসরকারী চাকরীতে তাঁহাদিগকে প্রবৃত্ত করিবার জন্য

* Sec 6, of the tetus, 33 vic. Chapter 3.

কোনরূপ বাধাবাধি থাকিবে না। তবে তেমন আবশ্যক উপস্থিত হইলে গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদিগকে কোন শিল্পস্কুলের শিক্ষক অথবা স্থানীয় শিল্পের উন্নতিসাধন বিষয়ক কোন কার্য্যে নিযুক্ত করিবার জন্য পাইলে আহ্লাদিত হইবেন।

খনিজ শিল্পের উন্নতিসাধন জন্য যাঁহারা বৃত্তিপ্রার্থী হইবেন সর্ব্বপ্রথমে তাঁহারাই শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টরের নিকট আবেদন করিবেন। নিজের শিক্ষাবিষয়ে এবং শিক্ষাদান বিষয়ে প্রার্থীর কিরূপ অভিজ্ঞতা আছে তাহা এবং তাঁহার ভবিষ্যৎ প্রয়োজন সমূহ সম্বন্ধে বিশেষ বিবরণ আবেদনপত্রের সহিত লিপিবদ্ধ করিতে হইবে। ভারতে ফিরিয়া আসিয়া তিনি কি করিতে ইচ্ছা করেন তাহাও সম্ভব হইলে ঐ সঙ্গে জানাইবেন। সমস্ত বিষয় বিবেচনা করিয়া স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট যাঁহাদের জন্য অনুরোধ করিবেন ভারত গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদেরই বৃত্তি দিবার ব্যবস্থা করিবেন। আগামী ১লা মার্চ্চ পর্য্যন্ত কলিকাতা, রাইটার্স বিল্ডিং ডিরেক্টর আফিসে বৃত্তিপ্রার্থিগণের লিখিত আবেদন গৃহীত হইবে।

জাপানবাসীর স্বদেশ ভক্তি।—রুষ ও জাপানে যুদ্ধ হইবার সম্ভাবনা। উভয় পক্ষই বিপুল আয়োজনে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইতেছে। ইংলণ্ড জাপানকে সাহায্য করিবেন জাপানবাসীর স্বদেশ ভক্তির কথা শুনিলে বিস্মিত হইতে হয়। দেশের জন্য জাপানের স্ত্রীলোক ও বালকেরা পর্য্যন্ত প্রাণদান করিতে কৃতসংকল্প বা উৎসুক হইয়াছে। জাপানীরা বলিতেছে, দেশে একটী প্রাণী থাকিতে সমরানল নির্ব্বাপিত হইবে না। সকলেই স্বদেশের জন্য সমরানলে জীবনাহুতি প্রদান করিবে। জাপানের একজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি তাঁহার "সহধর্ম্মিণীর প্রতি উপদেশ" নাম দিয়া একটি পত্রের প্রচার করিয়াছেন। তাহাতে তিনি স্বীয় সহধর্ম্মিণীকে বলিতেছেন,—"যুদ্ধারম্ভ হইবামাত্র তুমি স্বীয় সুকৃষ্ণ কেশ-দাম কর্ত্তণ করিয়া বিক্রয় এবং লব্ধ অর্থ যুদ্ধের ব্যয় নির্ব্বাহ-কল্পে প্রদান করিও। সেই সঙ্গে সমস্ত দাসদাসীদিগকে বিদায় দিতে যেন বিলম্ব না করা হয়। এইরূপে ব্যয় সংক্ষেপ করিয়া দেশরক্ষা কার্য্যে অর্থ সহায়তা করিতে ইতস্ততঃ করিও না। দেশের রমণীকুলকে লইয়া এখন হইতেই দেশের কার্য্যে সহায়তা করিবার জন্য প্রস্তাব ও পরামর্শাদি স্থির করিতে প্রবৃত্ত হও। দেশরক্ষক সৈনিকদিগকে সর্ব্বপ্রকারে সাহায্য করাই তোমাদিগের একমাত্র লক্ষ্য হউক!" এই পত্র পাঠে জাপানী রমণীমাত্রেই আপনাদিগের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে যে উপদেশ লাভ করিয়াছেন, তাহা নিষ্ফল হইবে বলিয়া বোধ হয় না।

বালিকার সংসাহস।—লিলি স্মিথ্ ৬ বৎসরের বালিকা। সে বড় বড় পুতুল বড়ই ভালবাসে, সর্ব্বদা কোলে করিয়া ফিরে। সে আর তাহার ১৫ মাসের একটী ভাই শয্যায় শুইয়াছিল। সেই ঘরে আর কেহ ছিল না। গৃহস্থিত ল্যাম্প ফাটিয়া শয্যায় আগুন লাগে। ধুঁয়াতে ঘর এবং সিঁড়ি আচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছিল। বালিকা শিশু ভাইটীকে কোলে করিয়া সেই নিঃশ্বাসরোধক ধুঁয়ার মধ্যদিয়া বহু কষ্টে নীচে নামিয়া আসিয়া নিজের এবং ভাইয়ের প্রাণ রক্ষা করিয়াছে। সে কিরূপে এরূপ কার্য্য করিল, জিজ্ঞাসা করিলে সরলা বালিকা উত্তর করিল,—"কেন, আমি পুতুলগুলিকে ভালবাসি।"

জয়পুরের যাদুঘর ও বাগান।

অন্তঃপুর

সচিত্র মাসিক পত্রিকা।

ANTAHPUR

AN ILLUSTRATED MONTHLY JOURNAL IN BENGALI

Edited and contributed to by the ladies only.

কেবল মহিলাগণ কর্ত্তৃক লিখিত ও সম্পাদিত।

বাহিরে কুহেলী জাল ছাইয়াছে চারিধার।
গাহে না পাপিয়া পিক ফুটে না কুসুম আর
অন্তরে বসন্ত নব জাগে যদি নিশি দিন।
এ আঁধারে প্রাণ কভু হবে নাক আশা হীন

৬ষ্ঠ বর্ষ।	১৩১০ ফাল্গুন বঙ্গাব্দ	VOL. V
১১শ সংখ্যা	MARCH, 1904.	NO. XI

নির্ব্বন্ধ।

সে আজ ৫।৬ বৎসরের কথা. কলিকাতায় সেবার প্রথম "প্লেগ" দেখা দিয়াছে। নানা-দেশ হইতে আসিয়া যাঁহারা কলিকাতায় কার্য্যোপলক্ষে বাস করিতেন, এ সময় তাঁহারা অনেকেই স্ব স্ব পরিবার সহ অনতি-বিলম্বে পলায়ন করিয়া প্রাণ বাঁচাইবার চেষ্টা পাইতে লাগিলেন। সেবার আমি বি, এ, পরীক্ষা দিয়া কলিকাতা হইতে স্বদেশে বিক্রমপুরে যাত্রা করিলাম। পরীক্ষার ৫।৭ দিন পূর্ব্বে বাড়ী হইতে বাবা পত্র লিখিয়া-ছিলেন, পরীক্ষা শেষ হইলে যেন আমি আর কলিকাতায় কালবিলম্ব না করি। শিয়াল-দহ আসিয়া ট্রেন উঠিলাম। ট্রেনে ছাড়িলে আমার ঘুম পাইতে লাগিল। ট্রেনের সহিত নিদ্রার কি সম্পর্ক জানি না; আমার কিন্তু ট্রেনে চড়িলেই শরীর অবশ হইয়া নিদ্রার আবেশ হইয়া থাকে।

আমার গন্তব্য স্থানের মধ্যবর্ত্তী কোন ষ্টেসনে গাড়ী থামিলে আমার নিদ্রা ভঙ্গ হইল। আমার নিকটে উপবিষ্ট জনৈক ভদ্রলোক আমাকে জাগ্রত দেখিয়া আমার নাম ধামাদি জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি

তাঁহার প্রশ্নের যথাযথ উত্তর করিলাম। আমি কলেজে পড়ি এবং ভদ্রঘরের সন্তান জানিয়া তিনি কাতর স্বরে বলিলেন,—"মহাশয় যদি অনুগ্রহ করে শ্রবণ করেন তা হ'লে আমি একটা কথা বল্‌তে ইচ্ছা করি।" আমি একটু নম্রস্বরে বলিলাম,—"তা আপনি ভদ্রলোক, বিশেষতঃ বয়োজ্যেষ্ঠ, আপনার একটা কথা শুন্‌বো তাতে আর আপত্তি কি হ'তে পারে ?"

"দেখুন, আমারও বাড়ী বিক্রমপুরে ; সম্প্রতি স্ত্রী এবং একমাত্র কন্যাসহ ছুটি নিয়া দেশে যাচ্ছি। কিন্তু আমি একটী ভয়ানক বিপদের আশঙ্কা করতেছি বলিয়া আপনাকে একটা অনুরোধ করতে ইচ্ছা করি। আমার শরীরের অবস্থানুভবে বুঝিতেছি আমার জ্বর হয়েছে। আপনি জানেন গোয়ালন্দ ষ্টেসনে নামলে প্লেগ-ডাক্তার যখন পরীক্ষা ক'রে আমার জ্বর হয়েছে জানতে পারবে আমাকে অবশ্যই তখন প্লেগ হাঁসপাতালে যেতে হবে। আমার স্ত্রী কন্যাটীর কি উপায় হবে তা ভেবে আমি একটু অস্থির হয়েছি। আপনি শিক্ষিত লোক, যদি এ অসময়ে আমার উপকার করেন, জগদীশ্বর আপনার মঙ্গল করিবেন।"

ভদ্রলোকটীর নাম রমেশ বাবু। উহার কথা বলিবার স্বরেই বুঝিলাম যে উহার শরীর কাঁপিতেছে। আমি বলিলাম,—"তা আপনি নিশ্চিন্ত হউন, আমাদ্বারা যে পর্য্যন্ত উপকার হতে পারে তাহা আমি নিশ্চয় করবো।"

গোয়ালন্দ ষ্টেসনে আসিয়া গাড়ী থামিলে আমি তাড়াতাড়ি নামিয়া পড়িলাম। রমেশ বাবু নামিতে পড়িয়া যাইতে ছিলেন, আমি তাহাকে ধরিয়া মেয়ে-গাড়ীর নিকট লইয়া গেলাম। ক্রমে ক্রমে সব লোক চলিয়া গেলে আমরা টিকেট দিয়া রেলওয়ে কম্পাউণ্ডের বাহিরে যাইবার জন্য চলিলাম। আমি অগ্রে অগ্রে রমেশ বাবুকে ধরিয়া আনিয়া ডাক্তারের নিকটে আসিয়া তাহার অদৃশ্যে রমেশ বাবুর হাত ছাড়িয়া দিলাম। ছাড়িয়া দেওয়ার কারণ,ডাক্তার পাছে ধরিয়া আনিতে দেখিয়াই সন্দেহ করেন। ডাক্তার বাবু কিন্তু তাঁহার হাত ধরিয়াই ব্যগ্রতার সহিত বলিলেন,—"মহাশয়ের হাঁসপাতালে যেতে হতেছে ; আপনার জ্বর হয়েছে।" রমেশ বাবু তজ্জন্য একপ্রকার প্রস্তুতই ছিলেন। আমরা বিনা আপত্তিতে হাঁসপাতালে গেলাম। তথায় রমেশ বাবু ভয়ানক প্লেগ জ্বরে অস্থির হইয়া ছট্‌ফট্‌ করিতে লাগিলেন। সরকারি ডাক্তার আপনা হইতেই আসিয়া ঔষধাদি দিয়া গেলেন।

আলাপ পরিচয়ে বুঝিলাম রমেশ বাবুর পরিবার শিক্ষিত, আধুনিক উদার সম্প্রদায় ভুক্ত। মেয়েটী অবিবাহিতা, বয়স প্রায় পঞ্চদশ বৎসর হইবে, দেখিতে সুন্দরী। রমেশ বাবুর স্ত্রী স্বামীর এই আকস্মিক বিপদে আত্মহারা হইলেন, কাঁদিয়া আমাকে বলিলেন,—"এ বিপদের সময় আপনি আমাদিগকে ছাড়িয়া গেলে উহাকে আর কিছুতেই বাঁচাতে পারবো না। আপনি যদি ভীত না হইয়া এই সময়ে এই অবলা দুটীর সাহায্য করেন, তা হলে চিরকাল এ উপকার স্মরণ করবো

ইহাদের অবস্থা দেখিয়া আমারও চক্ষে জল আসিল। আমি বলিলাম,—"চিন্তা করবেন না, ভগবান আছেন। এ অবস্থায় মানুষ মানুষকে ফেলে যেতে পারে না ; আমি আপনাদের একটা উপায় না ক'রে কোথাও যাব না।"

রমেশ বাবুর কন্যা শৈলজা অশ্রুবিগলিত

নেত্রে আমার দিকে চাহিয়া রহিল। আমি যে এই বিপদের সময় তাহাদিগকে সাহায্য করিতে প্রস্তুত হইলাম এই জন্য তাহার সরল আঁখি দুটী যেন তাহার অন্তরের কৃতজ্ঞতা আমাকে জ্ঞাপন করিল।

তিনজনে সারারাত্রি পরিশ্রম সহকারে রোগীর সেবা শুশ্রূষা করিয়াও তাঁহাকে বাঁচাইতে পারিলাম না। প্লেগের হৃদয় বিদারক যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া নিশাবসানের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে স্ত্রীকন্যাকে সংসার সাগরে ভাসাইয়া দিয়া রমেশ বাবু মানবলীলা সম্বরণ করিলেন।

আমি মহাবিপদে পড়িলাম। দুইটী স্ত্রীলোকের অন্তঃস্থলস্পর্শী করুণ ক্রন্দনে একে প্রাণ অস্থির হইয়া উঠিল, তাহাতে আবার শব সংকারের কঠোর কর্ত্তব্য আশু সম্পাদন আবশ্যক হইল। অনেক বলিয়া কহিয়া উহাদের একটু শান্ত করিয়া একটী লোকের অনুসন্ধানে বাহির হইলাম। প্লেগের মড়া পুড়িতে সহজে কেহই স্বীকৃত হইল না। অনেক ঘুরিয়া পাঁচটী টাকা দিতে প্রতিশ্রুত হইয়া একটী লোক সংগ্রহ করিলাম। তাহার সাহায্যে যথাসাধ্য শব সংকার করিয়া বেলা প্রায় দ্বিতীয় প্রহরের সময় শৈলজা ও তাহার মাকে বলিয়া কহিয়া স্নান করাইয়া নিজে স্নান করিলাম। রমেশ বাবুর সঙ্গে বেশী টাকা ছিল না। যাহা কিছু ছিল তাহাতে সংকারের কাঠ ইত্যাদি খরচ এবং একটি লোকের পারিশ্রমিক হইতে পারে না। রমেশ বাবুর স্ত্রী বলিলেন,—"আমার নিকট আর একটী পয়সাও নাই; আপনি আমার এই বালা বিক্রি করিয়া কিছু অর্থ সংগ্রহ করতঃ উপস্থিত খরচ সংকুলান করুন।"

আমার নিকটও বেশী টাকা ছিল না। তথাপি সদ্য বিধবার হস্তাপসারিত স্বর্ণবলয় বিক্রি করিতে আমার মন কিছুতেই অগ্রসর হইল না। আমি বলিলাম,—"এখন রাখুন, আমি অন্য উপায়ে টাকা সংগ্রহ করিতে পারি কি না দেখি। অবশ্য আমার নিকট টাকা থাকিলে ভাববার কোন কারণই ছিল না।"

আমি ভাবিতে ভাবিতে বাজারের উদ্দেশে বাহির হইলাম। কলিকাতা হইতে আসিবার সময় ৫০৲ টাকা মূল্যে ওয়েষ্ট এণ্ড ওয়াচ কোম্পানির একটি ঘড়ি খরিদ করিয়া আনিয়াছিলাম। বাজারে যাইয়া ২৫৲ টাকায় ঘড়িটী বিক্রয় করিয়া ফিরিয়া আসিলাম। ভাবিলাম একথা প্রকাশ করিব না; কিন্তু শৈলজার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি এড়াইতে পারিলাম না। আমি ঘরে ঢুকিয়া টাকা সংগ্রহ করিয়াছি বলাতে শৈলজা তাহার হাতের নখ খুঁটিতে খুঁটিতে বলিল,—"আপনার ঘড়ীটি দেখিতেছিনা, বোধ হয় বিক্রয় করতে হয়েছে।"

শৈলজা এত সহজেই বিষয়টা ধরিয়া ফেলিল দেখিয়া একটু লজ্জিত হইলাম, কোন উত্তর করিলাম না। শৈলজা কৃতজ্ঞ নেত্রে একবার আমার মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া মস্তক অবনত করিল।

পরদিন প্রাতে ষ্টীমারে চড়িয়া রাত্রিতে রমেশ বাবুর বাড়ীতে আসিয়া পৌঁছিলাম। বাড়ীতে এক খানা মাত্র পুরাতন দালান, কপাট বাহির হইতে তালাবদ্ধ। যাঁহারা কার্য্যোপলক্ষে অন্যত্র সপরিবারে বাস করেন তাঁহাদের অনেকের বাড়ীই এই প্রকার তালাবদ্ধ করিয়া রাখিতে হয়।

সে দিনকার রাত্রি তথায়ই অতিবাহিত করিলাম। আমাদের নিজ বাড়ী তথা হইতে

৪।৫ ঘণ্টার পথ ব্যবধান হইবে। পরদিন প্রাতে উঠিয়া শৈলজা এবং তাহার মাতার নিকট বিদায় লইলাম। ঘড়ি বিক্রির টাকা খরচ বাদে আমার নিকট যাহা ছিল তৎসমুদয় রমেশ বাবুর স্ত্রীর নিকট দিয়া বলিলাম,—"এখন আপনাদের সব ঠিক ক'রে নিতে একটু সময় লাগবে। এই সময় ইহা দ্বারা আপনাদের খরচ চালাবেন এবং ইহা গ্রহণ করতে কোন আপত্তি করলে বড়ই দুঃখিত হব।" চোখের জল ফেলিতে ফেলিতে লজ্জা ও কৃতজ্ঞতার সহিত তিনি উহা গ্রহণ করিলেন। যাইবার সময় কাঁদিতে কাঁদিতে বলিয়া দিলেন,—আপনার উপকার এ জন্মে ভুলবো না। জগদীশ্বর আপনার মঙ্গল করুন। সময় সময় আমাদের খবর নিবেন, সংসারে আমাদের দিগে চাহিবার আর কেহ নাই।"

সর্ব্বদা তাহাদের অনুসন্ধান করিব এইরূপ প্রতিশ্রুত হইয়া বিদায় হইব এমন সময় শৈলজার বাষ্পপূর্ণ কোমল মুখের দিকে দৃষ্টি পড়িল; সে প্রকোষ্ঠের এক কোণে দাঁড়াইয়া আমার দিকে স্থিরনেত্রে চাহিয়াছিল। আমি তাহার মুখের পানে চাহিলে সে কি যেন বলিতে যাইতেছিল কিন্তু পারিল না। অনিমেষ নেত্রে কিছু কাল চাহিয়া থাকিয়া মস্তক নত করিয়া নখ খুঁটিতে লাগিল। আমি তাহার অবস্থা দেখিয়া বলিলাম,—"শৈলজা! এখন যাই, সুবিধা পেলে শীঘ্রই তোমাদিগকে দেখে যাব। কোন প্রকার অসুবিধায় পড়িলে আমাকে চিঠি লিখো।"

"অবশ্য একবার আসবেন।" শৈলজা আরও কিছু বলিতে চাহিতেছে বুঝিলাম, কিন্তু কিছুই বলিতে পারিল না। আমি আর বিলম্ব না করিয়া শৈলজার প্রতি শেষ সস্নেহ দৃষ্টিপাত করিয়া অনিচ্ছায় ধীরে ধীরে বাড়ী অভিমুখে চলিলাম।

সমস্ত পথ কেবল শৈলজার কথাই ভাবিলাম। শৈলজা বেশ সুন্দরী ও সুশীলা সে আমার সহিত কথা বলিতে সময় সময় এত লজ্জিতা হইত কেন, তাহার জন্য মন এত চঞ্চল হইল কেন, আবার তাহাকে দেখিতে আসিব কি না, ইত্যাদি ভাবনায় মন বড়ই অস্থির হইল। বাড়ী পৌঁছিয়া এ সব ঘটনা কাহারও নিকট প্রকাশ করিলাম না।

বাড়ী আসিয়া নিয়মিত সময়ে স্নানাহার করি বটে কিন্তু মনে একেবারেই প্রফুল্লতা নাই। কাহারও সহিত বড় বিশেষ আলাপ পরিচয় করি না। পূর্ব্বে আমার একমাত্র বৌদিদি কোন [illegible] কোন রূপ বিদ্রূপ করিলে তাহার সমুচিত উত্তর শুনিয়া পরাস্ত হইয়া যা[illegible] বাড়ী আসিয়া তাঁহার কোন বিদ্রূপে [illegible] সেইরূপ উত্তর প্রদান করি[illegible]। আমি বি, এ, পরীক্ষা দিয়াছি, ভাল[illegible] পাস হইব সকলেই আশা করিতেছে। আর চতুর্দ্দিক হইতে মৌমাছির ন্যায় ঘটকগণ আসিয়া আমার বৃদ্ধ পিতাকে অস্থির করিয়া তুলিল এবং তাঁহার সন্ধ্যা আহ্নিকাদির ব্যাঘাত ঘটাইতে লাগিল। বাবা বৃদ্ধ হইয়াছেন, সংসারের কাজ কর্ম্ম নিজে দেখিতে পারেন না। বড় ভাইর উপরই সংসারের সম্পূর্ণ ভার। প্রত্যহ অসংখ্য ঘটক আসিতেছে দেখিয়া বাবা তাহাদিগকে একদিন বলিয়া দিলেন,—"আপনারা আমার বড় ছেলের সহিত এ বিষয়ে প্রস্তাব করুন, সেই যা হয় একটা করবে।"

দাদা বৌদিদির দ্বারা পরোক্ষে আমার অভিমত জানিতে চাহিলেন। আমি

বৌদিদিকে স্পষ্ট বলিলাম যে এখন আমি বিবাহ করিব না। বৌদিদি অত্যন্ত চতুরা এবং বুদ্ধিমতী, তিনি আমার পূর্ব্বাপর ভাব পর্য্যবেক্ষণ করিয়া সস্নেহে বলিলেন,—"ঠাকুর পো! আপনি নিশ্চয়ই কোন কারণে মনঃকষ্টে আছেন; তা আমাকে খুলে বলুন, আমা দ্বারা আপনার উপকার বৈ অপকার হবে না। আমি আপনার মানসিক অবস্থা কতকটা বুঝতে না পেরেছি এমন নয়।"

বৌদিদির করুণ বাক্যে আমার মনে একটু শান্তি আসিল; আমি সরল চিত্তে শৈলজা ঘটিত সকল কথা খুলিয়া বলিলাম। তিনি সমস্ত শ্রবণ করিয়া মৃদু মৃদু হাসিতে হাসিতে বলিয়া গেলেন,—"আমরা সাধারণ ওঝা নই, মনের বিষ টেনে বের করতে পারি। আপনি যে এরূপ একখানা উপন্যাস তৈয়ার করে বসে আছেন তা অনুমানেই বুঝতে পেরেছিলাম।" আমার জীবনে বৌদিদির নিকট বিদ্রূপে এই প্রথম হারিলাম।

তিনি চলিয়া গেলে ভাবিলাম আজি একটা কাণ্ড হইবে, দাদা ও বাবার কাণে আজ নিশ্চয়ই এই কথা উঠিবে। আমার মনে ভয়ানক উদ্বেগ উপস্থিত হইল। যদি বাবা এবং দাদা আমার ইচ্ছার বিরোধী হন তবেই সর্ব্বনাশ হইবে।

আহারান্তে রাত্রে শয়ন করিতে চলিয়াছি; বাবা যে ঘরে থাকেন তাহার পার্শ্ব দিয়াই আমার ঘরে যাইতে হয়। আমার পায়ে রবারসোলের জুতা ছিল; আমি নিঃশব্দে শয়ন কক্ষে যাইতেছি, শুনিতে পাইলাম বাবা ও দাদা বিবাহ সম্বন্ধে কি কি কথাবার্ত্তা বলিতেছেন। আমি দাঁড়াইলাম শুনিলাম বাবা বলিতেছেন,—"তা হবে না, এই মেয়ে আমি কিছুতেই ঘরে আনতে পারি না। মাথার কাপড় ফেলে, চুলে ফুল গুঁজে, গা ফুঁদিয়ে চলবেন এমন লক্ষ্মী বউ আমি চাই না। যতীন্দ্রের ইচ্ছা হয় সে সেই বিয়ে করতে পারে, কিন্তু আমি তাতে নেই জানবে,—এ বৃদ্ধ বয়সে ধর্ম্মে জলাঞ্জলী দিতে পারব না। তুমিও এ বিষয়ে আমাকে আর অনুরোধ করতে এস না।"

শুনিয়া আমার মাথা ঘুরিয়া গেল, আমি নিঃশব্দে যাইয়া বিছানায় শয়ন করিয়া আকাশ পাতাল ভাবিতে ভাবিতে সমস্ত রাত্রি কাটাইয়া দিলাম। হায়! শৈলজা আমার এত আদরের হইল কিসে?

প্রাতে বহির্বাটিতে কেদারায় বসিয়া অন্যমনস্ক ভাবে বিষবৃক্ষের পাতা উল্টাইয়া যাইতেছি, উদ্দেশ্য হরদেব ঘোষালের পত্রখানা পড়িব। এমন সময় ডাক পিয়ন চিঠি বিলি করিয়া গেল। আর বিষবৃক্ষে হরদেব ঘোষালের পত্র খোঁজা হইল না, ব্যস্ত হইয়া চিঠি খুলিয়া পড়িলাম। শৈলজা ও তাহার মাতা একই কাগজে ভিন্ন ভিন্ন দুই খানা চিঠি লিখিয়াছে। আমি বাড়ীতে আসিয়া উহাদের জন্য গোপনে নিজ হইতে যে কয়টা টাকা সাহায্য করিয়া ছিলাম তাহার প্রাপ্তি স্বীকার ও সঙ্গে সঙ্গে অসংখ্য ধন্যবাদ দেওয়াই দুই পত্রের উদ্দেশ্য। শৈলজার মাতা তাঁহার পত্রের উপসংহারে লিখিয়াছেন, "সংসারে আমাদের আত্মীয় স্বজন কেহই নাই, আপনি আমাদের একমাত্র ভরসাস্থল, কাজেই আপনার নিকট একটী বিষয় না লিখিয়া পারিলাম না। শৈলজার বয়স অনেক হইয়াছে, এখন উহাকে যে প্রকারে হউক বিবাহ দেওয়া দরকার। আপনার সাহায্য ব্যতীত আমি কন্যাদায়, হইতে কিছুতেই উদ্ধার পাইতে পারি না। আপনি অনুসন্ধান

করিলে শ্রীমতির জন্য একটী সংপাত্র যোগাড় করিতে পারিবেন আশা করি।”

চিঠি পড়িয়া মন আরও খারাপ হইল। ভাবিলাম যাহার সুখ-স্মৃতি লইয়া বাঁচিয়া আছি তাহাকে নিজে চেষ্টা করিয়া অন্যের হাতে তুলিয়া দিব?—না, তাহা কিছুতেই পারিব না। আবার বিপরীত ভাবিলাম—মনে করিলাম আমি ত পিতার অমতে কিছুতেই শৈলজাকে বিবাহ করিতে পারিব না। তবে কি সে চিরজীবন কষ্ট পাইবে? আমি সুখী হইতে পারিব না বলিয়া কি তাহাকেও সুখী হইতে দিব না? ভাবিতে ভাবিতে চিঠি খানা হাতে করিয়া একদিকে চলিয়া গেলাম।

আমার পরীক্ষার ফল বাহির হইল। আমি ইংরাজী ও ফিলসফিতে অনার পাস করিয়াছি দেখিলাম। দাদা ও বৌদিদির একান্ত ইচ্ছা যে বিবাহটা এখন শীঘ্র সম্পন্ন হইয়া যায়। আমি কিন্তু বৌদিদির নিকট স্পষ্ট বলিলাম যে এখন কিছুতেই বিবাহ করিব না। বৌদিদি আমার ভাব স্বভাব দেখিয়া কেবল হাসিতেন; আমার কিন্তু সে হাসি একটুও ভাল লাগিত না।

কলেজ খুলিলে আমি এম্ এ, পড়িবার জন্য কলিকাতায় চলিয়া গেলাম। তথায় যাইয়া মন ঠিক করিলাম,—আমার নিজের জন্য শৈলজার জীবন নষ্ট করিব না স্থির করিলাম। একটা সংপাত্রের সহিত তাহার বিবাহ দিয়া নিজে চির জীবন অবিবাহিত থাকিব মনে মনে এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিলাম। শৈলজার জন্য আমার একজন বি,এ, পাস সহাধ্যায়ীকে বিশেষ করিয়া অনুরোধ করাতে তিনি এ বিবাহ করিতে স্বীকৃত হইলেন। শৈলজার মাকে সে সংবাদ লিখিয়া পাঠাইলাম। মনের কি প্রকার অবস্থা লইয়া চিঠি খানা লিখিলাম তাহা লিখিয়া বুঝাইতে পারি না। ডাকবাক্সে দিয়া আসিয়া নীরবে অনেকক্ষণ কাঁদিলাম।

ইহার কয়েক দিন পর শৈলজার এক পত্র পাইলাম। পত্রখানা এইরূপ:—

শ্রদ্ধেয় যতীন বাবু, আপনি মাতাঠাকুরাণীর নিকট যে পত্র লিখিয়াছেন তাহা পাইয়াছি। আপনি আমাদের অনেক উপকার করিয়াছেন, বলিতে গেলে আমাদের জাতি-কুল-মান সব রক্ষা করিয়াছেন, তজ্জন্য আপনার নিকট চিরকৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ আছি। কিন্তু আপনি সম্প্রতি যাহা করিতেছেন তাহাতে বড়ই দুঃখিত হইলাম। আপনি জানেন যে আমি ব্যতীত মার আপনার বলিবার আর কেহই নাই। এমতাবস্থায় আমি অন্যের অধীনা হইলে তাঁহার কষ্টের আর সীমা থাকিবে না; তাঁহার সেবা শুশ্রূষা কিছুতেই চলিবে না। আমার বিবাহ হয় ভগবানের বোধ হয় সেইরূপ ইচ্ছা নয়। কাজেই অনুনয় করিয়া লিখিতেছি আপনি সে চেষ্টা হইতে ক্ষান্ত থাকিবেন। অনেক উপকার করিয়াছেন এটাও করিবেন। রমণীর প্রগল্ভতা মার্জ্জনা করিবেন ইতি।

আপনার কৃপাকাঙ্ক্ষিণী

শৈলজা।

চিঠি পড়িয়া সব বুঝিলাম। আমার হৃদয়ে যে আগুন জ্বলিতেছে সে আগুন যে শৈলজার হৃদয়কে দগ্ধ করিতেছে তাহা বেশ জানিলাম। হতভাগিনীর জন্য বড়ই কষ্ট হইল। তাহাকে লিখিলাম—“তোমার চিঠি পড়িয়া আশ্চর্য্য ও দুঃখিত হইলাম। স্ত্রীলোকের উপযুক্ত সময়ে বিবাহ না হইলে

ধর্ম্ম ও সমাজের নিকট অপরাধিনী হইতে হয়। কাজেই আমার অনুরোধ, তোমার মত পরিবর্ত্তন কর, নতুবা আমি বড়ই দুঃখিত হইব।"

প্রায় একমাস যাবৎ কলিকাতায় আসিয়াছি। এখানে আসিয়া উহাদিগকে কিছুই সাহায্য করিতে পারি নাই। সেই জন্য এই চিঠির সহিত ১০৲ টাকার একখানা নোট পাঠাইয়া দিলাম। চিঠিখানা ডাকে দিয়া সাতপাঁচ ভাবিতেছি এমন সময় এক আর্জেণ্ট টেলিগ্রাম পাইলাম। খুলিয়া দেখি দাদা পাঠাইয়াছেন, সংবাদ—"টেলিগ্রাম পাওয়া মাত্র বাড়ী রওনা হইয়া আইস।"

চিন্তার উপর আবার চিন্তা আসিল। একমাস হইল মাত্র বাড়ী হইতে আসিয়াছি, ইতিমধ্যেই আবার বাড়ী যাইবার জন্য জরুরী টেলিগ্রাম কেন? কারো কি কোন ব্যারাম হইল?—বাবা বৃদ্ধ, এক প্রকার চলচ্ছক্তিহীন, তাঁহার তো কোন অমঙ্গল হইল না? ভাবিতে ভাবিতে আমার চোখে পৃথিবী আঁধার ঠেকিতে লাগিল। আর চিন্তা করা নিষ্প্রয়োজন ভাবিয়া সেই দিনকার রাত্রির ট্রেনেই বাড়ী রওনা হইলাম। বাড়ীতে আসিয়া দেখিলাম যাহা ভাবিয়াছিলাম তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত। কোথায় বাড়ীতে নীরব বিমর্ষ ভাব দেখিবার আশঙ্কা করিয়াছিলাম, আর তৎপরিবর্ত্তে সমবেত পাড়াপড়সীদের আনন্দ কোলাহল ও মঙ্গল ধ্বনিতে আমার প্রাণ কেমন হইয়া গেল। দেখিয়াই বুঝিলাম আর কিছুই নয়, এ যতীন্দ্র-মেধ যজ্ঞের আয়োজন মাত্র। আমি কাহাকেও কিছু না বলিয়া বরাবর আমার শয়ন ঘরে প্রবেশ করিলাম। বৌদিদি আসিয়া আহারের জন্য ডাকিলেন। শরীর ভাল নয়, কিছু খাব না বলিয়া তাঁহাকে বিদায় করিলাম।

সারারাত্রি কি ভাবে কাটাইলাম তাহা ভগবানই জানেন। পরদিন আমার "অধিবাস,"—আমার শরীর শিহরিয়া উঠিল, চোখের জল শুকাইয়া গেল। আমি শয্যা পরিত্যাগ করিতে সহজে স্বীকৃত হইলাম না। বৌদিদি আসিয়া অনেক অনুনয় বিনয় করিতে লাগিলেন—এ অপরাধ সম্পূর্ণ তাঁহার, তাঁহাকে ক্ষমা করিতেই হইবে—ইত্যাদি বলিয়া আমার নিকট ক্ষমা চাহিলেন। এবং তাঁহার ঘটকালির নিম্নলিখিত রূপ বর্ণনা করিলেন :—

"দেখুন, আমার একটী দূর-সম্পর্কান্বিতা ভগ্নী—সংসারে তাহার কেউ নাই বল্লেও অত্যুক্তি হয় না, অবস্থা নিতান্ত খারাপ। দেখিতে সুন্দরী বটে। তার জন্য আমার নিকট অনুরোধ আসলে আমি ঠাকুরের হাতে পায়ে ধরে তাঁহাকে সম্মত করাইয়া এই সম্বন্ধ স্থির করেছি। দেখুন আপনি শিক্ষিত; আপনি যদি গরীবের এ উপকার না করেন তবে কে কর্‌বে? আমার বোন্‌টী নিতান্ত গরীব, এই কথা মনে ক'রে আমাকে ক্ষমা কর্‌তে হবে।"

বৌদিদির কথা শুনিয়া আমার চোখে জল আসিল, বলিলাম,—"আপনাকে বিশ্বাস ক'রে মনের কথা বলেছিলেম বলেই আমাকে এই শাস্তি দিলেন! দুঃখের বিষয় এই যে আপনি জেনে শুনে একটা স্ত্রীলোকের জীবন চিরকালের জন্য নষ্ট করেন; আর আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে সেই স্ত্রীলোকটী নাকি আবার আপনারই আত্মীয়া!"

যত ভাবিতে লাগিলাম মনের আবেগ ততই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে লাগিল। পুনরায়

বলিলাম,—"এইরূপেই কি আত্মীয়ের উপকার করতে হয়! আপনারা জোর করে যা করতেছেন তার নাম যে বিবাহ নয় তা হয় তো বুঝ্‌তে পারেন। তবে রীতি রক্ষা হবে মাত্র; আপনার বোন্ আপনারই থাক্‌বে।"

বৌদিদি যেন বড় দুঃখিত হইয়া বলিলেন,—"রীতি রক্ষা ও জাতি রক্ষা দুইই হবে।"

"কেন, আমি কি পরের বে'র হয়ে যাচ্ছিলাম?"

"আপনার কথা নয়, আমার বোনের কথা বল্‌ছি। তার বয়স কিছু বেশী হয়েছে, হিন্দু সমাজে এত বড় মেয়ে অবিবাহিতা কচিৎ দেখা যায়। আপনি শিক্ষিত লোক, তার জাতি রক্ষা না করলে কে করবে?"

আকাশ পাতাল ভাবিতে ভাবিতে হৃদয়ের যন্ত্রণায় সারারাত্রি ছট্‌ফট্ করিয়া কাটাইলাম। আমার এ অবস্থায় অন্যে পড়িলে কি করিত জানি না; আমি কিন্তু অহিফেন সেবন করিয়া বা গভীর রাত্রে গৃহ ত্যাগ করিয়া এ যন্ত্রণা হইতে পরিত্রাণ পাইতে চেষ্টা করিলাম না। অবশ্য সে জন্য আমার অকৃত্রিম ভালবাসায় কেহ সন্দেহ করিবেন না।

যাহা হউক, বৌদিদির নিকট আমার কোন কথাই খাটিল না। পরদিন যথাশাস্ত্র আমার বিবাহ হইয়া গেল। চোখের জল ফেলিতে ফেলিতে তোতার মত কতকগুলি মন্ত্র উচ্চারণ করিলাম। মুখচন্দ্রিকার সময় দুঃখে কষ্টে ও ক্ষোভে চক্ষু বুজিয়া রহিলাম। সমস্ত পৃথিবীটা যেন আমার মাথার উপর ঘুরিতে লাগিল। মনে মনে বলিলাম,—"জগদীশ! এই অসীম সংসারের এককোণে এই দুইটী সামান্য জীবনের উপর তোমার এত প্রখর দৃষ্টি পড়িল কেন! এ জীবন দুটী মাটি করিয়া তোমার কোন্ মঙ্গল ইচ্ছা সাধন করিবে?"

বিবাহের পর গোলযোগ মিটিয়া গেলে বৌদিদির আদেশে পুত্তলিকার মত ফুলশয্যায় শুইতে গেলাম। জীবনে প্রথম স্ত্রী সম্ভাষণ করিতে যাইতে লোকে মনে কিরূপ ভাব পোষণ করিয়া থাকে জানি না; আমি হতভাগা কিন্তু কাঁদিতে কাঁদিতে গৃহে প্রবেশ করিলাম।

অবনত মুখে গৃহে প্রবেশ করিয়া স্বীয় অদৃষ্ট ভাবিতে ভাবিতে অনিচ্ছায় ধীরে ধীরে শয্যার নিকটবর্ত্তী হইলাম। গৃহে প্রবেশ করিয়া প্রদীপ্ত আলোক সম্মুখে আমার নবপরিণীতা স্ত্রীকে দেখিয়াই শিহরিয়া উঠিলাম! "কে! শৈ—শৈল-জা!" বলিতেই আমার কণ্ঠরোধ হইল। কাঁপিতে কাঁপিতে তাহার নিকটে পড়িয়া অচৈতন্য হইলাম।

* * * * *

পরদিন প্রাতে যখন শয্যা ত্যাগ করিয়া বাহিরে যাইতেছি, দ্বারের নিকটেই বৌদিদির সহিত সাক্ষাৎ হইল; যেন তিনি আমারই অপেক্ষা করিতেছিলেন। আমি ঘরের বাহির হইতেই মুখের হাসি চাপিয়া, মুখখানা একটু কৃত্রিম ভাব করিয়া বলিলেন,—"আপনার অনুগ্রহে আমার বোনের জাতি তো কোন প্রকারে রক্ষা করলেম। আপনার বোধ হয় অশান্তি বোধ হইতেছে! বলেন তো আজই তাকে পিত্রালয়ে পাঠিয়ে দিই।"

আমি অনেক দিন পর আজ প্রকৃত মনের আনন্দে হাসিতে হাসিতে বলিলাম,—"এ ঘটকালী কোথায় শিখ্‌লে বৌদিদি? আজ হতে তোমার পূজাটাই আগে করবো।"

বৌদিদি এবার আর হাসি রাখিতে পারিলেন না, বলিলেন,—"এখন পূজা করবার দেবতা আরও পাবেন। কিন্তু সাবধান, ষট্‌কালার বাহাদুরিটা যেন সর্ব্বত্র প্রকাশ হয়ে না পড়ে। শ্বশুর ঠাকুরের কাণে উঠ্‌লে আর এ বাড়ীতে আমার ঠাঁই হবে না।"

শ্রীগিরিবালা সেন গুপ্তা।

চারিটী আদর্শ রমণী

(মায়াময়ী)।

মায়াময়ী যৌবনে যোগিনী, পরিধানে গৈরিক বসন, পৃষ্ঠদেশে বিমুক্ত কেশদাম, ললাটে সিন্দুরের কি অপূর্ব্ব শোভা। মায়াময়ী সামাজিক লজ্জা সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিয়া সর্ব্বত্র যাতায়াত ও সকলের সঙ্গে সরল চিত্তে কথাবার্ত্তা কহিয়া থাকেন। তাঁহার শরীরে বিলক্ষণ বল, ও মনে অসীম সাহস আছে। মুখ মণ্ডলে কি এক অনির্ব্বচনীয় শোভা যাহাতে তাঁহাকে বিদ্রূপ উপেক্ষা করিবার প্রবৃত্তি কাহারও হয় না। এই জন্য তিনি নিরুদ্বেগে ও প্রশান্ত ভাবে যৌবনতরঙ্গে ভাসিতেছেন। অদৃষ্ট গুণে তাঁহার অনুরূপ পতি মিলিয়াছে। তাঁহার পতির অনেক শিষ্য আছে। তিনিও সংসারে যোগী। শাস্ত্রালোচনায় দিন অতিবাহিত করেন। সেই রূপ শাস্ত্রালোচনায় উভয়ের দিনই পরম সুখে অতিবাহিত হয়।

মায়াময়ী গ্রন্থাদি পড়িতে পারেন। বৈষ্ণব গ্রন্থাদি সমুদায় তাঁহার মুখস্থ। তিনি শ্রীমদ্ভাগবতের অমৃতরসে ডুবিয়াছেন, প্রেমামৃত পানে মনকে অমৃতময় করিয়া তুলিয়াছেন।

বাড়ীতে গোবিন্দের শ্রীমন্দির আছে। মায়াময়ী অধিকাংশ সময় তথায় অতিবাহিত করেন। মন্দিরের দ্বার আবদ্ধ করিয়া তিনি সে কি করেন তাহা কেহই দেখিতে পায় না, তবে দ্বার উদ্ঘাটিত হইলে তাঁহার প্রেমাশ্রু পরিলিপ্ত নয়নযুগলের মধুর স্নিগ্ধদৃষ্টি যিনি দেখিয়াছেন, তিনি বুঝিয়াছেন যে, সাধনা কুসুমের কি আশ্চর্য্য সৌরভ, প্রেম প্রস্রবণের কি পবিত্র ধারা, এবং কালিন্দী তটবর্ত্তিনী কুঞ্জবন বিহারিণী প্রেমময়ী রাধার সহচরীর কি মোহিনী মূর্ত্তি। ব্রাহ্ম-মুহূর্ত্তে সেই মোহিনী মূর্ত্তি ধীরে ধীরে সন্নিহিত স্রোতস্বিনীতে অবগাহন করিয়া পূজা-বন্দনাদিতে মগ্ন হইতেন। তৎপরে মায়াময়ী স্বামীর পূজার ও হোমের প্রভৃতির আয়োজন করিয়া দিতেন, এবং শিষ্যার ন্যায় তাঁহার সমুদায় আদেশ প্রতিপালন করিতেন। এই ভাবে তৃতীয় প্রহর পর্য্যন্ত অতিবাহিত হইলে মায়াময়ী হবিষ্যান্ন প্রস্তুত করত গোবিন্দের ভোগ দিয়া পতিকে পরিতোষপূর্ব্বক ভোজন করাইতেন এবং তৎপরে নিজে স্বামীর প্রসাদ পাইতেন। আহারান্তে তাঁহার স্বামী বিশ্রামার্থে শয়ন করিলে মায়াময়ী পতির চরণতলে বসিয়া চরণ সেবা করিতেন, কোন দিন হয়ত সেই তীর্থধামে মস্তক রাখিয়া নিদ্রাদেবীর আশ্রয় লইতেন।

ছায়ার ন্যায় পত্নী পতির পথানুবর্ত্তন করিবেন, ইহা কি, কবির কল্পনা? যিনি কল্পনা মনে করেন, তিনি একবার

দেখুন দেশে বিদেশে সর্ব্বত্র স্বামীর সঙ্গে মায়াময়ী কেমন প্রীত মনে বেড়াইতেছেন। ঐ দেখুন প্রীতমনে তিনি স্বামীর পাশে বসিয়া একমনে শিল্পালয়ে বসিয়া সকলকে কত মধুর উপদেশ দিতেছেন। বিবাহের পর হইতে মায়ামরী একদিনও পতি বিরহিণী হয়েন নাই। সমাজে যাহা কল্পনার অতীত, মায়াময়ী নিজ জীবনে তাঁহার প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছেন।

প্রেমময়ীর মূর্ত্তি দর্শনে পতি বিমুগ্ধ। হাস্যের তরঙ্গ নাই, অথচ যেন পূর্ণ শশধরের বিমল কিরণে মুখমণ্ডল সুশোভিত, উল্লাস নাই অথচ যেন প্রীতি লাবণ্যে চিরবিকশিত। ভক্তির নয়ন যুগলে যে অমৃত বর্ষিত হইয়া থাকে, তাহাতে তিনি একান্ত পরিতৃপ্ত। হাব ভাব বিলাস ভঙ্গিমা বর্জ্জিত মধুর কান্তির যে কি অনির্ব্বচনীয় ভাব তাহা অপরের বুঝিবার সাধ্য নাই, কিন্তু তাঁহার স্বামী চিরমুগ্ধ! উভয়ের এই পবিত্র ভাব দর্শনে সকলে তাঁহাদের সেই আবাস স্থানকে আনন্দ কানন বলিয়া মনে করিত। সেই আনন্দ কাননে তাঁহারা অতি পবিত্র ভাবে জীবন অতিবাহিত করিতেন।

(দয়াময়ী)

দেবী দয়াময়ীর উপর সমস্ত সংসারের ভার। তাঁহাকে অতি প্রত্যূষে উঠিয়া সাংসারিক কার্য্যে নিযুক্ত হইতে হয়, তৎপরে স্নানাদি করিয়া রন্ধন শালায় প্রবেশ করেন; ও সাক্ষাৎ অন্নপূর্ণার ন্যায় অমৃত রন্ধন করিয়া থাকেন। নিজেই পরিবেশনও করিয়া থাকেন। সকলের আহারাদি সমাপ্ত হইলে সকলের পাতে যাহাকিছু থাকে তাহাতেই ক্ষুধা নিবৃত্তি করেন, পরে বাসনাদি পরিষ্কার করিয়া বৈকালে যে সময় পান তাহাতে পৈতার সুতা কোনদিন বা লেপ বালিস কাঁথা ইত্যাদি সেলাই করিয়া থাকেন। সন্ধ্যার পর হইতে পুনরায় রন্ধন শালায় প্রবেশ করিতে হয়, গৃহে একটি দুগ্ধবতী গাভী আছে, দয়াময়ী তাহার সেবায় অতিশয় আনন্দ অনুভব করিয়া থাকেন। দয়াময়ী সর্ব্বদা অবগুণ্ঠনবতী মূর্ত্তিমতী লজ্জা এমন কি তাঁহার স্বামী পর্য্যন্ত দিবসে মুখ দর্শন বা তাঁহার সহিত কথা কহিতে পায় না। যে গৃহ কার্য্য করিতে হয়, তাহাতেও দয়াময়ীর মনে হয় যে, এ সংসারে কাজ অতি সামান্য ইহা অপেক্ষা আরও বেশী কার্য্য থাকিলে ভাল হইত। দয়াময়ী রন্ধন করিয়া তৃপ্ত হয় না, কারণ তত বেশী লোক নাই। এজন্য তাঁহার গৃহে অতিথি বা কুটুম্ব আসিলে তাঁহার আর আনন্দ ধরিত না। তাহারা চলিয়া গেলে আবার তাঁহার মনে দুঃখ হইত। বাড়ীতে সকলে শয়ন করিলে দেবী দয়াময়ী ধীরে ধীরে পতি গৃহে প্রবেশ করিয়া স্বামীর চরণতলে বসিয়া ভক্তিভাবে তাহা বক্ষে ধারণ করিতেন। দিবসের সমুদায় পরিশ্রম অন্তর্হিত হইলে তিনি আনন্দ নীরে ভাসিতেন। নির্জ্জন গৃহ তথাপি স্বামীর সহিত তিনি উচ্চৈঃস্বরে কথা বলিতেন না।

ধীরে ধীরে যে অমৃত বর্ষণ হইত তাহাতে তাঁহার ভাগ্যবান পতি বিমুগ্ধ হইয়া যাইতেন। হাস্যের তরঙ্গ নাই, অথচ হাস্যের মোহিনী জ্যোৎস্নায় শয়ন গৃহ উজ্জ্বল করিত। বিলাসের কটাক্ষ নাই, অথচ মধুর দৃষ্টির আকর্ষণে পতির চিত্ত সমাচ্ছন্ন।

দয়াময়ী শ্বশুর শাশুড়ীর আদরিণী ছিলেন আত্মীয় স্বজনের স্নেহ ও ভক্তির পাত্রী এবং

স্বামীর চিত্ততোষিণী ছিলেন। সাক্ষাৎ লক্ষ্মীরূপাদয়াময়ীর পতিগৃহে আসা অবধি সে সংসার সুখসৌভাগ্যের আবাস স্থল হইয়াছে। তাঁহার আদরের সীমা নাই। পিতৃগৃহে যাইবার আর উপায় নাই। কারণ তিনি গেলে তাঁহার পতির সংসার একদিনও চলে না, এবং তাহাকে ছাড়িয়া তাঁহার বৃদ্ধ শ্বশুর শাশুড়ীও একদিন থাকিতে পারেন না। বধূমাতা বলিয়াই উভয়ে পাগল। আর তদীয় পতির প্রেম বাহিরে কেহই জানে না, উভয়ে ভিন্ন অপরে কেহ তাহা জানে না। সে প্রণয় যে কত উচ্চ প্রেম ও কত মধুর তাহা ভাষায় প্রকাশ করিবার ক্ষমতা নাই। সমস্ত দিবসের বিরহের পর প্রতিদিন রজনীতে মিলন—প্রতিদিন প্রাণের অনুরাগ ও আগ্রহ স্রোতে মিলিত হইয়া বিশালতায় পরিণত হইতেছে, কালে যে উহা অনন্ত সাগরে মিশিবে তাহাতে সন্দেহ নাই।

৩

সুশীলা

দেবী সুশীলা কুলীনকন্যা ও পরমা সুন্দরী। সৌভাগ্যক্রমে উপযুক্ত স্বামীর হস্তেও পড়িয়াছে। পতি শিক্ষকতা করিতেন তাহাতে সংসার বেশ চলিত। উভয়ের মধ্যে সদ্ভাব বিলক্ষণ ছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্য ক্রমে স্বামী পক্ষাঘাত রোগে আক্রান্ত হইলেন। সুশীলার পিতৃকুলে আর কেহ নাই। পতিকুলে দূরসম্পর্কীয় যাহারা আছেন, অসময় বুঝিয়া তাঁহারা সকলে সরিয়া দাঁড়াইলেন। সংসার আর চলেনা। বাধ্য হইয়া সুশীলাকে তাঁহার প্রতিবেশীর সাহায্য গ্রহণ করিতে হইল। ক্রমে ২।১ দিন সকলেই কিছু কিছু সাহায্য করিলেন। ক্রমে তাহাও বন্ধ হইল। তখন বাধ্য হইয়া তিনি একজন গৃহস্থের বাটীতে পাচিকা হইলেন। অতুল রূপরাশি লইয়া পরের আশ্রয়ে যাওয়াও বিপদের কারণ, এবং তাঁহার ভাগ্যে তাহাই ঘটিল। প্রলোভনের সম্ভাবনা দেখিয়া তিনি কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া গৃহে ফিরিয়া স্বামীর পদতলে বসিয়া রোদন করিতে লাগিলেন।

সুশীলা স্বামীর নিকট হইতে লেখাপড়া শিখিয়াছিলেন। কোনও একখানি সংবাদ পত্রে দেখিলেন যে,স্ত্রীলোক ডাক্তারী শিখিতে পারে; তাহা অবগত হইয়া তিনি পতিকে সঙ্গেলইয়া কলিকাতায় আসিলেন। কয়েক জন বদান্য ব্যক্তির সাহায্যে ও সরকারী সাহায্যে ডাক্তারী পড়িতে আরম্ভ করিলেন। একখানি সামান্য খোলার ঘরে স্বামীকে লইয়া তিনি অতি কষ্টে দিনাতিপাত করিতে লাগিলেন। চিকিৎসকগণ সন্তুষ্ট হইয়া বিনা পয়সায় তাঁহার চিকিৎসা করিতে লাগিলেন। এইরূপে তিন বৎসর অতিবাহিত করিয়া তিনি সম্মানের সহিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণা হইয়া তিনি পঞ্চাশ টাকা বেতনে একটী চাকুরী পাইলেন।

আজ সুশীলার বক্ষঃস্থল আনন্দাশ্রুতে ভাসিতেছে। সমস্ত পথ রোদন করিতে করিতে আসিয়া তিনি স্বামীর চরণ তলে উপবেশন করিলেন। হৃদয়ে এত উচ্ছ্বাস হইল যে তাহার বেগে বহুক্ষণ পর্য্যন্ত পতিকে এই শুভসংবাদ দিতে পারিল না। পরে নিয়োগ পত্র খানি স্বামীর চক্ষের কাছে ধরিলেন। বহুক্ষণ ধরিয়া উভয়েই রোদন করিতে লাগিলেন। ভগবানের কৃপার বিষয় ভাবিয়া উভয়েই ভক্তিরসে নিমগ্ন হইলেন, স্বামীকে লইয়া সুশীলা কর্ম্ম স্থানে

আসিলেন। নিজে পূর্ব্বকার মত সামান্য ভাবে থাকিয়া যে অর্থ উপার্জ্জন করিতে লাগিলেন তদ্দ্বারা স্বামীর সেবা ও শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। ক্রমে তিনিও নিরোগ হইলেন। সতীর মনস্কামনা পূর্ণ হইল।

সুশীলা সরকারী কার্য্য করিয়া বাসায় আসিয়া স্বহস্তে রন্ধনাদি করিয়া স্বামীকে পরিতোষ পূর্ব্বক ভোজন করাইতেন। অর্থের অভাব নাই তথাপি পতির সেবা নিজে করিতেই ভাল বাসিতেন। সুশীলা সরকারী বেতন ভিন্ন বাহিরে চিকিৎসা করিয়া কাহারও নিকট হইতে একটী পয়সাও গ্রহণ করিতেন না। দীন দুঃখীদিগকে চিকিৎসা করিয়া মনে অসীম আনন্দ অনুভব করিতেন। যাহাদের পথ্যের অপ্রতুল তাহাদের জন্য পথ্য সংগ্রহ করিয়া নিজে তাহাদিগকে দিয়া আসিতেন। কোন দিন হয়ত সমস্ত রাত্রি রোগীর পার্শ্বে বসিয়া সেবা করিতেন অথচ কিছুই লইতেন না। স্বামী পুনরায় শিক্ষকতা করিতেছেন। স্বামীর উপার্জ্জন যথেষ্ট, এই জন্য সুশীলা চাকুরী পরিত্যাগ করিয়া হিন্দুস্ত্রীর ন্যায় দিনাতিপাত করিতে লাগিলেন। তিনি সমস্ত সংসারের কার্য্য নিজ হস্তে করিয়া থাকেন, কারণ পূর্ব্ব সংস্কার এখনও ভুলিতে পারেন নাই। দীন দুঃখীর পীড়ার কথা শুনিলে তাঁহার প্রাণ কাঁদিয়া উঠে। নিজে সাধ্যমত তাহার চিকিৎসা ও ঔষধ বিতরণ করিয়া থাকেন।

স্বামী যতক্ষণ বিদ্যালয়ে থাকেন, তাঁহার প্রাণ তখন যারপর নাই ব্যাকুল হয়। পরে পতি গৃহে আসিলে তাঁহার আর আহ্লাদের থাকে না, এবং সে আনন্দের কথা তিনি বাক্যে প্রকাশ করিয়া বলিতে পারেন না। তবে প্রেমময়ীর সে মধুর নয়ন যুগলে যে প্রেমের প্রবাহ বহিতে থাকে তাহাতে ভাগ্যবান স্বামীর হৃদয় একেবারে ভাসিয়া যায়। প্রেম ও কর্ত্তব্যের উপাদানে সুশীলার চরিত্র বিরচিত।

করুণাময়ী।

করুণাময়ী বিধাতার আশ্চর্য্য সৃষ্টি। সৌন্দর্য্যের সমাবেশে গুণের প্রতিবিম্ব পড়িয়া রমণীকে অনুপমা করিয়া তুলিয়াছে। হঠাৎ দেখিলে বোধহয় কোনও স্বর্গের দেবকন্যা শাপভ্রষ্টা হইয়া মর্ত্ত্যে আগমন করিয়াছেন। সে সৌন্দর্য্য আর লেখনীতে কি বর্ণন করিব। যাহারা কবি ভারত চন্দ্র কি বঙ্কিম চন্দ্রের রূপ বর্ণনা পাঠ করিয়াছেন, তাহারা যদি করুণাময়ীকে একবার দেখিতেন তবে বুঝিতে পারিতেন যে প্রকৃত সৌন্দর্য্য বর্ণনা করা ভাষার সাধ্যাতীত সুতরাং অসাধ্য সাধনে বিরত হইলাম।

বয়স্থা হইয়া করুণাময়ীর বিবাহ হইয়াছে। অদৃষ্ট গুণে অতুল বিষয়ের সুকোমল ছায়ায় তিনি আশৈশব শয়ানা। অতি যত্নে তিনি লালিতা পালিতা হইয়াছেন। করুণাময়ী পতি গৃহে আসিয়াছেন। তাঁহার শয়নাগার কি সুন্দর শোভায় শোভান্বিত। সে সুসজ্জা ও পারিপাট্য দেখিলে উচ্চ কল্পনায় ও ভাবে হৃদয় পূর্ণ হয়। প্রাতঃকালে যখন কুসুম-স্তবকে শোভিত হইয়া করুণাময়ী উপবেশন করেন তখনি কি অপূর্ব্ব শোভা হয়। সে শোভায় মোহনমোহে তদীয় পতি অনুদিন বিমুগ্ধ থাকিতেন। প্রভাত সঙ্গীতে সে গৃহ পূর্ণ হইত। এসরাজ হারমোনিয়াম বাজিতেছে তাহা লজ্জন

করিয়া করুণাময়ীর কণ্ঠ নিসৃত সঙ্গীত অমৃত বর্ষণ করিতেছে, সে দৃশ্য কল্পনার অতীত। করুণাময়ী প্রকৃতই আনন্দময়ী। সেই হাস্যময় মুখের মিষ্ট কথায় সকলেরই প্রাণ কাড়িয়া লইত। সে আনন্দময়ীর সন্নিধানে শোক তাপ তিরোহিত হইয়া প্রফুল্ল জ্যোৎস্নার সমাগম হয়। সে হাসির প্রবাহ অতিক্রম করিবার ক্ষমতা কাহারও নাই। সে মিষ্ট মধুর কথায় মন তৃপ্ত হয় না এরূপ নীরস লোক জগতে কেহ নাই। এরূপ লোক নাই। সে সঙ্গীতে যাহার চিত্ত বিমোহিত না হয়। সে সৌন্দর্য্যে যাহার কল্পনা স্বর্গের শোভা হৃদয়-ঙ্গম করিতে না পারে তাহার কল্পনাই নাই তাহার কবিত্ব বোধ আদৌ হয় নাই। সে কোমল স্নিগ্ধ ভাবময়ী দৃষ্টিতে কি মধুরতা আছে তাহা যিনি বুঝিতে অক্ষম তাহার নয়নের সার্থকতা অদ্যাপি হয় নাই।

করুণাময়ীর সাহিত্যে বিশেষ অনুরাগ আছে। এই বয়সেই তিনি বাঙ্গালা ও সংস্কৃত সাহিত্যে বিশেষ জ্ঞানলাভ করিয়াছেন।

উচ্চ কল্পনায় তাঁহার মন শোভিত। তিনি সাহিত্যে যে উচ্চ প্রেমের কথা শুনিয়াছেন তাহাতেই অনুদিন নিমগ্না, সাহিত্যের কল্পনা পূর্ণ হৃদয়ে যখন তিনি স্বামীর পার্শ্বে বসিয়া প্রেমালাপ করেন, তখন তিনি এই বিশ্বসংসার ভুলিয়াগিয়া কি এক অনির্ব্বচনীয় দেশে চলিয়া যান। তিনি বসন্তে কুসুমের সঞ্চার দেখিয়া শিহরিয়া উঠেন, তখন কি এক মধুর আবেগে চিত্ত পুলকিত হয়। শরতের মেঘে প্রেম নিকেতন নির্ম্মাণ করিবার জন্য মন ব্যাকুল হয়। অমনি বোধ হয় যেন তাঁহারা উভয়ে তথায় সুখে বিচরণ করিতেছেন। এইরূপ প্রেমের আবেগে সৌন্দর্য্যের শোভায়, বিদ্যার নিপুণতায়, গুণের আধিক্য ও চরিত্রের মাধুর্য্য লইয়া করুণাময়ী স্বামী গৃহে থাকিয়া সুখে জীবন অতি বাহিত করিতেছেন। ভবিষ্যতের দৃশ্য পাঠিকাগণ অনুধাবন করিলেই বুঝিতে পারিবেন।

এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই যে এই চারিটী রমণীর মধ্যে কাহার স্বামী সৌভাগ্যবান ও সুখী?

শ্রীঅসীমাসুন্দরী সোম।

সকল দিন সকলের সমান যায় না

মানব জীবনের প্রত্যেক দিন সকলেরই সমান যায় না। দিবা রাত্রির প্রত্যেক ঘণ্টা, প্রত্যেক মিনিট, প্রত্যেক সেকেণ্ড নব নব রূপ ধারণ করিয়া নূতন নূতন রঙ্গের কত প্রকার ক্রীড়া দেখাইয়া কাহাকে হাসাইয়া কাহাকে কাঁদাইয়া নদীর স্রোতের মত চলিয়া যাইতেছে। চন্দ্র, সূর্য্য প্রত্যহ সমান ভাবেই উদয় হইতেছে এবং অস্ত যাইতেছে; এবং কাহার প্রতি কিছুই দৃক্পাত করিতেছে না। কিন্তু এই উদয় হওয়া ও অস্ত যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মনুষ্য জীবনের কত প্রকার পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে তাহা কে বলিতে পারে?

সূর্য্য উদয় হইবার সঙ্গে সঙ্গে কাহারও সৌভাগ্য শশী উদয় হইয়া ক্রমে ক্রমে উচ্চ হইতে উচ্চতম সোপানে আরোহণ করিতেছে, আবার অস্ত যাইবার সঙ্গে সঙ্গে কাহারও দুর্ভাগ্য নিশি প্রকাশিত হইয়া গাঢ় হইতে গাঢ়তর তিমিরে আচ্ছন্ন হইতেছে। কিন্তু হায়! এই উদয় হওয়া, ও অস্ত যাওয়াতে কেহ কি কখন ব্যাঘাত দেখিয়াছেন? কেহ

কি কোন তারতম্য লক্ষ্য করিয়াছেন? কেহ সূর্য্য তাপে দগ্ধীভূত হইয়া, যাতনায় অস্থির হইয়া. প্রিয় সম্মিলনের পথ তাকাইয়া কতই কাতর হইতেছেন, বিনয় বচনে বিনীত ভাবে সূর্য্যকে অস্ত যাইবার জন্য বারম্বার মিনতি করিতেছেন। আবার কেহ এখনও তাঁহার কর্ত্তব্য কাজ সমাধা করিতে পারেন নাই। এখনও গন্তব্য স্থানে পৌছিতে পারেন নাই শীঘ্র শীঘ্র পথ হাটিয়াও পৌছিতে পারিতেছেন না; সূর্য্য থাকিতে থাকিতে কোন সুসংবাদ আসিবার আশা আছে; বারম্বার সূর্য্য পানে তাকাইয়া অস্ত যাইতে কাতর স্বরে নিষেধ করিতেছেন।

নানা প্রকার মানসিক ও শারীরিক যাতনায় অস্থির হইয়া, নিদ্রা হইতেছে না, শয্যা বিষবৎ বোধ হইতেছে, প্রভাত হইলে সকল প্রকার যাতনার অনেক লাঘব হইতে পারে, কোন প্রকার সুফল ফলিতে পারে নিশির নিস্তব্ধতা রাক্ষসীর মত ভয়ঙ্কর মুখ-ব্যাদান করিয়া গ্রাস করিতে আসিতেছে, নিশাচর পক্ষিগণের বিকট শব্দে ভয় প্রাপ্ত হইতেছেন, হৃদয় দুর দুর করিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছে ভয়ে প্রাণ শুকাইয়া যাইতেছে; কিছুই ভাল লাগিতেছে না; চন্দ্রের সুবিমল জ্যোৎস্না রাশি বৃশ্চিকবৎ দংশন করিতেছে; কত প্রকার কত চিন্তা মনে উদিত হইয়া অকূল সাগরে ভাসমান করিতেছে, কষ্টে, যাতনায়, চিন্তায়, অস্থির হইয়া সূর্য্য উঠিবার জন্য বারম্বার কাতর স্বরে প্রার্থনা করিতেছেন; আবার অপর দিকে কেহ সমস্ত দিন কঠিন পরিশ্রম করিয়া শান্তির ক্রোড়ে সুখের ঘুম ঘুমাইতেছেন, সমস্ত দিবস মানসিক ও শারীরিক পরিশ্রমে ক্লান্ত হইয়া সংসার সমুদ্রের তরঙ্গ মালার ঘাত প্রতিঘাতে জর্জ্জরীভূত হইয়া নিদ্রাদেবীর শান্তি সুখ অনুভব করিতেছেন। প্রভাত হইবার ভয়ে বারম্বার আকাশ পানে তাকাইয়া দেখিতেছেন, কখন কোন শব্দে পক্ষীর কলরব ভাবিয়া হঠাৎ চমকিয়া উঠিতেছেন। আবার কেহ—রজনীর নিস্তব্ধতা সুখ অনুভব করিয়া চন্দ্রের জ্যোৎস্না সুধা ভোগ করিয়া নিজের ভাবে নিজেই মাতোয়ারা হইয়া আনন্দ সুখ ভোগ করিতেছেন। প্রার্থনা করিতেছেন, হে দুঃখ নাশিনী সন্তাপ হারিণী নিশা দেবি! এখন প্রভাত হইও না, হে সুবিমল সুধা প্রদায়ী, মানব হৃদয়ে আনন্দ লহরী প্রবাহী চন্দ্র, এখন অস্ত যাইও না! কিন্তু হায়! প্রকৃতি দেবী কাহারও প্রতি না তাকাইয়া নিজের মনে এক ভাবে সংসারক্ষেত্র অতিক্রম করিয়া চলিয়া যাইতেছে, এবং সঙ্গে সঙ্গে মাস বৎসর দিন, একের পর এক করিয়া গত হইয়া যাইতেছে। জীবনও ক্রমান্বয়ে দুঃখে হউক, সুখে হউক চলিয়াই যাইতেছে। আজ যাহাকে শিশু দেখিতেছি কাল তাহাকে বালক এবং পরে বৃদ্ধ দেখিতে পাওয়া যায়। আজ যে ধনমদে মত্ত, কাল সে পথের ভিখারী। আজ যে যৌবন গৌরবে গৌরবান্বিত কাল সে বার্দ্ধক্যের কালগ্রাসে পতিত। আজ যে আনন্দে উন্মত্ত হইয়া হাসির লহরী তুলিয়াছে, পরক্ষণেই তাহাকে দুঃখে অধীর হইয়া ক্রন্দন করিতে হইবে। যখন এই মুহূর্ত্তে যাহা ছিল পর মুহূর্ত্তে তাহা থাকে না, যে সেকেণ্ড যে মিনিট যে ঘণ্টা যে দিন আজ যাহা ছিল কাল তাহা থাকে না, তখন নিশ্চয়ই মানবের অবস্থাতেও এখন যাহা আছে পর মুহূর্ত্তে তাহা থাকিবে না সুতরাং "সকল দিন সকলের সমান যায় না!"

এই যে দিন, হতেছে গত মিনিট সেকেণ্ডে।
এই যে জীবন, চলেছে ভেসে, পলকে পলকে॥

এই যে উদিত রবি, উজ্জ্বল কিরণ।
এই যে অস্তমিত হয় লোহিত বরণ॥
এই যে উঠিয়া শশি, জগৎ মাতায়।
এই যে জোৎস্না রাশি জগতে ছড়ায়॥
হতেছে কেহ বা সুখী সংসার মাঝার।
কেহ বা দিতেছে সুখের সাঁতার॥
হায়! কেহ বা কাঁদিয়া হতেছে আকুল।
হায়! কেহ বা দুঃখেতে হইয়া ব্যাকুল।
ছাড়িয়া সকল আশা, সকল ভরসা।
করিল জীবন ত্যাগ! না পূরিল আশা।
হইয়া হতাশ, কেহ জীবনের আশে।
চলিল প্রবাসে ঐ কান্দিতে কান্দিতে॥
কেহ বা প্রবাস হইতে ফিরিয়া আইল।
দেখিয়া আত্মীয়ের মুখ সকলি ভুলিল॥
কেহ বা মুমূর্ষ প্রায় এখন তখন।
কেহ বা আনন্দে মত্ত আছে অচেতন॥
দিবা রাত্রি সম ভাবে চলিয়া যে যায়।
চন্দ্র সূর্য্য সম ভাবে হতেছে উদয়॥
কিন্তু সবার ভাগ্যে সমান না হয়।
এইত নিয়ম দেখি হায়! হায়!! হায়!!!

শ্রীআয়সা খাতুন

জীবন-সংগ্রাম।

(ভারত-মহিলাসমিতিতে পঠিত)

মানবজীবন সংগ্রামময়; এই সংগ্রামকে তিন ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে যথা—রাজকীয় সংগ্রাম, আধ্যাত্মিক সংগ্রাম, জীবিকা উপার্জ্জনের সংগ্রাম।

রাজকীয় যুদ্ধ ব্যাপারের বিষয় অনুসন্ধান করিলে দেখা যায়, যাহারা শারীরিক বল বিক্রমে, শৌর্য্যবীর্য্যে পরিপূর্ণ, তাহারাই সংগ্রামে জয়লাভ করে। ভীরু কাপুরুষ যাহারা, তাহারাই পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিয়া থাকে। অনেক সময় আমরা কত বীরপুরুষের অপূর্ব্ব বীরত্বকাহিনী পূর্ণ, আত্মোৎসর্গের ব্যাপার পাঠ করিয়া বিস্ময়রসে নিমগ্ন হই। বীরশ্রেষ্ঠ নেলসনের অসাধারণ বীরত্বকাহিনী পাঠ করিয়া কাহার হৃদয়ে না স্বদেশানুরাগ প্রজ্জলিত হইয়া উঠে। যখন কামানের গোলা, তাঁহার সেই সুবিস্তৃত বক্ষঃস্থল ভেদ করিয়া শোণিত স্রোত প্রবাহিত করিয়া অসহ্য যন্ত্রণা প্রদান করিতেছিল, অতি শ্রেষ্ঠ চিকিৎসকও সেই ক্ষত যন্ত্রণার কোনও প্রতিকার করিতে পারিলেন না, ক্রমশঃ যন্ত্রণার পরিণাম অতি ভীষণ ভাব ধারণ করিতে লাগিল, এখন মৃত্যু অতি সুখের অবস্থা বলিয়া প্রতীয়মান হওয়াই স্বাভাবিক কিন্তু সেই তীব্র যাতনার মুহূর্ত্তেও সেই স্বদেশানুরাগী যুবকের মুখ হইতে কি বীরত্ব গর্ব্ব পূর্ণ বাক্যাবলী নিসৃত হইয়াছিল, তাহা উদ্ধৃত করিতেছি “আমি এত অসহ্য যন্ত্রণা সহ্য করিয়া আরোও কয়েক ঘণ্টা জীবিত থাকিতে চাই, কারণ আমার প্রিয় জন্মভূমি পরঅধীনতাপাশ হইতে মুক্ত হইয়া স্বাধীনতা লাভ করিয়াছে, এই শুভ সংবাদ শ্রবণ করিয়া হাসিতে হাসিতে অনন্তধামে চলিয়া যাইব” ধন্য বীরত্ব! ধন্য স্বদেশানুরাগ!!

সম্প্রতি বুয়ার যুদ্ধে এইরূপ কত কত বীরের বীরত্ব কাহিনী পাঠ করিয়া আমরা আশ্চর্য্যে স্তব্ধ হইয়াছি।

মনোরাজ্যেও এইরূপ অবিরত সংগ্রাম-

স্রোত চলিতেছে। আধ্যাত্মিক বলে বলীয়ান ব্যক্তিরাই এরূপ সংগ্রামে জয়লাভ করিয়া থাকেন। তাঁহাদিগের বীরত্ব গাথা, রাজকীয় যুদ্ধ সম্বন্ধীয় বীরত্ব কাহিনী হইতেও অদ্ভুত ও বিস্ময়োৎপাদনকারী। রাজ্য লইয়া যে সংগ্রাম সূচিত হয়, তাহা মনুষ্যশোণিতে প্লাবনিত হয় মাত্র এবং কয়েক মুহূর্ত্তের যন্ত্রণাতে, প্রত্যেককে শমনসদনে প্রেরণ করিয়া, তাহার সমস্ত যন্ত্রণা বিদূরিত করে। কিন্তু মনুষ্য হৃদয়ে, পাপ প্রলোভনের সহিত সংগ্রাম ন্যায় অন্যায়ের সংগ্রাম, শোক তাপ, দুঃখ দারিদ্র্যের যে সংগ্রাম অহরহ প্রবাহিত হইতেছে, তাহা যোদ্ধৃ-হৃদয়শোণিত-রঞ্জিত, ইতিহাস পৃষ্ঠায় লিখিত, বীর পুঙ্গবের জীবনকাহিনী অপেক্ষা শঙ্কটাপন্ন, যাতনাপূর্ণ ও বিভীষিকা পূর্ণ। যখন বীরশ্রেষ্ঠ যীশুকে, ইহুদিরা মিলিয়া, নিদারুণ যন্ত্রণা প্রদান করিয়া অল্পে অল্পে হত্যা করিয়াছিল, তখন সেই বীরহৃদয় হইতে কি অকথিত বাণীই উচ্চারিত হইয়াছিল "পিত! ইহাদিগকে ক্ষমা কর, ইহারা জানে না কি করিতেছে!" অতুলনীয় বীরত্ব! এ বীরত্বের নিকট সব হা'র মানিয়া যায়!

মহাত্মা শাক্যসিংহ, শ্রীচৈতন্য, নিত্যানন্দ, গুরুনানক প্রভৃতি, ধর্ম্মরাজ্যের যোদ্ধাগণ, যে বিজয় নিশান উড্ডীন করিয়া গিয়াছেন, তাহা চিরদিন সেই সকল বীরকুমারগণের অমর কীর্ত্তিরূপে জগতে শ্রান্ত ক্লান্ত পাপভারে ভারাক্রান্ত হৃদয়ের ভার লঘু করিয়া দিবে। যে অতুল বিভবপূর্ণ সাম্রাজ্য লাভ করিতে ঘোরতর নিষ্ঠুরতা পূর্ণ যুদ্ধ ব্যাপার সংঘটিত হইয়া থাকে, যাহা লাভ করিতে কত রক্তপাত, কত পৈশাচিক কাণ্ডের অভিনয় করিতে মানব সঙ্কুচিত হয় না, সেই ষড়ৈশ্বর্য্যশালিনী, সাম্রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া মানবের মুক্তিতত্ত্ব আবিষ্কার করিবার জন্য, ফকির বেশ ধারণ করিলেন এ কি কম বীরত্ব! প্রেমিক প্রধান শ্রীচৈতন্য, মানব যে ভোগবিলাসে মত্ত হইয়া অসীম আনন্দ প্রাপ্ত হয় সেই ইন্দ্রিয় তৃপ্তিকর সুখে জলাঞ্জলি দিয়া, পুত্রবৎসলা মাতা ও স্নেহময়ী পত্নীর হৃদয়ে বিষম শেলাঘাত করিয়া সন্ন্যাসী বেশে ক্লেশ ভোগ করিয়া নগরে নগরে ভ্রমণ করিতেন, সে প্রেমপূর্ণ বীরত্বের ছবি দেখিয়া পাষাণও বিগলিত হইত। গুরুগোবিন্দ প্রমুখ অসাধারণ বীরগণের কাহিনী ইন্দ্রজালের অপেক্ষাও বিস্ময়কারী। অসংখ্য শিখধর্ম্মবীরগণ, অকাতরে জীবন বিসর্জ্জন দিয়া বলিয়াছিলেন "শির দিয়া, শের নেহি দিয়া" অর্থাৎ মস্তক দিয়াছি কিন্তু ধর্ম্ম বিশ্বাস বিসর্জ্জন দিই নাই। রামমোহন রায়, ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রভৃতি মহাত্মাগণ কর্ম্মবীর ছিলেন। মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়, সামাজিক বিবিধ প্রকার পাপ ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে, কিরূপ সংগ্রামানল প্রজ্জ্বলিত করিয়াছিলেন তাহা সকলেই অবগত আছেন। অবশেষে এই মহাবীর এদেশে কোনও প্রতিকারের উপায় করিতে না পারিয়া, আত্মীয়স্বজন পরিত্যাগ পূর্ব্বক অতুল সাহসে, ইংলণ্ড ভূমি গমন করিয়া বিজাতীয় গণের মধ্যে জীবনের শেষ বায়ু পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। এই অসাধারণ বীরপুরুষের জীবনের কার্য্যাবলী যখন পাঠ করি, প্রাণে আগ্নেয় গিরির অগ্নি স্রোতের তরঙ্গাঘাত অনুভব করি।

মহাবীর ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগরের, মহাপ্রাণতা আমাদিগের জাতীয় জীবনের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে।

বালবিধবার বিবাহ প্রচলন, বাল্যবিবাহ নিবারণ, স্ত্রীশিক্ষা প্রচলন, প্রভৃতি শুভ কার্য্যের সূচনা, তাঁহার তেজো গর্ব্ব বীরত্বের পরিচায়ক।

বালবিধবাগণের দুঃখদুর্গতি দূর করিবার জন্য, তাঁহাকে বিন্দু বিন্দু করিয়া হৃদয় শোণিত দান করিতে হইয়াছিল। এক একটি বিধবা বিবাহ দিতে, তাঁহাকে যে প্রকার অপমান ও নির্যাতন সহ্য করিতে হইয়াছিল, তাহা স্মরণ করিলে প্রাণে গভীর ক্ষোভের সঞ্চার হয়। এই সকল কার্য্যে সময় সময় এত শারীরিক ক্লেশ ও পরিশ্রম স্বীকার করিতে হইত, যে তাহাতেই তাঁহার স্বাস্থ্য ভঙ্গ হইয়া গিয়াছিল। বলিতে কি, এই কার্য্যের জন্য তিনি জীবন পাত করিয়া গিয়াছেন।

আমাদিগের জাতীয় জীবনের এই শোচনীয় দিনে প্রত্যেক ভারতবাসীর এই পথের অনুসরণ করা কর্ত্তব্য। পাপ প্রলোভনের ভীষণ বাণ প্রবাহিত হউক, আমরা যেন চরিত্ররূপ অটল দুর্গে দাঁড়াইয়া সহস্র অত্যাচার নির্যাতন সহ্য করিতে পারি। দুঃখ, দরিদ্রতা, বিপদ, রোগ ও শোকের ভীষণ ঘোরান্ধকার আসিয়া জীবনাকাশ আচ্ছাদিত করিয়া ফেলুক তখনও যেন জীবনের নিয়ন্তার উপর সন্দিহান না হই। জনসমাজের কল্যাণের জন্য, যদি সকল স্বার্থ বলিদান করিতে হয়, যদি হৃদয়ের অতি প্রিয়তম বস্তুও বিসর্জ্জন দিতে হয়, হৃদয়গ্রন্থিসমূহ ছিন্ন হইয়া রুধির ধারা বহির্গত হয় অসহনীয় যন্ত্রণা ও মর্ম্ম জ্বালায় পুড়িয়া মরিতেও হয়, তথাপি যেন বলিতে পারি "পরের কারণে মরণেও সুখ, আপনার কথা ভুলিয়া যাও" —"আলো ও ছায়া"

পরীক্ষা প্রলোভনের হস্তে পড়িয়া যিনি জয় লাভ করিতে পারেন তাঁহার বীরত্ব অতুলনীয়। পরীক্ষার কষ্টি প্রস্তরে কাহার কতখানি আধ্যাত্মিক বল আছে, তাহার পরিমাণ করিতে পারা যায়। ভারতনারীগণের বরণীয়া সীতা দেবীর চরিত্রের বল এইরূপেই পরীক্ষিত হইয়াছিল। অশোক কাননে অসীম পরাক্রমশালী, অতুল বৈভবের অধিপতি, রাবণ রাজা কুবেরের ভাণ্ডার তাঁহার চরণ তলে নিবেদন করিয়া, কত প্রকার স্তুতি মিনতিতে, তাঁহাকে প্রলোভিত করিতে চেষ্টা করিয়াছিল কিন্তু তাঁহার চরিত্রের অপূর্ব্ব তেজ, সেই বীর্য্যশালী প্রকাণ্ড দানবকে পরাভূত করিয়া, জগতের সমক্ষে এক মহান চিত্রপট উন্মোচিত করিয়া রাখিয়াছে। পরম পিতা পরমেশ্বর আশীর্ব্বাদ করুন, ভারত আবার যেন এইরূপ বীরাঙ্গনা দ্বারা শোভিত হইয়া সভ্য জগতকে চকিত ও স্তম্ভিত করিতে পারে।

সর্ব্বশেষে একটি অত্যাবশ্যকীয় বিষয়ের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতেছি—তাহা আর্থিক সংগ্রাম। ভারতবাসী যত দরিদ্র, তাহার তুলনায় অন্যান্য জাতি অর্থবলে বহুল উন্নতি সাধন করিয়া, জাতিগত পুষ্টি সাধন করিতেছে। যে জাপানবাসী, কয়েক বৎসর পূর্ব্বে অসভ্য, সামান্য জাতি রূপে পরিগণিত হইয়া আসিতেছিল, তাহারাই এক্ষণে অর্থ উপার্জ্জনের বিবিধ উপায় আবিস্কার করিয়া দ্রুতবেগে উন্নতির পথে ধাবমান হইতেছে। আর বাঙ্গালী—তাহাদিগের দুঃখ দুর্গতির বিষয় চিন্তা করিলে ম্রিয়মাণ হইতে হয়। তাহারা কেবল অকালে এক একটা বৃহৎ পরিবারের জনয়িতা হইয়া সামান্য, মানসিক শ্রমলব্ধ কয়েকটি অর্থের দ্বারা

স্বীয় স্বীয় পরিবারের ভরণ পোষণ করিতে পারিলে আর কিছু চান না। কেহ, স্বদেশ বা সমাজের দুর্গতি, চিন্তা করিয়া দেখিবার অবসর পান না, প্রত্যুত, কোনও দুর্নীতি বা অত্যাচার দমনের নামে, তাঁহারা শত হস্ত দূরে পলায়ন করেন। সামাজিক কোনও পরিবর্ত্তন বা কোনও উন্নতির চিন্তা তাঁহাদিগের চিন্তা বিহীন মস্তিষ্কগহ্বরে প্রবেশ লাভ করে না। এরূপ অলস কার্য্যবিমুখ যে জাতি দিন দিন দুর্গতির নিম্নতম স্তরে নিক্ষিপ্ত হইবে তাহাতে আর সন্দেহ কি?

এই শস্যশ্যামলা ভারত ভূমির অসাধারণ উৎপাদিকা শক্তি আছে কিন্তু কয়জন শিক্ষিত বঙ্গবাসী তাহার উন্নতি সাধন দ্বারা অর্থাগমের উপায় লাভ করিতে প্রস্তুত? অনেক সময় শিক্ষাভিমানী ব্যক্তিগণ এরূপ কার্য্যকে হেয় জ্ঞানে পরিহার করিয়া থাকেন।

বাঙ্গালীর প্রধান কলঙ্ক অলসতা—। জগতে যত জাতি উন্নতি শিখরে উত্থিত হইয়াছে, তাঁহারা সকলেই কার্য্য শীল জাতি। বাঙ্গালী সঙ্কল্প করিতে জানে কিন্তু তাহা কার্য্যে পরিণত করিতে পারে না, প্রতিজ্ঞা করিতে তৎপর কিন্তু প্রতিজ্ঞা পালনে শিথিল প্রযত্ন। যদি প্রত্যেক বঙ্গবাসী, প্রতিজ্ঞা পূর্ব্বক, কায়মনোবাক্যে, স্বীয় সমাজের, অশেষ দুঃখ দুর্নীতি ও অত্যাচার প্রশমন কল্পে খাটিতে শিক্ষা করে, তবে বঙ্গবাসীর অস্তমিত সৌভাগ্য সূর্য্যের পুনরুদয় হইবে সন্দেহ নাই!! যে দেশে রামচন্দ্রের ন্যায়, প্রতিজ্ঞা রক্ষণ শীল, অসাধারণ পুরুষের কীর্ত্তিগাথা গৃহে গৃহে পঠিত হয়, সেই জাতিই প্রতিজ্ঞা পালনে, পরাঙ্মুখ ইহা অপেক্ষা ক্ষোভের বিষয় আর কি হইতে পারে?

র উন্নতির আর এক প্রধান অন্তরায় —স্ত্রীজাতির অধোগতি। সত্যবটে বাঙ্গালী রমণী, স্নেহ প্রেম দয়া দাক্ষিণ্যাদি হৃদয়ের শ্রেষ্ঠ বৃত্তিসমূহের অধিকারিণী কিন্তু তাহার সম্যক বিকাশের উপায় না থাকাতে, তাঁহারা অতি হীন ভাবে সামান্য গৃহ পরিবারের কতকগুলি অঙ্গহীন কর্ত্তব্য সাধন করিয়া পশুর ন্যায়, আহার নিদ্রাতে জীবনের দিনগুলি অতিবাহিত করেন।

বাঙ্গালীর উন্নতির অন্তরায়, অনেক সময় বঙ্গকুললক্ষ্মীগণ। হয়ত কোনও বীর-হৃদয় বঙ্গবাসী স্বকীয় বিধবা বালিকা কন্যার বিবাহ দিতে সঙ্কল্প করিলেন কিন্তু পত্নীর অশ্রুজলে তাঁহার সে সঙ্কল্প কোথায় ভাসিয়া গেল!! অথবা কেহ হয়ত, পুত্রকন্যাদের যৌবন বিবাহ অন্তরের সহিত অনুমোদন করেন এবং নিজ পুত্র কন্যার বিবাহ বিষয়ে তদনুযায়ী কার্য্য করিবার ইচ্ছা প্রবল সত্ত্বেও স্ত্রী এবং আত্মীয়গণের কাতর অনুরোধ, তাঁহার কর্ত্তব্য পথে প্রচুর বিঘ্ন স্বরূপ উপস্থিত হইয়া থাকে। প্রকৃত শিক্ষার আলোক বঙ্গনারী-গণের হৃদয় ভূমি আলোকিত করিয়া কুসংস্কারান্ধকার রাশি অপসারিত করিয়া না দিলে বঙ্গরমণীগণ, শক্তিরূপিণী রূপে বঙ্গীয় পুরুষের পার্শ্বে না দাঁড়াইলে, রমণী শক্তি জাগ্রত না হইলে, বাঙ্গালীর এই শতাব্দী গত, দাসত্ব শৃঙ্খলে আবদ্ধ প্রাণ কিছুতেই জাগিয়া উঠিবে না।

"তোরা না করিলে এ মহা সাধনা"
এ ভারত আর জাগে না জাগে না"

কবির এই আহ্বান গীতি প্রত্যেক অক্ষরে সত্য, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। তাই বঙ্গীয় সমাজের নেতাগণের নিকট এই নিবেদন, তাঁহারা যেন জাতিগত বা সম্প্রদায়

গত বিদ্বেষ ভুলিয়া, রমণীজাতি যাহাতে প্রকৃত পক্ষে, ধর্ম্মে, কর্ম্মে, জ্ঞানে, তাঁহাদিগের সহকারিণী হইতে পারে তাহার উপায় বিধান করেন। আর যেন তাহারা পুরুষজাতির কেবলমাত্র ক্রীড়া পুত্তলিরূপে ব্যবহৃত না হন। "বাঙ্গালীর মেয়ে" এই খেদোক্তি ঘুচিয়া যাউক বঙ্গরমণী জ্ঞানে, ধর্ম্মে, বীরত্বে পূর্ণ হইয়া আবার যেন ভারতে সত্যযুগের অবতারণা করিতে পারেন। ভারত, অশেষ প্রকার হীনতা এবং জড়তার পাশ হইতে বিমুক্ত হইয়া জগতে শীঘ্র উন্নত স্থান অধিকার করুক।

শ্রীবসন্ত কুমারী বসু।

রন্ধন

খৈয়ের মুড়কী ও মুড়কীর মোয়া।—লৌহের কিম্বা পিতলের একটি পাত্রে পরিষ্কার গুড় উঠাইয়া অল্প জল দিয়া জ্বাল দিতে হয়। জ্বাল দিতে দিতে গুড় থক থকে হইয়া আসিবে। এদিকে কতকগুলি খৈ একটী ডালি কিম্বা ঝাঁকায় রাখ। তারপর একজনে ঐ থক থকে গুড় বেড়ীর দ্বারা ধরিয়া খৈয়ের ভিতর দাও একজন খৈগুলি বেশ করিয়া একটি খুন্তির দ্বারা নাড়িতে থাক। বেশ সাবধান হইয়া নাড়বে যেন হাতে গরম গুড় না পড়ে। খৈ এমন ভাবে নাড়বে যেন সবগুলি খৈয়ে গুড় মাখান হয়। তারপর খুন্তি রাখিয়া হাতে তেল মাখ এবং সবগুলি মুড়কী উপর নীচ করিয়া দেও। এই হইল মুড়কি। এই মুড়কীতে বড় বড় নাড়ু পাকাইলেই মুড়কীর মোয়া হইল।

খৈভাজা। কনকচুড় ধানই খৈ ভাজার জন্য প্রসিদ্ধ। ঐ ধান একদিন রৌদ্রে শুকাইয়া লইতে হয়। তারপর একটি কড়াই কিম্বা একটি হাড়ীর গলা ও পেট অবধি ভাঙ্গিয়া "খোলা" প্রস্তুত করিয়া লও তৎপর সেই খোলা জলন্ত অগ্নিতে চড়াও এবং তাহাতে অনেকগুলি শুক্‌নো বালি দাও। তারপর নিজে উননের সাম্‌নে বসিয়া বাম হস্তে মুঠা মুঠা ধান সেই তপ্ত বালিতে দিতে থাক আর দক্ষিণ হস্তে কুচী (যাহা দ্বারা নারীকেলের ঝাটা হয়, কুচী তাহাতেই হয়, নারিকেলের ডাটা শুকাইয়া ছোট ছোট করিয়া লইলেই কুচী হইল।) দ্বারা ঘন ঘন নাড়াতে থাক। নাড়াটা খুব সমান ভাবে হওয়া উচিত, কুচী ধরার একটি কৌশল আছে। এমন ভাবে কুচী ধরিতে হইবে যে কুচী গুলি হাতের মধ্যে একত্র জমা হইয়া না যায়। কুচী গুলি হাতের মধ্যেই বেশ ছড়াইয়া থাকিবে। ঘন ঘন নাড়িতে থাক, অল্পক্ষণ পরে চটা পট চটা পট শব্দে ধান গুলি ফুটিয়া খৈ হইবে এবং খোলা ভরিয়া যাইবে, পরে ঐ কুচী দ্বারা বেশ পরিষ্কার করিয়া খৈ গুলি নামাও। বালিতে যেন রহিয়া না যায় তাহইলে পুড়িয়া যাইবে। সমস্ত খৈ নামানো হইলে বামহস্ত দ্বারা আর এক মুঠো ধান দাও ও একরূপ নাড়িতে থাক।

এইরূপ করিতে করিতেই সমুদয় ধান

শেষ হইবে এবং খৈও প্রচুর পরিমাণে ভাজা হইবে। তারপর খৈ চালিতে হইবে, বাজারে "খৈ চালা" কিনিতে পাওয়া যায়, বড় ঝাকার ন্যায় এবং তাহাতে শত ছিদ্র বর্ত্তমান আছে। নীচে চারিটা পায়া আছে, তাহা দ্বারা তাহারা মাটিতে উঁচু হইয়া বসে। খৈগুলি সেই খৈচালাতে দাও এবং ক্ষিপ্র হস্তে অনবরত নাড়িতে থাক। সমুদয় ধান খৈ হইতে মুক্ত হইয়া নীচে পতিত হইবে। তার পরই "খৈ বাছা"। খৈ চালা হইলেও সমুদয় ধান পড়ে না, দুদশটি রহিয়াই যায়। একটি মাদুর বা পাটী বা কাপড় কি বড় ডালার উপরে সেই খৈ ঢালিয়া চাউল বাছার মত করিয়া খৈ বাছ। খৈ বাছা হইলে আহারের উপযোগী হইল।

মুড়ীভাজা। মুড়ী ভাজিতে হইলে অগ্রে চাউল প্রস্তত করিয়া লইতে হয়। মুড়ীর ধান কিনিতেও পাওয়া যায়, জোড়া দুইটি উননে মুড়ী ভাজিতে হয়। এক উননে একটি বড় হাঁড়ীতে বালি তুলিয়া দিতে হয়। আর এক উননে চাউল তুলিয়া দিতে হয়। বালি আপনা আপনি গরম হয়, চাউল কুচী দ্বারা অনবরত নাড়িতে হয়, চাউল গরম হইলেই নুনজল দিতে হয়। মুড়ী ভাজিবার সময়ই খানিকটা লবণের সহিত জল মিশাইয়া লইতে হয়। চাউল গরম হইলেই ঝিনুক অথবা ছোট বাটী করিয়া চাউলে ঢালিয়া দিতে হয়। লবণজল দিলেই চাউল ভিজিয়া জমা হইয়া যায়, নাড়িতে নাড়িতে পুনরায় চাউল জল গরম হইয়া ঝর ঝরে হইয়া উঠে, ওদিকে বালিও বেশ গরম হয়। এক খানা খড়ি দ্বারা বালি নাড়িয়া তুলিয়া দেখিতে হয়। বালি সম্পূর্ণ গরম হইলে ঐ খড়ির অগ্রভাগ-দিয়া ষ্টীমারের ধূমবৎ গভীর কালোধুঁয়া বাহির হয়। বালি ঠিক হইলে ঐ চাউল সেই গরম বালির ভিতরে ঢালিয়া দাও এবং দুই হস্তে দুই খানি ছালা খণ্ড লইয়া ঐ দুই হাতে হাঁড়ীর নীচে ধর এবং দাঁড়াইয়া হাড়ীটি জোরে ঝাঁকিতে থাক কুলকুল শব্দ করিতে করিতে চাউল গুলি ফুটিয়া মুড়ী হইবে। অমনি ক্ষিপ্রহস্তে সম্মুখস্থ "ঝাঁজুর" "ছাপ্‌নায়" ঢালিয়া ফেল। ঢালিতে আরম্ভ করা মাত্র অপর একজনের সেই গরম বালি শুদ্ধ মুড়ী গুলি ঘন ঘন নাড়িয়া লইতে হইবে। যিনি নাড়িবেন, তাহাকে একটু সতর্ক হইতে হইবে। কারণ যিনি ঢালিতে থাকিবেন, তাহার তখন অন্য মনস্ক হওয়াই সম্ভব।

শ্রীঅম্বুজাসুন্দরী দাস গুপ্ত।

কবিতা।

পূর্ণিমার চাঁদ।

উদয় হল পূর্ণচন্দ্র আলোকি গগন,
ধরাধর হাসে যেন মাখিয়া কিরণ,
লজ্জায় তারকারাজি,
ম্রিয়মাণ ভাবে আজি,
ভাবিছে কোথায় হায় লুকাব বদন,
চাঁদ হ'তে হীন মোরা বৃথাই জীবন।
হাসিল সরসী বুকে কুমুদিনী সতী,
আহা কি সুন্দর শোভা মনোহর অতি,
চাঁদের কিরণ মেখে,
হাসে বালা মন সুখে,

হেলিতেছে দুলিতেছে হয়ে আমোদিনী।
আহা কি সুন্দর মরি রাঙ্গা মুখ খানি॥
মনোহর রূপে আলো করে শশধর,
মাখিয়া চাঁদের কর সকলি সুন্দর,
অপূর্ব্ব রূপের ছটা,
নাশোগো তিমির ঘটা,
তাতে কি চাঁদের স্বার্থ আছে কিছু জান?
নিঃস্বার্থ পরোপকার তাকি তুমি জান?
বল তুমি নিস্বার্থ পরোপকার নাই,
সত্য করে বল দেখি আছে কিনা ভাই,
হও পর উপকারী,
সুশীল বলিয়া চারী,
যত্ন করি ছয় রিপু দাও বিসর্জ্জন,
লভিবে অক্ষয় যশ অমূল্য রতন।
এ হতে কি আছে বল আমাদের আর।
আমরা যেগো সন্তান ভারত মাতার॥
যেয়োনা বঙ্কিম পথে,
নানা বিঘ্ন আছে তাতে,
বিষম পঙ্কিল পথ, বিপদের ভারি।
উগারে গরল রাশি "পাপ" ফণা ধরি॥
সত্য পথের পথিক তুমি হও ভাই,
দেখিবে কোথায় কোন শোক তাপ নাই,
দূর কর কুমতিরে,
হৃদে রাখ সুমতিরে,
গুরু জনে তোষ সদা বিনয় বচনে,
রাখিও করুণাদৃষ্টি প্রতিবাসী গণে॥
ধনগর্ব্বে কভু যেন হ'য়োনা গর্ব্বিত।
মানী জনে মান জানে এ কথা নিশ্চিত॥
অতিথি আইলে দ্বারে,
কভু ফিরায়ো না তারে,
যথা সাধ্য অতিথির করিও আদর।
অবশ্য মঙ্গল তাতে হইবে তোমার॥
কি সাধ্য আমার আছে উপদেশ দিই,
মনে এ'ল বলিলাম কথা গোটা দুই,
কত ভুল আছে মূলে,
ক্ষমা দিয়ো বোন বলে,
ঘুচিবে বাঁদের শোভা উদিলে তপন,
চল সবে পূর্ণ চন্দ্র কার দরশন॥

শ্রীমোহিত কুমারী দেবী।

কে তুমি আমার?

(১)

কে তুমি আমার বল কে তুমি আমার?
যাহা লাগি নিশি দিন,
কাঁদিয়ে কাঁদিয়ে ক্ষীণ,
যাহা লাগি নিশিদিন ফেলি অশ্রুধার।

(২)

কে তুমি আমার বল কে তুমি আমার?
দেশে দেশে যার লাগি,
কাঁদিয়ে ফুলাই আঁখি,
নাহি পারি উত্তরিতে ভব-পারাবার।

(৩)

কে তুমি আমার বল কে তুমি আমার?
হেরি তোমা মাঝে মাঝে,
নিত্য নব নব সাজে,
ধরি বারে নাহি পারি কাঁদি অনিবার।

(৪)

কে তুমি আমার বল কে তুমি আমার?
সখা বলে যবে ডাকি,
নাচে গায় প্রাণ পাখী,
ইচ্ছা হয় তব মুখ হেরি অনিবার।

(৫)

কে তুমি আমার বল কে তুমি আমার?
যবে ডাকি মা, মা বলে,
স্নেহে লও কোলে তুলে,
ভক্তির ফোয়ারা ছুটে হৃদয়ে আমার।

(৬)

কে তুমি আমার বল কে তুমি আমার ?
জনকের স্নেহে মোরে,
পালিছ হৃদয়ে ধরে,
যাহা চাই তাহা দেও, কি স্নেহ তোমার !

(৭)

চিনিতে নারি গো দেব ! কে তুমি আমার
বিস্ময়ে নয়ন হারা,
দেও নাথ ! দেও সাড়া,
বলিয়া দেওগো নাথ ! নিবাস তোমার।

(৮)

'কে তুমি আমার' সদা ভাবি এ মানসে,
ক্ষণে কাঁদি ক্ষণে হাসি,
কভু গাই কভু নাচি,
"শান্তি-সমীরণ বহে অন্তর-আকাশে।"

(৯)

দু'হাতে দু'পায়ে দেব ! কঠোর বন্ধন,
না পারি ছিঁড়িতে বাঁধ,
কেমন পেতেছ ফাঁদ,
আপনি আপনি ঢাকি ঠুলিতে নয়ন।

(১০)

খুলে দেও হৃদি ধন ! ঠুলি নয়নের,
হেরিয়ে অভয় পদ,
জুড়াই তাপিত বুক,
চিনে নেই দেখে নেই 'কে তুমি আমার'।

শ্রীসৌদামিনী বসু।

কনিষ্ঠ ভ্রাতা অমিয়ের প্রমোসন

হাসিতে হাসিতে, নাচিতে নাচিতে
প্রাণ সম ভাই অমিয় আমার,
আসিল ছুটীয়া, সংবাদ লইয়া
প্রমোসন সে যে পেয়েছে এবার।

নয় বছরের অবোধ সে শিশু
কোন জ্ঞান তার হয় নাই এবে
বিভু কৃপা বলে, প্রমোসন পেল
প্রশংসা তাহার করিতেছে সবে !
"শুন শুন দিদি ! সুখবর যদি
দিতে পারি বল, তুমি বা কি দিবে ?
"সেদিন যে খানা, কিনেছি আয়না
সেই খানা তুমি তা হলে পাবে।"
"প্রমোসন আমি, পেয়েছি এবার"
হাসি হাসি শিশু বলিল আমারে,
কোলে লয়ে তার, চুম্বিনু মস্তক
কুশলে রাখুন ঈশ্বর তোমারে।

কুমারী সুরুচি

সুখের মরণ *

১

দেখরে মানব ! দেখ, সুখের মরণ !
ভীষণ রোগের জ্বালা,
করেনাকো ঝালা পালা,
মহাযোগী মহাযোগে হ'লেন মগন !
কতই প্রফুল্ল মুখ,
প্রাণে ভরা কত সুখ,
স্ব শরীরে স্বর্গ ভোগ কোথায় এমন ?
চির জীবি এ ধরায়,
কেহই তো নহে হায় !
কিন্তু, কে দেখেছে কোথা এমন মরণ ?
নাহি মৃত্যু নাহি রোগ,
সাধিবারে মহাযোগ,
সাধ করে যোগী যথা মুদেন নয়ন !

* সন ১৩০৫ সাল, ১৩ই আষাঢ় রবিবার আমার পরমারাধ্য পিতৃদেব মহাশয়ের সজ্ঞানে স্বর্গারোহণ দিন স্মরণে এই কবিতা লিখিত।
লেখিকা।

দেখরে মানব ! দেখ সুখের মরণ !
আহা কি সুন্দর দৃশ্য !
ভাবেতে ভরিল বিশ্ব,
ধরাপরে অবতীর্ণ ত্রিদিব আবাস।
গাইছে প্রভাতি গীত,
পাখী সবে আনন্দিত,
হরষে বহিছে মৃদু মলয় বাতাস।

৩

দেখরে মানব ! দেখ, সুখের মরণ !
ত্যজিয়া নশ্বর দেহ,
সংসারের মায়া মোহ,
ধীরে ধীরে অমরাত্মা করিল গমন !
ভীষণ ব্যাধির জ্বালা,
করেনাকো ঝালা পালা,
মুদিলেন আঁখি দুটী সহাস্য বদন !
জনমিয়া ধরা তলে,
কোন জন কোন কালে,
সাধকরি ত্যজিয়াছে মানব জীবন ?
সুখের মরণ হেন,
দেখিয়াছে কোন্ জন ?
(ধার্ম্মিক ভীষ্মের যথা স্বেচ্ছায় মরণ !)
আহা কি সুন্দর দৃশ্য !
ভাবেতে ভরিল বিশ্ব ;
স্বর্গের উচ্ছ্বাস যেন বহিছে ভূতলে।
এমন মরণে হায় !
অমরের (ও) সাধ যায়,
সার্থক জীবন কর, নিরখি সকলে !

৪

অমর বাঞ্ছিত এই সুখের মরণ,—
দেখরে মরত বাসি !
(কিবা শান্তি কিবা হাসি)
স্ব শরীরে স্বর্গ ভোগ কোথাও এমন ?
এই দৃশ্য মনোহর,
দেখিতে না পাবে আর,
জীব লীলা সাঙ্গ করি দেবতা আমার,
চলিলেন দিব্যধামে,
আরোহিয়া স্বর্গ-যানে,
দেখিয়া সফল কর জনম সবার !

৫

দেখরে মানব ; দেখ সুখের মরণ
উঠিল গভীর রোল,
সুমধুর হরি বোল,
স্বর্গ মর্ত্ত্য একাকার নাম সংকীর্ত্তন
তার মাঝে হাসি মুখে,
দেবতা আমার সুখে,
শান্তি ময় সমাধিতে হ'লেন মগন !

৬

নামিলেন স্বর্গ হতে দেব দূতগণ ;
সমাদরে সযতনে,
তুলিলেন পুষ্প যানে,
পবিত্র স্বর্গীয় বারি হ'ল বরিষণ ;—
সেই জলে স্নান করি,
বৃথা কায়া পরি হরি,
চলিলেন নিত্য দেশে ধার্ম্মিক সুজন !

৭

বাজিল উল্লাস বাদ্য স্বর্গ নিকেতনে,
খুলিয়া স্বর্গের দ্বার;—
দাঁড়ায়ে যত অমর,
প্রসারিয়ে দিব্য বাহু প্রফুল্ল বয়ানে,
লইলেন ক্রোড়ে তুলে,
পুষ্প মালা দিয়ে গলে,
সাজালেন দেবতারে বিবিধ ভূষণে।

৮

আমরা অজ্ঞান অতি, মোহেতে মগন,
বুঝিনা বুঝিনা তাই,
কিম্বা বুঝে (ও) ভুলে যাই,

তাই কাঁদি, দিবানিশী পাগল মতন!
পৃথিবীর মায়া মেলা,
পৃথিবীর ধূলা খেলা,
পৃথিবীর কপটতা তাঁর তরে নয়!
তাই তো সত্বরে এত,
কাজ কৰ্ম্ম ফেলি কত,
মগ্ন হইলেন তিনি মহাতপস্যায়!

৯

শুনিয়াছি কতদিন শ্রীমুখে তাঁহার,—
দুঃখ পূর্ণ এসংসার,
প্রীতি প্রদ নহে তাঁর,
পাপ স্বার্থে মগ্ন হেথা হৃদয় সবার,
ত্যজি গৃহ পরিজন,
তীর্থ ধামে যেতে মন,
(নিষ্কাম নিষ্পাপ সেই শান্তির আগার)
পৃথিবীর তীর্থে যত,
বহে সদা পাপস্রোত,
তাই—চলিলেন মহাতীর্থে দেবতা আমার!
অনন্ত অপরিসীম,
ভাবনা চিন্তা বিহীন,
সেই তো শান্তির রাজ্য প্রিয় দেবতার!

শ্রীকুমুদেন্দু দেবী।

বিবিধ প্রসঙ্গ।

যুদ্ধ সংবাদ—এ পর্য্যন্ত যে সকল সংবাদ যুদ্ধ সম্বন্ধে প্রকাশিত হইতেছে তাহাতে জল যুদ্ধে জাপানেরই জয় হইয়াছে। জাপানী বীর পুরুষগণ যুদ্ধ ক্ষেত্রে প্রাণ বিসর্জ্জন করিবার জন্য দলে দলে অগ্রসর হইতেছে। রুষের সম্রাট তাঁহার সৈনিক দিগকে নানাবিধ উত্তেজনা পূর্ণ উপদেশের দ্বারা উৎসাহিত করিতেছেন। জাপানের যুদ্ধ ফণ্ডে প্রজাগণ অকাতরে যথা সর্ব্বস্ব দান করিতেছে।

কুসংস্কার—জনৈক রমণীর নাকি সন্তান হইয়া বাচিত না। এই জন্য কোনও ব্যক্তি তাহাকে বলিয়াছিল, হাতী বসিয়া যাইবার সময় তাহার পেটের নীচ দিয়া যাইতে পারলেই তাহার মৃতবৎসা দোষ দূর হইবে। শিকারের হাতীগুলি তালতলায় আসিলে ঐ রমণী একটী হাতীর পেটের নীচ দিয়া যাইতেছিল। হাতী অমনি বসিয়া পড়িল কুসংস্কারের বশবর্ত্তিনী অভাগিনী রমণী হাতীর চাপায় পড়িয়া মরিয়া গেল। মূর্খতার অশেষ দোষ।

বালিকাদের শিক্ষার অভিনব প্রণালী—ইংলণ্ডে বালিকাগণকে শিক্ষা দিবার জন্য অনেক বিদ্যালয় আছে। সেই সকল বিদ্যালয়ে ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীতে বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষা দান করা হয়, রন্ধন, সীবন, অধ্যয়ন ইত্যাদি বিষয় বহু কাল হইতে প্রচলিত আছে, আজকাল আবার শিশু পালনের জন্য এক নূতন উপায় উদ্ভাবিত হইয়াছে। রবারের নির্ম্মিত বড় বড় পুতুল লইয়া বালিকারা তাহাদিগকে কাপড় পরাইতে দোলনা হইতে ক্রোড়ে করিতে শিক্ষা করিবে। পুতুল গুলির আকৃতি বাস্তবিক শিশুর মত হইবে। সুই- জারল্যাণ্ডে নাকি এই প্রথার বড় সুফল পাওয়া গিয়াছে। এতদ্দেশে বালিকাগণ নবম দশম বৎসর বয়সেই গৃহকর্ত্রী হইয়া বসেন ত্রয়োদশ বা চতুর্দ্দশ বৎসর বয়স অতীত না হইতেই সন্তানের মাতা হন। তাহাতে অধিকাংশ বালিকামাতা সন্তান ক্রোড়ে ধারণ ও পালন উপযুক্তরূপে জানেন না। নবপ্রণালী অনুসারে শিক্ষা দিলে সুফল হইতে পারে। পুতুলের পরিবর্ত্তে ছোট ছোট ভাই বোন গুলির যত্ন করিতে শিখাইলেও উপকার হয়।
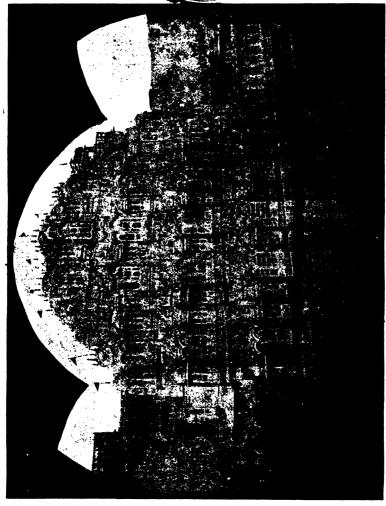
হাওয়া মহল—জয়পুর।

অন্তঃপুর

সচিত্র মাসিক পত্রিকা।

ANTAHPUR

AN ILLUSTRATED MONTHLY JOURNAL IN BENGALI

Edited and contributed to by the ladies only.

কেবল মহিলাগণ কর্ত্তৃক লিখিত ও সম্পাদিত।

বাহিরে কুহেলী জাল ছাইয়াছে চারিধার।
গাহে না পাপিয়া পিক ফুটে না কুসুম আর॥
অন্তরে বসন্ত নব জাগে যদি নিশি দিন।
এ আঁধারে প্রাণ কভু হবে নাক আশা হীন॥

৬ষ্ঠ বর্ষ।	১৩১০ চৈত্র বঙ্গাব্দ	VOL. VI
১২শ সংখ্যা	APRIL, 1904.	No. XII

বন্ধুতা ও প্রেম।

এ জগতে বন্ধুতা কি অমূল্য ধন! কি স্বর্গীয় ও মনোরম জিনিস! বন্ধুতার বন্ধন কি সুমধুর! কি পবিত্র ও নিস্বার্থ! কোথা হইতে এক সুমধুর পবিত্র স্রোত আসিয়া জীবন ও প্রাণমনকে যেন অনন্ত প্রেমের উৎসে ভাসাইয়া লইয়া যায়। কি এক পবিত্র নিঃস্বার্থ প্রেমের জ্যোতিঃ যেন হৃদয়ে প্রতিবিম্বিত হইয়া হৃদয় ও মনকে অপূর্ব্ব সুখ সৌন্দর্য্যে পূর্ণ করে। প্রেম ব্যতীত বন্ধুতা অসম্ভব, প্রেমই বন্ধুতার ভিত্তি, প্রেম হইতেই বন্ধুতা জন্মে। বিশ্বস্ততা বীজ স্বরূপ প্রেমের প্রথম অঙ্কুর, বিশ্বাস ব্যতীরেকে অসম্ভব। প্রেম কি অপূর্ব্ব জিনিস, তাহা নির্ণয় করা বড় কঠিন। যাহাতে স্বার্থের একেবারে সংস্রব নাই, "কেন ভালবাসি তাহা জানি না, কিন্তু ভাল না বাসিয়া পারি না" এই যে অনুরাগ, এই যে নিস্বার্থ পবিত্র প্রেমের সহিত প্রাণ মনকে আবদ্ধ করা, ইহাই বাস্তবিক প্রেমিকের উক্তি ও বন্ধুতার মূলসূত্র। প্রেমদ্বারা পরস্পর পরস্পরের নিকট আত্মবিক্রয় করা বা আবদ্ধ হওয়ার নাম বন্ধুতা! বিষয়ী, স্বার্থপর, কপট এবং অবিশ্বাসী লোকের বন্ধুতা অসম্ভব। সমবস্থাপন্ন লোকের, মধ্যে বন্ধুতা সহজে জন্মিয়া থাকে। যেমন জ্ঞানীতে জ্ঞানীতে, মূর্খে মূর্খে, বন্ধুতা সহজে জন্মিয়া থাকে।

বন্ধুতা স্বার্থ বিষয়কে বড় ঘৃণা করে এবং তথায় বসতি করিতে বড় ভয় পায় সুতরাং অচিরাৎ তথা হইতে পলায়ন করে। সংসারে কপটবন্ধু অনেক কিন্তু প্রকৃত বন্ধু মেলা বড়ই কঠিন। সংসারে বহুরূপীবেশধারী অনেক লোক দেখিতে পাওয়া যায়, যাহারা অকৃত্রিম প্রেম দেখাইয়া বন্ধুতার ছলনায় মনের কথা লইয়া অশেষ যন্ত্রনা দিয়া থাকে। প্রকৃত বন্ধু চিনিতে হইলে অগ্রে তাঁহার সংসর্গ ভালরূপ দেখিতে হইবে। যে যেরূপ প্রকৃতির লোক সে সেরূপ সংসর্গে মিশিতে ভালবাসে; সুতরাং কে কিরূপ প্রকৃতির মনুষ্য তাহা জানিতে হইলে সংসর্গ দ্বারা অনেক সাহায্য পাওয়া যায়। বন্ধুদের মধ্যে একবার অসদ্ভাব ঘটিলে বিশেষ অনিষ্ট হয়; মর্ম্মঘাতী বাক্যদ্বারা বন্ধুর হৃদয়ে আঘাত দেওয়া কর্ত্তব্য নয়, যাহাকে প্রকৃত ভালবাসা যায়, তাহার একটু কঠোর ব্যবহারে হৃদয়ে নিদারুণ ব্যথা লাগিয়া থাকে, ইহা স্মরণ করিয়া সর্ব্বদা সদ্ব্যবহার করা উচিত। বন্ধু যদি সংসর্গ দোষে বা অন্য কোন দোষে কুপথগামী বা পাপী বলিয়া প্রতিপন্ন হয় বন্ধু তাহাকে অযোগ্যবোধে কখনও ত্যাগ করে না, বরং সৎপথে আনিতে প্রাণপণ চেষ্টা করে। বন্ধুর অসন্তোষের ভয় সে করে না। বন্ধুর প্রতি কর্ত্তব্য সে পালন করিয়াই থাকে, বন্ধুর পাপের কালিমা সে নিজের পাপরাশির তুল্য জ্ঞান করে ও অন্তঃকরণে বিষম আঘাত প্রাপ্ত হয়। এ জগতে স্বার্থত্যাগ ও আপনাকে ভুলিবার শিক্ষা স্থলই বন্ধু! আপনাকে ভুলিতে অন্যের দুঃখে কাঁদিতে প্রথমতঃ আমরা বন্ধুর প্রেম হইতে শিক্ষা লাভ করি।

"আত্মত্যাগই প্রেমের ধর্ম্ম"। "প্রেমই বন্ধুতার ধর্ম্ম"। বন্ধুতা ছোট বড় বিচার করিতে অবসর পায় না। বাহ্যিক অসমতা থাকিলেও আভ্যন্তরিক সমতায় তাহা ঢাকিয়া যায়। বন্ধুর ন্যায় ব্যথার ব্যথী এ জগতে বিরল। বন্ধুতা মানব জীবনের বল শান্তি সুখ ও উৎসাহ বৃদ্ধি করিয়া থাকে। বন্ধু বন্ধুর কল্যাণ যাবজ্জীবন কামনা করেন। বন্ধুর প্রতি কর্ত্তব্য পালনের ও আধিপত্যের প্রধান বল প্রেম। প্রেম বন্ধুতার বীজস্বরূপ প্রথম অঙ্কুর এবং এই প্রেমরূপ বীজ হইতেই বন্ধুতারূপ বৃক্ষ অঙ্কুরিত হইয়া ক্রমশঃ বিশ্বস্ততারূপ সলিলসিঞ্চনে বৃহৎ বৃক্ষরূপে পরিণত হয় ও যথাসময়ে নানা পত্রে ও ফল ফুলে সুশোভিত হইয়া হৃদয়ে শান্তি সুধা ও প্রীতি বর্ষণ করিতে থাকে। এ জগতে প্রেমরূপ অস্ত্র দ্বারাই লোক অসাধ্য সাধনে সমর্থ হয় ও অলৌকিক কার্য্য সকল দেখাইয়া থাকে।

অহো! 'বন্ধু' কথাটী কি মধুর! কি শান্তি সুধাময়। বন্ধু কথাটী স্মরণ হইবামাত্র কি যেন এক অপূর্ব্ব আনন্দস্রোত হৃদয়ে প্রবাহিত হইতে থাকে। প্রেমময় পরমেশ্বর যে পবিত্র প্রেমবন্ধনে পরস্পরকে বাঁধিয়া দেন, এ জগতে এমন কি শক্তি আছে তাহা ছিন্ন করিতে করিতে পারে? এ প্রেমে শত কারণে বিচ্ছেদ ঘটিলেও মিলন নিশ্চয়। এ মিলনের শেষ নাই। একের মৃত্যু হইলেই যে বন্ধুতার অবসান হইল তাহা নয়। বন্ধুর প্রতি কর্ত্তব্যের অবসান নাই। বন্ধুর আত্মীয় পরিবার নিজ আত্মীয় ও পরিবার মধ্যে গণ্য। কবি বর্ণনা করিয়াছেন—

"তুচ্ছ সেই অমৃত ভাণ্ড বন্ধুতার কাছে
বন্ধু বসন্তের পদ্ম, শরতের শশী
বন্ধু সমুদ্রের রত্ন, বিপদের অসি
বন্ধু যার আছে তার কি ধন না আছে?"

কি সুন্দর বর্ণনা! বাস্তবিক এ জগতে

যে ব্যক্তি বন্ধুর ন্যায় মহারত্নের অধিকারী হইতে পারে নাই, সে নিতান্ত দুর্ভাগ্য জীব! এ সংসারে সকলেরই দেশ কাল ও পাত্রভেদে কথা কহিতে হয়, সাবধানতা অবলম্বন করিতে হয়; কিন্তু বন্ধুর সঙ্গে কথা বলিবার সময় হৃদয় খুলিয়া দাও, যত ইচ্ছা বলিয়া যাও, ভয় নাই, বাধা নাই, লজ্জা নাই! এ সংসারে বন্ধুপথ প্রদর্শক ও নিরাপদ দুর্গ বিশেষ। কোন কারণ বশতঃ যখন মন বিষাদছায়ায় আচ্ছন্ন হইতে থাকে, ভয়ে নিরাশায় দিক্‌শূন্য বোধ হয় এবং ভাল মন্দ বিচার করিবার ক্ষমতা থাকে না। সে সময় বন্ধু উৎসাহ ও জ্ঞানালোক দ্বারা পথ দেখাইয়া দেন ও নিজের সদ্‌গুণরাশি দ্বারা সজ্জিত করিতে যত্নবান হন। বন্ধু বন্ধুকে সৎসাহস ও সহানুভূতি দ্বারা উৎসাহিত করেন ও দুঃখ ভার নিজ স্কন্ধে লইয়া তাহার লাঘব করেন এবং সুখে যোগদান করিয়া তাহা দ্বিগুণিত করিয়া তুলেন। বাস্তবিক এ জগতে বন্ধুতা দুর্লভ রত্ন। এ জগতে যিনি বন্ধুরূপ মহারত্নের অধিকারী হইতে পারিয়াছেন, তিনি বাস্তবিক সুখী ও ভাগ্যবান ব্যক্তি। বন্ধু শত দোষ করিলেও বন্ধু চিরকালই তাহা হৃষ্টচিত্তে ক্ষমা করিয়া থাকেন। কোনও ধর্ম্মগ্রন্থে লিখিত আছে,—"যে ব্যক্তি তাহার ভ্রাতাকে ঘৃণা করে অথচ বলে, আমি ঈশ্বরকে ভালবাসি, সে মিথ্যাবাদী কারণ যে ব্যক্তি দৃশ্যমান ভ্রাতাকে ভালবাসিতে পারে না, সে অদৃশ্যমান ঈশ্বরকে কিরূপে ভালবাসিবে"। কোন সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থকার লিখিয়াছেন, "যিনি বন্ধুকে হৃদয়দ্বার উন্মুক্ত করিয়া প্রেমদান করিতে পারেন, তিনি ইহ পরকালের প্রকৃত বন্ধু পরমেশ্বরকে প্রেম করিবার উপযুক্ত হন।" এই অমূল্যরত্ন বন্ধুতার প্রকৃত আবাসভূমি পৃথিবীতে নহে। ইহা স্বার্থময় বিনয়ের ভূমিতে অঙ্কুরিত হইতে পারে না। ইহা স্বর্গীয় পদার্থ। এই স্বর্গীয় পবিত্র প্রেমের স্রোত ক্রমশঃ সেই প্রেমময়ের মহান্ প্রেমের জলধির সহিত মিশিতে থাকে ও এসংসার তাহার নিকট স্বর্গের ন্যায় শোভা ধারণ করে।

ধন্য সেই প্রেম, ধন্য সেই বন্ধুতা, ধন্য সেই ভাগ্যবান্ ব্যক্তি যিনি প্রেম ও বন্ধুতায় আত্মদান ও ত্যাগ স্বীকার করিয়া সেই প্রেমময়ের প্রেমের কিয়দংশও আস্বাদন এবং উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইয়াছেন।

শ্রীহিরণ্ময়ী সেন গুপ্তা।

মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়।

২৭শে সেপ্টেম্বর ভারতের এক মহা দুর্দ্দিন গিয়াছে। উনবিংশ শতাব্দির মধ্য ভাগে এই দিনে যুগধর্ম্মবার্ত্তাবহ মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় ইংলণ্ডের অন্তঃপাতী ব্রিষ্টল নগরে অকালে কালগ্রাসে পতিত হইয়াছিলেন। এই দিনে সমগ্র ভারতের নানাস্থানে এমন কি সুদূর বিদেশ ভূমিতেও তাঁহার প্রতি গভীর ভক্তি ও শ্রদ্ধাপ্রদর্শনার্থ কত সভা সমিতি হইয়াছে। ইহা ভারতের পক্ষে সুলক্ষণ বলিতে হইবে। যে দিন ভারতবাসী ধার্ম্মিকের ধর্ম্ম, গুণীর গুণ, পণ্ডিতের পাণ্ডিত্য ও স্বদেশহিতৈষীর স্বদেশ-

হিতৈষণাবৃত্তির প্রকৃত সম্মান করিতে পারিবে সেই দিন ভারতের মঙ্গল হইবে, নতুবা ইহার মঙ্গল সুদূর পরাহত।

ধর্ম্মজগতে দেখা যায়, যখন কোন সমাজ পাপের অত্যাচারে ধ্বংসমুখীন হইতে থাকে যখন ধর্ম্মের নামে সমাজে নানাপ্রকার পাপ প্রবেশ করে, মানুষ একেবারে হিতাহিত জ্ঞান-শূন্য হইয়া পশুর অধম হইয়া পড়ে। তখন ভগবান্ সেই পতিত সমাজকে উদ্ধার করিবার জন্য মহা প্রভাবশালী প্রাতঃস্মরণীয় মহাজন-গণকে প্রেরণ করেন। ইহা আমরা সকলেই জানি। ব্যক্তিগত জীবনেও দেখা যায় যখন সাংসারিক দুঃখ কষ্ট পূর্ণমাত্রায় উপস্থিত হয়, চতুর্দ্দিক শূন্য মনে হয়, তখনই ভগবান্ তাহার প্রাণে বিশেষ ভাবে অবতীর্ণ হইয়া প্রাণে শান্তিবারি বর্ষণ করেন। সে মহানন্দ উপভোগ করে, এমন কি অনেক সময়ে সেই অতীত দুঃখ কষ্টকে বর্ত্তমান উন্নতি ও সুখের হেতু মনে করিয়া ভগবানকে সে বারবার ধন্যবাদ প্রদান করে। যিনি বর্ত্তমান দুঃখের ভিতরে ভবিষ্যৎ (ইহকাল কিম্বা পরকাল) সুখের ইঙ্গীত দেখিতে পান তিনিই প্রকৃত মনুষ্য। মনুষ্যের সেই শ্রেষ্ঠ ব্যবস্থা, যখন সে দুঃখ কষ্ট এবং নিরাশায় ভিতরে ভগবানের শ্রীমুখ দর্শন করিয়া তৃপ্তিলাভ করে। কিন্তু আমরা এতই মোহে বদ্ধ যে সকল সময় তাহা বুঝিতে সমর্থ হই না।

ধর্ম্মজগতেও ঠিক এইরূপ ব্যাপার হইয়া থাকে। ভগবান্ যখন পাপভারাক্রান্ত পৃথিবীর পাপভার মোচন করিবার জন্য আবির্ভূত হন অর্থাৎ বিশেষভাবে কোনও মহাজনকে প্রেরণ করেন, তখন মহাপাপগ্রস্ত ও কুসংস্কারাপন্ন জগতবাসী তাঁহাকে চিনিতে অসমর্থ হইয়া নির্য্যাতন করিতে থাকে। কিন্তু জগতবাসীর কল্যাণ তখনই হয়, যখন তাহারা সেই মহান্ ঈশ্বর প্রেরিত মহাজনের ধর্ম্ম ও ভাব হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে, তাঁহার মুখপদ্মে ঈশ্বরের ছায়া দেখিয়া কৃতার্থ হয়, উদ্ধারলাভ করে। প্রায় দুই হাজার বৎসর পূর্ব্বে যখন ন্যাজারাথের এক কুঠীর হইতে সূত্রধর পুত্র ধর্ম্মাবতার যীশু ঈশ্বরের মহাভাব প্রচার করিতে আরম্ভ করিলেন, তখন অজ্ঞ কুসংস্কারাপন্ন য়িহুদীগণ তাঁহার ভাব হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিয়া, তাঁহাকে নৃশংসভাবে হত্যা করিয়াছিল। এই ভয়ানক হত্যা-কাণ্ডেই জগতের উদ্ধার পথ খুলিয়া গেল। পরবর্ত্তী মনুষ্য সমাজ যতই তাঁহার ধর্ম্মভাব প্রকৃতরূপে বুঝিয়াছে ও বুঝিবে ততই পরি-ত্রাণের দিকে অগ্রসর হইয়াছে এবং ভবিষ্যতে আরও হইবে। মহম্মদ, চৈতন্য এবং বুদ্ধ প্রভৃতি সকল মহাজন সম্বন্ধেই এইরূপ। ইহা পরমেশ্বরের মহা ধর্ম্মবিধান। মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় সম্বন্ধেও ঠিক এইরূপ ঘটিয়াছিল। এই ঈশ্বর প্রেরিত মহাপুরুষ যখন মৃত ভারতে আবির্ভূত হইয়া ইহার প্রাচীন গৌরব পুনঃ প্রতিষ্ঠায় দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলেন এবং প্রাচীন ভারতের "ভক্তি" ও পাশ্চাত্য জগতের "সেবা" এবং "ধর্ম্ম" মন্ত্রের একত্র মিলনে এক মহা ধর্ম্মের অভ্যুদয় ঘোষণা করিলেন, তখন অজ্ঞ, মৃতপ্রায় ভারতবাসী অবাক্ হইয়া গেল। ভাবিল, ইহা আবার কিসের বার্ত্তা! ঈশ্বরের বাণীকে শয়তানের বাণী ভাবিয়া মহাত্মার উপর নির্য্যাতন অস্ত্র নিক্ষেপ করিতে লাগিল। কিন্তু যাঁহার প্রাণ ধর্ম্মবলে বলীয়ান্, যাঁহার পিতা স্বয়ং ভগবান্, তাঁহাকে কে ভীত করিবে? মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের

সমসাময়িক বংশ এতই মোহে অন্ধ ছিল যে, তাঁহাকে চিনিতে পারিল না বটে; কিন্তু বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ বংশ তাঁহাকে যতই চিনিতেছে ও চিনিবে ততই পরম মঙ্গলের পথে অগ্রসর হইবে। দেশের কল্যাণ হইবে।

ইদানীং এই যে চতুর্দ্দিকে রাজার মৃত্যু-দিনে শোকপ্রকাশক কত সভা সমিতি হইল, বড় বড় লোকে কত বক্তৃতা করিয়া তাহাকে ভক্তি উপহার প্রদান করিলেন, ইহা কি দেশের পক্ষে মঙ্গল নয়? কেহই ইহা অস্বীকার করিবে না। যতদিন না ভারতবাসী ধার্ম্মিকের ধর্ম্মভাব এবং গুণীর গুণ প্রকৃতরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইবে, ততদিন এই পতিত দেশের উদ্ধার কোথায়? কিন্তু আমরা সকলেই কি রাজাকে প্রকৃতভাবে এখনও চিনিতে পারিয়াছি? কেহ তাঁহার বিচার শক্তি, কেহ বিদ্যা, কেহ সামাজিক সংস্কার এবং কেহ শিক্ষা ও রাজনৈতিক আন্দোলনের জন্য তাঁহাকে ভক্তি করিয়া থাকি। মানিলাম তাহাতে একাধারে এতগুলি গুণ ছিল। তাঁহার এই সকল কার্য্যের জন্য আমরা তাঁহার নিকট চির ঋণী। কিন্তু এই গুণগুলিত তাঁহার অন্তর্নিহিত মহাগুণেরই পরিচারক মাত্র। যে এক মহান্ অগ্নি তাঁহার প্রাণে প্রজ্বলিত ছিল, যাহার জন্য তিনি স্থির থাকিতে পারেন নাই, সেই অগ্নির নাম—ঈশ্বরে প্রত্যক্ষ বিশ্বাস। কণ্ঠে অমূল্য ধর্ম্মরত্ন ছিল বলিয়াই তিনি অসম সাহসের সহিত কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে পারিয়াছিলেন। ধর্ম্ম তাঁহার সকল গুণের আধার এবং ধর্ম্মই তাঁহার নেতা ছিলেন। এক ধর্ম্ম বলেই তিনি ভারতে নবযুগ আনয়ন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। যেদিন আমরা তাঁহার ধর্ম্মকে চিনিতে সমর্থ হইব, সেই দিন তাঁহাকে প্রকৃত ভাবে পূজা করিতে পারিব, নতুবা নহে। তাঁহার ধর্ম্ম ভারতে নববলের সঞ্চার করিয়াছে, ভারতের উদ্ধার পথ খুলিয়া দিয়াছে। মৃতপ্রায় ভারতে আশার বীণা বাজিয়া উঠিয়াছে। এই নবধর্ম্মবলে পূর্ব্ব ও পশ্চিম মিলিত হইয়া শ্বেত, কৃষ্ণ ভেদাভেদ ভুলিয়া এক মহাধর্ম্ম বিধানের মণ্ডপতলে দণ্ডায়মান হইয়া জগতবাসী এক তানে সেই একমেবা দ্বিতীয়ং এর ধ্বনি উত্থিত করিয়া জগতের উদ্ধারবার্ত্তা ঘোষিত করিবে। ঈশ্বর করুন সেই দিন শীঘ্র আসুক, জীর্ণ, শীর্ণ, মৃত ভারত পুনর্জ্জীবন লাভ করুক। আমরা মহাত্মা রাজার প্রাণের ধর্ম্মকে প্রকৃতরূপে বুঝিয়া তাঁহার আত্মমন্ত্রে দীক্ষিত হই।

শ্রীকুলদা দেবী।

হিন্দু সমাজে বঙ্গনারী।

মানব জীবনে যে সময় মেয়েদের শারীরিক অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ও মানসিক বৃত্তির স্ফুরণ হওয়ার সূত্রপাত হয়, সেই বাল্যাবস্থা অতিক্রম করিয়া কৈশোরে পদার্পণ করিতে না করিতেই হিন্দু সমাজে মেয়েরা সামাজিক নিয়মানুসারে, ধূলা খেলা সব সাঙ্গ করিয়া পরিণীতা হইয়া সংসারে প্রবেশ করে। বুদ্ধি ও জ্ঞানের বিকাশ এই পরিণয় ও সংসার যাত্রার মধ্যেই আবদ্ধ রহিল। কলের পুতুল সাজিয়া ইহারই ভিতর জীবনের কাজ আরম্ভ করিল। এই জীবনের

দৈনিক কাজের তালিকা দৃষ্টে দেখিতে পাই, রন্ধন ভোজন ইত্যাদি কাজের অতিরিক্ত চিন্তাস্রোত প্রাণের অভ্যন্তরে অতি অল্পই জাগিয়া থাকে। অবস্থা অনুকূল হউক আর প্রতিকূলই হউক, সংসারের এ সকল কার্য্য সম্পাদনেই তাহাদের পরিতৃপ্তি ও সন্তুষ্টি লাভ করিতে হইবে। এই সীমা অতিক্রম করিয়া প্রাণে আর অন্য কোন অভিনব আকাঙ্ক্ষা কিবা কর্ত্তব্যের পিপাসা জাগেনা। ইহাতে স্পষ্ট বুঝা যায় মনের অভ্যন্তরে জ্ঞান পিপাসার অভাব জনিত যে ক্লেশ রহিয়াছে, সেই ক্লেশ বোধ কচিৎ হয় ও সেই অজ্ঞানতাই নিশ্চিন্ততাও শান্তনার কারণ হইয়া দাঁড়ায়।

অভাব বোধ হইলে তাহা বিদুরিত করার চেষ্টা যতদিন না হয়, ততদিন মানব প্রাণ কিছুতেই আরাম ও শান্তি পাইতে পারে না। সেই আকুল পিপাসা যৎসামান্য কর্ত্তব্য সম্পাদনে নিবারিত হইতে পারে না। প্রাণে অভাব বোধ না হওয়ার মূলেই যখন আমাদের বর্ত্তমান দুর্দ্দশা তখন প্রতি শিক্ষা ও কার্য্যে সেই অভাব বোধ যাহাতে হয় তাহাই সঞ্চার করা একান্ত উচিত। আমাদের জীবনের ছোট বড় প্রায় সকল কার্য্যই পরের উপর নির্ভর। স্বাবলম্বন ও স্বাধীন চিন্তাত নাই বলিলেই হয়।

বস্তুত এই অবস্থার ভিতরে মানব জীবনের জ্ঞানোন্নতির বৃত্তিগুলি সম্পূর্ণ বিকাশ প্রাপ্ত হয় না। প্রকৃত পক্ষে কি নারী কি পুরুষ উভয়েরই জ্ঞান ধর্ম্মের বিকাশ ও উন্নতি না হইলে, যে উদ্দেশ্যে ভগবান পশু পক্ষী ইত্যাদি ইতর প্রাণী হইতে মানবকে পৃথকও শ্রেষ্ঠ করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহা রক্ষা হইয়া মানব জীবনের সার্থকতা সম্পাদিত হইতে পারে না।

শিক্ষার যত কেন সুবিধা থাকুক না, বর্ত্তমান অবস্থায় মেয়েদের এ শিক্ষার প্রকৃত সুফল লাভ হইতেছে না। ইহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কারণ সামাজিক নানা কুরীতি কুশাসন; ইহার বশবর্ত্তীতাই যে বঙ্গমহিলার সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতির প্রধান অন্তরায় ইহা ভয় বিহ্বল চিত্তে হইলেও অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। নিজের অবস্থা ও অভাব সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি করিয়া শারীরিক মানসিক উন্নতি সাধনে বদ্ধপরিকর হইতে পারা যায়, সেই শক্তি টুকু এই দুরবস্থার ভিতর হীন বীর্য্য হইয়া রহিয়াছে, তাই জগত পিতার স্নেহ ও কৃপা অযাচিত ভাবে পাইয়াও মানব নামের অযোগ্য ও পুরুষের ক্রীড়ার পুতুলি হইয়া অন্ধকারেই এই দুর্ল্লভ মানব জীবনের লীলা সাঙ্গ করিতে হইতেছে, ইহাকি কম মনস্তাপ ও ক্ষোভের বিষয়? কিন্তু সে ক্ষোভ বুঝিবার শক্তি কি আর আমাদের আছে? তাহলে কি বসন ভূষণে সুসজ্জিত হইয়া বিলাস গৃহ আলোকিত করিয়া জীবন সার্থক করিতে আকুল আকাঙ্ক্ষা হইত?

আজ কাল প্রায় সকল হিন্দু ভদ্র লোকের ঘরেই একটু একটু লেখা পড়ার চর্চ্চা হইতেছে, যদি এই চর্চ্চা যথোচিত ভাবে পরিচালিত হইত, তবে এই যৎসামান্য লেখা পড়াতেও যে অনেক সুফল ফলিত তাহার সন্দেহ নাই। কিন্তু পরিতাপের বিষয় অনেক ভগিনীগণই বিদ্যাশিক্ষা করিয়া বিদ্যার এ গৌরব টুকু রক্ষা করিতে অসমর্থ হন; একটু একটু লেখা পড়া আরম্ভ করিয়াই নভেল নাটক ইত্যাদি সুরুচি বর্জ্জিত পুস্তকাদি পাঠ করিতে আরম্ভ করেন, এই সকল পুস্তক পাঠে মনের সৎ-আকাঙ্ক্ষা চিন্তা

বিনিষ্ট হয় আমোদ ও বিলাসিতার স্পৃহা বাড়িয়া প্রাণের স্বাভাবিক কোমল বৃত্তিগুলি নষ্ট করিয়া তুলে। এবম্বিধ শিক্ষার বিপরীত অবস্থায় থাকিয়াও নিরক্ষরা প্রাচীন মহিলারা গৃহকার্য্য ইত্যাদিতে যেরূপ দক্ষতা ও শ্রমশীলতার পরিচয় দিয়াছেন, ইদানিং এই শ্রেণীর ভগিনীরা তাহাও করিতে সমর্থ নহেন, বরং কেহ কেহ সাংসারিক সকল কার্য্যে একটু অবহেলার ভাবই দেখাইয়া থাকেন, সুতরাং সংসারের অন্যান্য কর্ত্তব্য কাজও সুচারুরূপে নির্ব্বাহ হয় না। এদিকে আবার উন্নতির মধ্যে এই সামান্য ত্রুটীটুকু দেখিয়া স্ত্রীশিক্ষা ও উচ্চ শিক্ষার বিরোধী সমাজের অগ্রণী মহাত্মাগণ তাহাদের মত পরিপুষ্ট রাখিবার বেশী সুযোগ পান।

বাস্তবিক যদি মেয়েদের প্রত্যেকের জীবনে শারীরিক স্বাস্থ্য রক্ষা করিয়া আত্মচিন্তা ও আত্মগৌরব রক্ষা করিবার একটু ক্ষমতা ও স্পৃহা থাকিত, তবে যাবতীয় প্রতিকূল ঘটনা উত্তীর্ণ হওয়ার উপায় সহজসাধ্য হইত, কিন্তু সে শক্তি কৈ?

বাঙ্গালী মেয়েদের অল্প বয়সে স্বাস্থ্য ভঙ্গ হইয়া যায়, তাহার প্রধান কারণ বাল্যবিবাহ। লোকে কথায় বলে "কুড়ী হইলেই বুড়ী", বস্তুত ইহা যে সত্য কথা তাহার দৃষ্টান্ত প্রতি ঘরে ঘরে বিদ্যমান। এরূপ অল্প বয়সে বিবাহ প্রথা আর কোন সভ্য জাতির মধ্যে প্রচলিত আছে কি না জানি না। বার তের কিংবা চৌদ্দ বৎসরে পরিণীতা হইয়া বৎসরাধিক কাল গত না হইতেই সন্তানের জননী হয়। এই বালিকারা নিজের স্বাস্থ্য রক্ষা করিয়া সন্তান প্রতিপালন করিতেই অসমর্থা, এমতাবস্থায় তাঁহাদের সন্তানের উন্নতি ও নিজের আভ্যন্তরিক শক্তি সতেজ রাখিয়া মানসিক উন্নতি সাধন করাত কল্পনার অতীত কথা।

সত্য বটে আজ কাল স্কুল পাঠশালা ইত্যাদি দ্বারা স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের বিবিধ আয়োজন হইতেছে এবং ইহাতে অনেক সদাশয় ব্যক্তির দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে ও অনেকেই তাহার উপকারিতাও বুঝিতেছেন, কিন্তু প্রকৃত নীতি ও জ্ঞান শিক্ষা অর্থাৎ নানা প্রকার কুসংস্কার অতিক্রম করিয়া যে শিক্ষায় চিত্ত বিমল ও মানসিক বল বৃদ্ধি হয় এবং নিজের অভাব মোচন করিতে সক্ষম করে সে শিক্ষা কোথায়?

জাতীয় উন্নতির একমাত্র প্রত্যবায় স্ত্রীশিক্ষার অভাব। যে বীজে সমস্ত মানব জাতির জীবন ও উন্নতি নির্ভর করে সেই বীজ অকর্ম্মণ্য হইলে উন্নতির ভিত্তি কোথায় থাকে? মেয়েরাই যখন সকল উন্নতির সার, কারণ তাহারা জননী ও সন্তানের সর্ব্বাঙ্গীন শিক্ষা দায়িনী তাহাদের চরিত্র গঠন প্রভৃতি যাবতীয় সৎশিক্ষা অধিক পরিমাণে মাতার উপরই নির্ভর করে কিন্তু এই প্রকার অশিক্ষিতা এবং শারীরিক ও মানসিক দুর্ব্বলা জননীগণ দ্বারা যে কি প্রকার সন্তানের চরিত্রবল কিম্বা মহৎ ভাব সকল অঙ্কুরিত হইতে পারে তাহা সূক্ষ্ম দৃষ্টি করিলে অবশ্যই বোধগম্য হয়। কত সন্তান মাতার সম্মুখে মিথ্যাও বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে অশ্লীল কথোপকথনের দ্বারা আমোদ প্রমোদ করিতেছে, মাতা কোন প্রকার শাসন করিতেছেন না, কারণ তিনি স্বয়ংই বুঝিতে পারিতেছেন না, যে ইহা দ্বারা সন্তানের ভবিষ্যৎ জীবনের কি অনিষ্ট সাধিত হইতেছে, অনেক স্থলে দেখা যায় শাসন করিতে চাহিয়াও কি প্রকার শাসনে উপকার দর্শিবে বুঝিতে না পারিয়া হিতে বিপরীত করিয়া

সন্তানের মাথা নষ্ট করেন, ইহাও সামান্য বিষয়! এমন কত অন্ধ রমণী আছেন যিনি প্রাণসম সুকোমল মতি সন্তানকে কত রকম অসৎকার্য্যে সহানুভূতি দিতে সঙ্কুচিত হন না। অথচ তিনি যে কি গর্হিত কাজ করিতেছেন, নিজের অজ্ঞানতা বশতঃ বুঝিতে পারিতেছেন না। মাতার স্তনদুগ্ধে পালিত হইয়া শিশুর যে প্রকার শরীরের গঠন ও বিকাশ হয়, তদ্রূপ তদীয় চরিত্র অনুকরণদ্বারাও তাহার চরিত্র গঠিত হয়। ইহা কয়জন বুঝিতে পারেন? মাতার স্তনদুগ্ধের সঙ্গে যে প্রকার বীজ শিশুর শরীরে প্রবিষ্ট হয়, কালে জীবনবৃক্ষে তাহারই অনুরূপ ফল প্রসব করে। সুতরাং মাতা শিক্ষিতা না হইলে সুসন্তানের আশা কোথায়? কিন্তু যে দেশে এই মাতারই দুরবস্থার সীমা নাই, সেই দেশ উচ্ছন্ন যাইবে না ত কি?

আধুনিক হিন্দু সম্প্রদায়ে কন্যাবিবাহ-পণ নিয়া আর এক মহারোল উঠিয়াছে। কন্যার জন্ম গ্রহণ এক মহা অপরাধের ব্যাপার হইয়া পড়িয়াছে, কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করিলে পিতা মাতার মনোদুঃখ তো দূরের কথা আত্মীয় স্বজন, পাড়া প্রতিবেশী পর্য্যন্ত মুখ ভার করিয়া বিরক্তির ভাব প্রকাশ করেন। এ সকল ঘটনা দেখিলে মনে যে কি ভয়ঙ্কর ভাবের উদয় হয়, তাহা কি আবার বুঝাইবার বিষয়? আমরা কি রক্ত মাংসের জীবও নই? ইহা দ্বারাই এদেশে মেয়েরা কিরূপ সম্মানে জীবন যাপন করিতেছে তাহার আভাস পাওয়া যায়। আমার মনে হয় ইহার মূলেও মেয়েদের যথেষ্ট করণীয় কার্য্য রহিয়াছে ও তাহার অভাবেই আজি এই ঘরে ঘরে কন্যাদায়ের হাহাকার!!! এই কুরীতি ক্রমেই বদ্ধমূল হইতেছে। ইহা যে সকল অবস্থার লোকের পক্ষেই ক্ষতির কারণ তাহা কেহই অস্বীকার করিবেন না।

পুত্র কন্যা সকলেরই আছে, সকলেই ইহাদের সুখ দুঃখের ভুক্তভোগী। পুত্র প্রসবিনী গর্ব্বিনী জননীগণ যদি এই বিবাহ পণকে ঘৃণার চক্ষে দেখিতে পারিতেন এবং স্বজাতীয়া মেয়েদের সম্মানের হানির বিষয় বলিয়া বুঝিতে পারিতেন, তবে কি আজি কন্যা নিয়া ঘরে ঘরে এই প্রকার দুর্দ্দশা দেখা যাইত? তাঁহাদের উচ্চ আকাঙ্ক্ষা ও মনে বল থাকিলে পুত্রগণ এরূপ কাজে মূল্যবান জীবনের অনাদর করিতে কখনও সাহস পাইতেন না, পুত্রের কল্যাণ কামনা ত সকল মাতাই করেন কিন্তু এরূপ সুরুচি বহির্ভূত আত্মসন্মান হানি জনক কার্য্যে মাতার সহানুভূতি দেওয়া কতদূর অসঙ্গত তাহা বলা বাহুল্য।

বিশেষ ভাবে দেখিলে দেখা যায় মেয়েদের প্রতি কাজে প্রতি পাদবিক্ষেপেই সমাজের নানা কঠোর শাসন রহিয়াছে। মেয়েরা পতিহীনা হইলে তাহাদের জীবন এক কালে মূল্যহীন হয়; ব্রহ্মচর্য্য কঠোর ব্রত তাহাদিগকে পালন করিতেই হইবে; সংসারে কোন আমোদ জনক কার্য্যে ও সুখ স্বচ্ছন্দতায় তাহাদের আর অধিকার থাকে না। তাহারা সংসারে যতদিন জীবিত থাকে আত্মীয় স্বজনের গলগ্রহ ও নিতান্ত অবহেলার পাত্রী হইয়া ঘোর অবসাদে জীবন কাটাইতে হয়। বিশেষ অল্প বয়স্কা মেয়েরা বিধবা হইলে তাহাদের কি ভীষণ দুরবস্থা, সমাজের কি নির্য্যাতনই না তাহাদের কোমল প্রাণে সহিতে হয় এবং এ সব কঠোর শাসনের পরিণাম ফলে ঘরে ঘরে কত বিষ উৎপাদন

বর্ম্ম দেশীয় দুভাষী।
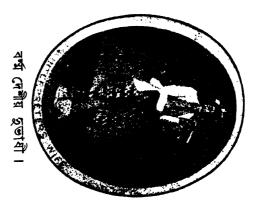
করিতেছে তাহা আর কাহারও অবিদিত নাই। সেই হৃদয় বিদারক দৃশ্যে পাষাণও বিগলিত হয় কিন্তু সমাজের কঠিন বন্ধন শিথিল হয় না।

ঘরের সামান্য তৈজস পত্রও মেয়েদের জীবন অপেক্ষা মূল্যবান, যদি আমাদের প্রত্যেকের মধ্যে জীবনের এ সকল দুরবস্থা বুঝিতে চেষ্টা করি ও নিজেরা এ বিষয় প্রত্যেকে আলোচনা করিয়া নষ্টোদ্ধারের উপায় অন্বেষণ করি, তবে এ দুর্দ্দিন ঘুচিবার কথঞ্চিৎ আশা করা যাইত এবং এরূপ অস্তিত্ব শূন্য হইয়া থাকাকে শান্তিসুখ মনে করিতে পারিতাম না।

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে হিন্দুসমাজে মেয়েদের শিক্ষা বিষয়ে কোন উৎকর্ষ সাধন হয় না এবং শরীর মন আত্মার সামঞ্জস্যরূপে স্ফুরণ হওয়ার পূর্ব্বেই বিবাহ-সূত্রে আবদ্ধ হয়, তাহার ফল এই হয় যে, তাহারা বিবাহিত জীবনের কর্ত্তব্য ভারগুলি বহিতে সমর্থ হয় না ও প্রকৃত দাম্পত্যপ্রেমের দেবভাব হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিয়া কেবল পশু ভাব লইয়া কাটানই সার্থক মনে করেন। আর যে সমাজে স্বামী শিক্ষিত ও স্ত্রী অশিক্ষিতা এবং উভয়েরই রুচির সম্পূর্ণ পার্থক্য রহিয়াছে, এ অবস্থায় এক দিকে যেমন দম্পতিগণ পবিত্র প্রণয়ের উচ্চ ভাব গ্রহণ করিতে পারে না, অপর দিকে সেই সমাজ কখনও উন্নতির আশা করিতে পারে না।

হিন্দু সমাজে নারী জীবনের লক্ষ্য কি তাহা একটু প্রণিধান করিয়া দেখিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়, বিবাহে স্ত্রী পুরুষকে আশ্রয় করিয়া কুলরক্ষণ ও সংসার পালন করিবে, এ ছাড়া আর কিছুই তাহার জীবনের উদ্দেশ্য নহে। এই কুলস্থিতি ও সংসার পালনে আবার নারীর কতদূর স্বাধীনতা তাহা বলা নিষ্প্রয়োজন। বঙ্গনারীর সকল দুরবস্থার প্রধান কারণই প্রকৃত শিক্ষার অভাব, যতদিন না এ অভাব ঘুচিবে, ততদিন এ শোচনীয় কষ্ট মোচন হইবে না।

~~এইরূপ~~ হিন্দুসমাজে ঘরে ঘরে বঙ্গনারীর এতদ্রূপ অবস্থা, এই অবস্থাপন্ন নারীগণ দ্বারা কিরূপে সমাজের কল্যাণ সাধিত হইতে পারে, তাহা শিক্ষিত ব্যক্তিমাত্রেরই বিচার করিয়া দেখা কর্ত্তব্য। সমাজের প্রধানতম লক্ষ্য যাহাতে নরনারী স্বাধীন ভাবে স্বেচ্ছামতে স্বীয় স্বীয় দেহ ও মনের শক্তি সকলকে সৎকার্য্যে নিয়োগ করিতে পারে তাহাতে সাহায্য করা, কিন্তু হতভাগ্য হিন্দুসমাজে নারীগণ স্বাধীনতা ও মানসিক শক্তির বিকাশে কতদূর সহায়তা পাইতেছেন তাহা লিখা নিষ্প্রয়োজন।

সমাজ বলিতে কতকগুলি নর নারীর সমষ্টি বুঝায়, হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান যে কোন সমাজই হউক, সমাজ শুধু স্ত্রী কিংবা শুধু পুরুষে গঠিত নহে, যেমন শরীর বলিতে হস্ত পদাদি অঙ্গ প্রত্যঙ্গের সমষ্টিকে বুঝায়, তদ্রূপ সমাজ বলিতেও নরনারীর সমষ্টিকে বুঝায়, পুরুষ সমাজের একার্দ্ধ, অপরার্দ্ধ নারী। মানব শরীরের কোন অংশ পীড়িত হইলে যেমন শরীরের স্বাস্থ্য অটুট বলিতে পারা যায় না, তদ্রূপ সমাজার্দ্ধ নারীর উন্নতি ব্যতিরেকে সমাজের উন্নতি অসম্ভব, পুরুষ যতই উন্নতি লাভ করুক না কেন, নারী ব্যতিরেকে কখনই সমাজের উন্নতি সাধিত হইবে না ইহা সুনিশ্চিত ও স্বতঃসিদ্ধ!

শ্রদ্ধেয়া প্রাণের ভগিনীগণ! আমরা আজ এই শুভদিনে এই গৃহে মিলিত হইয়াছি, আমাদের প্রত্যেকের অবস্থা প্রত্যেকে অবিদিত নই,

আমরা নিজেরা যদি নিজেদের উন্নতির জন্য অগ্রসর না হই, তবে এ দুঃখ ঘুচিবার নহে। চলুন জগৎ পিতার কৃপায় আমরা এ সম্মিলনকে কার্য্যক্ষেত্র করিয়া জীবনের অভাব মোচন করিতে যত্নবতী হই, ভগবান আমাদের সহায় হউন

শ্রীসুখদা গুপ্তা।

সাম্রাজ্ঞী আলেকজেন্দ্রা।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

১৮৭১ খৃঃ তাঁহার পতি তৎকালীন যুবরাজ এবং বর্ত্তমান সম্রাটের অরাতিসার হয়, জীবনের আশা এক প্রকার পরিত্যাগ করিতে হইয়াছিল। প্রতিপ্রাণা রাজবধূ দিবারাত্রি পতিপার্শ্বে বসিয়া তাঁহার সেবা শুশ্রূষা করিতেন। এই বিপদে তাঁহার আভ্যন্তরিক ধর্ম্ম বিশ্বাস অধিকতর বিকাশ প্রাপ্ত হইল। এবং এবম্বিধ বিপদে ধৈর্য্যাবলম্বন, ঈশ্বরে দৃঢ় বিশ্বাস ও পতিসেবানুরাগ দেখিয়া প্রজাবৃন্দ মুগ্ধ হইয়া গেল। যুবরাজ যখন একটু আরোগ্যলাভ করিলেন, তখন রাজবধূ প্রধান ধর্ম্মাচার্য্যকে লিখিলেন, "ঈশ্বরকে ধন্যবাদ যে আমার প্রিয়তম স্বামী রোগমুক্ত হইতেছেন, আমি আজ কিয়ৎক্ষণের জন্য ধর্ম্মালয়ে যাইব, কিন্তু আমায় শীঘ্র চলিয়া আসিতে হইবে। আমি বিলম্ব করিতে পারিব না। যেহেতু আমাকে আমার পতি-সেবা করিতে হইবে। আপনি কি প্রার্থনা-রম্ভে আমার পতির কল্যাণার্থ এমন কয়েকটী বাক্য উচ্চারণ করিতে পারেন না, যাহাতে আমি অন্তরের সহিত আপনার প্রার্থনায় যোগদান করিয়া গৃহে ফিরিতে পারি ?"

অতঃপর যুবরাজ সম্পূর্ণ আরোগ্যলাভ করিলে সাধ্বী আলেকজেন্দ্রা নিম্নলিখিত বাক্য খোদিত পিত্তলের সুন্দর বেদী ধর্ম্মালয়ে উৎসর্গ করিলেন—"প্রভু পরমেশ্বরের মহিমা গৌরবান্বিত হউক, তাঁহার দয়ার কৃতজ্ঞতার নিদর্শন এই ক্ষুদ্র বেদী নির্ম্মিত হইল, আমি যখন বিপদে পড়িয়া প্রভু পরমেশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিয়াছিলাম, তিনি তাহা শুনিয়াছেন।" ইহা যুবরাজ পত্নীর প্রগাঢ় পতি প্রাণতার পরিচয় প্রদান করিতেছে।

১৮৭৫খৃঃঅব্দে যুবরাজ যখন ভারতে আগমন করিলেন, তখন যুবরাজপত্নীকে প্রথম পতি-বিরহ সহ্য করিতে হইয়াছিল, এবং এই বিচ্ছেদকালে তিনি সাণ্ড্রিংহাম প্রাসাদে পুত্র কন্যাগণ সহ নির্জ্জনবাস করিতে ছিলেন। যুবরাজ ভারত হইতে নানাবিধ পশু পক্ষী স্বদেশে লইয়া গেলে পর আলেকজেন্দ্রা স্বয়ং সেইগুলির তত্ত্বাবধান করিতেন। গৃহপালিত পশু পক্ষীদেরে তিনি স্বহস্তে খাওয়াইতে বড় ভাল বাসিতেন।

১৮৮৮ খৃঃ তাঁহাদের বিবাহিত জীবনের পঞ্চবিংশতি বৎসর পূর্ণ হইলে রৌপ্য বিবাহ মহাসমারোহে সম্পন্ন হইল। সেই বৎসর তাঁহাদের জ্যেষ্ঠা কন্যার বিবাহ হয়, ১৮৯৩ খৃঃ তাঁহাদের দ্বিতীয় পুত্র জর্জ্জের, টেকের রাজকুমারী মের সহিত শুভ পরিণয় হইয়াছে।

১৯০২ ইং জুন মাসে যখন আমাদের

বর্ত্তমান সম্রাটের সাংঘাতিক পীড়া হইয়াছিল এবং যে সংবাদে জগৎশুদ্ধ লোক উদ্বিগ্ন ও চিন্তিত হইয়াছিল, সেই সময়ও রাজ্ঞী প্রগাঢ় পতিভক্তির পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য যে সম্রাট এডওয়ার্ডের সেবার জন্য বহু সেবিকা নিযুক্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু সেই শুশ্রূষাকারিণী সেবিকাগণই বলিয়াছেন যে, মহারাণী তাঁহাদের অপেক্ষাও শুশ্রূষা কার্য্যে অধিক সুদক্ষা ও ধৈর্য্যশালিনী। তিনি দিবারাত্রি পীড়িতপতির পার্শ্বে থাকিয়া তাঁহার সেবা শুশ্রূষা ও তত্ত্বাবধান করিয়াছেন।

পরলোকগতা ভারতেশ্বরীর ন্যায় আমাদের বর্ত্তমান সাম্রাজ্ঞী আলেকজেন্দ্রার জীবনে নারীজীবনের পূর্ণ বিকাশ হইয়াছে। আদর্শকন্যা আদর্শবধূ আদর্শপত্নী আদর্শ মাতা এমন কি আদর্শরাজ্ঞী রূপেও তিনি নারীসমাজে পূজনীয়া হইবার যোগ্য। সর্ব্বোপরি তাঁহার হৃদয়ের গভীর ঈশ্বর ভক্তি তাঁহাকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠা রমণী করিয়াছে। দুঃখী তাপী প্রজাদিগের প্রতি তাঁহার আন্তরিক সহানুভূতি সকলকে আকৃষ্ট করিয়াছে।

তাঁহার দৈনিক জীবনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনাবলীতে তাঁহার অনেক সদগুণের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। বিগত রাজ্যাভিষেক কালে ভারত নির্ম্মিত রাজপোষাক পরিধান ও তৎসম্বন্ধে প্রশংসাসূচক অভিমত প্রকাশে সাম্রাজ্ঞী ভারতের প্রতি তাঁহার অনুরাগ প্রদর্শন করিয়াছেন। সাম্রাজ্ঞী শিল্পকার্য্যে ও গৃহকার্য্যে সুদক্ষা। তিনি স্বহস্ত নির্ম্মিত শিল্পের দ্বারা তাঁহার বসিবার গৃহ সুসজ্জিত করিয়াছেন। রাজরাণী হইয়াও কখনও বৃথা সময় নষ্ট করেন না।

একদা তিনি অনাথ বালিকাদের আশ্রম পরিদর্শন করিতে গিয়াছিলেন। বালিকাদের শয়ন, পাঠ, ভোজন ও ক্রীড়ার সমুদয় প্রকোষ্ঠগুলি দেখিয়া তিনি আশ্রমের তত্ত্বাবধায়ীকাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বালিকারা কোন্ গৃহে বসিয়া ঈশ্বরোপাসনা করে?" সেই আশ্রমে ঈশ্বরোপাসনার জন্য কোন নির্দ্দিষ্ট স্থান ছিল না। তত্ত্বাবধায়িকা রাজ্ঞীর প্রশ্নের উত্তর দানে নিরুত্তর হইলেন। ইহাতে রাজ্ঞী কিছু দুঃখিত হইয়া বলিলেন, "আমাদের দৈনিক জীবনের কর্ত্তব্য পালনের সঙ্গে ভগবানের পূজার জন্যও প্রস্তুত হওয়া বাঞ্ছনীয়।" ইহাতে তাঁহার ঈশ্বরনিষ্ঠা সুন্দররূপে প্রকাশ পাইতেছে।

সাম্রাজ্ঞী চিরসৌভাগ্যবতী হইয়া নারী জীবনের সার্থকতা সম্পাদন করুন ও তদীয় জগদ্বিখ্যাতা পূজনীয়া শ্বশ্রূ স্বর্গীয়া মহারাণী ভিক্টোরিয়ার ন্যায় সর্ব্ব সাধারণের আদরনীয়া ও প্রাতঃ স্মরণীয়া হউন। সম্রাট এডওয়ার্ড ও পতিপ্রাণা সহধর্ম্মিণীর সাহায্যে রাজধর্ম্ম উপযুক্তরূপে পালন করিয়া সুখী হউন। অন্তঃপুর বাসিনী ভারত নারীগণের ইহাই আকাঙ্ক্ষা।

ধর্ম্ম

ধর্ম্ম মানব জীবনের ভিত্তি স্বরূপ ইহা আত্মার আলোক, ইহার বলে মানব জীবন উন্নত পবিত্র ও শান্তি পূর্ণ হয় এবং ইহা ঐহিক পারত্রিকের একমাত্র সম্বল।

মানব জীবনের প্রকৃত সুখ, ধর্ম্মের উপরই সম্পূর্ণ নির্ভর করে। ধর্ম্ম বিহীন মনুষ্য পশু অপেক্ষাও নিকৃষ্ট।

একমাত্র ধর্ম্মবলে মানব কত অসাধ্য সাধন করিতেছেন, যেখানে ধর্ম্ম সেখানে ক্ষমা, বিনয়, শ্রদ্ধা, ভালবাসা, দয়া, দাক্ষিণ্য সকল গুণই বিরাজিত থাকে। সে স্থান সুখ শান্তির একমাত্র আকর।

মানব ঐহিক সুখ লাভের জন্য কত না বিভৎস কার্য্যাবলী দ্বারা নরকের দ্বার উদ্ঘাটিত করিয়া দিতেছে, ধর্ম্মের দিকে না চাহিয়া কুৎসিত কার্য্য সকল অবলম্বন করিয়া যেরূপে হউক আপনাপন সুখলাভে মত্ত রহিয়াছে কিন্তু তাহারা ভাবিয়া দেখে না যে এসব ক'দিনের? কিছুই তো সঙ্গে যাইবে না, যাহার জন্য ইহকাল পরকাল চিরদিনের জন্য কলঙ্কিত করিতেছি তাহাও তো কখনও সঙ্গের সাথী হইবে না।

তবে এ ক্ষণিক সুখের জন্য কেন আত্মাকে এরূপ কলঙ্ক সাগরে ডুবাইতেছি?

যদি মানব ঐহিক সুখের জন্য এরূপ ব্যাকুল না হইয়া ঐহিক পারত্রিক সুখ ধর্ম্মলাভে যত্নবান হইত, তবে এ সংসারকে মানব বিষতুল্য বলিয়া অভিহিত করিত না। এ সংসার শান্তিময় হইত।

কত লোক সংসার সংসার বলিয়া কত নরক সদৃশ কার্য্য সকল সম্পাদন করিতেছে এবং নিজ পার্থিব উন্নতির জন্য কতই নিন্দনীয় জঘন্য উপায়ে অর্থোপার্জ্জন করিতেছে, ভ্রমান্ধ মানব বুঝে না এত ব্যগ্রতা সহকারে বিভৎস কার্য্য দ্বারা নিজ চরিত্র কাহার জন্য কলঙ্কিত করিতেছে?

হায় প্রাণের এত উৎসাহ প্রাণের এত ব্যগ্রতা যদি ধর্ম্মপথে চালনা করিত তবে মানব দেবতুল্য রূপে সকলের পূজ্য ও এসংসার স্বর্গধাম বলিয়া পরিগণিত হইত।

যদি কোন কুচরিত্র লোক কোন ধার্ম্মিক লোকের সহিত ক্ষণকালের জন্যও আলাপাদি করে, সেই ক্ষণকালের জন্যও তাহার হৃদয়ের অপবিত্র ভাব সকল দূরে পলায়ন করে এবং নিজ হৃদয়ের পবিত্রতার অভাব উপলব্ধি করিতে সমর্থ হয়।

ধর্ম্মের মনোহারিণী শক্তিবলে শত্রুতা মিত্রতাতে পরিণত হয়। হিংসা দ্বেষ অরিদল অবিলম্বে পলায়ন করে। একমাত্র ধর্ম্মবলে মানব, জগতে চিরস্মরণীয় হইয়া গিয়াছে। মহাত্মা যিশুখৃষ্টকে কত অশেষ যাতনা প্রদানে প্রাণ লওয়া হয়, তথাপি তিনি স্বীয়ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিলেন না, এখনও কত জাতি তাঁহাকে ঈশ্বররূপে পূজা করিয়া থাকেন।

ধর্ম্মই মানবের প্রকৃত বন্ধু। শাস্ত্রকার বলেন, "যে ব্যক্তি ধর্ম্মকে নাশ করে, ধর্ম্ম তাহাকে নষ্ট করেন, আর যিনি ধর্ম্মকে রক্ষা করেন তিনি ধর্ম্মকর্তৃক সুরক্ষিত হন। অতএব ধর্ম্মকে নাশ করিবে না ধর্ম্ম হত হইয়া আমাদিগকে নষ্ট না করুন।" কি সুন্দর বর্ণনা!! একজন ধার্ম্মিক ব্যক্তির জীবন

শত শত লোকের জীবনকে আলোকিত করে শত শত লোককে সুখের পথ দেখাইয়া দেয়। হৃদয় পবিত্র, নির্ম্মল ও শান্তি-পূর্ণ হয়।

মানব মোহান্ধ, ঘোর মোহে অচেতন রহিয়াছে তাই ধর্ম্মের দিকে একবারও ফিরিয়া চাহে না। কত লোক ধর্ম্ম আছে একথা বিশ্বাস করিতেও চাহে না, শুধু আমার আমার বলিয়াই ব্যাকুল, কিন্তু যাহাকে বাস্তবিকই আমার কই তাহাকে তো একবারও আমার বলিয়া অভিহিত করি না।

বাস্তবিক এ সংসারে ধর্ম্মের উপরই মানবের সুখ শান্তি সকলই নিহিত রহিয়াছে। যদি প্রত্যেক মানব একবার ধর্ম্ম-লাভে যত্নবান হইত তবে মানব জীবন কি সুখময় হইত।

শ্রীপ্রিয়বালা সেন গুপ্তা

এতদ্দেশীয়া মহিলাদের শিল্প শিক্ষা

(শ্রীহট্ট মহিলা সমিতিতে পঠিত)।

ভারতের নানা স্থানে স্ত্রীলোকের উপযোগী নানাবিধ শিল্প প্রচলিত আছে, কিন্তু উপযুক্ত পরিচালনার অভাবে কোনটাই সম্যকরূপ উন্নতি লাভে সমর্থ হইতেছে না। বস্ত্রবয়ন, সূচীকার্য্য, উলের কার্য্য, জরী ও রেশমের কার্য্য প্রভৃতি প্রচলিত শিল্পের মধ্যে বস্ত্রবয়ন ও সূচী-কার্য্যই সর্ব্বপ্রধান এবং সমধিক প্রয়োজনীয়। আসামী এবং মণিপুরী রমণীগণ তাহাদের ব্যবহার্য্য বস্ত্রাদি স্বয়ং প্রস্তুত করিয়া থাকে। শ্রীহট্ট অঞ্চলে মণিপুরী রমণীগন তাহাদিগের প্রস্তুত খেশ, গামছা প্রভৃতি বিক্রয় করিয়া স্বীয় জীবিকা অর্জ্জন করিয়া থাকে। আমাদের দেশীয় রমণীগণের এই অত্যুৎকৃষ্ট শিল্প শিক্ষা করা একান্ত কর্ত্তব্য; কিন্তু অনেকেই ইহার উপকারিতা বুঝিতে চেষ্টা করেন না। সূচী কার্য্যে আধুনিক স্ত্রীলোকের মধ্যে অনেকেই অভ্যস্ত কিন্তু ইহার সদ্ব্যবহার করিতে অনেকেই জানেন না। নিত্য ব্যবহার্য্য জামা প্রভৃতি নিজে প্রস্তুত করিতে পারিলে পরিবারের অনেক ব্যয় সংক্ষেপ হইয়া থাকে। বস্ত্রবয়ন ও সূচীকার্য্য এই উভয়বিধ শিল্পকার্য্যে অভ্যস্ত থাকিলে অনেক সময় স্বীয় উদরান্নের নিমিত্ত অপরের গলগ্রহ হইতে হয় না। দুঃখের বিষয় আমাদের দেশীয়া স্ত্রীলোকেরা উদরান্নের নিমিত্ত অপরের গলগ্রহ হইতে বিন্দুমাত্র সঙ্কুচিত হন না, কিন্তু স্বীয় পরিশ্রম দ্বারা জীবিকা উপার্জ্জন করিলে নিন্দার কার্য্য বলিয়া মনে করেন। আমাদের দেশীয়া স্ত্রীলোকেদের মধ্যে চিত্র অঙ্কন, নরুণের দ্বারা কাগজ কাটা, ছাঁচ খোদা প্রভৃতি সূক্ষ্মশিল্প প্রচলিত আছে কিন্তু এসকল কার্য্যে লোকের শৈথিল্যবশতঃ ইহা ক্রমশঃই লোপ পাইতে আরম্ভ হইয়াছে। এসকল অত্যুৎকৃষ্ট সূক্ষ্ম শিল্পের পুনরুদ্ধার বাঞ্ছনীয়। শিল্পবিদ্যা একটী উৎকৃষ্ট কার্য্যকরী বিদ্যা। অন্যান্য বিদ্যার ন্যায় শিল্প বিদ্যা শিক্ষা না করিলে শিক্ষা পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় না। শিল্পের উন্নতি ব্যতীত কোন দেশ বা জাতি দুঃখ দারিদ্র্যের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইতে পারে

না। ইহার উন্নতির অভাবেই আমাদের ভারতমাতা ঘোরতর দারিদ্র্যে নিমগ্ন। শিল্পের যথার্থ উন্নতি ব্যতীত এ দারিদ্র্য ঘুচিবার নহে। সুখের বিষয় সুশিক্ষিত ভারত সন্তান-গণ আজ কাল শিল্পের যথার্থ উপকারিতা হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইতেছেন, এবং ইহার উন্নতি কল্পে তাঁহাদের মধ্যে বিশেষ ব্যগ্রতা ও উৎসাহ পরিলক্ষিত হইতেছে। ভারতের নানাস্থানে শিল্প প্রদর্শিনী হইতেছে তাহাতে বস্ত্রাদি নানাবিধ দেশীয় শিল্পদ্রব্য প্রদর্শিত হইতেছে ইহাদ্বারা দেশের নানাবিধ শিল্প সম্বন্ধে বিশেষ অভিজ্ঞতা লাভের উপায় হইয়াছে, দেশের রাজা মহারাজা ইহার পৃষ্ঠ পোষক হইয়াছেন, ইহা সুখের বিষয় সন্দেহ নাই ; কিন্তু ইহাই যথেষ্ট নহে, দেশের প্রকৃত মঙ্গল কামনা করিলে রমণীগণকেও এক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে হইবে। স্ত্রী পুরুষ উভয়ের চেষ্টা ব্যতীত কোন জাতি যথার্থ উন্নতি লাভে সমর্থ হয় না। দুঃখের বিষয় আমাদের দেশে স্ত্রীলোকের শিল্প শিক্ষার কোন আয়োজন দৃষ্ট হয় না, বালিকা বিদ্যালয়সমূহে যে সমস্ত শিল্প শিক্ষা দেওয়া হয় তাহা অতি সামান্য মাত্র। কয়েক বৎসর যাবৎ কলিকাতায় কয়েক জন ব্রাহ্ম মহিলা একত্রিত হইয়া একটী শিল্প শিক্ষা শ্রেণী খুলিয়াছেন, তাহাতে একজন ইউরো-পীয় শিক্ষয়িত্রী নিযুক্ত করা হইয়াছে। এখানে প্রথমে কেবল দরজীর কার্য্য শিক্ষা করা হইবে এবং তৎপর টাইপরাইটিং ঘড়িমেরামৎ প্রভৃতি কার্য্য শিক্ষা করা হইবে। যদি স্থানে স্থানে মহিলাগণ কর্তৃক এরূপ শিল্প শিক্ষা সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয় এবং উপযুক্ত শিক্ষায়ত্রী নিযুক্ত করা যায় তাহা হইলে শিল্পশিক্ষা সম্বন্ধে অনেক সুবিধা হইতে পারে। স্থানে স্থানে শিল্প প্রদর্শনী খুলিয়া তাহাতে এ দেশীয় মহিলাদের প্রস্তুত নানাবিধ শিল্প প্রদর্শিত হইলে, নানা স্থানে বিভিন্ন প্রকারের শিল্প সম্বন্ধে অভিজ্ঞতালাভ করা যাইতে পারে এবং যাঁহাদিগের কার্য্য সর্ব্বোৎকৃষ্ট বিবেচিত হইবে, তাঁহাদিগকে পুরস্কৃত করিলে মহিলাদের এ বিষয়ে উৎসাহ বৃদ্ধি হইতে পারে

শ্রীকুমুদিনী সিংহ।

রন্ধন

চাল ভাজা ও চাল ভাজার মোয়া—একটী হাঁড়ীতে বালি দিয়া উনুনে চড়াও এদিকে চাটি চাল সাজিতে করিয়া নীজের কাছে রাখ। বালি গরম হইয়াছে কিনা একখানি কাঠ দ্বারা দেখ, যদি কাঠের অগ্রে গাঢ় কাল ধূঁয়া উঠে তবেই বালি গরম হইল, দুমুঠা কি তিন মুঠা চাউল সেই গরম বালিতে দাও এবং বাউলী দ্বারা সেই হাঁড়ী অনবরত নাড়িতে থাক এদিকে বালির ভিতর চাউলগুলি কুল কুল করিয়া চাল ভাজা হইবে। অমনি খুব তাড়াতাড়ি ঝাঁঝড় ছাপরার ভিতর ঢালিয়া ফেল এবং অতি তাড়াতাড়ি বালি শুদ্ধ হাঁড়ীটা দূরে রাখিয় কুচি দ্বারা ঐ গুলি নাড়িতে থাক। ঝাঁঝড়ের ছিদ্রে বালিগুলি পড়িয়া যাইবে, এবং ভাল চাল ভাজা হইবে। পরে সেই গুলি কাপড়ের

ভিতর লইয়া চালিতে থাক। অতঃপর অন্য পাত্রে ঢাল। এইরূপ করিলে অবশিষ্ট যাহা বালি থাকিবে তাহাও বাহির হইয়া যাইবে। এই হইল চাল ভাজা। চাউল ভাজারও মোয়া হয়, যেমন করিয়া মুড়কীর মোয়া প্রস্তুত করিতে হয় চাউল ভাজার মোয়াও সেইরূপে প্রস্তুত করে।

শ্রীঅম্বুজাসুন্দরী দাস গুপ্তা।

ট্যাঁড়সের ব্যঞ্জন—আধসের কচি কচি ট্যাঁড়স বেশ করিয়া ধুইয়া দুইধার কাটিয়া রাখ, পরে একটা পাত্রে ঘি চড়াইয়া একটু হিং সম্বারে দাও পরে ট্যাঁড়স ঐ ঘিতে দিয়া ভাজিতে আরম্ভ কর, ভাজা ভাজা হইলে তাহাতে লবণ, আমচুর দিয়া অল্প নাড়িয়া সুঁট বা আদা বাটা দিয়া পরে গুড়, অল্প ধনেবাটা জিরা বাটা দাও, একটু ভাজিয়া জল দিয়া ঢাকা দাও। সুসিদ্ধ হইলে গরম মশলা বাটা দিয়া নামাইয়া রাখ।

শ্রী চা দেবী।

হিন্দুস্থানী ধরণে করলার ব্যঞ্জন

রন্ধনের প্রণালী—প্রথমে করলা গুলি বেশ করিয়া ছাড়াইয়া খণ্ড খণ্ড করিয়া কুটিয়া অল্প লবণ মাখাইয়া রাখ এবং আধ-ঘণ্টা পরে সেগুলিকে খুব জোরে হাত দিয়া চাপিয়া জল বাহির করিয়া ফেল। সেই জল ফেলিয়া দিবে। একটা কড়াইতে কিম্বা কলাইকরা পাত্রে খানিকটা ঘি কিম্বা তৈল আগুনে চড়াও। সেই ঘৃতে একটু হিং দাও পরে ধনে, লঙ্কা ও হলুদ বাটা পরিমাণ মত দিয়া খুন্তীর দ্বারা নাড়িতে থাক। মশলাগুলি ভাজা হইয়া একটু সুগন্ধ বাহির হইলে করলা গুলি ছাড়িয়া নাড়িতে থাক, কিছু ভাজা ভাজা হইলে লবণ ও জল দাও, জল এরূপ পরিমাণ দিবে যাহাতে করলা সিদ্ধ হইলে শুকাইয়া যায়। অর্দ্ধ সিদ্ধ হইলে কয়েকটা আমচুর খণ্ড উহাতে দাও। সুসিদ্ধ হইলে মৌরী, গোল মরিচ, জায়ফল, জৈত্রী, এলাচ ও লবঙ্গ চূর্ণ করিয়া, উপরে ছড়াইয়া দাও, সর্ব্বশেষে খানিকটা ঘৃত দিয়া নাড়িয়া চাড়িয়া নামাইয়া রাখ।

কবিতা।

খুকুরাণী।

কে তুমি হৃদয় মাঝে
বীণাপানি সমা মোর?
এ বীণায় ছিন্ন তন্ত্রী
বেজেছে পরশে তোর,
খুলে গেছে জীবনের
অবরুদ্ধ দ্বার গুলি,
তোর মুখ চেয়ে, চেয়ে,
আপনারে গেছি ভুলি।
কুসুম পেলব জিনি
কোমল জীবনে তোর
ফোটেনা কণ্টক যেন,
প্রাণময়ী খুকু মোর।
অনাঘ্রাত থাক বালা
পবিত্র কুসুম সমা
থাক চির হাসি মাখা,
থাক চির মনোরমা
যেন কভু ও কপোলে
বহে না'রে অশ্রুধার
আজি এ বিশেষ দিনে
আকুল প্রার্থনা মার

শ্রীসরলা দত্ত।

উড়িষ্যায় জগন্নাথ দর্শনে লিখিত।

"জয় জগন্নাথ, মহিমা আকর
জয় জগবন্ধু, প্রেমময় হরি,"
স্মরি দীনেশের, দয়াময় নাম,
উঠিলাম গিয়ে বাষ্পরথো-পরি।
বহুদিন হ'তে, ছিল মনে সাধ,
নীলাচলে হরি, করিতে দর্শন,
নব রেল পথ, নির্ম্মাণ সুযোগে,
সে বাসনা আজি হইল পূরণ।
উল্লাসে পূরিত, উদ্বেগ হৃদয়ে,
শত লোক স্মৃতি বিস্মৃত হইয়ে,
শুনি জনরব, থাকে না সন্তাপ,
আনন্দময়ের আনন্দ আলয়ে।
অগ্নি বাষ্পরাশি, করি উদ্গীরণ,
বায়ু বেগে রথ, ছুটিল ধাইয়ে,
দুই পার্শ্বে ক্ষেত্র, শ্যামল সুন্দর,
নয়ন রঞ্জন দেখিনু চাহিয়ে।
মাতঃ বঙ্গভূমি! চিরদিন তুমি,
সুজলা, সুফলা, সৌন্দর্য্য রূপিণী,
নীহার মণ্ডিত, সুশ্যামলতনু,
অনন্ত উর্ব্বরা, আনন্দ দায়িনী।
ছাড়ি গেল ক্রমে, কত ক্ষুদ্র গ্রাম,
কুলপ্লাবীনদ, মহানদী কত,
"রূপ নারায়ণ," "মহানন্দা" সেতু
পার হয়ে বেগে, ছুটিতেছে রথ।
দুকূল প্লাবিত, "দামোদর" নদ,
হরিষ অন্তরে, দেখিতে দেখিতে,
ভীম বজ্রবেগে, সুবৃহৎ সেতু,
অতিক্রম করি ধাইল চকিতে।
সহসা কিসের; সুতীব্র গন্ধেতে,
রুদ্ধ হয়ে গেল, নাসিকার দ্বার,
কিসের এ গন্ধ? উদ্বিগ্ন অন্তরে,
করি পরস্পরে মীমাংসা আবার।

অকস্মাৎ এক, মহাকোলাহল,
শিহরিয়া তনু, প্রবেশিল কাণে,
"আগুন আগুন" "ফিমেলক্যারেজে"
"নেমে এস সবে অতি সাবধানে"
গভীর নিশীথে, ক্ষুদ্র ষ্টেসনেতে,
বাষ্পীয় শকট, থামিল অমনি,
ভীষণ চীৎকারে, ঘোর কোলাহলে
নাগে প্রাণ ভয়ে যতেক রমণী
কোথায় আগুন, কিসের আগুন,
লইল না কেহ সন্ধান তাহার,
ঠেলাঠেলি করি, নামিতে পারিলে,
এ যাত্রা জীবন রক্ষে আপনার।
কোথা জগন্নাথ, তোমার দর্শনে,
এ বিপদ কেন ঘটিলরে হায়,
অভাগাজনের, বিদগ্ধ অদৃষ্ট,
সর্ব্বত্রে সমান, সঙ্গে বুঝি যায়।
রমণী কণ্ঠের, ঘোর আর্ত্তনাদে,
নিশীথ গগন উঠিলেক ভরি,
বাষ্প যান চক্রে, পথ সংঘর্ষণে,
জ্বলিল অনল ধূমাচ্ছন্ন করি।
শ্রীক্ষেত্র দর্শন, হয়েছে সুগম,
শত তীর্থ যাত্রী উল্লাসে মগন,
ছিল ক্ষণ পূর্ব্বে, যেই বাষ্প রথ,
সহস্র কণ্ঠের প্রশংসা ভাজন;
এবে যমালয়, যেন মনে হয়,
শশব্যস্ত সবে, কক্ষ ত্যজিবারে,
ক্ষণেক বিলম্বে, মনে হয় বুঝি,
জীবন্তে দাহন হইল এবারে।
হ'লে জন শূন্য, ধূমায়িত বহ্নি-
করি নির্ব্বাপিত, ত্যজিয়া সে গাড়ী
চলিল আবার, বাষ্পীয় শকট,
সদম্ভে ভীষণ হুহুঙ্কার ছাড়ি।
আপন গরবে, ছুটিল সবেগে,
নিশ্বাসে অনল, করি উদ্গীরিত,

ত্যজি ক্রমে ক্রমে, বঙ্গের সীমানা,
উড়িষ্যায় আসি হ'ল উপনীত।
অভিনব দেশে, অভিনব বেশে,—
উড়িয়া রমণী, অপূর্ব্ব দর্শন,
শ্রবণে কুন্তল, উড়িয়া মানব;
শিরে বদ্ধ বেণী শ্যামল বরণ।
বায়ু গতি রথ, আঁখির নিমিষে,
কত দেশ গ্রাম, ত্যজিবেগে ধায়,
প্রান্তর প্রান্তর অক্লেশে ভেদিয়া
মহানদী বক্ষঃ পার হয়ে যায়।
যত দূর দৃষ্টি নীলাচল শ্রেণী
শোভে দুই প্রান্তে প্রশান্ত অটল,
কোথা গিরিগাত্রে খেলে কাদম্বিনী,
ঘন গরজনে বরষিয়া জল।
প্রভাত সূর্য্যের, প্রথম কিরণে,
অচল শিখরে কি শোভা সুন্দর
আধ স্নিগ্ধ ছায়া, আধ রৌদ্রোজ্জ্বল,
দূর হতে কিবা দৃশ্য মনোহর।

শ্রীসুশীলাবালা দেবী।

চাঁদের হাসি।

ঝিল্লী মুখর নিঝুম রাতে
পত্র মর্ম্মর মলয়া সাথে,
ভাসে চন্দ্রমা বিমল নীরে
কূলে ভাঙ্গিছে ঊর্ম্মি ধীরে।
দূর প্রান্তর শ্যাম ভূমে
শস্প কম্পিত আবেগ ভরে,
বায়ু সনে ছায়া খেলে,
ক্লান্ত শিশির নীরবে ঝরে।
ফুল্ল কুসুম চন্দ্র হেরে
তনু আবরি সরমে হাসে,
লয়ে জ্যোছনা-আঁচল ভরে
আশা হরষ নয়নে ভাসে।
স্নিগ্ধ রজনী পরেছে অঙ্গে
শুভ্র মধুর জ্যোছনা বাস,
স্বপ্ন আবেশে প্রকৃতির কোলে
নিরালায় দিগ্ বধূর হাস'।
স্তব্ধ কাননে, মুক্ত কণ্ঠে,
স্বর ললিত বিহগ গায়,
দিন যামিনী বহিয়া যায়,
প্রাণ তিয়াষা বাসনা ময়।

শ্রীনীরজা দেবী।

কৃষ্ণ চূড়া।

ও মধুর কৃষ্ণচূড়া কি ভাবে রয়েছ দাঁড়া,
প্রিয়পুষ্পে সুসজ্জিত হইয়া প্রাঙ্গনে?
হৃদয়ে লতিকা তোর, মধু পানে হয়ে ভোর'
হেরিছে ত্রিদিব রাজ্য অমৃত স্বপনে,

খেলিছে অধর প্রান্তে জ্যোছনা-বল্লরী
চকিতে তড়িৎ লতা ক'য়ে যায় কত কথা
আঁখিতে মদিরা মাখি, বিশ্ব মুগ্ধ করি।

শরীরে স্বর্গীয় সুধা সৌন্দর্য্য অতুল
প্রীতি ও পুণ্যের ছবি কি কলে আঁকিল কবি,
প্রচুর প্রণয়াদরে বেহুস্ বেভুল,

শ্রীঅম্বুজা সুন্দরী দাস গুপ্তা।

শ্মশান।

শুনিলে তোমার নাম কেন হয় ভয়?
মানবের একমাত্র শান্তির আলয়!
শোকে তাপে দগ্ধ হ'য়ে, তোমার নিকটে গিয়ে,
শুইয়া তোমার ক্রোড়ে; মানব হৃদয়,
জীবনান্তে পায় শান্তি অনন্ত অক্ষয়!

২

কুল কুল কুল রবে ওই স্রোতস্বিনী,—
তব পাদ ধৌত করে, নেচে নেচে ধীরে ধীরে,

যাইতেছে কোন পথে! দিবস রজনী
অবিশ্রান্ত অবিরাম কল নিনাদিনী।

৩

যাইতেছ কোন্ দেশে বলগো তটিনি?
শত শত উর্ম্মিমালা, হৃদয়ে করিছে খেলা,
আপনার ভাবে মগ্ন হইয়া আপনি,—
কাহার দর্শন আশে চলেছ তটিনি?

৪

শ্মশানে হইয়া ভস্ম মানবের দেহ,—
জীবনের শেষ দিনে, মিশে যায় তব সনে,
তুমি বুঝি লয়ে যাও পিতার সদনে?
নিত্য সুখ ময় সেই শান্তি নিকেতনে!

৫

যুগে যুগে এইরূপ কুল কুল রবে—
বহিতেছ নিরবধি, হরষিত মনে নদি!
কত রাজা কত দুঃখী ও পবিত্র নীরে,—
গিয়াছে মিশিয়া তাহা কে বলিতে পারে।

৬

আমারে কি নিতে পার? অয়ি! স্রোতস্বিনি,
তাই আজ ভাবি মনে, আসিয়াছি এ শ্মশানে
স্নেহময় পিতা মাতা প্রাণের ভগিনী,
যে দেশে গিয়াছে, যাব সেই দেশে আমি!

৭

শ্মশান! তোমার নামে কেন হয় ভয়?
এমন মধুর তুমি, অনন্তের ক্রীড়া ভূমি,
তোমার মতন এত সুখ শান্তিময়,
ভূমণ্ডলে স্থান আর নাহিক কোথায়?

৮

শোকাতুর রোগ ক্লিষ্ট দারিদ্র্য পীড়িত,—
কিম্বা সুখী নরনারী, সমান আদর করি,
স্থান দাও তব ওই প্রশস্ত হৃদয়ে,
তিল মাত্র ভেদ নাই তোমার আলয়ে!

৯

তোমার কোলেতে বসে মানব যখন,—
সংসার ভাবনা আর, জ্বালাতে না পারে তার,
অনন্ত সমাধি মগ্ন হয় সে তখন;—
যোগ সাধিবার তুমি পবিত্র আসন।

১০

বড় জ্বালা বড় ব্যথা লইয়া পরাণে,—
এসেছি তোমার পাশে, স্নেহ কণা প্রকাশে,
স্থান দাও মোরে তব পবিত্র সদনে।
জুড়াক তাপিত প্রাণ তব পরশনে!

১১

প্রসারিয়ে বাহু দুটি ধর গো আমারে!
ঘৃনা করে আর মোরে, দিওনা ফেলিয়া দূরে,
শ্মশান! তোমার কাছে ভেদাভেদ নাই,
আমার প্রাণের জ্বালা জুড়াবে কি ভাই!

১২

নীরবে রহিলে কেন শ্মশান এমন!
এমন উদার তুমি, করুণার লীলা ভূমি,
আমার যাতনা রাশি ঘুচাতে তোমার,
দেখিছি কেন হে এত উদাস অন্তর!

১৩

তোমারো কোলে কি হায়! নাহি মোর স্থান.
তুমিও আমারে হেরে, ঠেলে দিলে ঘৃণা করে,
কোথায় যাইয়া আর জুড়াব হৃদয়?
কে নিভাবে এ প্রাণের জ্বলন্ত নীলয়?

১৪

শ্মশান! চলিনু আমি গৃহে ফিরে আজ,
এমনি কাঙ্গালী বেশে, আসি যদি তব পাশে,
এমনি কাতর ভাবে চাহি যদি স্থান,
করুণা প্রকাশ করি, মুছায়ে নয়ন বারি,
একটুকু স্থান মোরে করিও প্রদান!

শ্রীকুমুদেন্দু দেবী।

বিবিধ প্রসঙ্গ।

কয়েকটী আশ্রমের কথা।—কলিকাতায় বোবাদের শিক্ষার জন্য এক বিদ্যালয় আছে, অন্ধদের শিক্ষার জন্য এক বিদ্যালয় আছে, অনাথ বালকবালিকার বাসের জন্য অনাথ আশ্রম আছে, জরাভারাক্রান্ত দুরারোগ্য স্ত্রীলোক ও পুরুষের বাসের জন্য আতুরাশ্রম আছে। অপার সার্কুলার রোডে মূখ ও বধির বিদ্যালয়ের জন্য এক সুন্দর বাটী নির্ম্মিত হইয়াছে। এই বিদ্যালয় নির্ম্মাণের জন্য প্রায় ৬০।৭০ হাজার টাকা ব্যয় হইয়াছে। কিছু কাল হইতে এই নূতন বাটীতে বিদ্যালয় স্থানান্তরিত হইয়াছে।

অন্ধদের জন্য বিদ্যালয় হইয়াছে বটে, কিন্তু কাহারও বিশেষ সহায়তা না পাওয়াতে বাবু লালবিহারী সাহা একাকী হাবুডুবু খাইতেছেন। তিনি ঈশ্বরের উপর নির্ভর করিয়া অন্ধদিগকে লেখাপড়া নানাপ্রকার শিল্পকার্য্য শিখাইতেছেন। ইঁহাকে সাহায্য করিবার কি কেহ আসিবেন না?

অনাথ আশ্রমে ৩০।৪০টী বালকবালিকা প্রতিপালিত হইতেছে। বাবু প্রাণকৃষ্ণ দত্ত তাহাদের সেবা করিতেছেন। কুমার মন্মথনাথ মিত্র এই আশ্রমের বাটীর জন্য ২৩ কাঠা জমি দান করিয়াছেন। বাটী নির্ম্মাণের জন্য ১৫,০০০৲ টাকা চাঁদা স্বাক্ষরিত হইয়াছে। ছোটলাট বিগত জানুয়ারী মাসে এই বাটীর ভিত্তি স্থাপন করিয়াছেন।

আতুরাশ্রমের ভার বাবু আনন্দচন্দ্র বিশ্বাস একাকী বহন করিতেছেন। দুরারোগ্য রোগিগণ আতুরাশ্রমে বাস করে, আনন্দ বাবু একাকী তাহাদের ভরণপোষণ করেন, একাকী তাহাদের মলমূত্র পরিষ্কার করেন, একাকী তাহাদের সেবাশুশ্রূষা করেন। আনন্দ বাবু নিজে দরিদ্র অথচ এক বৃহৎ কার্য্যে জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন—আতুরাশ্রমের জন্য কি কেহ বাটী নির্ম্মাণ করিয়া দিবেন না? আতুরদের সেবার জন্য কি কেহ আনন্দ বাবুর সহায় হইবেন না?

সদনুষ্ঠান।—বোম্বাইয়ের কতিপয় শিক্ষিতা মহিলা দরিদ্রদিগের ক্লেশ দূরীকরণে সচেষ্ট হইয়াছেন দেখিয়া আমরা প্রীতিলাভ করিয়াছি। বোম্বাই হাইকোর্টের বর্ত্তমান প্রধান বিচারপতি মহোদয়ের পত্নী শ্রীমতী জেঙ্কিন্স এই কার্য্যে অগ্রণী। তাঁহার চেষ্টায় সেনিটারি এসোসিয়েসনের সংস্রবে একটী মহিলা কমিটী গঠিত হইয়াছে। ইঁহারা চাঁদা সংগ্রহ পূর্ব্বক বেতন প্রদানে কতিপয় রমণীকে স্বাস্থ্য-পরিদর্শকরূপে নিযুক্ত করিবেন। এই সকল মহিলা দরিদ্রদিগের বাটীতে ও কল কারখানায় গমন পূর্ব্বক রমণীদিগকে স্বাস্থ্য রক্ষা, পরিচ্ছন্নতা প্রভৃতি বিষয়ে সদুপদেশ প্রদান করিবেন। কমিটীর মহিলা সদস্যগণ রমণীকর্ম্মচারিগণের কার্য্যকলাপের উপর দৃষ্টি রাখিবেন। আমরা শ্রীমতী জেঙ্কিন্স ও তদীয় সহযোগিনী মহোদয়াগণের সাধু উদ্যমের প্রশংসা করি। ইঁহারা পীড়িত ও বিপন্ন দরিদ্রদিগকে অর্থ সাহায্য দানের ব্যবস্থা করিতে পারিলে আমরা আরও সুখী হইব। আশা করি, ভারতের অন্যান্য নগরের মহিলামণ্ডলী এ বিষয়ে শ্রীমতী জেঙ্কিন্সের দৃষ্টান্তের অনুসরণ পূর্ব্বক মানব সমাজে অক্ষয় কীর্ত্তি স্থাপনে যত্ন পরায়ণ হইবেন।

শ্রীহট্ট মহিলা সম্মিলনীর প্রথম বার্ষিকোৎসব।— ১৭ই মাঘ, ২৭শে জানুয়ারী বুধবার অপরাহ্ণ ২টার সময় অন্তঃপুর সম্পাদিকার গৃহে স্থানীয় ভদ্র মহিলাগণ সমবেত হন। ২টার পরে সভার কার্য্য নিম্নলিখিত প্রণালীতে সম্পন্ন হয়। সঙ্গীত ও প্রার্থনার দ্বারা সভার কার্য্য আরম্ভ হয়। মহাভারত হইতে সাধ্বী জরৎকারী উপাখ্যান পাঠ ও সহধর্ম্মিণীর কর্ত্তব্য সম্বন্ধে উপদেশ হয়। জনৈক ভগিণী "হিন্দুসমাজে বঙ্গনারীর অবস্থা" বিষয়ক প্রবন্ধ পাঠ করেন। লেখিকা আমাদের বর্ত্তমান অবস্থার শিক্ষা সম্বন্ধে কতকগুলি সারগর্ভ কথা লিখিয়াছেন। অবশেষে "আমরা নিজেরা কুলবধূ ও বালিকাগণের জ্ঞানোন্নতির জন্য কি করিতে পারি" এবিষয় আলোচনা হয়। আলোচনান্তে জনৈক ভগিণী প্রস্তাব করেন "যে প্রত্যেক পাড়াতে একজন মহিলাও যদি প্রতি সপ্তাহের মধ্যে একদিন হউক বা প্রত্যহ কিছু সময় প্রতিবেশিনী বালিকাদিগকে পাঠ শিল্প কর্ম্ম শিক্ষাদেন, তাহা হইলে ও অনেকটা উপকার দর্শিতে পারে; আমাদেরও সময়ের সার্থকতা হয়। এবং বৎসরান্তে অন্তঃপুর বাসিনীগণের প্রস্তুত শিল্পদ্রব্য সমূহ সংগ্রহ করিয়া প্রদর্শনী করিলে মহিলাদিগের শিল্পোন্নতি হইতে পারে আমরা সামান্য শিক্ষার জন্য খৃষ্টান মিশনারীদেরনিকট বালিকাদিগকে পাঠাইয়া তাহাদের কোমল হৃদয়কে বিকৃত করিতেছি। মিশনারীদের স্কুলে যে শিক্ষা প্রদত্ত হয়, তাহা আমাদের দেশের বালিকাদের পক্ষে যে উপযোগী নহে, তাহা সকলেই স্বীকার করিবেন। এবং যাহাতে ভবিষ্যতে মাতৃগণ কন্যাদিগের সুশিক্ষার প্রতি মনোযোগী হন তাহাও করিতে হইবে। এক জনার চেষ্টাতে যাহা হয় না, দশজনার সমবেত চেষ্টাতে তাহা সফল হয়।" সর্ব্বসম্মতি ক্রমে প্রস্তাব গৃহীত হইল, এবং কয়েকটী মহিলা প্রস্তাবিত বিষয় কার্য্যে পরিণত করিতে উদ্যোগী হইলেন।

প্রায় ২৫।২৬ জন মহিলা সভাতে উপস্থিত ছিলেন। সকলেই এইরূপ সম্মিলনীর উপকারিতা অনুভব করিয়া আনন্দ প্রকাশ পূর্ব্বক সভার কার্য্য শেষ করিলেন।

মেসিডোনিয়ার নারীসেনা।—স্বাধীনতার যুদ্ধে মেসিডোনিয়ার বীর রমণীগণ তুর্কির বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়াছেন। এই নারীসেনা দলের "জয়কাইভানভ" নাম্নী জনৈক রমণী অদ্ভুত সাহস ও বীরত্ব প্রদর্শন করিয়া সকলকে বিস্মিত করিতেছেন। যুদ্ধের পূর্ব্বে এই বুলগেরিয়ান রমণী শিশুদিগের শিক্ষয়িত্রীর কার্য্য করিতেন। কিন্তু বিপ্লব যখন বাধিয়া উঠিল, তখন ইনি পুঁথি ফেলিয়া অসি ধারণ করিলেন। জয়কাইভানভ এপর্য্যন্ত বহু দলে মিশিয়া তুর্কির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছেন; এবং সর্ব্বত্রই অসাধারণ শৌর্য্য বীর্য্যের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। আবার কখন কখন স্বয়ং সেনাপতির পদ গ্রহণ করিয়া বহু সেনার উপরে নেতৃত্ব করিয়াছেন। একবার তুর্কি সৈন্য তাঁহার সৈন্যদলকে সম্পূর্ণরূপে বেরিয়া ফেলে; সৈন্যগণ হতাশ হইয়া পড়িতেছিল। জয়কা তখন উচ্চৈঃস্বরে প্রার্থনা করিয়া সৈন্যগণকে অনুপ্রাণিত করিলেন, এবং অদম্য বেগে শত্রুব্যূহ ভেদ করিয়া চলিয়া গেলেন। তুর্কি সৈন্যগণ এই বীর রমণীকে অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন বলিয়া বিশ্বাস করে, এবং তাঁহাকে দেখিলে অশুভ আশঙ্কায় পলায়ন করে। বিদ্রোহিগণ ইহাঁকে দ্বিতীয় জোয়ান অব্ আর্ক বলিয়া শ্রদ্ধাভক্তি করিতেছে।